নিবেদিতা লোকমাতা

তৃতীয় খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৫
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

ISBN 81-7066-113-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪০·০০

ভূমিকা

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশে নিবেদিতার ভূমিকা-প্রসঙ্গ এই খণ্ডে শেষ হল। এদেশে নিবেদিতার কার্যকাল যদিও মাত্র এক দশকের মতো, কিন্তু ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তা কালসীমাকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছে। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সেবা—এসব প্রসঙ্গ এখনো এই গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে আসেনি, কিন্তু ইতিমধ্যে যেটুকু পরিচয় মিলেছে (সবিনয়ে বলছি, খণ্ড পরিচয়টুকুই মাত্র উদ্ধার করা গেছে) তাতেই মনে হয়েছে, এই রকম সৃষ্টিময়ী চরিত্র ইতিহাসে দুর্লভ।

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার কথা বলার সময়ে এই আন্দোলনের রূপ ও প্রকৃতির বিষয়ে অনেক কথাই বলতে হয়েছে। তার ফলে গোটা স্বদেশী আন্দোলনের এক ধরনের ইতিহাসও এখানে মিলবে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষে প্রথম সত্যকার সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলন; বঙ্গবিভাগ সূত্রে তার সূচনা; পরিণতি—গোটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। স্বদেশী আন্দোলনের বৈপ্লবিক ও অবৈপ্লবিক রূপের ভিতর-বাহিরের নানা পরিচয় এই গ্রন্থে এসে গেছে।

নিবেদিতার পত্রাবলী-সূত্রে অন্যত্র সন্ধান ক'রে যেসব সংবাদ মিলেছে তাদের অনেক কিছুই বর্তমানের বিদ্বৎসমাজে অজানিত। সেইসকল তথ্যের কিছু অংশের আকার আবার যথেষ্ট সুন্দর নয়, বলা উচিত খুবই শ্রীহীন। সত্যের খাতিরে সেসব বিবরণ অল্পবিস্তর তুলে ধরতে হয়েছে, যা অনেকের মনঃপূত হবে না, বিতর্কের সৃষ্টি করবে। তবে ভরসা করি, তার দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা হবে। বিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা বা অ্যানী বেশান্তের ছবি সোনার জলে ধুয়ে আসেনি। অরবিন্দের ছবি সমুজ্জ্বল, তাঁর প্রতি নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধা, তবু অরবিন্দের অনেক মতের প্রতিবাদ নিবেদিতা করেছেন। অরবিন্দের পণ্ডিচেরী প্রস্থানকালে নিবেদিতার ভূমিকাও বিতর্কের উৎস। বিভিন্ন পক্ষীয় মতামত আমি যথাসম্ভব উপস্থিত করেছি। এ সকলই পাঠকসমাজে নাড়া দেবে বলে মনে হয়।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত করার কাজে ব্রতী হয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক কোন্ কঠিন শাস্তিভোগ করেছিলেন, সেই কথা বলার কালে তিলকের পত্র-পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে নানা সময়ে যা লেখা হয়েছিল তাদের বিস্তৃত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি দ্বিতীয় খণ্ডে। ওই অংশে কিন্তু তিলকের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের অল্প-স্বল্প উল্লেখের বেশি-কিছু করতে পারিনি সংবাদের অপ্রতুলতায়। এখনো সে ইতিহাস অনুদ্ঘাটিত। তবে তিলকের এক প্রধান সহকর্মী জি এস খাপার্দের সঙ্গে নিবেদিতার ১৯০২ সালের শেষে অমরাবতীতে পরিচয় ও কয়েক দিনের আলোচনা এবং ১৯০৫ সালের বেনারস কংগ্রেসে নিবেদিতার উপস্থিতি ও কংগ্রেসী আলোচনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ খাপার্দের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের কিছু অংশ নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিদেহাত্মানন্দ ফটোকপি ক'রে পাঠিয়েছেন। তার থেকে তিলক-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের উপরে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। এই খণ্ডের 'সংযোজন' অংশে সেই ডায়েরির বিবরণ এবং অন্যত্র পৃষ্ঠাগুলির ফটোচিত্র দিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বলেছেন, মীরকাশিমের সময়ে "বাংলার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত।" আরও বলেছেন, "এই সময়ে যে-সকল ইংরেজ বাংলায় বাস করিতেন-তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সংবরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম।...যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যসম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনো দেখা যায় নাই।"

উপন্যাসিক হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক, অভ্রান্ত তাঁর ঐতিহাসিক বিবেক—একথা ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেন। মীরকাশিমের আমলের পরে এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেককিছুই ঘটেছিল : গোটা ভারতে আগ্রাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার, সিপাহী যুদ্ধ, কোম্পানী-শাসনের অবসান, রক্তাক্ত ভারতবাসীর চিত্তে ভিক্টোরিয়া-মহারাণীর ঘোষণাপত্রের স্নিগ্ধ প্রলেপ ও আশ্বাসের হাতছানি, একই সঙ্গে 'ল' অ্যাণ্ড অর্ডার'-এর কঠিন শীতল লৌহজালের বিস্তার। এ সকলই আপাতত তৈরী ক'রে দিয়েছিল বাধ্য গোপালগণের জন্য সুখে বিচরণের গোষ্ঠ এবং দড়িবাঁধা অবস্থায় গলা ও মাথানাড়ার যুক্তিচর্চা। না, ইংরেজ বদলায়নি, তবে সাজ অল্প বদলেছিল—১৮৯৪ সালে বঙ্কিমের মৃত্যুর বছর-দশেক পরেই তার চেহারা দেখা গেল যখন কিছুটা দড়ি-ছেঁড়ার চেষ্টা করল কিছু মানুষ—স্বদেশী আন্দোলনের নামে। তখনকার ইংরেজের কর্কশ মুখ, কঠিন চোয়ালের ভিতরে দাঁতের পেষণ, দীর্ঘ প্রখর নখের ফণা—তা যে কী ছিল, নিবেদিতা চিঠির পর চিঠিতে খুলে ধরেছেন ; এই খণ্ডে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, নিষ্ঠুর পীড়ন, অসহনীয় অত্যাচার, নির্মম কণ্ঠরোধ ইত্যাদির বর্ণনায় তা অল্পবিস্তর দেখা যাবে। অর্থলোভে ইংরেজ কী করতে পারে, তার নমুনাও মিলবে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে পূর্ণ নিবেদিতার চিঠিগুলিতে। দেখা যাবে, সাহেব পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু ক'রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর পর্যন্ত নির্লজ্জ ঘুষখোর। চুনোপুঁটি পুলিশ বা অধস্তন নিম্নপর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের কথা বাদ দিলেও চলে যখন বোয়াল-কাহিনী হাতেই রয়েছে।

অপরদিকে কিছু ইংরেজের মহত্ত্বও অপরিসীম। এই খণ্ডে মানবতাবাদী র‍্যাটক্লিফ, ম্যাককারনেস, নেভিনসন, কেয়ার হার্ডি প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারতে রাজনৈতিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, বহুলাংশে অজ্ঞাত আশ্চর্য সেই কাহিনী উপস্থিত করেছি। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ফ্রেডরিখ্ ম্যাককারনেস কর্তৃক ভারতে পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় প্রকাশ, ভারতে তার নিষিদ্ধকরণ, পূর্বোক্ত কার্যাদির জন্য ম্যাককারনেসের পার্লামেন্টের সদস্যগিরি হারানোর কাহিনী যেমন এখানে রয়েছে—তেমনি রয়েছে নিবেদিতার প্ররোচনায় পড়ে স্টেটসম্যান পত্রিকাকে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তোলার জন্য র‍্যাটক্লিফের স্টেটসম্যান-সম্পাদকতার সুখের চাকরি খোয়ানোর চিত্তাকর্ষক সংবাদ। ইতালীয় বিপ্লবী জোসেফ মাৎসিনী এবং রুশ বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিনের চিন্তাধারাকে নিবেদিতা কিভাবে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তার বিবরণও আছে। আর সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়ে যাবে একটি ধারণা—নিবেদিতা বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের নিবিড় যোগ না থাকলে কখনো তাঁকে একাধিকবার বিদেশগমন ও প্রত্যাবর্তনের কালে ছদ্মনাম গ্রহণ ও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হত না, কিংবা ফরাসি চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণের কথাও ভাবতে হত না। নিবেদিতা কিভাবে ইংলণ্ডে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে উদারনৈতিক মহলে অনুকূল মত ও সমর্থন সৃষ্টিতে ব্রতী ছিলেন, তার কিছু ইতিহাস যেমন উদ্ধার করা গেছে, তেমনি অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকানোর জন্য এদেশে, ততোধিক বিদেশে, তাঁর ব্যাপক চেষ্টার

চকমপ্রদ কাহিনীও মিলেছে। হাইকোর্টের ন্যায়পর প্রধান বিচারপতি লরেন্স জেনকিনস্ নিম্ন আদালতের অপবিচারকে হাইকোর্টে বরবাদ ক'রে দিতেন, তাতে সরকারী আমলারা কী দারুণ ক্রুদ্ধ হতেন, তার কাহিনীও জেনেছি নিবেদিতাসূত্রে, তৎসহ সরকারী নথিপত্র থেকে। ভারতসচিব উদারনৈতিক লর্ড মর্লে সম্বন্ধে ইতিহাসে প্রচলিত ধারণাবদলের তথ্যও নিবেদিতার পত্র, সেইসঙ্গে মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত তাঁর অনামা-বেনামা রচনাগুলিতে যথেষ্ট মিলেছে। সে সবের মধ্যে জন মর্লে-র মুখোশের অন্তরালের যে-মুখ দেখা যায় তা তথাকথিত 'সাধু জনের' মুখ মোটেই নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে নিবেদিতার সচেতনতা, 'পশ্চাদ্‌পদ জাতিতত্ত্ব'-জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনভিত্তিক সমাজতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের ব্যাপক পরিচয়ও কিছু পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

একটি সংশোধনী বক্তব্য : বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছি, নিবেদিতার সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয় ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলেছি, বৎসরের গোড়ার দিকে মানে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে এই সাক্ষাৎ হয়, যখন নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসে মিসেস ওলি বুলের অতিথিরূপে চৌরঙ্গীতে কিছুদিন অবস্থান করছিলেন। শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস দেশ পত্রিকায় (১৬ জানুয়ারি ১৯৮৮) এক পত্রে বলেছেন, উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল সম্ভবত ১৯০২ সালের ৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো সময়ে, কারণ গান্ধীজী ২৮ জানুয়ারি ১৯০২ রেঙ্গুন যাত্রা করেন, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে রাজকোট যাত্রা করেন ২১ ফেব্রুয়ারি। নিবেদিতা কলকাতায় ফিরেছিলেন ৯ ফেব্রুয়ারি। নিবেদিতা গান্ধী সাক্ষাতের সময় সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বাসের মত বর্তমানের মতো গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইতিহাসের ছবি অনেক সময়ে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ছবিতে ইতিহাস দেখলে। অন্য খণ্ডগুলির মতো এই খণ্ডেও প্রচুর ছবি দেওয়া হয়েছে সমকালের নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ ক'রে। এর মধ্যে যেমন ওই সময়ের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত দেশী বিদেশী বহু মানুষের ছবি আছে, তেমনি আছে পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা, দুষ্প্রাপ্য চিঠিপত্র, বিচিত্র কার্টুন, ডায়েরি ইত্যাদির ছবি। সেই কালকে কিছুটা চাক্ষুষ করা যাবে ছবিগুলি থেকে।

নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিদেহাত্মানন্দের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি অযাচিতভাবে জি এস খাপার্দের ডায়েরির কিছু মূল্যবান পৃষ্ঠার ফটোকপি পাঠিয়েছেন। এ-ধরনের সাহায্য তিনি পূর্বেও করেছেন। নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কাছ থেকে পূজনীয় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার ইচ্ছায় নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের গোটা পাণ্ডুলিপির জেরক্স-কপি পেয়েছি। আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে পেয়েছি স্বদেশী যুগের যুগান্তর পত্রিকার এক পৃষ্ঠার ছবি। শ্রীরণজিৎ সাহা সদ্য কারামুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের দুষ্প্রাপ্য ছবিটি দিয়েছেন। শ্রীবিমলকুমার ঘোষ খাপার্দে-ডায়েরির ফটোকপির পাঠোদ্ধার করেছেন, এ খণ্ডের নির্ঘণ্টও তিনিই করেছেন। শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ অক্লান্তভাবে সাহায্য ক'রে গেছেন।
সকলকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন—ভারতবর্ষকে জানো, ভারতবর্ষকে ভালোবাসো। ভারতবর্ষকে জানা ও ভালবাসার আনন্দ ও যন্ত্রণা নিবেদিতা বহন করেছেন। তখন ছিল পরাধীন ভারতবর্ষ। মুক্তদিনের আলোকলাভের তপস্যায় নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু ভারতকে জানা ও ভালবাসার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র কমেনি। গৃহে-পথে-প্রান্তরে অন্ধকার ক্রমেই গাঢ়তর। ভারতবাসী যেন নিবেদিতার আলোকিত জীবনের দীপ ধরে অগ্রসর হতে পারে—এই আশায় আচার্য জগদীশচন্দ্র একদা তাঁর বিজ্ঞানাগারের দ্বারপথে 'আলোকদূতী' নিবেদিতার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই মূর্তি এখনো দীপধারিণী—ভারতবর্ষের জন্য।

১ বি, ওলাবিবিতলা লেন,
হাওড়া-৪

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৬ জানুয়ারি ১৯৮৮

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভগিনী নিবেদিতা
(শ্রীরণজিৎকুমার সাহার সৌজন্যে)

৪৮ পৃষ্ঠার পরে ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম গুচ্ছ :

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর দেহান্তের পরে তাঁর বিষয়ে বোম্বাইয়ের গেইটি থিয়েটারে নিবেদিতার বক্তৃতার প্রতিবেদন—বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' ও মরাঠা পত্রিকায়।

১৫ জানুয়ারি ১৮৯৮, অমৃতবাজার পত্রিকায় 'লণ্ডন লেটারে' ইংলণ্ডে পজিটিভিস্ট সোসাইটিতে প্রদত্ত নিবেদিতার বক্তৃতার রিপোর্ট।

তিলকের সহযোগী চরমপন্থী জি. এস. খাপার্দের ডায়েরিতে ১৯০২ সালে অমরাবতীতে এবং ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিবরণ আছে। পরপর ৮ পৃষ্ঠায় ডায়েরির প্রতিলিপি প্রদত্ত। (ডায়েরির পৃষ্ঠার ফটোকপি স্বামী বিদেহাত্মানন্দ সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

স্বদেশী যুগের ত্রয়ী—লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপনচন্দ্র পাল।

মাদ্রাজের চরমপন্থী 'বালভারত' পত্রিকার মার্চ ১৯০৮ সংখ্যার প্রচ্ছদ। পত্রিকাটি বিবেকানন্দের আদর্শকে জাতীয়তার ধারায় প্রবাহিত করার কাজে ব্রতী।

বালভারত-এর ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা—বিবেকানন্দের বাণী সংবলিত।

নিবেদিতাকে লেখা বালভারত পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক এস এন ত্রিমূলাচার্যের ১৬-৪-১৯০৭ তারিখের পত্র। ২ পৃষ্ঠা।

১১২ পৃষ্ঠার পরে ১৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় গুচ্ছ :

ইতালীয় বিপ্লবী জোসেফ মাৎসিনী।

পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ—এমপ্রেস্ পত্রিকায়, ফেব্রুয়ারি ১৯০৯।

যুগান্তর পত্রিকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। ২ পৃষ্ঠা। (আনন্দবাজারের সৌজন্যে)।

যুগান্তর পত্রিকা মামলা থেকে মুক্তি পাবার পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই ছবি হ্যাণ্ডবিলে ছেপে বিলি করা হয়। (শ্রীরণজিৎকুমার সাহার সৌজন্যে)।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় (৪-৮-১৯০৭) ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড বিষয়ে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা থেকে সংকলিত সংবাদ।

আইনজীবী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬-৭-১৯০৭ তারিখের পত্র। প্রসঙ্গ : যুগান্তর পত্রিকার মামলা।

নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থে গৃহীত স্বামী বিবেকানন্দের 'কালী দি মাদার' কবিতা। নিবেদিতার পাণ্ডুলিপি থেকে। (নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের সৌজন্যে)।

অরবিন্দের প্রস্থানের পরে নিবেদিতার সম্পাদনকালে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত দেশপ্রেমিকদের দৈনন্দিন প্রতিজ্ঞাপত্র।

নিবেদিতার সম্পাদনাকালে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার ৫ চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যার প্রতিলিপি। ৩ পৃষ্ঠা।

নিবেদিতার সম্পাদনাকালে কর্মযোগিন্-এর এক পৃষ্ঠা।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

নির্বাসিত নেতা মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা।
নির্বাসিত নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র

দাদাভাই নৌরজীর ৮২ বৎসর পূর্তিতে হিন্দী পাঞ্চের কার্টুন, সেপ্টেম্বর ১৯০৬।

১৬০ পৃষ্ঠার পরে ১৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় গুচ্ছ :

টমাস বাবিংটন মেকলে। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল পোরট্রেট গ্যালারিতে রক্ষিত স্যার ফান্সিস গ্রান্ট-কৃত প্রতিকৃতি।

ভারতের গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ অব পেনস্‌হার্স্ট। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল পোরট্রেট গ্যালারিতে রক্ষিত স্যার উইলিয়ম অরপেন-কৃত তৈলচিত্র।

ভারতসচিব ফার্স্ট ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ন।

স্যার লরেন্স এইচ জেনকিন্‌স্‌, কে-সি-আই-ই। বাংলার প্রধান বিচারপতি।

আর্ল অব মিণ্টো। ভারতের গভর্নর জেনারেল।

কাউন্টেস অব মিণ্টো।

গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের কার্টুন। হিন্দী পাঞ্চ, ১৫ অগস্ট ১৯০৯।

বিপিনচন্দ্র পালের কার্টুন। হিন্দী পাঞ্চ, ১৫ অগস্ট ১৯০৯।

অ্যানী বেশান্তের কার্টুন। হিন্দী পাঞ্চ, ৮ নভেম্বর ১৯০৮।

ভারতে উৎপীড়ক বৃটিশ শাসন বিষয়ে ‘লেবার লীডার’ পত্রিকায় শ্রমিকনেতা কেয়ার হার্ডির রচনা—ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (২৮ মে ১৯০৯) উৎকলিত।

ভারতে পুলিশী অত্যাচার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ফ্রেডরিক ম্যাককারনেস্‌, এম-পি।

ভারতীয় পুলিশী অত্যাচারের বিষয়ে ম্যাককারনেসের প্রবন্ধ, নেশন পত্রিকায়। ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (৩ ডিসেম্বর ১৯০৯) উৎকলিত।

ভারতে পুলিশী অত্যাচারের বিষয়ে ম্যাককারনেসের পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত। সেই সূত্রে ম্যাককারনেসকে ইন্টারভিউ। ইণ্ডিয়া, ৩ জুন ১৯১০।

বাংলার ৯ জন স্বদেশী নেতার বিনাবিচারে নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথের কাছে ১৪৬ জন বৃটিশ এম-পি-র পত্র।

রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় অগস্ট ১৯০৮ সংখ্যায় ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট থেকে মর্লে-কার্টুনের পুনর্মুদ্রণ।

স্টেটস্‌ম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক, নিবেদিতার বন্ধু এস কে র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুসংবাদ—লণ্ডন টাইমস পত্রিকায়, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। (স্বামী যোগেশানন্দের সৌজন্যে)। ২ পৃষ্ঠা।

নিবেদিতাকে লেখা এস কে র‍্যাটক্লিফের পত্র, ২৬ অগস্ট, ১৯০৫। ২ পৃষ্ঠা।

২০০ পৃষ্ঠার পরে ৮ পৃষ্ঠার চতুর্থ গুচ্ছ

অরবিন্দ-কার্টুন। হিন্দী পাঞ্চ, ২০ জুন ১৯০৯।

অরবিন্দ-কার্টুন। হিন্দী পাঞ্চ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৯।

ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসামের লেফট্‌ন্যান্ট-গভর্নর স্যার জোসেফ বামফিল্ড ফুলার, কে-সি-আই-ই। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লেফট্‌ন্যান্ট-গভর্নর স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার এবং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ।

মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ৭ এপ্রিল ১৯১০। প্রসঙ্গ : অরবিন্দের অন্তর্ধান, 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারী আক্রমণ, গোপন সংবাদপত্র। ২ পৃষ্ঠা।

মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার ২৮ এপ্রিল ১৯০১ তারিখের পত্র। প্রসঙ্গ : পুলিশ কর্তৃক নিবেদিতার বিরুদ্ধে ডাকাতিতে প্রেরণাদানের অভিযোগ; নিবেদিতার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা; অরবিন্দের অন্তর্ধান; ইংলণ্ডে কেয়ার হার্ডি প্রমুখের ভারত-পক্ষে আন্দোলন; গোপন সংবাদপত্র। ২ পৃষ্ঠা।

মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ১৪ অক্টোবর ১৯১০। প্রসঙ্গ : নিবেদিতার ছদ্মবেশ।

নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন
দ্বিতীয় পর্ব

নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রয়াসের তৃতীয় পর্যায় (দুই)

প্রথম অধ্যায়

নিবেদিতার নানাপ্রকার বৈপ্লবিক সম্পর্ক

নিবেদিতা সম্বন্ধে সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয়—গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপ। এ-বিষয়ে তাঁর পত্রে যেসব উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে, তাদের কিছু কিছু এখানে উপস্থিত করব। চিঠিপত্রে কেউ খোলাখুলি এইসব বিপজ্জনক বিষয়ের আলোচনা করে না। তবে বর্ণনাভঙ্গি থেকে, কিছুটা বিষয়বিন্যাস থেকেও, লেখকের মনোভাব অনুমান করা যায়।

॥ ১ ॥ নিবেদিতার চিঠিপত্রের উপর পুলিশের নজর

নিবেদিতার উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি ছিল—সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ তাঁর পত্রে আছে। স্বামীজীর জীবনকালেই, যখন নিবেদিতা সবে ওকাকুরার সঙ্গে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছেন, তখনই, ৩ মার্চ, ১৯০২, লিখেছেন :

"পুলিশ আমার চিঠি খোলার অনুমতি পেয়েছে—এইকথা জানিয়ে আমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমি অবশ্যই পুলিশের নেত্রসুখকর বস্তু তোমার কাছে লিখতে আগ্রহী নই।"

এই বিষয়ে নিবেদিতাকে আমৃত্যু সতর্ক থাকতে হয়েছে। অজস্র চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর পত্র থেকে জেনেছি, পুলিশের চোখ এড়াতে তিনি সরাসরি ডাকে না পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক বা অন্য এজেন্ট মারফত চিঠি পাঠাতেন। এক্ষেত্রে অপরকে সাবধান হতে বলেছেন, এবং *ভিন্ন-ঠিকানায় ও ভিন্ন-নামে চিঠি পাঠিয়েছেন ; চিঠির ভাষাকে অস্পষ্ট করেছেন* : 'কোড্' ব্যবহারও করেছেন, কোড্ মাঝে মাঝে বদলেছেনও ; পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য সাড়ম্বরে বলেছেন, তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন ; তাঁর ডায়েরির বিষয়ে বোনকে সতর্ক করেছেন : গোয়েন্দারা কিভাবে চিঠি খুলে পড়ে, তার বিবরণ দিয়েছেন ; জঘন্যভাবে ছিঁড়ে চিঠি পড়ার বিরুদ্ধে পোস্টমাস্টার-জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নিবেদিতার চিঠি থেকে এইসব বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া যাক :

"[জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানকে সরকার 'রাজনৈতিক' মনে করে—একথা বলার পরে—] যাই হোক, তুমি যেভাবে 'রাজনীতি' কথাটা বলে ফেলো, তা চিঠিতে আর বলবে না, কেননা কোনো ডিটেকটিভ তোমার চিঠি পড়ে নির্ঘাত বলে বসবে, 'এই মহিলা জানেন যে, তাঁর পত্র-প্রাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত, যিনি নির্ঘাত খুব মারাত্মক ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, নচেৎ কেন আমি তার হদিশ করতে প্যারছি না।' বস্তুতপক্ষে আমি রাজনীতিতে নেই, কিন্তু সেই ভাবটি বাইরে ছড়াতেও পারছি না। সুতরাং ঐ [রাজনীতি] কথাটি যেন তোমার চিঠিতে কদাপি না থাকে।" [৩-৪-১৯০৯ ; মিস ম্যাকলাউডকে]।

"[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে—] কলকাতায় আমার জন্য যেসব চিঠি যাবে তাদের ঠিকানা ক্রিস্টিনের নামে হবে, কেবল কোণের দিকে লেখা থাকবে—২। এসব করার ঠিক কোনো দরকার নেই। কেবল আমি যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ দৃষ্টি এড়ানো ভালো বলেই আমরা মনে করি। জাহাজে থাকার সময়ে খোকা-র [ডাঃ বসুর] ঠিকানায় চিঠি দেবে।" [১১-৫-১৯০৯, মিস ম্যাকলাউডকে]।

"[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে–] বৃহস্পতিবার রাত্রে মার্সেলিজ্ যাত্রার আশা রাখি। সকাল দশটায় ছাড়বে—এস্ এস্ ইজিপ্ট। সেখানে, কিংবা যাত্রাপথে, সকল চিঠি 'হিমসেলফ্'-এর [ডাঃ বসুর] ঠিকানায় পাঠাবে।

"একটা ব্যাপারের চিন্তা আমাদের মন অধিকার করে আছে, সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করে নেওয়া ভালো, যাতে কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিপত্র বেশী স্পষ্ট করার দরকার হবে না।" [র‍্যাটক্লিফকে, ২৬-৬-১৯০৯]

"[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে—] এখন থেকে চিঠিপত্রে সতর্কভাবে ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে—প্রথমে হিমসেলফ্-এর নামে, পরে ক্রিস্টিনের নামে—২নং, এই লিখে। ভালো হয়, গ্রিন্ড্লের মারফত পাঠালে, যেহেতু সেগুলি হারিয়ে যাক [গায়েব করা হোক ?], বা খুলে পড়া হোক, তা আমি চাই না।...

"১৬ জুলাই বোম্বাইয়ে নামব। ক্রিস্টিন সেখানে দেখা করতে আসবে বলেছে। কুড়ি তারিখ নাগাদ কলকাতায় পৌঁছানোর কথা। চিঠিপত্র ডাঃ বসুর ঠিকানায় পাঠাবে—ভিতরে আমার নাম।" [মিসেস উইলসনকে ; ১-৭-১৯০৯]

"[ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে—] এখানে অবস্থানের শেষ। বিদায়। অতঃপর চিঠিপত্র সম্বন্ধে অতীব সতর্কতা।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে, ১-৭-১৯০৯]

"[কলকাতা থেকে—] চিঠিপত্রে যেন আমার নামোল্লেখ করো না। আমি চুপচাপ আছি, বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছি না।" [মিসেস বুলকে ; ২২-৭-১৯০৯]

"খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি আমাকে '২ নম্বর' বলে চালিয়ে যাও। চমৎকার এই ভূমিকা। এডেন থেকে বোম্বাই পর্যন্ত 'পি অ্যান্ড ও' কোম্পানীর ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিনটি ব্যাপার-স্যাপার আমাকে সবিশেষ বুঝিয়ে দিয়েছে। দশ কি পনর জন লোক [সেখানে] চিঠিপত্র নিয়ে দারুণ খাটছে। রেজিস্টার্ড চিঠিও নিরাপদ নয়, তাকেও ছাড়া হচ্ছে না। নানা ধরনের লোককে লাগানো হয়েছে। আমি নানা সময়ে ঘরটির সামনে দিয়ে গিয়েছি—দেখেছি, উচ্চপর্যায়ের কেরানীদের একজন চিঠি উঁচুতে তুলে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করছে—স্পষ্টতই বিবেচনা করছে, চিঠি খোলার দরকার আছে কি নেই।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ; ১-৯-১৯০৯]

"একথা তোমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলা উচিত যে, এই ঠিকানা [র‍্যাটক্লিফের ঠিকানা ?] ব্যবহার করি না—যতক্ষণ-না শহরের কোনো নিরাপদ ব্যক্তির দ্বারা তোমাকে লেখা চিঠি ফেলার ব্যবস্থা করতে পারি। এই কারণে আমি কখনো-কখনো কেটি-র [মিসেস র‍্যাটক্লিফ] বিবাহপূর্ব ঠিকানায় চিঠি পাঠাই, বা অন্য উপায়ে পাঠাই। যখনই নতুন কোনো সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটে অমনি কিছু সময়ের জন্য উৎসাহের সঙ্গে ডাক-ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়—সে সময়ে আমার এজেন্টরা বা আমার ভগিনী বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ; ১৭-২-১৯১০]।

"দু'এক সপ্তাহ আগে আমার একটি চিঠির প্রান্ত এমন করে কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছে যে, সেটি পোস্টমাস্টার-জেনারেলকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছি, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ার পরে সেগুলি আবার মুড়ে বন্ধ ক'রে আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ তিনি যেন দয়া ক'রে জারি করেন। তিনি আমার কাছে রেজিস্টার্ড-পত্রে উত্তর পাঠিয়েছেন, এক ব্যক্তিকেও পাঠিয়েছেন। তাদের থেকে আমি জেনেছি—আমার নাম বিদ্রোহী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় নেই। তবে তাঁরা ট্রেনে বা জাহাজপথে *চৌর্য* বা হস্তক্ষেপ নিবারণের ব্যাপারে বস্তুতপক্ষে ক্ষমতাহীন। অবস্থাটা আমি অধিকতর ভালই বুঝি, কিন্তু আমার চিঠিপত্র সম্বন্ধে আশ্বাস বোধ করেছি, একথা বলতে পারি না। যদি তুমি আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠাতে চাও তাহলে সিল ক'রে সে-চিঠি আমার এজেন্টের হাতে দেবে। তাদের বলে দেবে—আমি নিজে গিয়ে ও-বস্তু নেব, তারা যেন আমাকে সেকথা জানায়। সেটি পাঠাবার জন্য হয়ত ডাকটিকিট চাইবে—তবে ইংলেন্ডের ডাকটিকেট হলেও চলবে। যদি খুব জরুরী কোনো ব্যাপার ঘটে তবেই এরকম করার দরকার হবে।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে : ২৮-৪-১৯১০]

নিবেদিতা পোস্টমাস্টার-জেনারেলকে এই সূত্রে ১৭ এপ্রিল, ১৯১০, নিম্নের চিঠি লেখেন, ব্যঙ্গে রি-রি করা চিঠিটি এই :

প্রিয় মহাশয়,

আমার ভগিনীর শিশুগণের এবং ভগিনীর রান্নাবান্নার গোপন সংবাদ সম্বন্ধে আপনার অধীনস্থ কিছু-কিছু কর্মচারীর মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলের বিষয়টি আমি সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব, যদি চিঠিগুলি খুলে পড়ার পরে তাদের আবার বন্ধ ক'রে আমার কাছে পাঠাবার নির্দেশ উক্ত ব্যক্তিগণকে আপনি দান করেন। বর্তমানে আপনারা যে-বিরক্তি উৎপাদক, ও পত্র হারাবার সম্ভাবনাসূচক পদ্ধতি নিয়েছেন—আমি কেবল তার থেকে অব্যাহতি চাইছি। অদ্য প্রভাতে আমি যে-পত্রটি পেয়েছি, সেটি আমি এইসঙ্গে আপনার সকাশে পাঠাচ্ছি। সেটিকে যে-আকারে পেয়েছি, সেই আকারে রক্ষা করতে আমাকে খুবই চেষ্টা-যত্ন করতে হয়েছে। তদুপরি, আমার অভিযোগের একটি দীর্ঘ তালিকা সঞ্চিত হয়ে আছে। আমি প্রায়শই চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা যথেচ্ছ ছিন্ন আকারে লাভ করছি, কিংবা দেখতে পাচ্ছি, সাহিত্যিক রচনাসমূহের উপরের মোড়ক অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আশা করতে ইচ্ছুক যে, আমার এই পত্রটি, যার নকল রাখছি, আপনার কাছে সরাসরি পৌঁছবে। ইতি

ভবদীয়—

নিবেদিতার পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু তথ্য, যার ভাষা অবশ্য যথেষ্টই অস্পষ্ট :

"এক সপ্তাহে একটি চিঠি ও একটি পোস্টকার্ড একসঙ্গে উপস্থিত। এমন হবার কারণ, আমি এই ঠিকানা [১৭ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার] কদাপি ব্যবহার করি না—যদিনা মনে করি যে, শহরে নিরাপদ হস্তে পত্রটি পেয়ে যেতে পারি। ঐ সময়ে [অর্থাৎ উল্লিখিত পত্র দুটি নেবার ব্যাপারে] আমি বিমূঢ় বোধ ক'রে নেওয়া স্থগিত রেখেছিলাম। কোনো ভৃত্য গোপনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে উৎসুক

হয়ে উঠতেই পারে। কোনো ভদ্রলোকের উপরই এ-ব্যাপারে ভার দিতে হবে।" [র‍্যাটক্লিফকে : ৬-৭-১০]।

"তোমার স্বামী অস্বাক্ষরিত একটি পত্র পাবে। সেটি মিঃ র‍্যাটক্লিফকে পাঠিয়ে দেবে।" [মিসেস উইলসনকে : ৬-৭-১৯১০]।

"পত্র প্রসঙ্গ। ওরা [কলকাতার পোস্টঅফিস কর্তৃপক্ষ ?] ইচ্ছাপূর্বক বিশ্বাসহানির কাজ করছে বলে সন্দেহ করছি না। যেখানে পুলিশের কাছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির চিঠি পাঠাবার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না থাকে, সেখানে চিঠি খোলার কাজটা হয় জাহাজী পোস্টঅফিসে। জাহাজী পোস্টঅফিস আমার ধারণা প্রধানত ডিটেকটিভদের দ্বারা পরিচালিত—তবে তাতে কর্তৃপক্ষের কতখানি গোপন সমর্থন আছে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। এখানকার পোস্টমাস্টার-জেনারেল বলেছেন, তিনি ট্রেনে চিঠি খোলা বন্ধ করতে অসমর্থ। বড়বাজারের চিঠিপত্র অবিরাম চুরি। তিনি [পোস্টমাস্টার-জেনারেল ?] এ সম্বন্ধে সবকিছু করেও হতবুদ্ধি। মনে হয় তিনি সহজ বিশ্বাসেই কথা বলেন—কিন্তু—।" [র‍্যাটক্লিফকে : ১৯-২০-৭-১৯১০]।

"কতকগুলি পুরনো ডায়েরী তোমার কাছে পাঠাবার কথা ভাবছি, সেগুলি অপরাপর ডায়েরীর সঙ্গে রেখে দেবে। মিস্টোরা চলে যাবার আগে যদি এইসব কাগজপত্র তোমার হাতে পৌঁছে যায় তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাব। যদি কিছু সত্যই ঘটে তাহলে আমি চাইব, ওরা অন্যদের নয়, তোমাকেই (বা ডাঃ বসুকে বা ক্রিস্টিনকে) খানাতল্লাশ করুক।" [মিসেস উইলসনকে ; ২২-৯-১৯১০]।

"আমার প্রস্থানের পরে সম্পাদকের [র‍্যাটক্লিফের] সাপ্তাহিক পত্র এলে আমার ধারণা, তা 'হিমসেলফ' [ডাঃ বসু] খুলবেন।...ডাঃ বসুর কাছে চিঠিতে আমাকে দুর্বোধ্যভাবে উল্লেখ করাই ভালো—কদাপি নামে নয়।" [মিসেস র‍্যাটক্লিফকে ; ১৪-১০-১৯১০]।

"খোকাকে [ডাঃ বসুকে] এই কথা বলতে ক্রিস্টিনকে বলবে : খোকা ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেবে—মোড়কের মধ্যে তাদের নামে পাঠানো চিঠি খোকার কাছে পাঠাতে হবে।

"এটা একটা বাড়তি সুবিধা নেওয়া। আমি বুঝতে পেরেছি, তাকে [ক্রিস্টিনকে] আমি যে-কোড় দিয়েছিলাম তা চিঠির পক্ষে খাটবে না। সুতরাং আমি হয়ত এই চিঠিতেই একটা খেয়ালমতো নতুন কোড় তৈরী ক'রে তাকে পাঠাতে চাইছি।" [মিস ম্যাকলাউডকে ; ৪-১২-১৯১০]।

বেশ বোঝা যায়, নিবেদিতার রাজনীতির অনেক কিছুই মিস ম্যাকলাউড এবং সিস্টার ক্রিস্টিন জানতেন।

নিবেদিতা যে, তাঁর কাগজপত্র চলাচলের বাহকরূপে কেবল সিস্টার ক্রিস্টিন, জগদীশচন্দ্র বসু, মিঃ ও মিসেস উইলসন প্রভৃতিকে ব্যবহার করেননি, আরও চিত্তাকর্ষক কথা—এ ব্যাপারে তিনি ইংলন্ডের রাজান্তঃপুরের অন্তর্গত মানুষকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছেন !! মিস ম্যাকলাউডের বোনঝি অ্যালবার্টা স্টার্জেস বিবাহসূত্রে হয়েছিলেন লেডি স্যান্ডউইচ—সেই সম্পর্কের দ্বারা তিনি ইংলন্ডের রাজপরিবারের পরিধির মধ্যে ঢুকে পড়েন। এই অ্যালবার্টাকে নিবেদিতা তাঁর রাজনৈতিক সংবাদবাহী করে তুলেছিলেন। বিবাহপূর্ব জীবনে অ্যালবার্টা রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, তা স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি থেকে আমরা দেখতে পাই। নিবেদিতা অ্যালবার্টার এই প্রকার আগ্রহের কথা খুবই জানতেন। ১২ মে, ১৯০০, মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন : "কল্পনা

ক'রে দ্যাখো—তোমার ভাগিনেয়ী—রাজনীতির নায়িকা !" মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১৯০২ সালের একটি চিঠিতে পাচ্ছি, অ্যালবার্টা ও তাঁর ভাই হলিস্টার নিবেদিতাকে ৬ খণ্ড মাৎসিনীর আত্মজীবনী পাঠিয়েছেন—যেগুলি নিবেদিতা বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

অ্যালবার্টাকে জিনিসপত্র পাঠাবার সময়ে নিবেদিতা তাঁকে বিচিত্র এক টাইটেল্ দিলেন, অবশ্যই জটিলতা সৃষ্টির জন্য—*The Hon.* মিস ম্যাকলাউডকে ৫ অগস্ট, ১৯০৯, এই সূত্রে লিখলেন :

"'দি হন্'—এই সম্বোধনে অ্যালবার্টাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। তাকে দয়া করে জানিয়ে দিও যে, এই ভুলটি কখনো-সখনো করা হবে—জিনিসপত্র নিরাপদে পাঠাবার প্রয়োজনে।"

র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে একই তারিখে লিখলেন :

"[কর্মযোগিনে প্রকাশিত] অরবিন্দের খোলা চিঠির একটি কপি আমি অ্যালবার্টার মারফত প্রেতদর্শীর [স্টেডের] কাছে পাঠাচ্ছি। দয়া ক'রে সুযোগ ক'রে নিয়ে অ্যালবার্টাকে বলো, আমি জানি যে, সে 'দি হন্' নয়—কিন্তু খামের উপর ঐ সম্বোধন বিশেষ উদ্দেশ্যেই করেছি। কারণটা তুমিই তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলবে।"

১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে পুনশ্চ লিখলেন : "আমি অ্যালবার্টাকে 'হন্' উপাধি দিয়েছি এই কারণে যাতে ব্যাপারটি উদ্ভট দেখায়।"

সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পরে রাজদরবারে অ্যালবার্টার গুরুত্ব বাড়বার সম্ভাবনায় নিবেদিতা আনন্দ বোধ করেছেন : [২৫-৫-১৯১০]। তিনি ভেবেছেন যে, সেক্ষেত্রে অ্যালবার্টা রাজদরবারে ভারত সম্বন্ধে অধিকতর মানসিক আনুকূল্য সৃষ্টিতে সমর্থ হবেন :

"একথা না ভেবে পারছি না, বর্তমান রাজদরবারে সে বেশ বড়-কিছু হয়ে দাঁড়াবে। শোনা যায়, আয়ারল্যান্ডের ব্যাপারে সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রভাব অতীব মূল্যবান হয়েছিল। পঞ্চম জর্জ তাহলে কেন ভারতের জন্য অনেক-কিছু করবেন না ? অ্যালবার্টার নিজের কী মনে হয় ?" [মিস ম্যাকলাউডকে ; ৭-৭-১৯১০]

॥ ২ ॥ নিবেদিতার পিছনে গোয়েন্দা

নিবেদিতার পিছনে সর্বদা গোয়েন্দা লেগে থাকত। "সম্প্রতি তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য বারবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করে গেছে, [নিবেদিতা লিখেছেন]—কিন্তু মনে হয় সবক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এ-ব্যাপারে ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা আছেই, কারণ [আমার কাছে সংবাদের জন্য এলে] যে-তীব্র ক্রোধের সঙ্গে সেই চেষ্টার মুখোমুখি হয়েছি এবং তাকে যেভাবে 'ঔদ্ধত্য' বলে চিহ্নিত করেছি, তা তাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেবে। আর যে-শ্রেণীর লোক এখানকার মানসিক গতিবিধি বুঝতে আসে, তারাই [অর্থাৎ তাদের নিম্নশ্রেণীর জ্ঞান-বুদ্ধিই] এর মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও মজাদার ব্যাপার।" [১৭-২-১৯১০]

না, কেবল নিম্নশ্রেণীর বোধবুদ্ধির লোক গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত ছিল না—সর্বোচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরাও একই কাজ করতেন—তাঁদের একজন হলেন—ইঙ্গবঙ্গ সমাজজীবনে প্রখ্যাত মহিলা কর্নেলিয়া সোরাবজি। এই মহিলা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে খুবই ব্যগ্র ছিলেন। অপরপক্ষে নিবেদিতাও তাঁকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই কর্নেলিয়া সোরাবজি নিবেদিতার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। নিবেদিতার অনেক বন্ধুর সঙ্গেই এঁর বিশেষ পরিচয় ছিল—যেমন গোখলে বা মিস ম্যাকলাউড। গোখলের মারফত কর্নেলিয়া যখন নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, তখন নিবেদিতা ১৯০৪, ইস্টার দিবসে—(স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই), গোখলেকে চিঠি লিখে যে চেষ্টাকে বরবাদ করে দেন।

"প্রিয় মিঃ গোখলে," নিবেদিতা লেখেন, "মিস সোরাবৃজিকে একথা জানানো উচিত যে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি বাড়ি থাকতে পারছি না—যে-সময়ে তাঁর আসার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দিয়েছিলে। আশা করা যায়, এই চিঠি যথাকালে পৌঁছে গিয়ে এক্ষেত্রে অসুবিধা নিবারণ করবে। ক্রিস্টিন অবশ্য মিস সোরাবৃজিকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। আশা করি তুমি মিস সোরাবৃজিকে আমার দুঃখ ও ক্ষমাপ্রার্থনার কথা জানাবে।"

নিবেদিতা যে, ইচ্ছা করেই মিস সোরাবৃজির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়াতে চেয়েছিলেন, (যদিও শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হননি) তা ১৯ এপ্রিল ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায় :

"মিস সোরাবৃজি এখন কলকাতায়। সর্বপ্রকার পরোক্ষ উপায়ে আমার দ্বারা আমন্ত্রিত হবার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে সরাসরি লিখে সেকথা বলেছেন। ফলে পরের শনিবার চা-পানের জন্য তাঁকে ডাকতে হচ্ছে—তাতে বিরক্তির শেষ নেই।"

কয়েক বছর পরের ঘটনা : ১৯১০ সালে ভাইসরয়পত্নী লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাড়িতে আসেন—তাঁরা দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদিও একসঙ্গে ঘোরেন। [এ-প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে]। লেডি মিন্টো বেলুড় মঠেও যান, এবার কিন্তু নিবেদিতা সঙ্গে ছিলেন না—ছিলেন মিস সোরাবৃজি। সে সময়ে মিস সোরাবৃজি নোংরা গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা করেন এবং তাতে নিবেদিতার ক্রোধের সীমা ছিল না। ১০ মার্চ, ১৯১০, নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন :

"বুধবার কর্নেলিয়া [সোরাবৃজি] লেডি মিন্টোকে হঠাৎ মঠে নিয়ে গিয়েছিল—এবং বেশ কিছু সরাসরি প্রশ্ন করেছিল। যথা, মঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি রকম, মঠ কি এই-এই জিনিসে [অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যাপারাদিতে] আগ্রহী, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওটা চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য। আমি থাকলে ওটা ঘটা অসম্ভব হত।"

একই তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

"[দক্ষিণেশ্বর-ভ্রমণের] পরদিন সকালে তিনি [লেডি মিন্টো] মঠ দেখতে যান তোমার বান্ধবী কর্নেলিয়ার সঙ্গে। কর্নেলিয়া যে গোয়েন্দা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।"

কর্নেলিয়া সোরাবৃজি নিবেদিতার পিছনে নাছোড় লেগে ছিলেন, তা র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার ২৮ জুলাই, ১৯১০, তারিখের চিঠি থেকেও জানতে পারি।

কর্নেলিয়া সোরাবৃজি সম্বন্ধে সন্দেহ যে-সত্য, তার পক্ষে নিবেদিতা নিশ্চিত প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে যান। ১৯১১, এপ্রিল মাসে যখন তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরছিলেন তখন জাহাজে ভাইসরয়-কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য স্ল্যাক-এর[১] পত্নীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। নিবেদিতা তাঁকে স্বামীজীর বিষয়ে অনেক কথা বলেন, মহিলা শুনে মোহিত হন, এবং আবেগভরে কর্নেলিয়ার ভূমিকার কথা বলে ফেলেন, যা শুনতে নিবেদিতার সংকোচ হলেও সেটা শোনা তাঁর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। ২ এপ্রিল, ১৯১১ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

১ Francis Alexander Slacke, B. A. (Cantab) I. P. ইনি ৮ অগাস্ট ১৮৭৬ থেকে ১৪ অক্টোবর ১৯০৩ পর্যন্ত ছোটনাগপুরের কমিশনার। ১৩-১১-১৯০৫ থেকে 'লেফটন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গলে'র কাউন্সিলের অন্যতম কাউন্সিলর। ১১-৪-১৯০৬ থেকে অ্যানড্রু ফ্রেজার ৬ মাসের ছুটিতে গেলে ১৬-৮-১৯০৬ থেকে অস্থায়ী লেফটন্যান্ট গভর্নর। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের অ্যাডিশন্যাল মেম্বার। ৩১-১২-১৯০৯-এ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। [ডঃ স্বপন বসু প্রদত্ত তথ্য]

"ঘটনার সমাপ্তি হল এইভাবে—এই মধুর মহিলাটিকে বললাম, আমি যথার্থই কে ? [নিবেদিতা ছদ্মপরিচয়ে ছিলেন] সেইসঙ্গে আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুর কথা। তার ফলে তিনি স্বামীজীর কথা শুনবার জন্য, সবকিছু জানবার জন্য, একেবারে ক্ষুধার্ত। শেষের দিকে প্রতিদিনই আমরা একসঙ্গে একঘণ্টা কাটিয়েছি। তিনি মিস লংফেলোর মতোই সরে গিয়ে ব্যাপারটা রোমন্থন করেছেন—তারপর আবার এসেছেন, নূতনতর প্রশ্ন নিয়ে। এই ধরনের কাজ আমাকে করতেই হয়েছে কারণ প্রথম যে-সংবাদ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তা হল—কর্নেলিয়া সোরাবৃজি তাঁর স্বামীর [মিঃ স্ল্যাক-এর] অধীনে কর্মরত। সে কথা শোনবার সময়ে নিজেকে খুবই ছোট মনে হচ্ছিল। [কারণ আর কিছু নয়, স্বামীজীর দিব্যবার্তা শুনে মোহিত এক মহিলার কাছ থেকে রাজনৈতিক সংবাদ বার করেছিলেন বলে]।"

কর্নেলিয়া সোরাবৃজি যে, সরকারের বেতনভোগী গোয়েন্দা—একথা মিসেস স্ল্যাকের মুখে শোনার আগেই তার শয়তানী চরিত্র নিবেদিতার জানা হয়ে গিয়েছিল। ২৮ জুলাই, ১৯১০, তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন :

"আমার সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্রূর শত্রু কে জানো—তোমার বান্ধবী কর্নেলিয়া। সে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগের চর। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্ররোচনা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি—তাতেই আমার নিরাপত্তা। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, সে আমার শত্রু—এমন শত্রু, যে আবার আমার সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব করে। অপরপক্ষে আমি মোলায়েম বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা খোলাখুলি শত্রুতা পেতেই চাইব। ওঃ যুম, সে সত্যই নীচ ঘৃণ্য। ভালো কথা, তুমি যে আমাদের দুজনকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলে, এবং লন্ডনে সে আমাকে চিঠি লিখেছিল—[সেগুলি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে]—নচেৎ আমি ভারতে সোজা তার খপ্পরে ঢুকে যেতাম। তার সপক্ষে সারাক্ষণ কত কথা শুনতে হচ্ছে। সুতরাং তুমিই বাঁচিয়ে দিয়েছ।"[২]

গোয়েন্দাদের বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব মোটেই আধ্যাত্মিক ছিল না। ২৮ এপ্রিল, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন :

"অত্যন্ত চতুর একটি লোকের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আমার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবার জন্য। আমি উক্ত বুদ্ধিমানের ভাগ্য পেতে একেবারেই ইচ্ছুক নই—যার দেহ এখন থেকে সপ্তাহখানেক কি সপ্তাহ দুই পরে নির্জন পাহাড়ে খাড়া খাদের পাশে আবিষ্কৃত হতে পারে।"

২ কর্নেলিয়া সোরাবৃজির চরিত্র সদা বিকশিত। ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শত্রুতা তিনি সর্বপ্রকারে ক'রে গেছেন। আলোচ্য সময়ের বহু বছর পরে, ১৯৩২, ডিসেম্বর, প্রবুদ্ধ ভারতে, কর্নেলিয়া সোরাবৃজি-র কার্যকলাপের বিষয়ে শিরোনামা ছিল : *A Vile Propaganda Against Hinduism*

এই লেখাটির গোড়ায় বলা হয়, "কিছুদিন আগে মিস কর্নেলিয়া সোরাবৃজি 'আটলান্টিক মানথলি'-তে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য।" মিস সোরাবৃজির "মনোবিকারের" পুনশ্চ প্রকাশ "নাইনটিনথ সেঞ্চুরি" পত্রিকায় *Hindu Swamis and Women of the West* প্রবন্ধের মধ্যে। "এখন এই মিস সোরাবৃজি-র কী গুণাবলী আছে, যার দ্বারা তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এত নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন ?"—প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক এই প্রশ্ন করে উত্তরও একইসঙ্গে দিয়েছিলেন—"*তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ হল—অজ্ঞতা।*" *মিস সোরাবৃজি তাঁর এই বিরাট* গুণের প্রতি কোন অত্যন্ত সুবিচার করেছিলেন, তার অনেক প্রমাণ সম্পাদক কর্নেলিয়ার লেখাটি থেকে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ঔৎসুক্য নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে। দেখা যায়, বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের বেতনভোগী এই কর্মচারীটি নীচতা ও মিথ্যার সঙ্গে সানন্দে বিলসিতা :

"Miss Noble, an English woman, [Miss Sorabji wrote] used to lie prostrate before the image of Kali on Christmas Eve and then *say to the monks: 'Now* let us go into the fields equipped with crooks and read the story of the shepherds of Bethlehem'."

॥ ৩.॥ নিবেদিতার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

"ঐকালে নিবেদিতার বিপদের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাঁর [চরম] রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও উচ্চপর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল—ফলে তাঁর গ্রেপ্তারের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না।"[৩]

স্বদেশী আন্দোলন শেষ হয়ে যাবার বহু বৎসর পরে পণ্ডিচেরীতে থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিচারণাকালে উপরের কথাগুলি বলেছেন। অনেকে তাঁর মতে সায় দিয়েছেন। কথাটা কিন্তু পুরো ঠিক নয়। উচ্চপর্যায়ে বন্ধুত্বও নিবেদিতার গ্রেপ্তার ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অন্ততঃ স্বয়ং নিবেদিতা তাই মনে করেছেন। ৩০ মে, ১৯০৬, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"জেলের জীবন মানুষের চরিত্র-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ দেয় কি ? তোমার মেয়েটির [অর্থাৎ নিবেদিতার] বিষয়ে তা সত্য হোক—তা খুবই চাই।"

৯ জুন, ১৯০৭, একইজনকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা বললেন, আর সাড়ে পাঁচ বছর বড় জোর তিনি জেলের বাইরে থাকতে পারবেন। দ্রুত সে সময় ঘনিয়ে আসছে যখন কোনো ইউরোপীয় পর্যন্ত বিশেষ মত পোষণ করবার জন্য কারারুদ্ধ হবে। [নিবেদিতাকে সাড়ে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়নি, কয়েকমাস পরেই গ্রেপ্তার এড়াতে ভারতত্যাগ করতে হয়েছিল—কিছু পরে সে প্রসঙ্গ আসবে।]

২৫ অগস্ট, ১৯১০-এর এক চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে ইঙ্গিতময় ভাষায় গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছিলেন। বিষয়টি খোলাখুলি লিখেছেন র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে, যার মধ্যে শ্রীমা সারদাদেবীর অধ্যাত্মমহিমার সম্বন্ধে অনুভূতিময় উল্লেখ আছে :

"যদি কখনো আমি দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই, সেজন্য আমার কোনো বন্ধুর দুঃখ করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব—চেষ্টা করব সেই অপূর্ব শিখরে উত্থিত হতে যেখানে হোলি মাদার সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁর তুল্য মধুরিমা ও নির্মল প্রশান্তি কল্পনাও করা যায় না, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও স্নিগ্ধ স্নেহ।"

॥ ৪ ॥ রাজনৈতিক কারণে নিবেদিতার ভারতত্যাগ

নিবেদিতা যদি জেলে না যান, তার একটা কারণ—তিনি কৌশলে গ্রেপ্তার এড়াতে পারতেন। জেলে গেলে তিনি ভারতের কোন্ উপকার করতে পারবেন, আর না গেলে কোন্ উপকার—তার হিসাব করেই তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে চেয়েছেন। জেলে গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে, জননেত্রী হয়ে ওঠার বাসনা তাঁর ছিল না (জেলে গেলে ইংরাজ মহিলা হিসাবে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকতেন)। মৃত্তিকানিম্নে শিকড় বিস্তার ক'রে যে-কাজ করছিলেন, জেলে গেলে তা ব্যাহত হবে ; বিপ্লবী নেতাদের পুলিশের নজরের বাইরে থাকা বা জেলের বাইরে থাকা বৈপ্লবিক কার্যসাধনেই প্রয়োজন—এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে নিয়ে তিনি গণ্ডগোলের ক্ষেত্রে ভারতত্যাগ করেছেন। (কিংবা হয়ত ভারতের দুর্গম হিমালয়ে তীর্থযাত্রা করেছেন। তবে তাঁর ধর্মীয় অভীপ্সাকে সন্দেহ করার মতো নিরেট মনোভাব আমরা যেন না দেখাই।)। নিবেদিতার পত্রগুলি যদি তারিখ অনুযায়ী সতর্কভাবে পড়া যায় তাহলে কোনোই সন্দেহ থাকে না যে, ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি তিনি

৩ Sri Aurobindo to Pavitra (Reymond Collection).

রাজনৈতিক কারণেই ভারত ছেড়ে গিয়েছিলেন।

বিষয়টি একটু পরীক্ষা করা যাক।

১৯০৩, ২৬ মার্চের চিঠিতে নিবেদিতা বলেছেন—তিনি এখন ভারত ছেড়ে যেতে পারবেন না। ৯ এপ্রিলের চিঠিতেও তাই।

১৯০৪ সালের ২১ জানুয়ারির চিঠিতে পরের বছর পাশ্চাত্য যাবার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এই বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ এবং এপ্রিলের ইস্টার সপ্তাহের চিঠিতে বলেছেন, পাশ্চাত্যে যেতে পারবেন না।

১৯০৬ সালের ২৪ জানুয়ারি লিখলেন:

"প্রিয় য়ুম, আশা হয় এই বছর ইউরোপ যেতে পারব, কিন্তু পথ পরিষ্কার নয়। সেন্ট সারা [মিসেস বুল] যথারীতি এই বিশ্বাস করে যাচ্ছেন আমি যাব—কিন্তু এখনকার ব্যাপারটি ঠিকভাবে দেখা সহজ নয়। **অপরের পথের রাজনৈতিক সংকটসমূহ উত্তরণের ব্যবস্থাদি করার আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি**। সুতরাং আমি কোনো পরিকল্পনা করতে সমর্থ নই।"

এর পর গোটা ১৯০৬ সাল জুড়ে নানা চিঠিতে বললেন, তিনি ইউরোপ যেতে পারবেন না। ১৫ মার্চের চিঠিতে বললেন: "ইউরোপের অনেক জিনিসই দেখতে ইচ্ছা হয়, অনেক মানুষের সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাতের বাসনাও জাগে। এসব সত্ত্বেও আমার ধারণা, আমি কদাপি ইউরোপে যাব না। ভারতে অবস্থানকালে প্রতি মুহূর্তে যা করি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তা স্বামীজীর অভিপ্রেত কার্য। ইউরোপে গেলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।" ২ মে-র চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তিনি পাশ্চাত্যে যেতে পারবেন না কারণ দল রিক্রুট করতে হচ্ছে। ২১ জুন লিখলেন: "হাঁ প্রিয় য়ুম, সেন্ট সারার চিঠিগুলি থেকে বুঝতে পারছি—সকলেই পারছে যে—আমি না-যাওয়ায় তিনি নিরাশ হয়েছেন। উল্টোটাই আমি চেয়েছি। [অর্থাৎ তাঁর কথামত কাজ করতে চেয়েছি।] কিন্তু অসম্ভব তা। আমার কাজ এখানে; আর আমার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কর্মবিরতিও চাই না। তা এখন পুরোপুরি পুনর্গঠিত। আমি পূর্বের মতোই ভালো, মেজাজটি ছাড়া। ঐ ব্যাপারে মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছি। কিন্তু পুনর্বার রথের রজ্জু ধরে ফেলার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছি। অত্যুত্তম স্বাস্থ্যের উপর ঋষিত্ব কতখানি নির্ভরশীল তার হিসাব কেউ জানে না।"

বেশ কিছুদিন ধরেই নিবেদিতার পাশ্চাত্যগমনের কথা চলছিল। তার নানা কারণ, যথা, স্বামীজীর জীবনীর জন্য তথ্যসংগ্রহ, পাশ্চাত্যে বেদান্ত-আন্দোলনের সংগঠন, ভারতীয় কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ, জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য। তাছাড়া নিবেদিতার হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন ছিল।

১৯০৭ সালের ১৫ জানুয়ারির চিঠিতে নিবেদিতা লিখলেন, ১৯০৮-এর আগে তিনি ইউরোপ যাচ্ছেন না। ৬ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে একই কথা। ২৭ ফেব্রুয়ারির আর একটি চিঠিতে লিখলেন, আগামী বছরের গোড়ার দিকে যাত্রা করতে পারি। ১৪ মার্চ লিখলেন, এখন যাওয়া সম্ভব নয়। ২৬ মার্চ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের চিঠিতে কখনো জুলাই, কখনো অগস্ট, কখনো সেপ্টেম্বর, কখনো অক্টোবর মাসে ইউরোপ যাবার কথা বললেন। (২০ মার্চ, ৪ এপ্রিল, ১১ এপ্রিল, ১৮ এপ্রিল)। ৯ জুন বললেন: "পাশ্চাত্যে যে, যেতেই পারব, এমন বলা খুবই শক্ত।" ১৭ জুন লিখলেন, "তুমি ইতিমধ্যে জেনে গেছ যে, সকলই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে; আমি হয়ত এবছর যেতে পারব না।" ১৭ জুলাই লিখলেন, ১৫ অক্টোবরের আগে যেতে পারছেন না। যাত্রাকাল খুবই অনিশ্চিত, তাও বললেন। ২৫ জুলাই লিখলেন, ১৫ সেপ্টেম্বরের আগে যাত্রা করতে পারবেন না। ৩১ জুলাইয়ের চিঠিতে যাত্রা-তারিখ সুস্পষ্ট জানালেন: "গ্রিন্ডলের মারফত

আগামীকাল টেলিগ্রাম করছি—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জেনেভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।"

কিন্তু ঠিক পরদিন, ১ অগস্ট, মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

"গতকাল বিকালে আমার সকল চিঠিপত্র লিখে ফেলার পরে সন্ধ্যায় সহসা স্থির হল—১৫ অগস্ট জেনোয়ার উদ্দেশ্যে আমার যাত্রা করা উচিত। আমরা আরও ঠিক করলাম—লন্ডনের টিকেট কাটা উচিত হবে না—জেনোয়া পর্যন্ত টিকেট নেওয়াই ঠিক।"

তাঁর যাত্রাপথ কী হবে তা কেবল অতি অন্তরঙ্গরাই জেনেছিলেন—পূর্বে আস্থাভাজন বলে বিবেচিত গোখলেকে পর্যন্ত যথাকালে খবর দেননি—তা গোখলেকে লেখা ১৪ অগস্টের ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক পত্র থেকে দেখা যায় :

"আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারোনি বলে দুঃখিত হয়ো না। আমার কেবল ভয় ছিল, তুমি অসম্ভব চেষ্টা করে বসবে এক্ষেত্রে। আমার মন এই ভেবে হালকা হয়েছে যে, তুমি অবস্থাটা শান্তভাবে মেনে নিয়েছ।" 163710

যাত্রাপথে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। [অল্প পরেই সেকথা আসবে]।

বলা বাহুল্য, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর ভারতত্যাগ রাজনৈতিক আত্মগোপন ছাড়া কিছু নয়—বিশেষতঃ যদি মনে রাখি—ইতিমধ্যে যুগান্তর মামলা শুরু হয়ে গেছে।

॥ ৫ ॥ নিবেদিতার ছদ্মবেশ

১৯০৭ অগস্ট মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা পাশ্চাত্যযাত্রা করেন ; সেখানে বছর-দুই কাটিয়ে ভারতে ফেরেন। আবার ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে মিসেস ওলি বুলের সংকট-অসুখের খবর পেয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখান থেকে ভারতে ফিরে আসেন ১৯১১ সালের গোড়ার দিকে। এই সকল যাতায়াতের সময়ে তিনি ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন, এবং একবার অন্তত আমরা জেনেছি—ছদ্মনামও নেন। নিবেদিতার মতো মানুষ কেন ছদ্মবেশ বা ছদ্মনাম নেন, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

১৯০৭ সালে ভারত থেকে পাশ্চাত্যে গমনকালে নিজের ছদ্মবেশ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ৩০ অগস্ট, ১৯০৭, মিস ম্যাকলাউডকে জাহাজ থেকে লিখেছেন :

"তোমার প্রতিভাময়ী কোনো পরিচারিকা আছে নাকি ? 'ভেল্' দিয়ে ভিন্ন ধরনের 'হেড-ড্রেস্' করতে চাই। একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেছে—কিন্তু তা কার্যকর করতে বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রয়োজন।"

এই পর্বের শেষের দিকে ১৯০৯ মার্চ মাসে যখন আমেরিকা থেকে ইংলন্ড যাচ্ছেন তখন ৯ মার্চ মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"তুমি কি এপ্রিলে লন্ডনে থাকবে ? সেখানে বসুদের সঙ্গে আমার থাকার কথা। স্থানত্যাগের আগে আমি তোমার কাছে গিয়ে যে-কোনো একটা পুরনো মসলিন গাউন নিয়ে নেব—জাহাজে পরবার জন্য। যদি তোমার কাছ থেকে একটা জোগাড় করতে পারি—সেইসঙ্গে অ্যালবার্টা ও মিসেস হেলীয়ারের কাছ থেকেও একটা ক'রে—তাহলে [জাহাজে] সেকুলার পোশাক পরে চলতে পারব।"

এই সেকুলার পোশাক পরে, নতুন 'হেড-ড্রেস'-সহ কিভাবে ছদ্মবেশিনী তিনি কলকতার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য থেকে যাত্রা করেছিলেন, তার একাধিক উল্লেখ তাঁর চিঠিতে আছে।—

"*তোমার পরিচ্ছদগুলি একেবারে ঈশ্বরপ্রেরিত যেন। এখানকার কাজ শেষ করার পরমুহূর্ত থেকে কলকাতা পৌঁছানো পর্যন্ত, আমাকে সেকুলার পোশাক পরতে হবে। এমন অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতেও হবে—আমি মিস বা মিসেস বুল। সুতরাং কথাটি কয়ো না।*" [মিস ম্যাকলাউডকে ; ১১-৫-১৯০৯]

"আমাকে নীল সার্জের টুপি পাঠাবার জন্য তোমার কাছে বৈজ্ঞানিকপ্রবর [ডাঃ বসু] প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তুমি কি দিতে পারবে ? তিনি বলছেন—আমার সেকুলার পোশাকের সঙ্গে ঐরকম একটা টুপি চাই-ই।" [একই জনকে ; ১৫-৫-১৯০৯]

"আমার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ—তোমার পোশাকের কারণে।" [একই জনকে ; ৪-৬-১৯০৯]

বোম্বাইয়ে পৌঁছবার পরে জাহাজঘাটায় খানাতল্লাসীর যে-চেহারা দেখলেন, তা র‍্যাটক্লিফকে ২১ জুলাই লিখে পাঠান :

"নানা দিক দিয়ে অবতরণ-ব্যাপারটি শিক্ষণীয় বস্তু। আগ্নেয়াস্ত্র ও তার রসদের উপর শুল্ক-সংক্রান্ত যেসব অপূর্ব নিয়ম ফাঁদা হয়েছে সেগুলি থেকে মনে হবে যে, ভবিষ্যতে প্রচণ্ডতম বিধিনিষেধের বেড়াজাল না কাটিয়ে, কিংবা সুনির্দিষ্ট ছাড়পত্র ছাড়া, কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না। নিয়মগুলি অবশ্য ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে স্থগিত থাকে—কিন্তু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগের চেহারা নৈতিক উৎপীড়নের অব্যর্থ নমুনা। আমার এজেন্ট (গ্রিন্ডলেজ্) স্টেশনে আমার মালপত্র ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়েছিলেন—তাঁরা আমার [বাক্স ইত্যাদির] চাবি পর্যন্ত নিতে গররাজি [অর্থাৎ বাক্স-পত্র খুলে পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেননি]—কারণ, ওর কোনো প্রয়োজনই নেই !! একজনের [ভারতীয় ?] বন্ধুর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিটি বাক্স খুলে পরীক্ষা করা হবে, শেষ ফার্দিং পর্যন্ত কঠোরভাবে আদায় ক'রে নেওয়া হবে—এক্ষেত্রে ব্যক্তিবিবেচনা থাকবে না। আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রটিতে এই বিরক্তিকর ব্যাপারটি অবশ্য সৌভাগ্যবশতঃ এড়ানো গিয়েছিল, যদিও তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন আমি নালি-পথ পেরুচ্ছি, দেখি যে, দুজন অফিসার হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে আছে একটা নিতান্ত তুচ্ছ চেহারার ছোট স্টীল ট্রাঙ্কের উপরে, তার মাপ হবে আড়াই ফুট × দেড় ফুট—তার মধ্যে একটি তোয়ালে, সাবান এবং টুকিটাকি জিনিস, যা আমরা হ্যান্ডব্যাগে ভরে নিই। হাঁটু-গেড়ে-বসা পরীক্ষকদের ভাবভঙ্গিতে এমনই দুর্দান্ত প্রচণ্ডতা যে, আমি তাদের কিছু লজ্জা দেবার জন্য বললাম—'ওটা খুব নিরীহ চেহারার বাক্স, নয় কি ?' তারা মজাবোধ ক'রে মুখ তুলে বলল—'ঠিক, কিন্তু এটা যে নেটিভের বাক্স।' মনে হল, এক্ষেত্রে ওটার সম্বন্ধে ভদ্র ব্যবহার স্পষ্টতই মহাপাপ। দেখা গেল, দুটি লম্বা-চওড়া ইউরোপীয় পুঙ্গব গিল্টি-করা কাঁচের ছোটখাট তুচ্ছ একটা খাঁজকাটা গয়নাদানী উপরে তুলে আলোয় এধার-ওধার নাড়িয়ে পরীক্ষা করছে—যে-বস্তুটি মালিক-ভদ্রলোক স্পষ্টতই তাঁর তরুণী পত্নীর জন্য নিয়ে আসছেন। ভাবছি, এইসকল পরীক্ষাকারী ব্যক্তিগণের হস্তে যে-ধরনের দায়িত্বশূন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের শিকাররা যে-প্রকার আত্মরক্ষায় অধিকারহীন—তাতে এরা [পরীক্ষাকারীরা] কতদিন এইসব জিনিসের ছিচকে চুরি থেকে নিজেদের সামলে রাখবে ! দেখা যাচ্ছে, ভোলা [*Bhola*] [কে ইনি ?] পৌঁছবার পরে তার ট্রাঙ্ক তল্লাস করা হয়েছিল—এবং তার চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়—অনুবাদ করে পড়ে নেবার জন্য !!! লাজপত

রায় সম্বন্ধেও নিশ্চয় একইপ্রকার ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব ব্যাপারের মোকাবিলা ভালভাবে করা যাবে বলে মনে করি না। আমার একটুও সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের কানুনকেও কৌশলে পরিহার করা সম্ভব, যদি লোকজন এইসব ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাবার চাতুরী পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে। নীট ফল—পৌঁছানোর পর থেকে তিক্ত সম্পর্ক। কিন্তু কি দৃশ্য!—মানুষ তার নিজের দেশে এইভাবে অবতরণ করছে—অপূর্ব! ১৬৬০ সালের বোম্বাই—১৯০৯ সালে সেই একই স্থান—উভয়ের মধ্যে শিক্ষণীয় বৈপরীত্য বটে! ইতিমধ্যে আমি আমার লেখার টেবিলে প্রত্যাবর্তন করেছি। ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে? আমার তো হচ্ছে না। সন্ধ্যায় পূজার ঘণ্টা বাজছে—প্রতি সন্ধ্যায় বাজছে—সেটা এখানেই—আগে যেমন বাজত। গত দু'বৎসর একটা স্বপ্নের মতো।"

কলকাতায় ফিরেও নিবেদিতা কিছুদিন ছদ্মবেশ রেখেছিলেন, বাড়ি থেকে বেরোননি, সিস্টার দেবমাতাকে অনেকে ঐ সময়ে নিবেদিতা বলে ভুল করায় তাঁর সুবিধা হয়েছিল—এসব কথাও নিবেদিতার চিঠি থেকেই পাই। ২২ জুলাই, ১৯০৯, তিনি মিস ম্যাকলাউডকে তাঁর প্রদত্ত পোশাক সম্বন্ধে লিখেছেন, "সেগুলি এখন পরছি—ছদ্ম থাকার প্রয়োজনে।" একই তারিখে মিসেস বুলকে লিখলেন,

"সিস্টার দেবমাতা এখন এখানে আছেন, খুবই মনোহারিণী, আমার মতোই পোশাক পরেন।...তোমার চিঠিতে যেন আমার নামোচ্চারণ করো না। আমি আড়ালে আছি, রাস্তায় বেরুতে চাইছি না। দেবমাতাকেই সকলে আমি বলে ধরে নেয়।"

দেবমাতা তাঁর নিবেদিতা-স্মৃতিতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"নিবেদিতা আমাকে যতদিন সম্ভব কলকাতায় আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন—আমি তাঁর আত্মগোপনের সহায়ক হয়েছিলাম। বিদ্যালয়ে আমি পৌঁছবার কিছু পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফিরেছিলেন। আমি দেখে অবাক—তিনি একেবারে আধুনিকতম ফ্যাশানে সজ্জিত, মাথায় মস্ত শাদা হ্যাট, পালক গোঁজা, পরিপাটি জমকালো গাউন। আমি বললাম, 'নিবেদিতা, কি কাণ্ড! আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরো।' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না-ফেরার জন্য লিখে পাঠানো হয়, কারণ ভারতে পদার্পণ করলেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারের শাসানি দিয়ে রেখেছে। আমি কিন্তু ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি জানতাম, আমার এই পোশাক দেখে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।' পুলিশ সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা যথাযথ, কারণ যখন আমি বাগবাজারের সরু গলি দিয়ে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করা হত—'আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?' যখন বলতাম—'না'—তখন তারা স্থির করত—আমি স্কুলের দ্বিতীয় সিস্টার।...আমার কোনো রাজনৈতিক সংস্রব ছিল না বলে তারা স্কুলে বিশেষ নজর দেয় নি, ফলে নিবেদিতা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়েছিল।"

পরবর্তীকালে, ১৯১০ অক্টোবর মাসে, আমেরিকা যাত্রাকালে নিবেদিতা পুনশ্চ ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। মিসেস বুলের গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত ভারত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ছিল—হয়ত সরকার তাঁকে ভারতে আর ফিরতে দেবে না। আর্ত হয়ে মিস ম্যাকলাউডকে কলম্বো থেকে ১৪ অক্টোবর লিখেছেন:

"যদি কোনো সাইকিক্-কে পাও—যে কোনো সাইকিক্-কে—আমার হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এই কি আমার শেষবারের মতো ভারতত্যাগ? আমি কি খোকাকে [ডাঃ বসুকে] আবার দেখতে পাব,

এবং তার সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারব ? ...আ-হ্যাঃ, ফিরতে পারব কি ? ভবিষ্যতে কী আছে ? ...এখান থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ে যদি তুমি আমাকে চিঠি লেখো বা তার করো, তাহলে—মিসেস মার্গট এই নামে করবে। আমি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছি।"

একই তারিখে মিসেস র‍্যাটক্লিফ-কে লিখেছেন :

"তুমি বোধহয় জানো যে, সেন্ট সারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।...

"এখানে ভারতীয় দিকে আর একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যে-ব্যাপারটি এখন ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না—তা আমাদের পক্ষে দ্রুত কাজ করার প্রয়োজন ঘটিয়েছে। উপরমহলে: কোনো ব্যক্তি চতুর একটি মতলব ভেঁজেছেন, যা আমাকে সুবিধামতো গর্দভ বানিয়ে ছাড়বে—কিন্তু আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে দেবে না।...

"আমি মিসেস থেটা মার্গট নাম নিয়ে ছদ্মপরিচয়ে ভ্রমণ করছি—নতুন নাম স্বাক্ষরে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

নিবেদিতার সফল কৌশল। তিনি শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষে ফিরতে পেরেছিলেন—তবে ছদ্মবেশে।

॥ ৬ ॥ নিবেদিতার ফরাসি চন্দননগরে বসবাসের পরিকল্পনা

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক সংবাদ—নিবেদিতা ফরাসি চন্দননগরে বাস করার পরিকল্পনা করেছিলেন। রোগশয্যালীন মিসেস বুলের সঙ্গে একত্রে এই পরিকল্পনা করেন এবং এর কথা তিনি খুবই গোপন রাখেন—মিস ম্যাকলাউড, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতি, বা মিসেস উইলসন প্রভৃতি অত্যন্ত অন্তরঙ্গদের বেশি কেউ সেকথা জানেননি।

মিস ম্যাকলাউডকে ২৮ ডিসেম্বর ১৯১০, তিনি লেখেন :

"*সেন্ট সারা সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডে* যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ; তারপর যদি শরীরে জোর পান—ফরাসি জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষে। চন্দননগরে একটি বাড়ি নেবেন—একটি নৌকাও রাখবেন। *মঁসিয়ে নোবেলের সাহায্য আমাদের নিতে হবে*—এবং ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে সেখানে উপযুক্ত পরিচয়পত্রসহ যেতে হবে—আমি যাব ছদ্মনামে—ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি ওঁর শারীরিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে আমাকে একলাই যেতে হবে—তবে সেটা ঘটবে না বলেই মনে হয়। আমি সেখানে নিতান্তই যেতে চাই—রাশি-রাশি কাজ অপেক্ষা করে আছে। বিজ্ঞানের বিষয়ে নতুন একটা কাজ এগিয়ে চলেছে।"

১২ জানুয়ারি, ১৯১১ র‍্যাটক্লিফকে একই প্রসঙ্গে লিখলেন :

"সে যাই হোক,...ফরাসি জাহাজে যাওয়া হবে ; আমরা থাকব ফরাসি চন্দননগরে। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁর [মিসেস বুলের] অতিশয়িত চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। আমি অবশ্য পৌঁছবার পরে ফরাসি-ভূমিতে বাঁধা থাকতে খুবই ইচ্ছুক—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজের লেখা ও [বসুর বৈজ্ঞানিক রচনার] সম্পাদনার কাজ ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারব। এই জিনিসগুলি সম্বন্ধেই কেবল কড়ার করার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি। আমি অবশ্য সেখানে সেকুলার পোশাকে ও ছদ্মনামে থাকব।"

১৮ জানুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে এ সম্বন্ধে যা লেখেন, তাতে অল্প-কিছু বাড়তি সংবাদ আছে :

"ফেরার পথে শীঘ্রই তোমার কাছে হাজির হবার সুযোগ তুমি আমাকে দেবে তা জানি। মে-র [বোন মিসেস উইলসন] কাছে এবং তোমার কাছে একটু উঁকি দেব—যদি সম্ভব হয় প্যারিসে দু'একদিন থেকে বুতে দ্য মোভেল্ [?]-এর সঙ্গে দেখা ক'রে চন্দননগরের জন্য পরিচয়পত্র জোগাড় করব—তারপর ফিরে চলো—ফিরে চলো—ফিরে চলো ভারতে—এবং কাজে। সেন্ট সারা-ই আমার প্রত্যাবর্তনের গোটা পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে যে, 'ফরাসি সরকারের সৌজন্য চাওয়ার' ঔচিত্য আছেই। তারপর চন্দননগরে খোলাখুলি বাস করব—এমন-কি এই লেখিকা-মর্যাদা সেইসঙ্গে থাকবে—যিনি সহজ জীবন চান ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিকল্পনাটি এখনো কার্যকর করার চেষ্টা আমি করতে পারি, অন্তত এর দ্বারা বোসপাড়ায় ফেরার আগে একটা সাময়িক আস্তানা প্রস্তুত রাখতে পারি। এর জন্য ফরাসি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আমার নিজের নামে পরিচয়পত্র প্রয়োজন—তবে চন্দননগরে পৌঁছবার আগে-পর্যন্ত যাত্রাপথ বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে টুঁ-শব্দটি নয়। যাত্রাপথে ছদ্মনাম নিতে পারি। একথা তোমায় বলছি, যাতে কোনো সময় নষ্ট না হয়। অনুগ্রহ করে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে বিষয়টির আলোচনা করো। আমি মেসাজেরি মারিতিম্-এর জাহাজ সম্বন্ধে জানতে চাই। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই তোমার কাছে পৌঁছচ্ছি—জানি যে, তুমি আমাকে গ্রহণ করবে। দয়া করে একটা বার্থ-এর ব্যবস্থা ক'রে রেখো—**তোমারই জন্য করছ, এইভাবে**।"

একই তারিখে র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখা চিঠিতে মোটামুটি এক ধরনের কথাই লিখেছিলেন। "সকল পরিকল্পনা যেন একেবারে নিঃশব্দে, চূড়ান্ত গোপনে রাখা হয়"—ঐ চিঠিতে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

॥ ৭ ॥ নিবেদিতার বিরুদ্ধে পুলিশের নানা মারাত্মক অভিযোগ

আধুনিক গবেষকরা পুলিশের গোপন ফাইলে নিবেদিতার নামোল্লেখ না পেয়ে হতাশার আনন্দ বোধ করতে পারেন—কিন্তু তৎকালীন পুলিশকর্তৃপক্ষ সে-রকম স্বস্তি-সুখে ছিলেন না। নিবেদিতার বিরুদ্ধে নানা ভয়াবহ অভিযোগ তাঁরা পোষণ করেছেন।

অভিযোগের একটি—তিনি বিপ্লবীদের পত্রিকা যুগান্তরের উস্কানিদাত্রী। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে তিনি লেখেন :

"শুনলাম, আমি সি-আই-ডি-র তালিকাভুক্ত হয়েছি—যুগান্তরের প্রেরণাদাত্রী হিসাবে। হাস্যকর অভিযোগ, কেননা আমি জানিই না, তার মধ্যে কী থাকে—কিংবা কারা সেটিকে চালায়। আমি অবশ্যই সম্মানিত। তবে কিনা ক্ষেত্রবিশেষে সম্মান অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।"

আর একটি অভিযোগ—নিবেদিতা ডাকাতির জন্য দায়ী। ২৮ এপ্রিল, ১৯১০, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন :

"সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বন্ধুর কাছে মারাত্মক খবর এসেছে—'অনুচ্চারিত প্রজ্ঞা বিভাগে'র [অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের] খাতায় আমার নাম উঠে গেছে সর্বাত্মক প্রেরণাদাত্রী

হিসাবে—কিসের ?—মনে রেখো—ডাকাতির। সুতরাং আমি নজরদারির অধীন।"

৬ জুলাই, ১৯১০, মিসেস উইলসনকে লিখলেন :

"প্রতিদিন খবর আসছে, মানী লোকদের ঐকে-ওকে কাঠগড়ায় শীঘ্রই তোলা হবে—চুরি, ডাকাতি সংগঠনের জন্য। বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, কিছুদিন আগে আমি সেই তালিকায় ছিলাম।"

২৮ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

"মনে হয় কিছুদিন আগে তোমাকে বলেছি—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা (কিংবা সি-আই-ডি বিভাগের) ডেনহ্যাম আমাকে এই ধারণার দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন যে, আমি সকল ডাকাতির মূল প্রেরণা-উৎস। মনে হয় না এখন কেউ (এমন কি তিনিও) কথাটা সত্য মনে করেন। এর মানে, আমার ধারণা, তাঁরা আমাকে দমন করবেন, যদি পারেন।"

॥ ৮ ॥ গোপন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক

নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্যে যে, গোপন প্রেসের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বৈপ্লবিক ব্যক্তি ও সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপার ছিল—তা আমরা নানা ইঙ্গিতসূত্রে সঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারি। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচুর সংবাদ তাঁর চিঠিতে আছে, আর তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত রোষ।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের কিছু-বেশি আড়াই বৎসর আগেকার কথা, নিবেদিতা ২৮ জানুয়ারি, ১৯০৩, লিখলেন : "শোনা যাচ্ছে, বেঙ্গলী-ইংলিশ কাগজগুলি সবকিছু সম্বন্ধে গরলপূর্ণ সমালোচনা ক'রে যাচ্ছে। তার ফলে খুব সম্ভব নতুনভাবে সংবাদপত্রের দলন শুরু হবে, আর পরিস্থিতি অস্বাভাবিক সংকটপূর্ণ হয়ে যাবে।"

স্বদেশী আন্দোলনের একাংশ বৈপ্লবিক চরিত্র নেবার পরে, তার মূলে বিপ্লবপন্থী পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার জন্য, সরকার নিষ্ঠুরতম উপায়ে সংবাদপত্র দলনকার্য আরম্ভ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছেন :

"১৬ অক্টোবর [জাতীয় দিবস] যতই নিকটতর হচ্ছে, সরকার ততই অল্পবিস্তর তার বিশেষ পর্বে জেগে-ওঠা আতঙ্কের অধীন হচ্ছে। বাংলা পত্রিকা 'হিতোপদেশ'—নিতান্তই মডারেট বলে কথিত—তার বিরুদ্ধে মামলা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।"

র‍্যাটক্লিফকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০, 'প্রেস-বিল' প্রসঙ্গে লিখলেন :

"তুমি অবশ্যই, আমাদের মতোই, প্রেস বিলের চেহারা দেখে হতবাক। অদ্ভুত লাগে নাকি যখন দেখি—জনসাধারণ নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকার কথা কদাপি ভাবেনি। শুনলাম, ভূপেন বসু ও এলাহাবাদের মালব্য—এই দুইজন মাত্র এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। কেটি-র [মিসেস র‍্যাটক্লিফ] বন্ধুর [গোখলের] উপর বোধহয় অভিশাপ এসে পড়েছে—উৎকট ভ্রান্তি ছাড়া সে আর কিছু ঘটাতে পারছে না। [গোখলে প্রেস বিলের বিরোধিতা করেন নি]। ভূপেন [বসু] দেখিয়ে দেন—ছাপাখানার বাড়তি খরচ—শিক্ষার উপর অধিকতর দণ্ডাঘাত ছাড়া কিছু নয় ; কেননা তার ফলে পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে !!!"

র‍্যাটক্লিফকে লেখা ১৩ জুলাই, ১৯১০, চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মুখ বন্ধ করার জন্য সরকার তাঁকে ডাকাতির মামলায় জড়াবার চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপিত হয়েছে। একই জনকে ১৯-২০ জুলাইয়ের চিঠিতে নিবেদিতা বললেন, রামানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কিন্তু—

"জনৈক জরাতুর বৃদ্ধ ভদ্রলোক—দেবীপ্রসন্ন রায়—প্রবল ভাবাবেগে বক্তৃতা ক'রে থাকেন—বয়স ৬০-এর মতো—কোনো একটি পত্রিকার সম্পাদক—তাঁকে ধ্বংস করতে সরকার ইচ্ছুক। তদনুযায়ী তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ তিনি এক মুসলমানের লেখা কয়েক বৎসরের পুরনো একটি বই ছেপেছেন, তার নাম, মনে হচ্ছে, 'অনল ভারত' (কথাটার মানে আমি জানি না)।[৪] তরুণতর ব্যক্তিও গ্রেপ্তার। সেইসূত্রে গোপন প্রেসের কথিত অফিসে হানা—সাম্প্রতিক যুগান্তর বাজেয়াপ্ত—সাঙ্গপাঙ্গদের কাউকে-কাউকে গ্রেপ্তার।"

নিবেদিতার ধারণা—পৃথিবীতে কোথাও কখনো এইভাবে মন ও বাক্যের স্বাধীনতার উপর অত্যাচার করা হয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখলেন :

"আমার সৌভাগ্য যে, আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোনো সংবাদ সংবাদপত্রে নেই। তেমন কিছু কানেও শুনিনি। মনে হয় না, তেমন কিছু আছেও। দেখে বোধ হচ্ছে, 'হিজ অনার' রাজদ্রোহকে উত্তরোত্তর পিষে চূর্ণ করতে ব্রতী। সে-কাজ করার সময়ে অবলম্বিত উপায় উত্তরোত্তর অসুন্দর হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে অবশ্য কোনো খবর নেই। **আমি মনে করি, এখন এখানে নিয়ন্ত্রী নীতির দ্বারা যে-প্রকারে চিন্তার স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার অপহৃত, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম সময়ে কম ক্ষেত্রেই তেমন ঘটেছে। স্পেন, ভেনিস, মেরীর অধীনে ইংলেন্ড, ১৮৬০ সালের আগে পেপ্যাল [পোপ নিয়ন্ত্রিত] রাজ্যগুলিও এই ব্যাপারে মন্দতর ছিল কিনা সন্দেহ।** কেবলই দেখা যায়, হয়ত বাইসাইকেলে চড়ে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় কেউ যাচ্ছে, তার পিঠে বাঁধা বন্দুক—জনগণকে বোধহয় এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, তাদের অস্ত্র রাখার অধিকার নেই। সামরিকতা গ্রাস করেছে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে। বয় স্কাউটের [যাদের কাজ সামরিক সংবাদ সংগ্রহ] ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। ওরা কি ভাবে, এটা চিরদিন একতরফা থাকবে?"

কয়েক মাস আগে (২৮-৭-১৯১০) নিবেদিতা একই জনকে লিখেছেন :

"সংবাদপত্রগুলি চুপ। তাদের শিরোনামাগুলিও সতর্কভাবে, নিয়ন্ত্রিত আকারে, ছাপতে হবে! দেশ কিন্তু দুঃখে পূর্ণ। কেবল কলকাতাতেই গত ১২/১৪ দিনের মধ্যে প্রায় ২০ জন গ্রেপ্তার—ডাকাতি ও রাজদ্রোহের অভিযোগে। তাদের কয়েকজনকে আটক করা

৪ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী 'নব্যভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ঘোর জাতীয়তাবাদী। এঁর 'প্রসূন' ও 'প্রণব' নামে দুটি নিবন্ধের বই নিষিদ্ধ হয়—প্রথমটি ১৯১১ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯১৫ সালে। দেবীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নিবন্ধের বই, এবং একাধিক উপন্যাসের লেখক।

সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল হোসেনের 'অনল প্রবাহ' নামক কাব্যগ্রন্থটি ২১০-১৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, নব্যভারত প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ভূতনাথ পালিত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালের ভারতীয় প্রেস আইনের ১ নং ধারায় এবং ১৯১০, ৮ অগস্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এটি বাজেয়াপ্ত হয়। এই বই প্রকাশের দায়ে প্রেসের মালিক দেবীপ্রসন্নর জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাস জেল হয়—৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০। লেখক সিরাজীকে ১২৪/এ এবং ১৫৩/এ সেকশন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়—১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০। বিচারক, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ডি সুইন-হো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিরাজী আরও অনেক কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখেছেন। মুসলিম জাতীয়তার প্রবক্তা হলেও তিনি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার শিকার ছিলেন না।

উপরের তথ্যগুলি ডঃ শিশির করের সৌজন্যে পেয়েছি।

হয়েছে—সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারের মনের জ্বালার জন্য। টুঁ শব্দও নেই। কিন্তু একবার গলার উপর থেকে পেষণের হাত তুলে নাও, দেখবে বাক্যে ও রচনায় কোন্ নির্গমন! ওরা কি ভাবে—চিন্তা রুদ্ধ হয়ে গেছে, যেহেতু শব্দ শোনা যাচ্ছে না?"

সংবাদপত্রের উপর উৎপীড়নের নানা সংবাদ দিয়ে নিবেদিতা ৭ এপ্রিল, ১৯১০ তারিখে র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে এই ভয়ঙ্কর কথাগুলি লিখলেন :

"অবস্থাটা একবার বুঝে নাও। কোনো সমালোচনার কণ্ঠ ওরা থাকতে দেবে না। যদি কোনো সংবাদপত্র সামান্যতম স্বাধীনতার ভাব দেখিয়েছে, অমনি তাকে চুরমার ক'রে দাও। সরকার স্পষ্টত সেই দিনগুলির জন্য লালায়িত যখন দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে ব্রতী মানুষদের কাছে হত্যার পক্ষে প্রচারই একমাত্র দেশসেবা হয়ে দাঁড়াবে। আর সরকার যতই দেশপ্রেমের উপর ঘা মেরে পরীক্ষা করতে চাইবে ততই ঐ ধরনের মানুষ উত্থিত হবে।

"এই পরিস্থিতিতে—গোপন সংবাদপত্রই জনগণের পক্ষে একমাত্র উত্তর। আর শুনছি, ইতিমধ্যেই ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় কয়েকটি তেমন কাগজের আবির্ভাব হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে সমর্থ নই! মনে হয়, ওরা ভাবছে, এগুলিকে স্বচ্ছন্দে বিনাশ করা যাবে। সম্ভব নাকি! শোনা যাচ্ছে, আমাদের গম্ভীর বন্ধুর [রামানন্দ?] পত্রিকাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হতে পারে। তা করলে—পাগল, উন্মাদ পাগল ওরা—ঈশ্বরের হাতে ধ্বংস অনিবার্য।"

চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনার কথা বলার পরে, নিবেদিতা আরও যা বললেন, তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তিনি নিজে গোপন প্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন :

"এখানে সরকার দেউলিয়া। গোয়েন্দাবাহিনী ও নতুন প্রদেশের খরচ, আফিমের আয় হ্রাস, সামরিক খাতে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধি—এসব নিয়ে তাদের মাথা খারাপ হবার জোগাড়। ধরো, গোপন প্রেস—'ক্রেডিট' নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল? অবশ্যই মনে রেখো, গোপন প্রেস—গোপন বলে—একেবারে বাঁধনছেঁড়া। সেখানে বিচার-বিবেচনার কোনো দরকারই নেই। শিব! শিব!"

নিবেদিতার ১৯-২০ জুলাইয়ের চিঠি থেকে একটু আগেই দেখেছি—তিনি গোপনে ছাপা যুগান্তরের সংবাদ দিয়েছেন।[৫] গোপন সংবাদপত্রকে অকুণ্ঠে সমর্থন জানিয়ে, সেইসঙ্গে রুদ্ধ দেশে বৈপ্লবিক উত্থানের অনিবার্যতাকে স্বীকার ক'রে, লিখেছিলেন (২৭-১-১৯১০) :

"আমার কাছে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, যে-ধরনের নিপীড়ন এখানে চলেছে, সৎ সমালোচনার প্রতিটি শব্দকে যেভাবে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা আপাততঃ যাই মনে হোক না কেন, বস্তুতঃপক্ষে মধ্যপন্থিতার উপরই প্রচণ্ড আঘাত। কতকগুলি ক্রীতদাসের ঘ্যানঘেনে কাঁদুনি কেবল শোনা যাচ্ছে, অপরপক্ষে যথার্থ স্বাধীনচেতা মানুষ বাধ্য হয়ে নিশ্চুপ। এক্ষেত্রে একমাত্র যে-আন্দোলনের বৃদ্ধির পথ খোলা আছে তা হল—সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের পক্ষে গোপন প্রচার।"

৫ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেকটার জেনারেল এফ সি ড্যালী ১৯১১, অগস্ট মাসে একটি গোপন নোট প্রস্তুত করে মুদ্রিত করেন, কেবল সরকারের ভিতর মহলের ব্যবহারের জন্য, নাম "নোট অন দি গ্রোথ্ অব দি রেভলিউশনারি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল," (যেটি সম্প্রতি শ্রীশঙ্কর ঘোষ "ফার্স্ট রেবেলস্" নাম দিয়ে পুনঃপ্রকাশ করেছেন ; রিদ্ধি, ১৯৮১), তার মধ্যে যুগান্তরের গোপন মুদ্রণের সংবাদ আছে :

"The papers, and in particular the *Jugantar*, become more violent than ever, and when their publication was eventually put a stop to they continued to appear in the form of secretly printed leaflets."

এইসূত্রে সরকার কোন্ বারুদের উপর বসে আছে, তার কথাও নিবেদিতা বললেন :

"এই একেবারে প্রাথমিক মনস্তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও [অর্থাৎ কণ্ঠরোধের মারাত্মক ফল ইত্যাদি]—শাসকদলের চূড়ান্ত হঠকারিতায় স্তম্ভিত হতে হয়। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে এদেশকে তারা কিভাবে কব্জায় রাখবে ? একদিকে [বিরোধী] মুসলমান-জগৎ অন্যদিকে জাপান—ওরা কি মনে করে বৃটিশরাজের কোনো বিকল্প নেই ? আর ওরা তো ব্যক্তিগত লোভ, স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়ন ছাড়া কিছু বোঝে না। চূড়ান্ত দায়িত্বহীন। ইংলণ্ডে এই নির্বাচনের ফলে যদি উচ্চতর শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এসে যায়—নিশ্চিত তাই হবে বলে আমি মনে করি—সেক্ষেত্রে খোদ ইংলণ্ডেও ভবিষ্যতে একই ধরনের হঠকারিতা, দায়িত্বহীনতার রাজ্য আসবে। তা যে ঘটতে পারে—বুয়োর যুদ্ধই প্রমাণ।"

নিবেদিতা ধর্মযুদ্ধের পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিলেন :

"অবশ্যই তুমি বুঝবে—বর্তমানে গোপন প্রেসের তুল্য পবিত্র ধর্মযুদ্ধের অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।" [১৯/২০-৭-১৯১০]

অগ্নি ঝরল ভাষায় :

"কিছু করার নেই—শুধু অপেক্ষা—আর অন্তরালের গোপন শক্তিতে বিশ্বাস। দুষ্ট আইনকে ভাঙা যদি সর্বোচ্চ ন্যায় হয় তাহলে এই মুহূর্তে গোপন সংবাদপত্রের পরিচালক ঈশ্বরের খাঁটি সন্তান।" [২৮-৪-১৯১০]

চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী ফিরোজ শা মেটা কাউন্সিল পুরো অধিকার করে বসে আছেন, গোখলে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে দেশের কাছে নিজের মুখ পুড়িয়েছেন : তাঁদের হয়ে দু-চারটি কাগজ কেঁউ-কেঁউ করলেও তাঁদের ভবিষ্যৎ নেই—এইসব কথা বলার পরে নিবেদিতা লিখলেন :

"সত্যকার গুরুত্ব যদি কোনো দলকে পেতে হয়, তাদের নিশ্চয় করে গুপ্তভাবে কাজ করতে হবে। তারা কেবল কর্মে নিজেদের ব্যক্ত করবে।" [২৫-১১-১৯০৯]

বিপ্লববাদিনীর অগ্নিময় বিশ্বাসের সঙ্গে কিন্তু করুণাময়ী মাতার দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে ছিলই। ১৪ অক্টোবর ১৯১০ তিনি লিখলেন :

"কেবল যে, সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে তাই নয়, আদালতে যতকিছু বলা হয় তা লিখিতও হয় না, প্রকাশিতও হয় না। সুতরাং কোনোই আশা নেই। অবশ্য গুপ্ত শক্তিগুলি জমায়েত হচ্ছে—কিন্তু কতটুকু আর তাদের সামর্থ্য হতে পারে ? এ যেন নেকড়ের বিরুদ্ধে মেষশাবকেরা। একদিকে এই সকল আধুনিক শহরগুলি, তাদের অন্তরালবর্তী শোষণের পন্থাসমূহ, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিকড় ছড়ানো, অন্যদিকে এই শিশুতুল্য মানুষগুলি, ইংরেজি স্কুলগুলি যাদের অর্থহীন কেতা-কানুন শিখিয়ে যাচ্ছে—আর তাকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত জাপান—কি আশা আছে বলো ?"

তবু—। নিবেদিতা একটা তবু যোগ করলেন :

"তবু—ঈশ্বরের অস্ত্রশালা সুবিশাল। এক মুহূর্তে অবস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে যেতে পারে—সেটা ভুললে চলবে না—মানুষকে এগিয়ে যেতেই হবে—আশা অনির্বাণ—এই বিশ্বাসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবেদিতার পত্রে সমকালীন রাজনীতির ব্যক্ত ও গুপ্ত সংবাদ

॥১॥ উচ্চপর্যায়ের ইংরেজ প্রশাসকদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে সরকারের গোয়েন্দা-ব্যবস্থা তেমন জোরদার ছিল না বলা হয়। হতে পারে। উল্টোপক্ষে আমরা দেখি, শাসকমহলের ভিতরের সংবাদ বার করায় নিবেদিতার বিশেষ দক্ষতা ছিল। একথা ইতস্তত শোনা যায় যে, এই পর্যায়ে ভারতের ইংরেজ শাসকেরা অনুভূতিহীন, ন্যায়বোধহীন হলেও সাধারণভাবে সৎ ও পরিশ্রমী ছিলেন—অন্তত উচ্চপর্যায়ের কর্মচারীরা। নিবেদিতার পত্রে যেসব মারাত্মক সংবাদ আছে, তা ঐ ধারণাকে টলিয়ে দেবে। শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ বড়কর্তাদের বহুল দুর্নীতির সংবাদ নিবেদিতার পত্রে-পত্রে ছড়িয়ে আছে, সে প্রসঙ্গ বাদ দেব। কিন্তু যদি দেখা যায়, পুলিশের বড়কর্তা থেকে আরম্ভ ক'রে লেফট্ন্যান্ট গভর্নর পর্যন্ত ঘুষখোর ও অসচ্চরিত্র, তাহলে চমকিত হতে হয়ই। নিবেদিতার পত্রে এইসব বিষয়ে যেসব তথ্য আছে তা অন্য সূত্রে প্রাপ্তব্য কিনা জানি না।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারপক্ষের প্রধান কৌসলী ছিলেন নর্টন। নিবেদিতার চিঠিতে নর্টনের চেহারা এই :

"তোমাকে জানাতে চাই, বলা হচ্ছে যে, নর্টন পুরো আহম্মক, তার আইনজ্ঞান সামান্যই বা কিছুই নেই—উপস্থিত-বুদ্ধি নেই, আইন-কৌশলও অনায়ত্ত। মামলা চলা-কালে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল যে, সরকারপক্ষে আসল খুঁটি [আশুতোষ] বিশ্বাস ; বিশ্বাস না থাকলে মামলা ভেঙে যাবে। তাছাড়া নর্টনের পত্নীকে গর্বভরে বলতে শোনা গেছে—যদি এই মামলা আরও মাস-দুই চলে তাহলে তার একটা মোটরগাড়ি হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, বাইরে থেকে যা দেখা যায়, ব্যাপার সর্বদা আসলে তা নয়। ইতিমধ্যে নর্টন যে-বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে তা জুয়াখেলায় নষ্ট—এইরকমই শোনা যাচ্ছে।

"এই মামলার পুলিশ-সংগঠককে, মেদিনীপুর মামলায় তার সহকর্মী সম্বন্ধে খোলাখুলি ঘৃণা প্রকাশ করতে শোনা গেছে : 'লোকটাকে দ্যাখো একবার। ধনী ও রাজাদের জড়িয়ে মামলা ফেঁদে বসে ; কিন্তু ঐসব ব্যক্তিরা সেরা আইনজীবী স্বপক্ষে দিতে পারেন, ফলে মামলা ফেঁসে যায় !! এদিকে আমাকে দ্যাখো ! আমি সতর্ক থাকি—কোনো ধনীকে না জড়াতে !' কলকাতার পুলিশ !!!"
[৩০-১-১৯০৯]

উচ্চপর্যায়ের ইংরেজ রাজকর্মচারী ফ্রন্স—তাঁর সংবাদ :

"পুনর্বার পত্র আরম্ভ করছি অলিখিত ইতিহাসের একটি টুকরো তোমাকে দেবার জন্য—বুড়ো ফক্স শেষপর্যন্ত ঘুষ খেয়ে গেছে। শোনা গেল, মেদিনীপুর-কেসে অভিযুক্তদের তালিকায় নাড়াজোলের রাজা ছাড়াও আর একজন রাজাকে ঢোকানো হয়েছিল, কিন্তু পরে রহস্যজনকভাবে তাঁর নাম অদৃশ্য হয়ে যায়—আর, ৪০,০০০ টাকা হাতফিরি হয়, ৫ টাকার নোটে, যাতে টাকার হদিশ করা সম্ভব না হয় !!! শোনা গেল, নাড়াজোল বোঝাপড়ায় আসতে রাজি হননি, তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সব ফাঁস ক'রে দেবার হুমকি দিলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, অন্ততপক্ষে তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা হয়। সর্বদা যা বলেছি এখানেও তাই তোমাকে স্মরণ করাচ্ছি—এসব শোনা কথা মাত্র। এদের মূল্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না।" [১-৯-১৯০৯]

পুলিশ-প্রধান হ্যালিডের চরিতকথা :

"পুলিশ-প্রধানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা ক্রিস্টিন তোমাকে জানাবে। সেইসঙ্গে বলি, সুস্পষ্টভাবে আমরা আমাদের মনে কোন্ কথাটা ধরে রেখেছিলাম : 'এস…বি…খুনের কেসে কতটাকা পেয়েছ ?' ঐ কেসটি তোমার [র‍্যাটক্লিফের] কর্মজীবনে মস্ত ভূমিকা নিয়েছিল। উত্তরটা সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছে এসে হাজির। কথাটা কি তোমাকে বলেছি ? মণিমাণিক্য থেকে এক লক্ষ টাকা তোলা হয়। এটা তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ ব্যাপার বোধ হয় যখন ভাবি যে, ওরা নির্দোষ একটি লোককে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে কত ব্যস্ত ছিল। মোকর্দমা পরিচালনায় ফ্রেজারের কার্যধারা ক্রমেই সুপরিচিত হয়ে উঠছে। হাইকোর্টের এক বিহারী মুসলমান বিচারপতিকে—তাঁর নাম আশু ব্যারিস্টার নিশ্চয় দিতে পারবে—একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, প্রস্তাবটা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা তিনি জানেন—কিন্তু বর্তমান পদে আরও পাঁচ বছর তাঁকে থাকতে হবে যাতে পদটি পেতে যে-মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে তা পরিশোধ করতে পারেন। অপরাধী—ফ্রেজার ! এসব ব্যাপার সুপরিচিত, কিন্তু এদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা যাবে না। কারণ তা করলে—আগে যা ছিল মানহানি, এখন তা রাজদ্রোহ !" [২৮-৯-১৯১০]

উদ্ধৃতির শেষের দিকে 'অপরাধী ফ্রেজার'-এর কথা আছে। তাঁর অন্য কথা একটু পরে আনব—এখানে আরও কিছু হ্যালিডে-বার্তা দেওয়া যাক। এইসূত্রে প্রেসের কণ্ঠরোধের কথাও এসে গেছে :

"সংবাদপত্রের গলায় ফাঁসি। বাকেন্দ রায়টের ব্যাপারে পান্নালাল বলে একটি লোকের সংবাদ আছে। লোকটির বাড়ি লুঠ করা হয়—তাতে পুলিশের হাত ছিল তার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহে সমর্থ হয়ে সে কেস খাড়া করে। কিন্তু প্রতিটি সংবাদপত্রে যদিও তার বিবরণ টাইপ ক'রে পাঠানো হয়, কোনো সংবাদপত্রই, এমনকি সাহেবী কাগজ পর্যন্ত, তা ছাপতে সাহস করেনি।…

"হ্যামিলটনের দোকানে দশ হাজার টাকা দামের একটি মুকুট বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়—সেটি দেশীয় এক জহুরীর সম্পত্তি—হ্যালিডের কাছ থেকে এসেছিল—সাম্প্রতিক রায়টে লুণ্ঠিত !!! ব্যাপারটির আবিষ্কর্তা স্বয়ং ভাইসরয় [লর্ড হার্ডিঞ্জ]। হ্যালিডেকে কাঠগড়ায় না তোলার কারণ, হতভাগ্য জহুরী পুলিশী প্রতিহিংসা অপেক্ষা ক্ষতিই শ্রেয় মনে করেছিল।" [৬-৭-১৯১১]

ফ্রেজারের কারচুপির কথা উপরে বলা হয়েছে। অন্যত্রও তা আছে। ফ্রেজার, এবং ভাইসরয়-কাউন্সিলের সদস্য 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ম্যাকের কীর্তির এই সংবাদ :

"দুমরাও-রাজ কেস সম্বন্ধে একটি বিকট গুজব চলছে। ঐ মামলায় স্ল্যাক শপথ নিয়ে মহারাণী কর্তৃক একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার কথা বলেছে—যদিও দত্তক নেবার কথিত সময়ে মহারাণী ধরাধামে ছিলেন না। ফ্রেজারকে ২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—কিন্তু তিনি পান মাত্র ৫০০০, বাকিটা স্ল্যাক ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।" [৬-৭-১৯১১]

চোরের বাটপার ভাই।

লেফটন্যান্ট গভর্নর হেয়ার-কথা[১] এই প্রকার :

"কথিত যে, হেয়ার মদ্যপ—স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন না। তিনটি ইংরাজের চক্রে তিনি আবদ্ধ, যাদের 'শ্যালকগণ' পেটমোটা হচ্ছে, আর বাকি সিভিল সার্ভিসের লোক গজরাচ্ছে।" [১৬-৯-১৯০৯]

অন্য লেফটন্যান্ট গভর্নর বেকার[২], আপাততঃ দৃঢ়চরিত্র মনে হলেও বস্তুতপক্ষে একটি আকাট বর্বর :

"কথিত যে, বেকার প্রচুর মদ টেনে এক সরকারী নাচের আসরে বর্ধমানের মহারাণীর প্রতি অতি-কামার্তের আচরণ করেছেন।" [৬-৭-১৯১৯]

নিবেদিতার কাছে বেকারের এই নষ্টামীর চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা মনে হয়েছিল উক্ত মহারাণীর মহারাজ-স্বামীর কাপুরুষতা, যে-লোকটি "ডুয়েল না লড়ে ঐ বিষয়ে শুধু মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছে।"—

"আঃ ধিক্! জঘন্য সেই পুরুষ, যে জানে না কোন্ সময়ে খুন করতে হয়!"

সব জড়িয়ে নিবেদিতার দৃষ্টিতে পরিস্থিতির চেহারা এই :

"কমিশন, পারসেনটেজ্ ইত্যাদির নামে যে-ধরনের দুর্নীতি চলেছে তার পরিমাণ ধারণাতেও আনতে পারবে না। তোমার জানা লোকেরাই এর মধ্যে আছে। আগে কে ঘুষখোর তা কল্পনায় আনা কঠিন ছিল; এখন ইচ্ছা হয় আঙুলে গুণে দেখি—কতজন সৎ?" [১-৯-১৯২০]

মিন্টোর পরে জবরদস্ত হার্ডিঞ্জ ভাইসরয় হয়ে এলে নিবেদিতা আশঙ্কিত হয়েছিলেন—নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন যখন দেখলেন—অতি উচ্চপর্যায়ের ইংরাজ প্রশাসকরাও দুর্নীতির ক্ষেত্রে হার্ডিঞ্জের কঠিন হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন না :

"নতুন ভাইসরয় অপূর্ব। তাঁর হাতে খ্যাতিমানেরা ভেঙে চুরমার। বেকার যাচ্ছে—স্ল্যাক কাঁপছে—হ্যালিডে গ্রেপ্তার হয়ে সিমলায় প্রেরিত। গুজব এই, তিনি [হার্ডিঞ্জ] নাকি বলেছেন, হাঁ, আমি রাশিয়ায় ছিলাম, তবু বলছি, এখানকার মতো দুর্নীতি অন্য কোথাও দেখিনি।" [৬-৭-১৯১১]

১ The Hon'ble Mr. Lancelot Hare, C. I. E.
Date of commencement of service—July 3, 1873. Subs. appointment, Member, Board of Revenue, Land Revenue Deptt. Oct. 29, 1904. from 29. 10. 1904, Councilor to the Council of the Lieutenant Governor of Bengal. From 11. 4. 1906 offg. Lieutenant Governor. [ডঃ স্বপন বসু প্রদত্ত]

২ Edward Norman Baker, C. S. I.
Date of commencement of service, Sep. 2, 1878. Secy to the Govt. of India, Fin., Com. Deptt., May 10, 1903. Member, Governor General's Council, Jany 10, 1905. President, Bengal Executive Council. Appointed Lieutenant Governor of Bengal 1. 12. 1908. [ঐ]

॥ ২ ॥ গ্রেপ্তার, পীড়ন, অত্যাচার, সর্বাত্মক দমনের সংবাদ

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্বে ধৃত বিপ্লবীদের উপরে কী-ধরনের পীড়ন করা হোত, সে সম্বন্ধে সমকালীন বিবরণ পরিমাণে অল্প (পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা অবশ্য কিছু পাওয়া গেছে)—নিবেদিতার পত্রগুলি এক্ষেত্রে মূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করেছে। এইসব সংবাদ—নিবেদিতা ইংলন্ডে আগ্রহী মহলে পাঠাতেন, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই, ১৯০৪ এপ্রিল মাসে (ইস্টার সপ্তাহে), নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"তুমি জানো না যে, সরকার ক্রমে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। তিব্বত অভিযান, নতুন শিক্ষানীতি, বঙ্গ-বিভাগ, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ বিল, প্রাচীন প্রত্নানিদর্শনের সংরক্ষণ—ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সরকারের বিধিব্যবস্থা উৎপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী—তাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা-চেতনার দমন।

৫ মার্চ, ১৯০৫ নিবেদিতা লিখলেন :

"ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর অবিরাম আক্রমণ চলছেই—জঘন্য থেকে জঘন্যতর—নৈরাশ্য ক্রমবর্ধমান।"

তখনো সরকারের পীড়ন-ব্যবস্থা 'মৃদুমন্দ।' তাতেই যদি নিবেদিতার মনোভাব ঐ প্রকার হয়, তাহলে সরকারের কঠিন চোয়ালের কামড়কে তিনি কী মনে নিয়েছিলেন, তা কিছুটা বোধগম্য। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যপর্বে, ২৭ মে, ১৯০৭, লিখলেন :

"১১ তারিখে কলকাতা ছেড়েছি, এবং এখানে [মায়াবতীতে] ২৩ তারিখে পৌঁছেছি—ফলে সারা সময়টিতে আস্তানার বাইরে। [নিবেদিতা রাজনৈতিক কারণে কিছু সময়ের জন্য সরে থেকেছিলেন—এখানে এমন ইঙ্গিত থাকতে পারে]। সরকার যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। এখন সে পাইকারী গ্রেপ্তার ও নির্বাসন ইত্যাদির দ্বারা জাতীয়আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে। এমন করার কারণ, সে ১৮৫৭ সালের [বিদ্রোহের] পুনরাবৃত্তি ঘটবার চিন্তায় আতঙ্কিত। কিন্তু এই তো [অর্থাৎ সরকারের এই আচরণই তো] তা ঘটাবার উপায়।"

চিঠির পর চিঠিতে নিবেদিতা সরকারের ক্রূর ভারতবিরোধী নীতির কথা বলছেন :

"প্রিয় [য়ুম], জানি না, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা। পুনরায় সকলই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। [সরকারী মহলে] ভারতবিরোধী ঢেউ—আর জনগণ বিপর্যস্ত।" [২-৬-১৯০৭]

"সরকার এখন ভারতবিরোধী নীতি কতখানি নগ্নভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছে, তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা, বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত। এখন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড বেধে যাবে—ওদেরই কাজের ফলে। এসব কথা যেন কাউকে বলো না। তবে সংবাদপত্র থেকে সংবাদ জানতে পারবে।...

"স্বামীজীর সুমহান কথাগুলি মনে পড়ে? 'যতদিন না তাদের কাল ঘনাচ্ছে। কিন্তু যখন ধ্বনিত হয় কালের ঘণ্টাধ্বনি—তখন স্মৃতিভ্রংশ হয় মানুষের। হাত থেকে লাগাম খসে পড়ে। বুদ্ধিদাতাদের বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যায়। নেমে আসে বিনাশ।' হাঁ, ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে—তার প্রথম শব্দ শুনতে পাচ্ছি।" [৯-৬-১৯০৭]

"সরকার ভারতবিরোধী। অবস্থা যৎপরোনাস্তি মন্দ।" [২০-৭-১৯০৭]

ইংলণ্ডে অবস্থিত এস কে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা অবিরাম তল্লাশ, গ্রেপ্তার ও উৎপীড়নের সংবাদ দিয়েছেন :

"ইতিমধ্যে আমি শুনেছি—[নির্বাসিত] কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিষয়ে দারুণতম কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁর পুত্র তাঁকে জেলে দেখে আসার পরে তাঁর অবস্থার বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখেছিল। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণ কি করে চুপ করে বসে থাকতে পারে? লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপুল ক্রিয়াকলাপের কথাই কেবল এখন ভাবতে পারি। [অর্থাৎ সেই ধরনের কাজের উপরই এখন ভরসা]। শোনা যাচ্ছে, বেকার আরও বেশি নির্বাসনে একেবারেই গররাজি। অপরপক্ষে রিস্‌লে*, অথবা অন্য যে-আহাম্মক কর্তৃত্বে আছে, ভেবেছে যে, ভারত মাথা নামিয়ে দেবে—যেহেতু তা করলেই সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার ও কারাবাস এড়ানো যাবে!!! [নিবেদিতা বোধহয় বলতে চেয়েছেন—সুরেন্দ্রনাথের তখন সেই রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই, যার জন্য তাঁর গ্রেপ্তার জনগণের কাছে হাহাকারের কারণ হবে; উল্টোপক্ষে সুরেন্দ্রনাথের মতো নামী মডারেট নেতাও গ্রেপ্তার হচ্ছেন—এটা রাজনৈতিক প্রচারের সহায়ক হবে, সুতরাং তাঁর গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য জনগণের ব্যস্ত হবার কারণ নেই]। এটা কি রিসলে-সুলভ ব্যাপার হল না? কি অপূর্ব তীক্ষ্ণবুদ্ধি।" [১৬-৯-১৯০৯]

"গত কয়েকদিনের মধ্যে নতুন একরাশ গ্রেপ্তার হয়ে গেল—ডাকাতির অভিযোগে। মনে হচ্ছে, আলিপুর ধাঁচে মস্ত আকারে দীর্ঘস্থায়ী নতুন এক মামলার মধ্যে আমরা চলে যাব। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বেশির ভাগই পুলিশের সাজানো ব্যাপার। পুলিশ সংখ্যায় অগণিত—তাদের পেটভরানো তো চাই।

"৩০ অক্টোবর এসে যাওয়া মাত্র এখানে, দার্জিলিংয়ে, নারী ও পুরুষ গোয়েন্দার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অনেক বিচিত্র আগন্তুকের সাক্ষাৎপ্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য করেছি।" [৩-১১-১৯০৯]

"কার্জন [ভারতে] বিজ্ঞানের বিকাশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। শুনেছি, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিজ্ঞানের কিছু নেই। এখানে জে-সি-বি [জগদীশচন্দ্র বসু] এবং পি-সি-আর-এর [প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের] অস্তিত্ব সরকারের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকার বিজ্ঞানকে নিরতিশয় ব্যয়বহুল—ফলে দুষ্প্রবেশ্য, অসম্ভব ব্যাপার করে তুলেছে। কিন্তু বাংলা হল আদর্শের জন্য অতিমানবিক সাধনার দেশ। এক বৎসরে ৭৫০ 'সতী'-র এই দেশ। এই বাংলা দেশ অসম্ভব বলে কিছু জানে না। নতুন পথে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ দেখা যায়, প্রতিটি অলি-গলি বি-এসসি পড়ার জন্য আগ্রহী ছাত্রে ভর্তি। এখন থেকে পাঁচ বছরের ৫০০ বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করবে—তারা সারা ভারতকে শিক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সেটাই আমাদের প্রাপ্তি। এই হল কালী—একই আঘাতে অভিশাপ ও আশীর্বাদ—মৃত্যু—যার নাম সর্বোচ্চ জীবন!

"কৃষ্ণনগর কলেজের কথা শুনেছ? চারটি কি পাঁচটি সরকারী কলেজের অন্যতম। যখন সকল প্রাইভেট কলেজের বিজ্ঞানবিভাগ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন এরাই আলো

* Herbert Hope Risley, B. A., (Oxon), C. S. I., C. I. E. Date of commencement of service, June 3, 1873. Secy. Home Department Government of India, Nov. 2, 1903. [ডঃ স্বপন বসু প্রদত্ত]

জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এদেরও একে-একে নিবিয়ে দিতে হবে !! কৃষ্ণনগর ও হুগলীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণনগরের উপরই হল প্রথম আক্রমণ। এই কলেজটি নির্মাণ ও বহনের খরচ অর্ধেক জনসাধারণ, অর্ধেক সরকার বহন করেছে ও করছে। এখন সরকার থেকে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে—যদি-না জনসাধারণ সম্পূর্ণত এটির ব্যয় বহন ক'রে চলতে পারে, এবং বিরাট আকারে এর বৃদ্ধির খরচ জোগাতে পারে, তাহলে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। জনসাধারণের উত্তর : তারা সব দায়ই নেবে, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেরাই কলেজ চালাবে, নিয়োগের অধিকারও তাদেরই থাকবে। নির্লজ্জ সরকার—অগ্রাহ্য ক'রে দিল। দায় অবশ্যই জনগণের—নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সরকারের। কলেজ বন্ধ।

"ইনকুয়িজিশন্ [রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে দমনের জন্য স্থাপিত বিচারালয়] কি এর থেকে মন্দ ছিল ?

"প্রতিটি স্কুল-বইয়ের উপরে এখন লেখা থাকা চাই—'সেন্ট্রাল কমিটির দ্বারা অনুমোদিত।' এটা আমাকে 'মিস্টিরিয়াস্ টেন'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষাই সংগ্রামক্ষেত্র।" [২৫-১১-১৯০৯]

"জানি না, ইংরাজি কাগজগুলিতে লাহোরের খবর কতখানি দিয়েছে ? মনে হয়, মুখরোচক বস্তুর কোনোটিই দেয়নি। যথা, তুমি কি জানো, অজিত সিং-এর ভাই লালা কিষেণলাল, ভারত সরকার সম্বন্ধে ব্রায়ানের প্রবন্ধ অনুবাদ করে তা প্রকাশের জন্য কাঠগড়ায় !!!! অজিত সিং পালাতে পেরেছেন। দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক কলেজের এক অধ্যাপক, ভাই পরমানন্দ, গ্রেপ্তার হয়েছেন—ওঁরা একই বাড়িতে বাস করতেন, এই কারণেই সম্ভবত। এই সেদিন, আমাদের সম্পাদক-বন্ধুকে [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়] সমন দিয়ে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—লাহোরের আর এক সম্পাদকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে, যিনি তাঁর পত্রিকায় মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত ডুপ্লে-র বিষয়ে ইংরাজিতে লেখা একটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।" [২০-১-১৯১০]

"[ইংলন্ডে নির্বাচনে] লিবারালদের প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করছি, কারণ মর্লে-র পতন মানে পাইকারী নির্বাসনের নির্দেশ। মধ্যবর্তীকালে মর্লে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তকে মুক্তি দেবার সাহস দেখাবেন, এই একান্ত আশা। নির্জন কারাকক্ষে আটক থেকে প্রথম ব্যক্তি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুমুখে—তার জন্য জনসাধারণ রোষে উন্মত্ত। সন্ত্রাসবাদী কার্যের হঠাৎ আবির্ভাবে কেউ বিস্মিত হবে না। শোনা গেল, তাঁর দুঃখের কিছুটা উপশম হয়েছে নবনিযুক্ত এক ইংরাজ জেলারের সহৃদয় মনোভাবে—কিন্তু সে ব্যক্তিও আদেশের ব্যতিক্রম করতে সাহস করেন না, আর কৃষ্ণকুমার মিত্রও নীরবে মেনে নেওয়ার নীতি নিয়েছেন (ঠিক কাজই করেছেন বলে মনে করি)—গ্রেপ্তারের পর থেকে কোনো অনুরোধ-উপরোধ করছেন না। তাঁকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনলে রক্ত টগবগ করে ফুটবে। পুলিশ তাঁর বাড়িতে এই খবর রেখে আসে যে, থানার সুপারিনটেনডেন্ট তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। একটি দয়ার্দ্র নির্বোধ তিনি—সেখানে গেলেন—তারপর ৩৬ ঘন্টা ধরে তাঁর হতবুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত বাড়ির লোকজন তাঁর তল্লাশ করতে লাগল—কদাপি সন্দেহ করতে পারল না যে, তিনি সোজা এগিয়ে গিয়ে ফাঁদে পা দিয়েছেন !!!" [২০-১-১৯১০]

"হাইকোর্টে এক পুলিশ অফিসারের [গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলম] হত্যাকাণ্ড সকলকে চমকিত করেছে। বলাবলি হচ্ছে—এমন নিপীড়নের আইন করা হবে

যাতে 'পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা মাটিতে লুটোবে'—অর্থাৎ আর কদাপি উঠে দাঁড়াতে পারবে না। ভাবছিলাম যে, এবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে আক্রমণ করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেটা এমন প্রচণ্ডভাবে করা হয়েছে যে, আর নতুন কী করা যেতে পারে বলা সম্ভব নয়।" [২-২-১৯১০]

"কে একজন বলছিল, সরকার এখন বিভ্রান্তি ও উদ্‌ভ্রান্তির চূড়োয় বসে। যাই সে করুক না কেন, তার দ্বারা মন্দতর করে তুলবে পরিস্থিতি।...মিন্টো এই সেদিন গোয়া-দর্শনে গিয়ে, চুক্তিবলে, অর্ধডজন বাঙালি কর্মীকে আটক করানোর ব্যাপারে চাপ দিলেন—লোকগুলি একটি ইংলিশ ফার্মে গৃহনির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ছিল। মিন্টোর অবস্থানকালে তাদের জেলে রাখা হল, তারপর ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের সম্বন্ধে [সেখানে] তখন দারুণ গৌরবের উচ্ছ্বাস ও বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতূহল। সরকার এখন এখানে প্রতিটি বিভাগে মাদ্রাজীদের বদলী ক'রে আনছে ও [এখান থেকে বাঙালীদের] বদলী করে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত [ফলদানের দিক দিয়ে] খুবই সন্দেহজনক, নয় কি? ভালো, ভালো। এই কি শেষ, জানি না। কোন্ বজ্রপাত হবে এর পরে, তাও কেউ জানে না। [১০-২-১৯১০]

"পুলিশ-আইন নিয়ে দেশ হতভম্ব। তীর্থযাত্রী এক বৃদ্ধাকে ২৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর গ্রামের নাম, বা কিভাবে সেখানে যেতে হয় (যথা, লখনৌ-এ গাড়ি বদলে, আরও আট মাইল এগিয়ে ইত্যাদি) বলতে পারলেও, জেলার নাম বা পুলিশের বড় থানার নাম বলতে পারেননি। আমি সেখানে থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা পুলিশের পক্ষে মঙ্গলজনক হত না। আমাদের একজন সন্ন্যাসী ওখানে ঘণ্টাখানেক বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। যাইহোক, এই ধরনের জিনিস নিশ্চয় সর্বত্র ঘটছে।" [৬-৭-১৯১০]

"কিভাবে প্রেসের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে তা ধারণাই করতে পারবে না। হাড়ে-হাড়ে রুশীয় কাণ্ড! ভাবতেই পারবে না—কিভাবে মানুষকে বিনা-বিচারে মাসের পর মাস জেলে আটকে রাখা হচ্ছে—তারপর, কোনো প্রমাণ নেই বলে—খালাস!

"গত রাত্রে শুনলাম কে-কে-এম [কৃষ্ণকুমার মিত্র] ও অন্যান্যরা পার্টিশন, স্বদেশী ইত্যাদি সংক্রান্ত মিটিং করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মিটিং ভেঙে দেওয়া হবে—সকলকে রাস্তায় ঠেলে দেওয়া হবে—সেখানে বক্তৃতাদি হবে—ফল, নেতার গ্রেপ্তার। আসল কথাটা তুমি নিশ্চয় জানো—এখানকার কর্তৃপক্ষ রাজদ্রোহ নিবারণের জন্য যেসব ক্ষমতা পেয়েছে সেগুলিকে অসৎভাবে প্রয়োগ করছে—তা করছে সেইসকল মানুষের ধ্বংসকার্যে, যাঁরা 'স্বদেশী'র [স্বদেশী শিল্পের] প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে পরিচিত। বহুজনকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে।" [১৩-৭-১৯১০]

"দেখতেই পাচ্ছ, সরকার দেশকে রীতিমতো যুদ্ধের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। যখন আমরা একত্র হই—তখন হাসাহাসি করি—কিন্তু একথাও জানি, কেউ বলতে পারবে না, পরের পালা কার? তবে বিশ্বাস্ করি যে, আমরা তখনো হাসতে পারব।" [১৯-২০.-৭-১৯১০]

"একটি ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের বিবরণে পাচ্ছি, পুলিশ রূপোর গহনা তুলে নিয়ে গেছে। এখন, রূপোর গহনা ডাকাতির জিনিস হতে পারে না, কেননা তাদের দাম সামান্যই। সেগুলি স্পষ্টতই পারিবারিক অলঙ্কার। এই দরিদ্র লোকগুলির পক্ষে তাদের পারিবারিক অলঙ্কারের দর্শন ফিরে পেতে বহু বৎসর কেটে যাবে।

"গত সপ্তাহে মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১০০ তাঁতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—যেহেতু তারা ধুতির পাড়ে একটি বিশেষ গান বুনেছিল। এই কাজটা রাজদ্রোহকর বস্তু মুদ্রণের তুল্য।...এ-ব্যাপারে এমন অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা অশিক্ষিত, বুননের গানটির মানেই জানে না। গানটি তোমার জন্য জোগাড় করবার চেষ্টা করছি; সেটি নিশ্চয় দেখিয়ে দেবে—এই প্রকার ব্যবস্থাগ্রহণ কী প্রকার মন্দ কাণ্ড। তুমি তখন প্রশ্ন করতে পারবে—১০০ লোককে বিনা কারণে হাজতে রাখার কারণ কি? [নিবেদিতা যে, ইংলন্ডের পত্র-পত্রিকার জন্য তথ্য প্রেরণ করতেন, তা এখানে স্পষ্টই দেখা গেল]। বস্তুতপক্ষে ওরা [পুলিশ] চায়—তাঁতিদের কেউ-কেউ—তাদের খরিদ্দারের বিষয়ে খবরাখবর দেবে; কিংবা শপথসহ [পুলিশের] সাজানো সংবাদে সায় দেবে। ব্যাপারটির সম্বন্ধে এইরকম ধারণাই করা হচ্ছে। এই বিশেষ কেসটির বিষয়ে খুঁটিনাটি সংবাদ তোমার জন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি, যাতে তুমি প্রশ্ন তুলতে পারো। আমার তরুণ সংবাদদাতা [আমাকে সংবাদ দেবার সময়ে এই বলে শুরু করেছিলেন—] 'আমি মিঃ আর-এর [র‍্যাটক্লিফের] জন্য একটি স্পষ্ট কাহিনী সংগ্রহের চেষ্টা করছি—'।...

"মনে করো না, আমি শুধু অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরছি। আমি কেবল যা ঘটছে তাদের কয়েকটি কুটোর হিসেব দিচ্ছি। তুমি এখানে থাকলে ওরা তোমাকে জেলে পুরতই। কেননা তুমি ওদের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে উঠতে।

"শুনলাম, এক বছর আগে কৃষ্ণনগর-ডাকাতি বলে কথিত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে ১২টি ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর থেকে তাদের বিচার হয়নি, তাদের কোনো খবরই জানা যায়নি। কেউ জানে না, তারা বেঁচে আছে কি নিকেশ হয়ে গেছে।" [২৮-৭-১৯১০]

"আজ তোমাকে অল্পই লেখবার আছে। আইনের হস্ত উত্তরোত্তর দীর্ঘ। তোমাকে খুঁটিনাটি বলার প্রয়োজন নেই। বলাবলি হচ্ছে, মিউটিনির ২৫ বছর পরে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে আদালতের বিচার শুরু হয়েছে—লোকজনকে ধারাবাহিকভাবে ধরপাকড় করা হচ্ছে। এ এমন একটা পর্ব যার কথা ইতিহাস কদাপি লেখে না কিন্তু তা মুদ্রিত থাকে জাতির স্মৃতিতে, যেমন আয়ারল্যান্ডে ক্রমওয়েলের কথা। শাসকজাতির দীর্ঘ ধীর প্রতিহিংসা—তারই নাম তার আইন ব্যবস্থা !!" [৪-৮-১৯১০]

"বর্তমান অবস্থার সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ—স্তব্ধতা। সংবাদপত্রের কণ্ঠপীড়ন এমনভাবে করা হয়েছে যার তুল্য-কিছু কোনো সভ্যদেশে পাওয়া যাবে না। সকল জনসভা নিষিদ্ধ—'সিডিশাস্ মিটিংস অ্যাক্ট' সদ্য সিমলায় প্রেরিত।...বেকার গতকাল, ৭ তারিখে, সভাসমিতি শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন গ্রেপ্তার, খানাতল্লাশ, ধৃতদের উৎপীড়ন—যাতে তারা ইনফরমার হয়। এইভাবে প্রদত্ত বেশির ভাগ সংবাদই অসার। কিন্তু তাহলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কম গুরুতর নয়—যাদের বিচারের কাঠগড়ায় তুলবার নাম ক'রে নাগাড় আটক রাখা হয়, তারপর, যতদূর জানি, গোপনে বিচার সমাধা ক'রে ফেলা হয়—আইনজীবী বা সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়াই !!!...

"এই সকল দৃঢ়-নির্ধারিত পলিসি 'স্বদেশী'কে ধ্বংস করবার জন্যই।...বর্তমান শাসনের চেয়ে 'সিক্রেট চেন'-এর 'ইনকুয়িজিশন' অধিক নিপীড়নমূলক ছিল না। কোনো অপছন্দের নাম বা কর্মযোগিন-এর কোনো সংখ্যা—এদের যে-কোনো একটি কারো কাছে থাকলেই তাকে বিচারকের সামনে টেনে আনার বা বিচারের উদ্দেশ্যে কারাগারে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একবার ভেবে

দ্যাখো—আমরা এইসব জিনিসের মধ্যে বাস করছি। রাশিয়া—কিংবা টিউডরদের রাজ্যকাল!!" [১০-৮-১৯১০]

"কোনো বাঙালী ট্রেনে পর্যন্ত পুলিশের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। আর পাসপোর্ট আইন তো এখন রাশিয়ার যোগ্য।" [২৫-১০-১৯১০]

"স্যার জি-বি [জর্জ বার্ডউড] রিপন কলেজে কি-একটা ব্যাপারে সভাপতিত্ব করেছিলেন। শোনা গেছে যে, বেচারা বৃদ্ধ এস-এন-বি [সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] আকণ্ঠ এই শপথ নিয়েছেন—তাঁর ছাত্ররা পলিটিকস্ কথাটা বানান পর্যন্ত করতে শিখবে না!!!

"শিক্ষাবিভাগের কাছে একটি সার্কুলার পাঠানো হয়েছে—অফিসাররা যেন *The Drain To England* নামক দুষ্ট মতবাদের [শোষিত ভারতবর্ষের অর্থধারাকে প্রবাহিত করানো হচ্ছে ইংলন্ডের দিকে—এই অর্থনৈতিক মতবাদ] সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করে দেয়। ওরা কি তাহলে লোকজনকে বিশ্বাস করাবে—অর্থ বইছে ইংলন্ড থেকে ভারতের দিকে? ওরা কি মানুষকে তাদের পত্নী, পুত্র বা আত্মীয়দের মতামতের জন্য দায়ী করতে থাকবে? ইতিমধ্যে কণ্ঠরোধ চলছেই—আর বদমাশরা স্বকার্যসাধনের সুযোগ পেয়ে গেছে। একটি ঘটনার কথা জানি, যেখানে মহাস্ফূর্তিতে পুরনো শয়তানী চক্রের কাজ চলছে। জুনিয়ার প্রফেসার, প্রিন্সিপাল, ডিরেক্টার সবাই জোটবদ্ধ হয়ে যেখানে একজন সিনিয়ারের উপর প্রকাশ্য অপমান চাপিয়ে দিতে চায় সেখানে একথা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে, এমন-কি ঈশ্বর পর্যন্ত শক্তিশালীকে দমন করতে সমর্থ!…শিক্ষাবিভাগে কী যে দুর্নীতি! কল্পনাও করতে পারবে না।…বর্তমানে অবস্থা ক্রমেই মন্দ—আরও মন্দ। জনসাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত। কী যে ক্ষতি এতে। সাংবাদিকতা বিচূর্ণ। স্বদেশী ছত্রভঙ্গ। আর দারিদ্র্য বাড়ছে—বাড়ছেই।" [১৪-৯-১৯১০]

"নিষিদ্ধ সাহিত্যের জন্য বাড়ি-বাড়ি তল্লাশ—স্কুল কলেজে ভর্তি বন্ধ করা—শিক্ষার খরচ বাড়িয়ে দেওয়া—অধিকাংশ উত্তরপত্রের উপরে 'ফেল' কথাটা দেগে দেওয়া—পাঠ্যসূচীর বাইরে থেকে প্রশ্ন দেওয়া—তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ করতে না দেওয়া—এ সবের অর্থ কি আমরা অনুধাবন করেছি? এই সকলই করা হচ্ছে একটি বিরাট জাতিকে ধ্বংস ক'রে, তার দ্বারা স্বশ্রেণীর মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির নগ্ন নির্লজ্জ উদ্দেশ্যে।

"কে উপলব্ধি করেছে যে, বর্তমানে এখানকার সরকারের শিক্ষানীতি তাকে স্পেনীয় ইনকুয়িজিশনের বাড়বাড়ন্তকালের তুল্য করে তুলেছে, কিংবা ৬০ বছর আগে ইতালিতে পোপের অ-পারমার্থিক শাসনকালের সমস্তরীয় করেছে?" [১২-৬-১৯১১]

বন্দীদের উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতনের কিছু-কিছু উল্লেখ নিবেদিতার পত্রে আছে। আলিপুর মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস খুন হলে, ধৃত চারু বসুর উপরে অত্যাচারের বিষয়ে নিবেদিতা ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৯, লিখেছেন:

"বোধ হচ্ছে, এ-বিশ্বাসকে [আশুতোষ বিশ্বাসকে] যে এক বসু (চারু?) গুলি করেছিল, তার সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানা যায়নি। কিন্তু অশোক নন্দী—জেলে গিয়ে যার যক্ষ্মা হয় ও তাতেই মারা যায়—সে এবং মৃত্যুদণ্ডিত কিন্তু বর্তমানে আপীলের আসামী উল্লাসকর খুব কাছের সেলেই

ছিল—দুজনেই বলেছে যে, অধিকতর সংবাদ আদায়ের জন্য বসুকে রাত্রে ইলেকট্রিক শক্ দেও হয়। এরা তার চীৎকার শুনেছে—কথাবার্তাও। মনে হয়, অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ভাঁওতা-সংবাদ দেবে, যাচাইয়ের পরে যখন দেখা যাবে যে, সংবাদ মিথ্যা, তখন আবার নির্যাত শুরু করা হবে।"[৪]

পুলিশের এক ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট শামসুল আলমকে হত্যা করেন বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত। নিবেদিতা-প্রদত্ত তাঁর নির্যাতনের বিবরণ এই :

"দত্তগুপ্ত সম্বন্ধে একটি কদর্য কাহিনী এখন চলিত ; তার ফাঁসি হয়ে গেছে সোমবার ৩১ ভোরে ; ওরা তার কাছ থেকে একটি লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করতে পেরেছে (নির্যাত দ্বারা—এই ধারণা বলবৎ) যাতে অন্যান্যদের জড়ানো হয়েছে। তারপর ধৃত লোকটির (কৃষ্ণনগরের উকিল) রবিবার অপরাহ্ণে তাকে জেরা করবার জন্য দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার আবেদন জানান—বেকার তা চড়াভাবে সরাসরি নাকচ ক'রে দেন এবং বন্দীর অবিলম্বে ফাঁসির নি দেন। এই ঘটনা (যার বিষয় সংবাদপত্রে বেরিয়েছে) তার স্বীকারোক্তিকে, যাই বলুক না অসিদ্ধ করে দেয়। হাউসে [লন্ডন পার্লামেন্টে] এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হবে না কেন [২৩-২-১৯১০]

এই সূত্রে জনৈক পাদরীর জঘন্য আচরণের কথা নিবেদিতা বলেছেন, যার সম্বন্ধে উল্লেখ ইতিহাসেই পাইনি :

"বিগত খুন ও দত্তগুপ্তের ফাঁসির পর থেকে এই অস্পষ্ট ঘোষণা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে— এক ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার মুখে, তা 'সবাইকে জড়াবে,' তাতে যাই বোঝাক। পুলিশের মনোযোগ আমাদের রীতিমতো ঠেলা দিচ্ছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন আধ্যাত্মিক ও ভাবাবেগমূলক প্রভাব এই হতভাগ্য বালকটির উপর খাটিয়ে, তার দৃঢ় সংকল্প...

৪ নিবেদিতা ঠিক সংবাদই পেয়েছিলেন। কালীচরণ ঘোষের "দি রোল অব অনার" (১৯৬৫) বইয়ে বলা হ... সকলপ্রকার নারকীয় উৎপীড়ন ক'রে চারু বসুর কাছ থেকে মাত্র এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল—ঢাকার পাঁচকড়ি সান্যাল তার কাছে এসে বলেন—আশু বিশ্বাসকে খুন করার ভার তার উপর এসে পড়েছে। পাঁচকড়ি ... লেনের অধিবাসী। পুলিশ কিন্তু কোনো পাঁচকড়ি সান্যালের হদিশ পায়নি। বলাবাহুল্য ওটা ছিল ফাঁকা নাম। (পৃঃ ২০

উল্লিখিত অশোক নন্দী ২ মে, ১৯০৮ তারিখে ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে গ্রেপ্তার হন। মুরারিপুকুর বাগানে... এটি। অশোকের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ। প্রথম—তিনি নিজের সংগ্রহে বোমা রেখেছেন ('একস্‌প্লোসিভ সাবস্ট্যান্স ... অনুযায়ী অপরাধী) ; দ্বিতীয়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। ২৮ জুলাই ... মামলা শুরু হয়ে শেষ হয় ৭ অগস্ট ১৯০৮, হাইকোর্টে। অশোক বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু মুক্তি না দি... দ্বিতীয় মামলায় আটকে দেওয়া হয়। জেলে থাকার সময়ে তাঁর যক্ষ্মা হয়। দ্বিতীয় মামলায় আলিপুর সেসনস্-কোর্টে ... প্রমাণিত হলে ৭ বছরের নির্বাসনদণ্ড হয়। হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। এই সমস্ত যখন চলছিল তখন ... তাঁর অবস্থা সংকটজনক হতে থাকে, বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও মুমূর্ষু মানুষটিকে বিকট নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আটক ... টালবাহানার পরে ২ জুলাই, ১৯০৯, তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৭ অগস্ট, ১৯০৯, চিত্তরঞ্জন দাশ আদাল... জানান—সরকারের প্রতিহিংসার কবল এড়িয়ে অশোক এখন এমন উর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেছেন, যেখানে আইনের দীর্ঘ ... বাহুও পৌঁছতে অসমর্থ।"২৬ নভেম্বর, ১৯০৯, হাইকোর্ট অশোক নন্দীকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়, যার ফলে অশোক ... পার্থিব ও অপার্থিব দুই মুক্তির অধিকারী হন। [ঐ, ১৮৮-১৯০]

উল্লাসকর দত্ত আলিপুর বোমার মামলার আসামী, মুরারিপুকুরে তিনিই প্রথম বোমা প্রস্তুত করেন। সমিতিতে যোগদানে... পূর্বেই তিনি নিজে পরীক্ষা চালিয়ে বোমা তৈরী করতে পেরেছিলেন। ছোটলাট অ্যানড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দে... জন্য লাইনের উপর যে-ডিনামাইট স্থাপন করা হয়, তা এঁরই নির্মাণ। আলিপুর আদালতের বিচারে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে ... প্রাণদণ্ড হয় ; হাইকোর্ট শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বিধান দেয়।

ক'রে, তার কাছ থেকে সবকিছু টেনে বার করবার চেষ্টা করেছিল কিনা তাই ভাবছি। ব্রাউনের মতো লোক বোধহয় এ-কাজটাকে কর্তব্য বলেই মনে করে। তাই যদি হয়, তাহলে ইংরেজরা জোয়ান অব আর্ক-এর ক্ষেত্রে তাদের পুরোহিতদের যৎসামান্য ব্যবহার ক'রে কি নির্বুদ্ধিতাই না দেখিয়েছিল। কেটি-র ব্রাহ্মণ বন্ধুর [গোখলের] মারফত জানলাম—সে [দত্তগুপ্ত] ব্রাউনের প্রিয় ছাত্র ছিল, এবং ব্রাউন তাকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। যাইহোক, এই স্বীকারোক্তি মধ্যরাত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও এস এন রায়ের সমক্ষে করা হয়, স্বাক্ষরিত হয়—তার ফাঁসির আগে। বেচারা বালকটি! মনের কোন্ নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তার আত্মা প্রস্থান করল।" [৩-৩-১৯১০][৫]

পুলিশী নির্যাতনের এক বিশেষ পদ্ধতি—নিবেদিতার চিঠিতে বিবৃত :

"হিমসেলফ্ [জগদীশচন্দ্র] আমাকে এখানকার একটি ক্ষুদ্র মনোরম পুলিশী পদ্ধতি বিষয়ে জানিয়েছে : মুখে তোয়ালে জড়িয়ে এক নাগাড়ে তার উপর জল ঢেলে যাওয়া—যতক্ষণ-না স্বীকারোক্তি করার জন্য সে হাত তুলছে। সে [ডাঃ বসু] বলেছে, কোনো মানুষের পক্ষে এ-জিনিস শেষপর্যন্ত সহ্য করা সম্ভব নয়। যদি এতে মৃত্যু হয়, বলপ্রয়োগের কোনো চিহ্নই দেখা যাবে না। [এই নির্যাতনের ক্ষেত্রে] অভিযুক্ত ব্যক্তি যে-কোনো কথাই মেনে নেবে, কেবল হাইকোর্টের কাছে যাবার প্রার্থনা জানাবে, যাতে সেখানে [আসল] কাহিনীটা বলে নিতে পারে। ঐ পদ্ধতির কথা তাকে [বসুকে] তার এক স্কুলের সহপাঠী বলেছে, যে পুলিশে যোগ দিয়েছিল, শেষে একজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলাবার বীভৎস কাণ্ড থেকে এক চুলের জন্য পার পেয়ে পদত্যাগ করেছে।" [২২-৯-১৯১০]

॥ ৩ ॥ পুলিশের গোয়েন্দা, সরকারী উকিল, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি প্রসঙ্গ

স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য সরকার রাজকোষ উজাড় ক'রে খরচ করেছে। ৩০ জুলাই, ১৯০৯, নিবেদিতা লিখেছেন : "সরকার গোয়েন্দাগিরির খরচ জোগাতে দেউলিয়া।" ২৮ এপ্রিল, ১৯১০, তিনি লিখেছেন :

"গতকাল শুনলাম—গোপন বিভাগে নিযুক্ত এক মুসলমান কেরানিই এক্ষেত্রে আমার সংবাদ

৫ দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হল : ফাঁসির আগে তার কাছে পুলিশ "একটি নকল যুগান্তর পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা বীরেন্দ্রকে দেখায় ; তাহাতে লেখা ছিল : 'বীরেন্দ্র কাপুরুষ, নেতা কর্তৃক নিয়োজিত হইলেও ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে নাই ; দলকে ফাঁসাইবার জন্য ধরা দিয়েছে।' অত্যন্ত দক্ষতার সহিত শামসুল আলমকে হত্যা করিয়া, বিচারালয়েও বীরের মতো ব্যবহার করার পরও যুগান্তর তাহাকে এই অপবাদ দিয়াছে শুনিয়া বীরেন্দ্র মর্মাহত হয়। তাহার এই বেদনার সুযোগ লইয়া সি-আই-ডি'র লোক বলে, তাহার নেতা যতীন্দ্র মুখার্জিই এই অপবাদ দিয়াছে। তখন সে বলে : 'যতীনদা কি জানেন না যে, আমি কাপুরুষ নহি ?' তাহার পর স্বীকার করে, যতীন্দ্রনাথই তাহাকে রিভলবার দিয়াছেন।" ['বিপ্লবী যুগের কথা' (৫০), প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়]

বিপ্লবের বিভিন্ন ইতিহাসে মোটামুটি এই কাহিনীই মেলে। কালীচরণ ঘোষ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে অধিক এই লিখেছেন—পুলিশের কারসাজি একেবারে শেষে বুঝতে পেরে বীরেন্দ্র যতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে সহজবোধ্য কারণে বলা হয়েছে, দত্তগুপ্ত স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করেছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথের কাছে স্বীকারোক্তি আদায়ের পরেই, তাকে জেরা করার সুযোগ না দিয়ে ফাঁসি দেওয়াই, শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথের অব্যাহতির কারণ হয়। যতীন্দ্রনাথকে হাওড়া ডাকাতি কেসে জড়িয়ে যখন মামলা চলছিল (হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে তাঁর মামলা চলে গিয়েছিল হাইকোর্টে) তখন একইসঙ্গে দত্তগুপ্তর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শামসুল আলমের হত্যা মামলাতেও তাঁকে জড়ানো হয়। কিন্তু দত্তগুপ্তকে জেরা করা হয়নি বলে হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১, রুলিং দেন—যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে কেস করা যাবে না।

সরবরাহকারী—কেবল বাংলাতেই গোয়েন্দা বিভাগের খরচ গতবছর ৫৬ লক্ষ থেকে এক কোটিতে উঠেছে !"

উত্তম পান-ভোজনের ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও গোয়েন্দাদের মানসিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়েছিল ; কারণ প্রথমত গোয়েন্দাগিরি অত্যন্ত বিপজ্জনক ; তাছাড়া ছিল গোয়েন্দাদের আত্মগ্লানি । সে যে পুলিশের লোক একথা জানতে পারলে তার বিরুদ্ধে এক ধরনের সামাজিক বয়কটও হচ্ছিল । সব জড়িয়ে গোয়েন্দাদের দেহ-মনের শোচনীয় অবস্থা ।

নিবেদিতার চিঠিতে এই সম্পর্কে কিছু সংবাদ :

"বিকট সময় আমাদের সামনে ! পুলিশের কী চেহারা ভাবতেই পারবে না । প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তিই বোধহয় পুলিশ ! অবশ্য হিন্দুধর্মের সুদীর্ঘ জাতিপ্রথা মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে চিহ্ন না রেখে যায়নি—যেসব লোক নিজ জাতির মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা কিছুদিন পরে নিজেদের মগ্নচৈতন্যে বৃশ্চিকদংশন অনুভব করে—ফলে হয় তারা পাগল হয়, না-হয় অন্যভাবে বিধ্বস্ত হয় । এই পল্লীর বিনোদ গুপ্ত পাগল হয়ে যাচ্ছে—শশিভূষণ দে মদ ধরেছে । শুনছি, সে কার্জনের মতোই নিজের জীবন সম্বন্ধে আতঙ্কিত । বর্তমানে ভারত যেভাবে গোয়েন্দা দপ্তরের কবলিত, তুরস্কও ততখানি হয়েছে কিনা সন্দেহ ।" [২৫-১১-১৯০৯]

কার্জনের ভাগ্য—তাঁকে বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়নি, যদিও নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর সঙ্গে বন্ধনীবদ্ধ শশিভূষণ দে-কে অচিরে সেই ভাগ্য পেতে হয়েছিল :

"সুপরিচিত ডিটেকটিভ শশিভূষণ দে ৭ তারিখ রবিবার ভোরে মারা গেছে । তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবরের জন্য ক্রিস্টিনকে জিজ্ঞাসা করো । পুনশ্চ সেই ট্রাজিক নিয়তি । নির্ধারিত সর্বনাশের দিন ।" [১০-৮-১৯০১]

"গুজব যে, ইন্দ্রনাথ নন্দী বলে একটি ছেলে গোপনে ইনফরমার হয়েছে ।[৬] এইসব হত্যাকাণ্ড পুলিশকে একেবারে কাপুরুষ করে দিয়েছে । আর সেটা স্বাভাবিক । আমরা কেউই প্রতি ঘণ্টায় গুলিবিদ্ধ হবার ঝুঁকি উপভোগ করতে পারি না ।" [১৭-২-১৯১০]

"[শামসুল আলমের] গত খুনটি গোয়েন্দা বাহিনীর মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে ; তারা প্রাণভয়ে কাঁপছে । তাছাড়া বিভাগের মধ্যে অনিবার্য অসন্তোষ আছে—কারণ বিদেশী প্রভুরা জানে না—কাকে বিশ্বাস করা যায়, আর কাকে যায় না ; ফলে সংকটের সময়ে ক্ষোভপ্রকাশ এবং সন্দেহপূর্ণ কঠোর শৃঙ্খলা বলবৎ করার চেষ্টা তারা ক'রে যায় ।" [১০-২-১৯১০]

৬ নিবেদিতারই দলভুক্ত ছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী—এর ইঙ্গিত আছে নিবেদিতার চিঠিতে । নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখায় ইন্দ্রনাথ নন্দীর পূর্বভূমিকা ও পরবর্তী ভূমিকার বিষয়ে সংবাদ পাই :

"প্রেসিডেন্সি কলেজে...আমার সহপাঠীদের মধ্যে...দামাল ছেলেদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী—কর্নেল নন্দী আই-এম-এস-এর পুত্র ।...মানিকতলা বাগানে বারীন ঘোষের সহকর্মী ইনি, আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য ।...ইন্দ্র নন্দী...গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন—বোমা তৈরীর প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন—এবং শেষে পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ফোরকে তাঁর হাতের আঙুলগুলি উড়ে যায় এবং এই ঠুটো অবস্থায় ধৃত হয়ে তিনি আলিপুর বোমার মামলার আসামী হয়েছিলেন । তবে তাঁর দণ্ড কিছু হয়নি—কৌঁসিলীদের কারসাজিতে প্রমাণ হয়েছিল যে, একটা লোহার সিন্দুকের তলায় চাপা পড়ে তাঁর হাতের ঐ অবস্থা হয় ।...তবে গুজব ছিল, কর্নেল নন্দী সরকারের সঙ্গে রফা করেছিলেন এই কথা দিয়ে যে, অতঃপর তাঁর ছেলে ভালো ছেলেটি হয়ে থাকবে ।" ['স্মৃতির পাতা', ১৩৮১ সং, ২৩-২৪]

অনেকদিন পরে নলিনীকান্ত যে-গুজবের কথা বলেছেন, সমকালে তা আরও চড়া ছিল—যার উল্লেখ নিবেদিতা করেছেন ।

ললিতকুমার চক্রবর্তী হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে অনেকগুলি বিপ্লবী দলের কথা ফাঁস করে দেয়। নিবেদিতা তার সম্পর্কে লিখেছেন :

"ললিতকুমার চক্রবর্তী নামক এক বিশেষ সংবাদদাতাকে ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে—সে পুলিশের নির্দেশমতো বিবৃতি দিচ্ছে।" [১৩-৭-১৯১০][৭]

মুরারিপুকুর মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকে বাদ দিলে এইকালে সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দুটি—পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস ও পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট শামসুল আলমের হত্যা। দু'জন হত্যাকারীই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের [বাঘা যতীন] দলভুক্ত।

আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করেন পূর্বে উল্লিখিত চারুচন্দ্র বসু। এ-সম্পর্কে সাহেবী পত্রিকা 'এমপ্রেস্'-এর ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯-এর সংবাদ :

"বাবু আশুতোষ বিশ্বাস, গভর্নমেণ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটার, যিনি মিঃ বিচ্‌ক্রফটের এজলাসে [বিপ্লবীদের] মামলার পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছিলেন—তিনি গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ৩-৪০ মিনিটের সময়, আলিপুর সুবার্বন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের প্রাঙ্গণে জনৈক বাঙালী তরুণের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আততায়ী অবিলম্বে ধৃত।

"মৃত ব্যক্তি ঐদিন যথারীতি আলিপুরের সেসনস্-বিচারক মিঃ বিচ্‌ক্রফটের এজলাসে বোমা-ষড়যন্ত্রের মামলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরে তিনি আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল্লার এজলাসে উপস্থিত হয়ে সরকারপক্ষে মুদ্রা জাল করার একটি মামলা পরিচালনা করছিলেন। ৩-৪০ মিনিটের সময়ে যখন তিনি আদালত পরিত্যাগ করেন তখন ১৬-১৭ বছরের একটি বাঙালী যুবক দর্শকদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর দিকে ছুটে যায়, এবং শার্টের ভিতর থেকে রিভলবার বার ক'রে আশুতোষবাবুকে গুলি করে। গুলি ফুসফুস ভেদ ক'রে বেরিয়ে যায়। হতভাগ্য আক্রান্ত ব্যক্তি ফিরে পালাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আততায়ী পুনশ্চ তাঁর পিঠে গুলি করে। আশুবাবু পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খুনী আরও একটি গুলি করে, যেটি অবশ্য কার্যকর হয় না।

"বাবু আশুতোষ বিশ্বাসের জন্ম হাওড়া জেলার মথুরাবাটীর এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। সম্পূর্ণ সৎ ও উন্নতচেতা মানুষ তিনি, ভারতীয় মহলের বিশেষ প্রিয়, এবং পরিচিত ইউরোপীয়দের দ্বারা সম্মানিত ও সমাদৃত। হেয়ার স্কুলে বাবু আশুতোষের বাল্যশিক্ষা ; ১৮৬৮ সালে এনট্রান্স পাস ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, শেষত এম-এ ও বি-এল ডিগ্রি নিয়ে, আদালতে যোগদান করেন। তার আগে বাবু আশুতোষ শিক্ষকতা করেছেন ; সাউথ সুবার্বন স্কুলে অ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমাস্টার হয়েছেন যখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেখানকার হেডমাস্টার ছিলেন। ঐকালে অন্যান্যদের সঙ্গে মিঃ জাস্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৭ ললিত চক্রবর্তীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তির সোল্লাস উল্লেখ প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়। ডালীর রিপোর্টে তার রূপ :

"The statement of Lalit Mohan Chakravarti made before the committing Magistrate of the Howrah Gang Case, Mr. Duval, is well worth perusal, and though discredited by the Chief Justice in the trial, there is not the slightest doubt to all who know the history of the arrest of Lalit, that it is in the main true, though it may contain a few inaccuracies, the result of a desire for self-glorification and a persistence of filling in blanks where memory failed."
[First Rebels, p. 50]

তাঁর ছাত্র।

"যৌবনকালে বাবু আশুতোষ রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৭৭-৭৮ সালে যুক্তপ্রদেশে [বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ] রাজনৈতিক সফর করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি বেঙ্গলীর (তখন সাপ্তাহিক) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন। ঐ মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে তিনি কর্পোরেশনের অন্যতম কমিশনার হন। আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করায় তিনি রাজনীতি ত্যাগ ক'রে ঐ বৃত্তি নিয়েই থাকেন, এবং এক্ষেত্রে আলিপুর ডিস্ট্রিকট কোর্টে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এবং কোনো-কোনো স্থানীয় আইনের বাংলা রূপান্তর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন।"

আশুতোষ বিশ্বাসের বিবরণ দীর্ঘায়িত করার কারণ—যেসব দেশীয় মানুষকে বিপ্লবীরা হত্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা ও পদমর্যাদায় তাঁর স্থানই সর্বোচ্চ। তাঁর হত্যাকারীও আশ্চর্য চরিত্র। চারু বসুর ডান হাত ছিল অকর্মণ্য, জন্ম থেকেই ঐ হাতের তালু ও আঙুল ছিল না (কালীচরণ ঘোষ একথা বলেছেন; প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত)—সেই হাতের সঙ্গে রিভলবারটি বাঁধা ছিল—তিনি বাম হাত দিয়ে ট্রিগার টেনেছিলেন। চারু কিভাবে অসহ্য পীড়ন সহ্য করেও কোনো আসল কথা ফাঁস করেননি, তা আগেই দেখেছি। কালীচরণ ঘোষের বিবরণ অনুযায়ী, চারু প্রাথমিক তদন্তের সময়ে বলেছিলেন, "আমি আশু বিশ্বাসকে খুন করেছি, কারণ তিনি দেশের শত্রু। তিনি নির্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে মামলা চালান এবং শাস্তির ব্যবস্থা করতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন।" তদন্ত শেষ হলে তিনি বলেন, "সেসন-কোর্টে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই। আজকেই, না হলে কালকেই, আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আমার হাতে আশু মরবে, তাই নিয়তি, আর আমি সেজন্য ফাঁসিতে ঝুলব।"

সেসন-কোর্টে ও হাইকোর্টে—উভয় স্থানেই চারুকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়—দণ্ড মকুবের আবেদন করতে তিনি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। ১৯ মার্চ, ১৯০৯ তাঁর ফাঁসি হয়।

শামসুল আলমের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অরবিন্দের 'ধর্ম' পত্রিকার (১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) বিবরণ এই:

"গত সোমবার [২৪ জানুয়ারি] ৫-১০ মিনিটের সময় কলিকাতা হাইকোর্টে, আন্দাজ বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মৌলবী শামসুল খাঁ বাহাদুরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। মিঃ আলম গত ১৯০৮ অব্দের মে মাস হইতে আলিপুরের বোমার মামলার তদ্‌বির করিতেছিল এবং আশু বিশ্বাসের হত্যার পূর্বে আশুবাবুর, ও পরে ঐ মামলায় আলিপুরের দায়রায় এবং হাইকোর্টে নর্টন-সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া কাজ করিতেছিল। হাইকোর্টে যে বোমার মামলা এখন চলিতেছে, তাহার তদ্‌বিরও আলম করিতেছিল এবং গত সোমবার প্রায় সমস্ত দিনই সে আদালতে হাজির ছিল। পাঁচটা বাজিতে যখন দশ মিনিট বাকি, তখন জজ্ উঠিলে আলম তাহার কাগজপত্র সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্তা কহিতে-কহিতে বাহিরে আসে। যে ঘুরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলে ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রীটে আসা যায়, আলম যখন সেই সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে তখন প্রায় ১৯-২০ বৎসরের একজন যুবক পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার নিকট আসিয়া আলোয়ানের ভিতর হইতে রিভলবার বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আলম তখন

একবার খুব চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। শাদী চাপরাশিকে পাক্‌ড়ো-পাক্‌ড়ো বলিয়া তৎক্ষণাৎ সটান হইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া যায় এবং দু'একবার গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার তিন-চার মিনিট পরে আলম মরিয়া যায়।"[৮]

নিবেদিতার চিঠিতে এই দুই হত্যাকাণ্ডের একাধিক উল্লেখ আছে। সেই উল্লেখগুলির ভাষাভঙ্গি থেকে বোঝা যায়—*এই কাজগুলি সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন তো ছিলই, প্ররোচনা থাকাও আশ্চর্য নয়।* ঘটনাদুটির নেপথ্য-নায়ক বাঘা যতীনের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ সংযোগের কথা আগেই বলেছি। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, চিঠিতে নিবেদিতা অপদার্থ নর্টনের কথা বলার পরে জানান—

"বাদীপক্ষে [সরকার পক্ষে] আশুতোষ বিশ্বাসই আসল শক্তি। মনে হচ্ছে, তার 'অপসারণ' এতাবৎ যা ঘটেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সময়োচিত কার্য। ['Asutosh Biswas was the real strength of the prosecution, and his 'removal' the most opportune thing that has ever happened, it seems."]।[৯] নর্টনের মতো অধিকন্তু সেও স্বপক্ষত্যাগী দেশপ্রেমিক। [নর্টন পূর্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন]। বহু বৎসর আগে বিশ্বাস সেই প্রবন্ধটি লিখেছিল, যা প্রকাশ করে বেচারা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জেলে যান। এই ঘটনাটি এ এম বসুর প্রকাশিতব্য জীবনীতে [হেমচন্দ্র সরকার-কৃত আনন্দমোহন বসুর জীবনী, যাতে নিবেদিতার হাত ছিল, তা আগেই বলেছি] কথাপ্রসঙ্গে বলে নেওয়া হয়েছে।"[১০]

শামসুল আলমের খুন সম্বন্ধে নিবেদিতা ২৭ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে মিসেস বুলকে লেখেন : "জনগণ সম্পর্কিত সংবাদ ভয়ঙ্কর। আর একটি খুন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে এর অত্যন্ত

৮ গিরিজাশঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত, ৮১৬।

৯ জেমস ক্যাম্বেল কার-রচিত 'পোলিটিক্যাল ট্রাবল্ ইন ইন্ডিয়া (১৯০৭-১৭)' গ্রন্থে (মহাদেবপ্রসাদ সাহা কর্তৃক ১৯৭৩ সালে পুনঃপ্রকাশিত) নিবেদিতার বক্তব্যের অনুরূপ কথা পাই, অবশ্য তা নিবেদিতার বিপরীত মনোভাবেই লিখিত। কার লিখেছেন (পৃ ২৯২) :

"Ever since the murder of Deputy Superintendent Shamsul Alam it had been the practice of the apologists of the revolutionary party in Bengal to suggest, both in court and out of it, that it was he who got up political cases and manufactured evidence, and that he was therefore *Justly removed.* This view was evidently strongly impressed on the Chief Justice in the Howrah-Sibpur Case."

প্রধান বিচারপতি জেনকিনস্ মনে করেছিলেন, তা বলেছিলেনও যে, শামসুল আলম রাজসাক্ষীদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। বলাবাহুল্য কার তা অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু পরেই দেখব, নিবেদিতার মতে, মামলা সাজানোর ব্যাপারে শামসুল আলমের চেয়ে উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী আশুতোষ বিশ্বাস।

১০ আনন্দমোহন বসুর জীবনীতে "বলে নেওয়া হয়েছিল"—১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশ করা ইলবার্ট বিলে সিভিল সার্ভিসে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূর করার প্রস্তাব যখন পেশ করা হয়, তখন ইউরোপীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তিক্ত জাতিবিদ্বেষ ছড়াতে থাকে ; ভারত-পক্ষেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ; উত্তেজনা চরমে ওঠে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে।—

"Meetings, demonstrations, conferences were held at frequent intervals; and the excitement reached its climax when, in May 1883, Mr. Surendranath Banerjee was convicted and sentenced by a full Bench of the Calcutta *High Court, presided over by Sir Richard* Garth—Justice Romes Chandra Mitter dissenting—to two months' imprisonment on a charge of contempt of Court. In an article in Mr. Banerjee's paper, the *Bengalee*, written by Mr. Ashutosh Biswas, recently assassinated by an anarchist at Alipore, Mr Justice Norris of the

বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।" ২ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে বললেন : "হাইকোর্টে কোনো এক পুলিশ অফিসারের নিধন সকলকে চমকিত শিহরিত করেছে।"

এইসব মন্তব্যে নিবেদিতার আসল মনোভাব ধরা পড়েনি, যা র‍্যাটক্লিফকে লেখা ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পাই :

"সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্‌ভাবন ও সাজানোর শক্তিতে শামসুল আলম [সরকার পক্ষে] অমূল্য ব্যাপার—এক্ষেত্রে তার স্থানপূরণ সম্ভব নয়। উচ্চতর ক্ষেত্রে [আশুতোষ] বিশ্বাসের বিষয়ে একই কথা সত্য, একথা বলা হয়। বিশ্বাসকে আলিপুরে গুলি করে মারা হয়।"

নিবেদিতার মনোভাব বুঝতে অতঃপর অসুবিধা থাকার কথা নয়।

॥ ৪ ॥ কয়েকটি রাজনৈতিক মামলা : পি মিত্র প্রসঙ্গ : ন্যায়পর প্রধান বিচারপতি—স্যার লরেন্স্ জেনকিন্স্

নিবেদিতার পত্রে ইতস্তত কতকগুলি রাজনৈতিক মামলার উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে যুগান্তর মামলা ও আলিপুরের মামলার কথা প্রসঙ্গান্তরে বলব। বাকি থাকে কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও মেদিনীপুরের মামলা। শেষোক্ত মামলাটিকে সরকারী ষড়যন্ত্রের বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে আনা যায়।

ঢাকা মামলা সম্পর্কে র‍্যাটক্লিফ ইংলণ্ডে যা লিখেছিলেন, তার সংশোধন ক'রে নিবেদিতা ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০, লেখেন : "ঢাকা থেকে পাঠানো টেলিগ্রামের প্রভাবে তুমি ওসব কথা লিখেছ। ওয়াকিবহাল মহল কিন্তু বলেন যে, সরকারপক্ষ নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবে না, এবং তাদের পক্ষে মামলাটা মন্দই দাঁড়াবে।"

সত্যই তাই দাঁড়িয়েছিল। হাইকোর্ট থেকে অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়েছিলেন, এবং বিচারপতিরা পুলিশী তদন্তের ফাঁকি একেবারে খুলে ধরেছিলেন।[১১]

নিবেদিতা কয়েকদিন পরেই আবার এই সূত্রে লেখেন :

"শোনা যাচ্ছে, ঢাকা মামলা শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে। হাজির করার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য সরকারের কাছে ছিল না এবং পি এল রায়কে যা করতে বলা হয়েছিল সে তার থেকে বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে—মারাত্মক ত্রুটি। মেদিনীপুর মামলাই এখানে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে গৃহীত—অবশ্য নাসিক মামলাও রয়েছে।" [২৮-৯-১৯১০]

এইসকল মামলাসূত্রে নিবেদিতার চিঠিতে আশুতোষ বিশ্বাস বা শামসুল আলমের শত্রুতা-নীতির সঙ্গে আর একজনের কথাও কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—আইনজীবী পি এল রায়। এই ব্যক্তি নিবেদিতার দৃষ্টিতে পাকা শয়তান। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ইনি জেলে পুরবার মতলব

Calcutta High Court was likened to Jeffreys and Scroggs, two notoriously oppressive English Judges, for asking that a Hindu God, the *Saligram*, shall be produced in Court for purposes of evidence. Mr Banerjee, who would not give the name of the writer, published an apology for the offence, but was not exempted from punishment. The whole country was excited to a fury of passion, at the incarceration of Mr. Banarjee." [*Ananda Mohan Bose*, by Hem Chandra Sarkar]

নিবেদিতার উদ্দেশ্য স্পষ্ট—তিনি আশুতোষ বিশ্বাসের ডিগ্‌বাজি দেখাতে চেয়েছিলেন। ঐ ধরনের মানুষের পক্ষে ন্যায়বিচারের জন্য ওকালতি করা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। বেঙ্গলীতে আপত্তিকর প্রবন্ধটির লেখক তিনি—তাঁর নাম ফাঁস না করে সুরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন—সেই তিনি কৃতজ্ঞতার ঋণশোধ করলেন বিপ্লবীদের ভিতরের কথা ফাঁস ক'রে, তাঁদের ফাঁসিতে ঝোলাবার বাড়তি উদ্যম দেখিয়ে !!

১১ *India*, 2 June, 1911, 'The Dacca Shooting Case.'

করেছিলেন, কেবল প্রধান বিচারপতি স্যার লরেনস্ জেনকিন্সের দৃঢ়তায় সে-বিষয়ে কিছুটা সমঝে যান। রামানন্দ-প্রসঙ্গে সেকথা আগেই বলে এসেছি। ওঁর শয়তানির আরও কথা নিবেদিতার চিঠিতে আছে—দেশবিরোধী ক্রূরতার কথা। "গত সপ্তাহের চাঞ্চল্যের বস্তু হল [নিবেদিতা লিখেছেন] ঢাকায় [আদালতে] সরকারপক্ষে পি এল রায়ের দু'দিনব্যাপী বক্তৃতা যাতে সে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে আক্রমণ করেছে। সে পতাকা বিষয়েও বলেছে—একথা আমাকে জানানো হলেও, তার বক্তৃতা পড়ে দেখলাম সেটা সত্য নয়। তবু লোকটি একেবারে বেপরোয়া। সুধাংশু বলে, তার কোনো বুদ্ধি নেই, জানে না কী করছে। সবাই বিবর্ণ মুখে তার বক্তৃতা পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন—সে মৃত্যু টেনে আনছে। পি এল রায়ের নিজের গোপন ব্যক্তিগত ইতিহাস চিত্তাকর্ষক, যা ছাপার অক্ষরে পড়লে সে দগ্ধাবে। সেটি সদ্য আমি পড়েছি।" [২৫-৮-১৯১০]

ঐ ব্যক্তিগত ইতিহাসে কী ছিল আমরা জানি না, কিন্তু নিবেদিতার চিঠির আর একটি উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, ভদ্রলোক আশুতোষ বিশ্বাসের মতোই নিজের পূর্ব জীবন ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন :

"পি মিত্র মারা গেছেন—উত্তেজনাতেই সম্ভবতঃ—এই দেখে যে, তিনি ঢাকায় পি এল রায়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বলাবলি করা হচ্ছে, ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমি নিজেই স্মরণ করতে পারি—পি এল রায় আমাকে বলেছিল—পি মিত্র তার কাছে আদর্শ পুরুষ। সুতরাং স্পষ্টতই দু'জনের মধ্যে বিশেষ ভাববন্ধন ছিল। বোঝা গেছে যে, ঢাকা মামলার শেষে তাঁর [পি মিত্রের] ও রজত রায় নামক একটি বালকের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছিল।"[১৪-১০-১৯১০]

ভারতে রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় নিবেদিতার সঙ্গে পি মিত্রের যোগাযোগ। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের এই 'পিতামহ' বার্ধক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত সমান সক্রিয় থাকতে পারেননি, কিন্তু তিনি আদর্শে অটল ছিলেন, এবং নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। তাঁর দেহান্তের সংবাদ দিয়ে গভীর বেদনা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন :

"পি মিত্রের মৃত্যু হয়েছে। অবর্ণনীয় শোক আমার। কী বিরাট শক্তি তিনি—চলে গেলেন।" [২৮-৯-১৯১০]।[১২]

১২ নলিনীকিশোর গুহ তাঁর "বাংলার বিপ্লববাদ" গ্রন্থে (১৩৬১ সংস্করণ) "মিত্র মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ও শিষ্যস্থানীয়" আশুতোষ দাশগুপ্তের ("ঢাকা অনুশীলন সমিতির ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী" যিনি) স্মৃতিচারণা উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ আছে। দাশগুপ্ত লিখেছেন :

"একদিন মিত্র-মহাশয় কথায়-কথায় ভগিনী নিবেদিতার কথায় বলেন। নিবেদিতা আমার কাছে আসতেন। তিনি শুনেছিলেন, অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।...নিবেদিতা একদিন আমাকে নিভৃতে বলেন : 'দেখুন, কুরুক্ষেত্র দেখবার সাধ হল—গেলাম। সারাদিন কুরুক্ষেত্র ময়দান ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। পরে আশ্রয় নিলাম এক কর্নেলের বাংলায়। রাত্রিতে একখানা গীতা পড়তে-পড়তে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত দুপুরে হঠাৎ জেগে যাই—কুরুক্ষেত্রের দিক থেকে একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। সেই বজ্রগম্ভীর শব্দ সংস্কৃত শ্লোক বলে মনে হল। ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি না-তো। চোখ দুটো রগড়িয়ে উঠে বসলাম। আবার সেই বজ্রগম্ভীর শব্দ। তখন বেরিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের দিকে ছুটলাম। সঙ্গে কেউ নেই, একাই ছুটছি। প্রান্তরের নিকটবর্তী হতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম গীতার সেই চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোক দুটি : 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥' এই চারটি লাইনই কেবল পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে। ভাবলাম, কে এই গভীর নিশীথে এই শ্লোক এখানে আবৃত্তি করছে। যেদিক থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম—তখন সেই দিকেই চললাম। প্রান্তরের কেন্দ্রের দিকে যতই যাই ততই যেন ঐ একই শ্লোক উচ্চারিত হতে শুনি। গুরুগম্ভীর অথচ অতীব সুস্পষ্ট।'—পরে নিবেদিতা আমাকে বললেন—'আপনি ওদিকে গেলে একবার কর্নেলের বাংলায় যাবেন।'—এই ঘটনার পর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সত্য, যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—এ সবই সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছে আমার। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য তা স্বামীজী প্রমাণ করে গেছেন।" [পৃঃ ৩৫৯]

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেনস্ জেনকিন্‌সের ন্যায়পরতা ও দৃঢ়তার একাধিক উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিতে আছে। রামানন্দের বিরুদ্ধে সরকারের অনুচিত অভিযোগের প্রতিরোধে তাঁর দৃঢ়তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঐ সময়ে নিবেদিতা বলেছিলেন, "হাঁ লরেনস্ জেনকিন্‌সের অস্তিত্ব আছে সত্য, তবু আর কতদিন এইভাবে চলবে ?" [৬-৭-১৯১০]। একই তারিখে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির পুলিশী সন্দেহের কথা জানিয়ে মিসেস উইলসনকে লেখেন : "সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আমরা চমৎকার এক চীফ জাস্টিস পেয়েছি, যিনি এই ধরনের অভিযোগকে পাত্তা দেবেন না। কিন্তু তাঁর পর কে ?"

ন্যায়বিচারের জন্য স্যার লরেনস্ পুলিশের কাছে অসুবিধাজনক সুতরাং সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এক বছর পরে নিবেদিতা যা লিখলেন, তার থেকে তৎকালীন পুলিশী রাজত্বের চেহারা কিছুটা বোঝা সম্ভব হবে। পুলিশকর্তা হ্যালিডের চুরির সংবাদ দেবার পরে তিনি লিখেছেন :

"সর্বোপরি, চীফ জাস্টিস দেখলেন যে, তাঁর বাড়ি ডিটেকটিভরা ঘিরে আছে—তিনি ভারতসচিবকে সেজন্য তার করলেন। হ্যালিডে-কে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বলা হল। তিনি বললেন—ওখানে অনেক ভারতীয় সাক্ষাৎপ্রার্থী আসেন—তাদের সঙ্গে উনি রাজদ্রোহের কথা বলতে পারেন !!:!!! চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। ফলে হ্যালিডে-কে চারজন প্রহরীর অধীনে সিমলায় পাঠানো হল।" [৬-৭-১৯১১]।

চীফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে পুলিশী আক্রোশের যথেষ্টই কারণ ছিল। বহু কষ্টে ও যত্নে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, সাহেব-পুলিশ যে-সব মামলা সাজিয়েছিল, এবং নিম্ন আদালতে আসামীদের শাস্তি পাইয়ে দিয়ে স্বদেশে বাহবাও কুড়িয়েছিল, ভারত থেকে অর্থও—তাদের অধিকাংশকেই পুলিশের কারসাজি বলে হাইকোর্ট বরবাদ ক'রে দেয়। ঢাকা মামলার ক্ষেত্রে তা হয়, মেদিনীপুর মামলার ক্ষেত্রেও তাই। দণ্ডিত ব্যক্তিরা সেজন্য হাইকোর্টকে পরিত্রাণের শেষ উপায় বলে ধরেছিলেন—যদি অবশ্য ততদিন হাজতবাসের পীড়ন সহ্য ক'রে টিকে থাকা, ও হাইকোর্টে পৌঁছবার খরচ জোগাড় করা, তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে।

মেদিনীপুর মামলায় হাইকোর্টের রায় ভারতে ও ইংলণ্ডে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এই মামলায় পুলিশ টাকার লোভে কিভাবে বিরাট-বিরাট অর্থশালী ব্যক্তিদের জড়িত করেছিল, তাঁদের মধ্যে নাড়াজোলের রাজাও ছিলেন—সেকথা আগে বলে এসেছি। টাকার লেনদেনে, এবং কিছুটা জোচ্চুরি ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কাতেও বটে, অধিকাংশের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত নিম্ন আদালতে তিনজনের নানা মেয়াদী শাস্তি হয়। তারপর মামলা যায় হাইকোর্টে। এস কে র‍্যাটক্লিফ হাইকোর্টের রায়ের পরে ইংলণ্ডের 'নেশন' পত্রিকায় তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে লেখেন—"দি ট্রাজিক ফার্স অব মিড্‌নাপোর।" তার মধ্যে কুশীলব-সংবাদ এই :

দৃশ্য : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গের একটি নগর।
কাল : জুন, ১৯০৮ থেকে অগস্ট ১৯১১।
প্রধান চরিত্রগুলি

ডোনাল্ড ওয়াটসন, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।
মৌলবী মজারুল হক, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, পুলিশ (মুসলমান)।

লালমোহন গুহ, সাব ইনস্‌পেকটর, পুলিশ (হিন্দু)।
প্যারীমোহন দাস, পেনসনভোগী সরকারী কর্মচারী, বয়স প্রায় ৬৫।
সন্তোষ (ওঁর পুত্র), শিক্ষানবিশী পুলিশ।
আবদুর রহমান, পুলিশ স্পাই, (মুসলমান)।
রাখালচন্দ্র লাহা, পুলিশ স্পাই (হিন্দু)।
মেদিনীপুরের নাগরিকগণ—১৫৪ পর্যন্ত সংখ্যায়—জমিদার, উকীল, দোকানদার, একজন রাজা, এবং অন্ততঃ একজন ভিখারী।

পটভূমিকা :

"১৯০৮ সালের সুবিস্তৃত বঙ্গভূমি। জুন মাসের আরম্ভ, ভারতীয় সমভূমির উত্তাপ চরম অবস্থার দিকে এগোচ্ছে, যা মৌসুমীকালের পূর্বসূচক। লর্ড মিন্টো ভাইসরয় ; স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর। জাতীয় আন্দোলনের নিদর্শন সর্বত্র প্রকট, যা বাংলা প্রদেশ বিভক্তির দ্বারা প্রবলতা পেয়েছে। লর্ড কার্জন তাঁর কর্তৃত্বের শেষ সময়ে, এখন থেকে তিন বৎসর আগে, বঙ্গবিভাগ করেন। মজঃফরপুরে প্রথম বোমা নিক্ষেপ ও তার বীভৎস পরিণতির পরে মাসখানেকের বেশি সময় কাটেনি। ফৌজদারি আদালতের নথিপত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে পূর্ণ। সাহেবী কাগজগুলি লৌহশাসন প্রবর্তনের পক্ষে কলরবরত। পুলিশ—গৌরবলাভের জন্য উদগ্র। আর কখনো অসামরিক কর্মচারীদের পক্ষে অধিক বিজ্ঞতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির সঙ্গে, কিংবা ঋজু কঠিনভাবে, সরকারের বিরাট খেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এখনকার মতো অনুভূত হয়নি।"

র‍্যাটক্লিফ তারপর পূর্বের তিন বৎসরের মুখ্য ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে মেদিনীপুর মামলা ও তাতে পুলিশের ক্রূর চাতুরীর বিষয়ে তথ্য ছিল। তিনি হাইকোর্টের রায়ের বিবরণ দেন। তারপর বলেন, হাইকোর্টের রায়ে যা প্রকাশিত হয়েছে তা স্তম্ভিত করে দেবার মতো ব্যাপার ; তা "ইংলণ্ডের শুভ্র নামের উপরে ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পাপের প্রহার।"[১৩]

৪ জুন ১৯০৯, ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত মেদিনীপুর মামলার প্রথমাংশ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, স্যার লরেনস্‌ জেনকিনস্‌ কী পরিমাণে নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থ ছিলেন। তার ফলে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এবং অবশ্যম্ভাবী পুলিশী ক্রোধ।

কিভাবে বোমা "বানানো হয়"
মেদিনীপুর 'ষড়যন্ত্র' মামলা ফাঁস

"মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত তিন ব্যক্তির আপীলের মামলায় হাইকোর্ট আজ (রয়টার কলিকাতা থেকে ১ জুন তারিখে প্রেরিত টেলিগ্রামে জানিয়েছে) রায় দিয়েছে। তিনজন অভিযুক্ত [এবং পূর্ব আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত] ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছেন। হাইকোর্টের রায় বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুর সেসনস্‌-কোর্টে গত বৎসর এই মামলা শুরু হয়। আদিতে বিবাদী ছিলেন ২৬ জন—কিন্তু সরকার পক্ষের প্রধান একজন সাক্ষী বক্তব্য

১৩ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২৫ অগস্ট, ১৯১১, উদ্ধৃত।

প্রত্যাহার করায় ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। বাকি ৩ জন দণ্ড পান—দীর্ঘমেয়াদী নির্বাসন।....

"পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের হত্যার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পুলিশ এনেছিল, যাতে ১৫৪ জড়িত। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শোনেন প্রধান বিচারপতি (স্যার লরেনস্ জেনকিনস্) এবং বিচারপতি মিঃ মুখার্জি। এঁরা দশ দিন শুনানির পর দণ্ডাদেশ বাতিল করে তিন দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।

"রায় দানকালে হাইকোর্ট বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেসব স্বীকারোক্তি করা হয়েছে, সেগুলি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত নয়; পুলিশ অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধভাব সেগুলি আদায় করেছে; তাদের লিপিবদ্ধ করেছেন যে-ম্যাজিস্ট্রেট তিনি আইনের ভাষা বা ভাব কোনো কিছুকেই মান্য করেননি। একজন দণ্ডিতের বাড়িতে একটি বোমা পাওয়া গিয়েছে—এই অভিযোগের বিষয়ে বিচারপতিরা বলেছেন—বিবাদীদের তরফে যে বলা হয়েছে, ঐ বোমা পুলিশই স্থাপন করেছিল, সেই কথাকে তাঁরা উড়িয়ে দিতে অসমর্থ। পুলিশ এই মামলায় যে-ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তদনুযায়ী তাঁদের এই সিদ্ধান্ত।

"এই হল সাম্প্রতিক তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মামলা যাতে হাইকোর্ট [নিম্ন আদালতের] দণ্ডাদেশ অগ্রাহ্য করলেন, পুলিশী সাক্ষ্যকে পুরোপুরি বাতিল করলেন, সেই সঙ্গে তাদের অবলম্বিত পদ্ধতির নিন্দা করলেন। জানা গেছে, লেফটন্যান্ট গভর্নর গোটা মেদিনীপুর ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষরকম তদন্ত করবেন। মধ্যবর্তীকালে তিনি আদেশ দিয়েছেন—সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কেউই যেন কোনো অজুহাতে ছুটিতে না যায়।"

ইংলণ্ডীয় সরকারের বেসরকারী মুখপত্র লণ্ডন টাইমস, সরকারের এই মুখপোড়ানো ঘটনার প্রচারে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক ছিল [ইণ্ডিয়া সেজন্য কটাক্ষও করেছিল], কিন্তু ইংলণ্ডের অন্য অনেক সংবাদপত্র কলকাতা হাইকোর্টকে অভিনন্দন জানায়—জাতিবিদ্বেষের উপরে উঠে ন্যায়বিচারের সামর্থ্য প্রদর্শনের জন্য। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান রায়ের বিবরণ দেবার পরে মন্তব্য করে:

"এইপ্রকার একটি রায় প্রশাসনের মর্যাদাকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করবে। হাইকোর্টের ন্যায়পরতা অসামান্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন, সেইসঙ্গে নিম্ন আদালত, সন্দেহের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে—কেন না তারা এমন অতিক্ষীণ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছে যার সাহায্যে দণ্ডাদেশ দান অযৌক্তিক। ঐসব সাক্ষ্য অধিকন্তু এমন-সব মনুষ্য প্রদান করেছে যাদের না আছে চরিত্র, না আছে নীতিজ্ঞান, যার ফলে সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি।"

শাস্তিদানে উন্মত্ত সরকার, এবং তাকে সাহায্য করতে সদা উদ্যত পুলিশের বিরুদ্ধে আরও অনেক কঠোর কথাই ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান বলেছিল।

স্টার পত্রিকার মন্তব্যের অংশ:

"এই রায়....ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের পদ্ধতির হতবাককারী উদ্‌ঘাটন।"

এই "ইম্পিরিয়াল স্ক্যাণ্ডাল"-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ ক'রে, এই ধরনের সংবাদকে ঢেকে রাখার চেষ্টার সমালোচনাও এই পত্রিকায় করা হয়। শেষে সে মিঃ প্রাইস কোলিয়ারের মন্তব্য নিজ মনোভাবের সমর্থনে উদ্ধৃত করে:

"আমরা বিস্মিত হব না যদি দেখি যে, ভারত ও ইংলণ্ড তাদের শাসকদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে অস্বীকার করেছে—যাদের শাসনাধীনে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটরা ন্যায়বিচারের উপর এহেন জঘন্য অত্যাচার করেছে যে, তাকে তুরস্ক বা রাশিয়াও অতিক্রম করতে পারেনি। এখানে একমাত্র

সান্ত্বনা—হাইকোর্ট দায়িত্ব পালন করেছে।"

গ্লোব পত্রিকার মতে, কলকাতা হাইকোর্ট "সুদৃঢ় এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।" ডেইলি নিউজ স্যার লরেন্সের কর্তৃত্বাধীন হাইকোর্টের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে যা বলেছিল, তা দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করা যায় :

"ন্যায়বিচারের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের যে-সুনাম ভারতীয়দের মধ্যে স্বীকৃত, তার ঔচিত্য পুনর্ঘোষিত হয়েছে।...গত মঙ্গলবার মেদিনীপুর মামলার অবশিষ্ট তিন দণ্ডিত ব্যক্তিকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সে পুনশ্চ প্রমাণ করল—জাতিগত অথবা রাজনৈতিক পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে সে অবস্থিত, এবং ন্যায়চক্ষু ভিন্ন অন্য কোনো চোখে সাক্ষ্যসমূহকে এবং তথ্যকে দর্শন করতে প্রস্তুত নয়।"[১৪]

১৪ ইন্ডিয়া পত্রিকায়, ৪ জুন, ১৯০৯ তারিখে সংকলিত।

জেমস ক্যাম্বেল কার তাঁর গোপন রিপোর্টে আশাহত চিত্তে স্যার লরেনস্ জেনকিনস্‌-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন :

"The decisions in these two cases [Howrah-Sibpur and Netra Dacoity case] were a heavy blow to the police; in the former they saw men, admittedly guilty against whom evidence had been collected with the greatest difficulty, released with no more serious punishment than a lecture from the Chief Justice; in the latter the sentences passed appeared to indicate that to make disclosure to the police was regarded by the High Court as an aggravation to the offence. There may have been reasons of high policy behind both decisions, but these were unknown to the police to whom the time and labour spent had brought no commendation but only what was regarded by their friends and enemies alike as a severe reprimand." [James Campbell Ker, I. C. S., *Political Trouble in India (1907-1917)*, edited by Mahadevaprasad Saha, p. 294]

তৃতীয় অধ্যায়

নিবেদিতার কালের কয়েকজন বিপ্লবী ও চরমপন্থী

॥ ১ ॥ 'কানাইলাল দত্ত প্রসঙ্গে নিবেদিতা'

নিবেদিতার কালে যেসব বাঙালী বিপ্লবী আত্মোৎসর্গ করেন—তাঁদের মধ্যে কানাইলাল দত্ত তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পেয়েছেন। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধৃত কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা ক'রে ফাঁসি যান। যেভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তা একমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। কানাইলাল সমগ্র জাতিচিত্তকে ভাবাকুল ক'রে তুলেছিলেন। অজস্র বন্দনা তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। নিবেদিতা শ্রদ্ধানত মস্তকে সেই স্তোত্রগানে অংশ নিয়েছেন।

কানাইলালের প্রতি এই সর্বজনীন অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা কেবল চমকপ্রদ বৈপ্লবিক কৌশলে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্যই নয়—ততোধিক, ফাঁসির আদেশের পরে তাঁর দেহ-মনের অবর্ণনীয় রূপান্তর সংবাদে। সে সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনা আছে। আমি কেবল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' থেকে অংশ উদ্ধৃত করব। দুটি ছবি—একটি, কানাই যখন আলিপুর-মামলার অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে একই ওয়ার্ডে আছেন। দ্বিতীয়, কানাইয়ের ফাঁসির আদেশ হবার কিছু পূর্বের।

প্রথম চিত্র :

"ছেলেরা অনেকেই সেকালের স্বদেশী গান গাহিত। তাহাদের অদম্য উৎসাহ ও স্ফূর্তি চাপিয়া রাখাই দায়। শচীন সেন ছিল তাহাদের অগ্রণী।...চীৎকার করিয়া, লাফালাফি করিয়া, গান গাহিয়া, কাঁধে চড়িয়া, আমকাঁঠাল চুরি করিয়া, সে শুধু আমাদেরই অস্থির করিয়া তুলিল তাহা নহে, জেলের কর্তৃপক্ষগণও তাহার বক্তৃতার ও গানের জ্বালায় অস্থির হইয়া গেলেন।... অরবিন্দবাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত ; তবে মধ্যে-মধ্যে উঁহারাও যে বাদ পড়িতেন তাহা নহে।... কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত দশটা-এগারোটার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম বা বিস্কুট লুকানো আছে, তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যেদিন সেসব কিছু মিলিত না সেদিন একগাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা, বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুন্নমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় একটার সময় ঘুম ভাঙিয়া দেখি—কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম

ভাঙিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন, নিদ্রাভঙ্গের আর কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। চুরিও ধরা পড়িল না।"

দ্বিতীয় চিত্র :

"আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম, কানাইল্যালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময় প্রহরী বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে, কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

"যাহা দেখিলাম—তাহা দেখিবার মতো জিনিসই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে, জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মতো অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই—প্রফুল্ল কমলের মতো তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকুটে ঘুরিবার সময় একসময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেইকথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ—সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত!

"তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজশাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপিচুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এ-রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?' যে-উন্মত্ত জনসংঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"

কানাইলালের মৃতদেহ নিয়ে হাজার-হাজার মানুষ শ্মশানে গিয়েছিল। যে-গভীর শোক ও গৌরববোধ সেইকালে দেখা গিয়েছিল তা অতুলনীয়। যতদূর মনে হয়, বাংলাদেশে সে-পর্যন্ত এই শোকযাত্রাই সর্ববৃহৎ, অন্ততঃ বিপ্লবীর শোকযাত্রা সম্বন্ধে একথা সত্য।

কানাইলাল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বিবেকহীন আচরণের উল্লেখ নিবেদিতা করেছেন, ৫ অগস্ট, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখা চিঠিতে :

"তোমরা জানো কি, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসির আগে তাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দেবার জন্য বৃদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল? তবে হাঁ, ও-কাজটা করতে হবে গরাদের বাইরে থেকে—আর সেইকালে ঘিরে থাকবে, ও তাঁদের কথাবার্তা শুনবে পাঁচ কি ছয়জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় ওয়ার্ডার ও গার্ড। কানাইলাল দত্ত সম্বন্ধেও একই কাজ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ঐ সময়ে খুবই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকলেও তিনি উঠে সেখানে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন—কিন্তু কানাইকে দেখতে তাঁকে দেওয়া হয়নি। তোমাদের এসব কথা বলার কারণ—ভবিষ্যতেও এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। মৃত্যুদণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যাজকের সাক্ষাৎ বন্ধ

করা নিশ্চয় স্বাভাবিক রীতি নয়!"

কানাইলাল সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে এক প্রধান প্রশাসক ফক্সের স্মরণীয় সংলাপ নিবেদিতা আমাদের গোচর করেছেন। এই সংলাপ থেকে বোঝা যায়, তথাকথিত অনেক মডারেটের ভিতরে কোন্ প্রাণ কাঁপত! মডারেট ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কাউন্সিল-সদস্য, সরকারের আস্থাভাজন—সে-হেন ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফক্সের কথাবার্তার বিবরণ এই, নিবেদিতার ৩ নভেম্বর, ১৯০৯, চিঠিতে:

> ভূপেনবাবু ফক্স সম্বন্ধে মনোরম কাহিনীটি শোনালেন। ভূপেনবাবু ফক্সকে ভালভাবে চেনেন।
>
> ফক্সের নিরীহ প্রশ্ন: আচ্ছা, হিন্দুরা কানাইলাল দত্ত সম্বন্ধে অমন উচ্ছ্বাস দেখালো কি ক'রে—যে-লোকটিকে আদালত বিচার ক'রে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তারপরে সাধারণ একজন খুনী হিসেবে যার ফাঁসি হয়েছে।
>
> ভূপেন: তার উত্তর আমি দিতে পারি—কিন্তু সেটা তোমার কাছে মধুর ঠেকবে না।
>
> ফক্স: আরে বলো, বলো—অরুচিকর কথা শুনতে আমি ভয় পাই না।
>
> ভূপেন: যীশু খ্রীস্টকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছিল—জুডাস ইস্‌কারিয়ট ছিল গোয়েন্দা পুলিশের লোক। সেটা কিন্তু তাঁদের একজনকে পূজা করতে এবং অন্যজনকে ধিক্কার দিতে তোমাদের বাধা দেয় না। অল্পাকারে সেটা এখানেও সত্য।
>
> ফক্স টকটকে লাল। ভূপেন বিষয়ান্তরে গেলেন।
>
> ফক্স আবার প্রশ্ন করলেন: ওরা রিভলবার পেল কোথা থেকে?
>
> ভূপেন: তা আমি জানি না। তবে ওসব বস্তু খুব সহজে কোথা থেকে পেতে পারে, তা আমি জানি।
>
> ফক্স, ব্যগ্র হয়ে: কোথা থেকে?
>
> ভূপেন: পুলিশের কাছ থেকে।

এর আগে ৫ অগস্ট নিবেদিতা কানাইয়ের মৃত্যুবরণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন:

"কি অপূর্বভাবে ছেলেটি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করল! ঠিক হোক, ভুল হোক—বীরত্ব, যা সত্যই বিশাল বীরত্ব—তা ইতিহাস সৃষ্টি করে।"

না, কানাইয়ের বীরত্বকে ভ্রান্ত বলার কোনো অভিপ্রায় নিবেদিতার ছিল না, বস্তুতপক্ষে সে শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন কানাইয়ের মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে। কানাইয়ের আত্মদান তাঁকে জোয়ান অব আর্ক-এর আত্মদানের কথা স্মরণ করিয়েছিল। না, কানাইয়ের আত্মদানের প্রকৃতি এমন-কি বৃহত্তর বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। কানাই একেবারে গীতামূর্তি!

"এই তো সেদিন—কানাইলাল দত্ত!—[জোয়ান অব আর্ক-এর তুলনায়] আরও বৃহৎ সে বস্তু! নিজ হস্তে সংহার ক'রে বলা—'কেই-বা হন্তা, কেই-বা হত?' এই ধরনের ঘটনা মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের তটে এমনই প্রবল প্রচণ্ড তরঙ্গে আছড়ে পড়ে যে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়—ঐ মনোভাব কি ক'রে কেউ ধারণ করে রাখতে পারে!" [১৪-৯-১৯১১]।

একথা বলেছেন অন্য কেউ নন—অন্তর্লোকে স্বাধিষ্ঠিতা স্বয়ং নিবেদিতা!

॥ ২ ॥ নিবেদিতা : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : যুগান্তর মামলা

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় বলাবাহুল্য কেবল রাজনীতি-ঘটিত নয়। এখানে অবশ্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গটিকেই প্রাধান্য দেব।

নিবেদিতার চিঠিপত্রে একাধিকবার 'যুগান্তর' মামলার উল্লেখ আছে। এদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির অপরিসীম গুরুত্ব। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট ও অন্য নানা তথ্যসূত্রে দেখা যায়—এই পত্রিকা বহু যুবকের চিত্তে বিস্ফোরকের কাজ করেছিল, এবং এর দ্বারা অনেকের মনেই তীব্র বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়, যাদের একাংশে আবার বিপ্লবী দলে যোগও দেয়। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সবিশেষ ভূমিকার কথা আমরা জানি, কিন্তু ঐ ইংরাজি পত্রিকা ও তার উচ্চাঙ্গের রচনাদির আবেদন প্রধানত শিক্ষিতজনের কাছেই, অন্যদিকে বাংলা 'যুগান্তর' তার উগ্র আক্রমণ ও মুক্ত বৈপ্লবিক প্রচারের দ্বারা জনচিত্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার জন্য তা স্বয়ং অধীর হয়ে উঠেছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, এটি গোষ্ঠীর পত্রিকা। "এই যুগান্তর কাগজ বাহির করিবার প্রধান উদ্যোগী বারীন্দ্র, অবিনাশ [ভট্টাচার্য] ও আমি।... ৩০০ টাকা লইয়া বুক ঠুকিয়া আমরা মাথা গরমের দল যুগান্তর কাগজ প্রকাশ করিলাম।... যুগান্তর নাম আমার মনোনীত ; দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়।... যুগান্তর, দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই প্যার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, [সখারাম গণেশ] দেউস্কর, ও 'চ' মহাশয়।"[১]

১৯০৬ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে প্রবর্তিত এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন বারীন্দ্র, দেবব্রত বসু [পরে যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ], উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বিস্ফোরক' এই পত্রিকাটির অচিরে বিক্রয়-বিস্ফোরণ ঘটে।"হুহু করিয়া দিন-দিন যুগান্তরের গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।"

কিন্তু দৈনিক পত্রের আতশবাজি তো একদিনেই শেষ। যাতে দীর্ঘস্থায়ী ঝলসানি সম্ভব হয় তার ব্যবস্থাও এঁরা ক'রে ফেললেন। যুগান্তরের চোখা-চোখা লেখাগুলি সংকলন ক'রে বই বেরুল, "মুক্তি কোন্ পথে", সেইসঙ্গে "বর্তমান রণনীতি।" প্রথম বইয়ে জনমত গঠন এবং অস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থ জোগাড় করতে দরকার হলে ডাকাতি করতে হবে। সানন্দে জানানো হয়—ট্রিগার টেনে কোনো ইউরোপীয়কে নিকেশ করতে তো বেশি গায়ের জোরের দরকার হয় না ; বোমা তৈরী করতেই বা অসুবিধা কি ? শাসকগণ চমৎকৃত হয়ে শুনেছিলেন, মুক্তি কোন্ পথে-র সন্ধানীরা সৈন্যবাহিনীর কাছেও হাজির হতে ইচ্ছুক। এ ক্ষেত্রে শুভফল অবধারিত, কেননা দেশীয় সৈন্যরা পেটের দায়ে সৈন্যদলে ঢুকলেও এদেশেরই মানুষ, তাদেরও রক্তমাংসের শরীর, তাদের যদি স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা যথাকালে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে (যেগুলি শাসকরাই সরবরাহ করেছে) এগিয়ে এসে স্বাধীনতা-যুদ্ধে লেগে পড়তে পারবে।

মারাত্মক কথা সন্দেহ নেই। বিষাক্ত আতঙ্কের সঙ্গে সিডিশন কমিটি (১৯১৮) তাঁদের রিপোর্টে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'বর্তমান রণনীতি' পুস্তকটিও তাঁদের কাছে কম মারাত্মক মনে

১ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড, ১৩৩৩), পৃ· ২৯-৩০।

হয়নি, যা ভারতীয়দের পরিচিত করতে চাইছিল আধুনিক যুদ্ধনীতি, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে, যাতে করে শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর মধ্যে সামরিকতা আসে। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ১৩ অক্টোবর, ১৯০৭ সংখ্যায় পুস্তকটিকে সংবর্ধনা জানিয়ে লেখে : "এই বই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ, জাতীয় চিত্তের নবভাবনার দ্যোতক। অতীতের সংকীর্ণ জীবন ও আবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পর্বে আমরা রোমান্টিক কবিতা ও উপন্যাসে পরিতৃপ্ত ছিলাম, মাঝে-মধ্যে হয়ত পাঠ্যসূচীসম্মত দর্শন বা সমালোচনা মিলত। এখন কিন্তু জাতিচিত্ত উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত—ইতিহাস, দেশাত্মবোধক নাটক, জাতীয়তার গান, এবং আমাদের প্রাচীন ও সজীব ধর্মের নিত্যউৎসের বারিধারা ছাড়া কোনো-কিছু কেউ পড়তে চায় না।" "বর্তমান রণনীতি"তে যে রণনীতি প্রকাশিত, সেটা আশু-গ্রাহ্য, এমন কথা বললে যে, ব্যাপারটা বিপজ্জনক দাঁড়াবে, সেই বাস্তববোধ 'বন্দেমাতরম্' কাগজের ছিল ; সুতরাং ত্বরিতে সে বলে দিল—ঐ 'বর্তমান রণনীতি' ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমানের রণনীতি নয়। সমান ব্যস্ততার সঙ্গে জানাল : "আমাদের কাজ হল দেশবাসীকে জাতীয় জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান ও কর্মের জন্য প্রস্তুত করা।...ঐ সকল জ্ঞান ও কর্মের অধিকার বর্তমানে আমাদের নেই, কিন্তু তা জাতির ভাবী পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য আবশ্যক।"[২] বন্দেমাতরম্ পত্রিকা অবশ্যই জানত, তার দ্বারা নির্দেশিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কালব্যবধানকে এখন যারা প্রগতির রথে চড়ে বসে আছে তারা ভেঙে ফেলতে দেরী করবে না। এবং সে কথা বন্দেমাতরম্ কাগজের চেয়ে কম জানত না বৃটিশ শাসকেরা।[৩]

কোনো সন্দেহ নেই, যুগান্তরের এই সকল রচনা শাসক-দৃষ্টিতে রাজদ্রোহে পূর্ণ।—"এদের মধ্যে বৃটিশ জাতি সম্বন্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা ; প্রতি লাইনে বিপ্লবের নিঃশ্বাস ; বিপ্লব কিভাবে সম্পাদিত করা যাবে তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ। দেশবাসীর মনে একই ভাব প্রোথিত করার জন্য—কিংবা সহজেই প্রভাবিত হয় এমন তরুণদের পাকড়াবার জন্য—কোনো কুৎসা বা চাতুরী বাদ থাকেনি"—আলিপুরের সেসন্-জজের এই মন্তব্যে প্রধান বিচারপতির সমর্থন ছিল—থাকতেই পারে, যদি ভারতশাসনে ইংরাজের চির অধিকারকে মেনে নেওয়া যায়।[৪]

২ কালীচরণ, ১৪০-৪১।

৩ 'মরাঠা' পত্রিকায় ৩১ মে, ১৯০৮, 'পঞ্জাবী' পত্রিকা থেকে এই বইটির উপর রচিত আলোচনা উদ্ধৃত হয়। তার শেষাংশে প্রশ্ন করা হয়—বাংলায় যে-নিহিলিস্ট আন্দোলন পুলিশ সদ্য আবিষ্কার করেছে, তার সঙ্গে কি বইটির কোনো সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক আছে বলেই পত্রিকাটি মনে করেছিল, কারণ এই বইয়ে গেরিলা যুদ্ধের কথা উত্থাপনমাত্রে অসাধারণ উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বইটির কেন্দ্রীয় দর্শন—যুদ্ধ-সৃষ্টির, ধ্বংস-সৃষ্টির দর্শন। দেহের কোনো অংশ পচে গেলে যেমন তাকে বাদ দিতে হয়, তেমনি পরাধীনতায় পচে-যাওয়া দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক আঘাত না আনলে জাতির প্রাণশক্তি ফিরবে না। কেন বইটি প্রকাশ করা হয়েছে, সে-কথা বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছিল। তার অংশ :

"The people of India have been disarmed under the orders of the King. For self-protection the alien King has deprived a whole people of arms, lest the people, being oppressed should overthrow the King. The Sikhs, Mahrattas, Rajputs and Telangis are admitted into the army, and obtain a little training in war tactics. But intelligent Bengalis and the Brahmins of Poona cannot even carry long sticks for self-protection, for, should the intellect and the strength of the arm combine, who can say for a certainty that such combination will not result in an end of the British rule? The faint-hearted King may have established an unjust law. And because of this should the Bengalis, eight millions strong, and the Mahrattas, Rajputs and other various warlike races over two hundred millions remain as beasts? What if we have opportunity of learning war-tactics, how to drill and march, openly and by fair means? If the Bengalis should take upon themselves the task of training in this direction...they can get grounded in the secrets of the science of war... It is to lay the foundation of this new training that the book is published." [*Mahratta*, May 31, 1908, *The Militant Aspirations of Bengal.*]

৪ সিডিশন কমিটি রিপোর্ট, (নিউ এজ সংস্করণ), পৃ. ২২।

এমন একটি সংবাদপত্রকে ছেড়ে রাখা যায় না। বিস্ময়ের কথা, প্রায় দেড় বছর তাকে ছেড়ে রাখা হয়েছিল। যাই হোক, অতঃপর যুগান্তরের সম্পাদক হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথের বিচার হল। ভূপেন্দ্রনাথ কি যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন? না। বড় জোর বলা চলে, অন্যতম সম্পাদক। কোনো একজন পত্রিকাটির সম্পাদক নন। যে-দুটি রচনার জন্য বিশেষভাবে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গিরিজাশঙ্কর বলেছেন, শোনা যায় সেগুলি ভূপেন্দ্রের রচনা নয়—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তার একটি—'ভয় ভাঙো', অন্যটি 'লাঠ্যৌষধি'। প্রথমটিতে বলা হয়—বৃটিশ-সাম্রাজ্য একটি সাজানো তামাশা, এর ভিত্ নড়বড়ে, একটু ধাক্কা দিলেই ভেঙে চুরমার। ভারতবাসীর নির্বুদ্ধিতার জন্যই এই সাম্রাজ্য টিকে আছে। নিছক মিথ্যা দম্ভের উপর স্থাপিত এই সাম্রাজ্যকে সহজেই ফেলে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় রচনায় পঞ্জাবের অধিবাসীদের বীরত্বের প্রশংসা করা হয়, কারণ তারা খাল-কর বৃদ্ধি করা হলে প্রতিরোধের শক্তি দেখিয়েছে—একমাত্র যে শক্তির ভাষা মাথামোটা শাসকেরা বোঝে। তাদের মাথা ফাটিয়ে দেবার, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেবার পরেই তারা ঠাণ্ডা হয়েছে। আচ্ছা ক'রে কাবুলি-দাওয়াই দিলেই তবে ওরা শায়েস্তা হয়।[৫]

একমাত্র সম্পাদক না হওয়া সত্ত্বেও পুলিশের কাছে সম্পাদকের দায়িত্ব ভূপেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন—অরবিন্দের নির্দেশেই। কোনো এক নিগূঢ় কারণে অরবিন্দ এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা নিগূঢ়তার কারণে সহজবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।[৬]

৫ কালীচরণ, ১৩৯।

৬ গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন : "যুগান্তরের বেলায় অরবিন্দ ভূপেন দত্তকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে—যুগান্তরে প্রকাশিত যে-প্রবন্ধগুলির জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধগুলির ও কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব আদালতে স্বীকার করিয়া মাথা উঁচু করিয়া সোজা জেলে চলিয়া যাও। বেচারী ভূপেন দত্ত কিছুই জানেন না। জামালপুর হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াই যুগান্তর পত্রিকা অফিসে বসিয়াছেন। ভূপেন দত্ত ঐ প্রবন্ধগুলি লেখেনও নাই, আর যুগান্তর কাগজের সম্পাদকও তিনি নহেন। সম্ভবত যুগান্তর কাগজের সম্পাদক বলিয়া কেহই ছিলেন না। তথাপি গুরুর আদেশ মানা করিয়া ভূপেন দত্ত অধরে মৃদ হাস্য আনিয়া ২৪শে জুলাই জেলে গমন করিলেন। ২৫শে জুলাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ ভূপেন দত্তকে বাহবা দিয়া প্রশংসা করিয়া লিখিলেন—'Bhupendra Nath Dutta imprisoned for telling the truth with too much emphasis.' এখন প্রশ্ন, নিজের বেলায় অরবিন্দ এরূপ করিলেন না কেন? তিনি কি যথেষ্ট সাহসী নহেন? নতুবা পরোপদেশে যে-পাণ্ডিত্য ও সাহস দেখাইলেন, নিজের বেলায় তাহা হইতে পিছাইয়া গেলেন কেন? কেন—অরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন : 'ভূপেনবাবুর বেলায় বীরত্বব্যঞ্জক রাজদ্রোহিতার স্বীকারোক্তি দেওয়াবার জন্য ক-বাবু (অরবিন্দ) অন্য নেতাদের নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলেন।... পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু বন্দেমাতরম্ পত্রিকাতে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অনুরূপ অবস্থাতে সমানভাবে অভিযুক্ত হয়ে ভূপেনবাবুর ঠিক উল্টো ব্যাপার করেছিলেন। তাতেও দেশে ধন্য-ধন্য পড়ে গেছল। আমাদের লোকমতের বাহাদুরী নয় কি?' ['বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা, ৩০০-৩০১]।"

অরবিন্দের আচরণের অসামঞ্জস্য সমালোচনার কারণ হয়েছিল। সে-সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের এই মন্তব্য গিরিজাশঙ্কর উদ্ধৃত করেছেন : "যুগান্তর মামলায় তিনি (অরবিন্দ) ভূপেন্দ্রনাথকে যেভাবে কাজ করিতে, যে-পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কেন আত্মসমর্থন করিলেন, কেহ-কেহ অরবিন্দকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার কার্যের দ্বারা ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রবন্ধে তাঁহার কৃতকার্যের কারণ বুঝাইয়া দিলেন।" ['কংগ্রেস', ২০৯]।

গিরিজাশঙ্কর বন্দেমাতরম্ তল্লাশ করেও অরবিন্দের কৈফিয়ত খুঁজে পাননি। তিনি লিখেছেন : "বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যায় অরবিন্দ তাঁহার কৃতকার্যতার কারণ বুঝাইয়া দিলেন, হেমেন্দ্রবাবু সেইটি আমাদের জানাইলে বড়ই উপকৃত হইতাম।" গিরিজাশঙ্কর অরবিন্দের রচনার সাহায্য ছাড়াই অবশ্য অরবিন্দ-কার্যের কারণ অনুমানের চেষ্টা সবিস্তারে করেছেন। এ চেষ্টা তাঁকে করতেই হয়েছে যেহেতু তিলকের অতুলনীয় বিপরীত দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল : "১৯০৮, ২৪ জুন মিঃ তিলক কেশরী পত্রিকার কতকগুলি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ঐ প্রবন্ধগুলি একটাও তাঁহার নিজের লেখা ছিল না। [?] তথাপি কেশরী কাগজের সম্পাদক হিসাবে তিনি অপরের লিখিত ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব আদালতে গ্রহণ করিলেন এবং ফলে ছয় বৎসর যাবৎ মান্দালয় দুর্গে বন্দী থাকিলেন।" [৬৩১]।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে ভীরুতা বা পশ্চাদপসরণের অনুচিত অভিযোগে গিরিজাশঙ্কর সায় দেন নি। বিপ্লবী নেতা হিসাবে জেল এড়ানোর নীতিকেই গ্রহণ ক'রে অরবিন্দ ঐ ধরনের কাজ করেছিলেন। যুগান্তর পত্রিকার ব্যাপারে তিনি সম্ভবত [আমরা অনুমান করি] বিপ্লবীদলের দ্বিতীয় নেতা বারীন্দ্রকে জেল থেকে দূরে রাখার জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে যেতে প্ররোচনা দিয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। আদালতে ২২ জুলাই তিনি এই স্মরণীয় উক্তি করেন :

"আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, একথা জানাচ্ছি যে, আমি যুগান্তরের সম্পাদক, এবং আমি প্রশ্নাধীন সকল প্রবন্ধের জন্য দায়ী। আমি সৎ বিশ্বাসে আমার দেশের জন্য যা করা উচিত মনে করি তাই করেছি। আমি আর কোনো বিবৃতি দেব না, এবং বিচারে আর কোনো অংশ নেব না।"[৭]

ভূপেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "ভারতে বৃটিশ বিচারালয়ের সঙ্গে এই প্রথম অসহযোগ।"[৮]

সমস্ত দেশ শিহরিত হয়েছিল। ২৪ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 'বন্দেমাতরম্'-এ ২৫ জুলাই, ১৯০৭, অরবিন্দ এক অসামান্য প্রশস্তি লিখলেন—"বেদীমূলে আর একজন"—*One More for the Altar*। বললেন, "শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড পেয়েছেন অতিরিক্ত দাপটে সত্য কথনের কারণে। ও-সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলার নেই, কারণ ওটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাসির সঙ্গে ভারতীয় ডেমোক্র্যাসির সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ।... কিন্তু ব্যুরোক্র্যাসির করায়ত্ত যেখানে সকল পার্থিব শক্তি—সেখানে ডেমোক্র্যাসির আয়ত্তে আছে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মোৎসর্গের বীর্যশক্তি, অটল সাহস, আদর্শের জন্য আত্মবলিদানের সামর্থ্য।" অরবিন্দ স্মরণ করিয়ে দিলেন : "ভারতের অধ্যাত্মজীবন যেহেতু পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য সর্বাদি প্রয়োজন, তাই আমাদের সংগ্রাম কেবল আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য।"[৯]

২৮ জুলাই একই কাগজে দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডসূত্রে চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার বিশ্লেষণ ছিল। ভূপেন্দ্রনাথকে 'বন্দেমাতরম্'-প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধতন্ত্রের প্রথম বাস্তব প্রয়োগসাধক রূপে উপস্থিত ক'রে বলা হয় :

"যুগান্তর মামলায় শাস্তিবিধানে জাতীয় জীবন সুস্পষ্টভাবে লাভবান হয়েছে। এর ফলে এদেশের মানুষের নৈতিক আধিপত্য স্থাপনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কার্যসূচনা হয়ে গেছে। ঐ নৈতিক আধিপত্য—বিদেশীয় আধিপত্যকে দূরীভূত ক'রে তাদের নিছক শারীরিক শ্রেষ্ঠত্বকে বরবাদ ক'রে দেবে। যুগান্তরের সম্পাদক তাঁর অপূর্ব নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা এই অনন্যসাধারণ ফলোৎপাদন করেছেন। আত্মসমর্থনে তাঁর অস্বীকৃতি বহু চাঞ্চল্যকর মামলার ফলাফলের সমতুল। সারা ভারতের জনচিত্তে তা বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে—তাতে নৈতিক সাহস, নীরব সহন, দেশের জন্য মানুষের সহজ কর্তব্যসাধনের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে বলেই নয়, সেখানে দেখা গেছে উৎপীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে আপসহীন স্বরাজী-আদর্শের প্রথম বাস্তব প্রয়োগরূপ। এই প্রথম একজন মানুষকে পাওয়া গেল যিনি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বলতে পারেন—'তোমার সাম্রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য আড়ম্বর ও আধিপত্য নিয়ে যে-তুমি, জনসম্পদ, অর্থসম্পদ, কামান, বন্দুক নিয়ে যে-তুমি, আইনের শক্তি, কারারুদ্ধ করার শক্তি, পীড়নের শক্তি, হননের শক্তি নিয়ে যে-তুমি—সেই তুমি কিন্তু আমার কাছে, আমার অন্তর্নিহিত যথার্থ মানবসত্তার কাছে—কিছুই নও। তুমি স্বল্পকালীন এক

৭ কালীচরণ, ১৩৮।
৮ ভূপেন্দ্রনাথ, "স্বামী বিবেকানন্দ", পৃ. ১০৭।
৯ Haridas Mukherjee, Uma Mukherjee, *Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics*, 120-21.

অধ্যায়, চলমান এক দৃশ্য, অপসৃয়মান এক মায়া ছাড়া কিছু নও। আমার কাছে চিরসত্য—জগন্মাতা ও স্বাধীনতা।"[১০]

সত্যই শিহরিত হয়েছিল ভারতবর্ষ, নচেৎ সুধীর রচনার জন্য খ্যাত মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজের পক্ষে নিম্নের কথাগুলি কি ক'রে লেখা সম্ভব হয়েছিল ?—

"Babu Bhupendranath Dutt, the Editor of the *Yugantar*, has been sentenced to one year's rigorous imprisonment. This talented young man has been sentenced to hard labour for sedition. There is, indeed, much that is heroic and pathetic in the way in which he has gone to jail to suffer like a common criminal. When he was first arrested, some of the most leading gentlemen of Bengal offered to stand surety for him. *Sister Nivedita was also among those who kindly came forward.* The sympathy that was felt for him was extremely note-worthy. His youth, his culture, his patriotism and his kinship to Swami Vivekananda were the cause of this remarkable sympathy. But he needed not the sympathy of anyone. The blood of the martyr is in his veins. He was threatened with criminal proceedings by the Government but he heeded not and persisted in what seemed to him to be the most proper course for one of his patriotism. He was then charged and put up before the Magistrate for an offence under section 124A of I.P.C. What was his answer ?—'I am solely responsible for all the articles in questions. I have done what I have considered in good faith to be my duty to my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny. I do not wish to make any other statement or to take anyfurther action in the trial.' He refused to plead. He has in him the stuff of which heroes are made. In a free country the reward for such a man would have been astonishingly great. But in India it is only the jail. Mr. Dutt knew of it and unhesitatingly submitted to it. Attempts are now being made to crush

১০ কালীচরণ, ১৪০।

খুবই বিস্ময়ের কথা, শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে যথেষ্টই ঝাঁঝ আছে, এবং উপরের সম্পাদকীয় দুটিতে লিখিত মন্তব্যের প্রায় বিপরীত কথাই সেখানে পাই। তাহলে অরবিন্দ কি রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভূপেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত স্তুতি করেছিলেন ? ভূপেন্দ্রনাথও আমরা দেখি, পরবর্তী স্মৃতিকথাগুলিতে অরবিন্দের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে নানা কঠোর মন্তব্য করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ 'অন হিমসেলফ্'-এর মধ্যে (সম্পূর্ণ রচনাবলীর ২৬ খণ্ডের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায়) বলছেন :

"Bhupendranath Dutt as the Editor of *Yugantar*. In the intersts of truth this name should be omitted. Bhupen Dutt was at the time only an obscure hand in the Jugantar Office incapable of writing anything important and an ordinary recruit in the revolutionary ranks quite incapable of leading anybody, not even himself. When the police searched the office of the newspaper, he came forward and in a spirit of bravado declared himself the editor, although that was quite untrue. Afterwards he wanted todefendhimself, but it was decided that the *Yugantar*, a paper ostentatiously revolutionary advocating armed insurrection, could not do that and must refuse to plead in a British Court. This positon was afterwards maintained throughout and greatly enhanced the prestige of the paper. Bhupen was sentenced, served his turn and subsequently wentto America. This at the time was his only title to fame. The real editors or writers of *Yugantar* (fot there was no declared editor) were Barin, Upen Banerjee, (also a sub-editor of the *Bande Mataram*) and Debabrata Bose who subsequently joined the Ramakrishna Mission (being acquitted in the Alipur Case) and was prominent among the Sannyasins at Almora and was a writer in the Mission's journals. Upen and Debabrata were masters of Bengali prose and it was their writings and Barin's that gained an unequalled popularity for the paper. These are the facts, but it will be sufficient to omit Bhupen's name."

the *Yugantar*. The Sadhana Press, where the *Yugantar* is printed has been orderd to be confiscated. In the history of sedition trials in this country, the case of the *Yugantar* is, we believe the first of its kind, where the incriminated Editor, instead of trying to twist the facts or the law in his favour in the least, has courageously stood by what he said and fearlessly met what he knew to be certain punishment in a Court of Law. If only a few editors should court imprisonment in this fashion, either there would be no sedition trials in future or patriotic newspapers as a body will cease to exist."[১১]

এই ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট ভাবাবেগ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহিলারা ডাঃ নীলরতন সরকারের ৬১ নং হ্যারিসন রোডের বাসভবনে সম্মিলিত হয়ে জননী ভুবনেশ্বরী দেবীকে অভিনন্দিত করেন। সভায় কবিতা পড়া হয়, এবং মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রে বলা হয়েছিল: "আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রতি বঙ্গনারী অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি।" স্বর্ণপ্রভা দেবী তাঁর দীর্ঘ কবিতার মধ্যে বলেছিলেন,

> "ভালই হয়েছে বৎস, আছ কারাগারে।
> কণ্টকমুকুট মাল্য পারিজাত সম
> শোভিছে তোমার শিরে।"

উত্তরে ভুবনেশ্বরী দেবী বলেন, "ভূপেনের কাজ সবে শুরু হয়েছে। দেশের জন্য আমি তাকে উৎসর্গ করেছি।" "তাঁর এই উক্তি [ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন] দেশের প্রেরণার উৎস হয়েছিল। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁর ভাষণে গ্রন্থকারের মাতার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন যে, 'বাংলাদেশের বর্ষীয়সী মহিলারা পর্যন্ত দেশের কাজে এগিয়ে আসছেন।'"[১২]

স্বামীজীর ভাই হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ নিবেদিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন। প্রথম থেকেই ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রে উগ্রতা, এমন কি কর্কশতা ছিল, পৃথিবীবিখ্যাত জ্যেষ্ঠভ্রাতার গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল হওয়াকে তিনি আত্মমর্যাদার সহায়ক মনে করতেন না। ভূপেন্দ্রনাথের আত্মাভিমান নিবেদিতাকে প্রায়শই বিরক্ত করেছে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মুখে ভূপেন্দ্রনাথ যখন দেশভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে যথার্থ বীরব্রত গ্রহণ করেছিলেন তখন নিবেদিতা অত্যন্ত গৌরববোধ না ক'রে পারেননি।

ভূপেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের পরিচয় নিবেদিতা ১৯০২ সাল থেকে পেয়েছেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে, ২৮ জুলাই, নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন:

"তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, ভারতবর্ষীয় সকলের কাছে জীবন কি কঠিন সংগ্রামময় হয়ে উঠেছে। 'আমাদের দেশ তার নিজের সন্তানদের কবরভূমি, এবং প্রতিটি বর্বর গুণ্ডার কাছে

১১ Quoted in the *Bandemataram*, Aug. 4, 1907.
১২ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দ", ১০৭-১০।

স্বর্গভূমি, যারা তার উপর অত্যাচার করতে চায়'—[স্বামীজীর] এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলল, প্রায় স্বামীজীরই ভঙ্গিতে।"

যুগান্তর মামলা শুরু হয়ে যাবার পরে নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথের মুখে বীরত্বব্যঞ্জক নানা উক্তি শুনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলেন—দেখেছিলেন যে, ভূপেন্দ্রনাথ জেলে যাওয়ার ভয়ে একেবারেই কাতর নন।

মিসেস বুলকে নিবেদিতা ২০ জুলাই, ১৯০৭, লিখেছেন :

"স্বামীজীর সর্বকনিষ্ঠ ভাই, যাকে তুমি স্মরণ করতে পারবে, সে এখন রাজদ্রোহাত্মক লেখা প্রকাশের জন্য বিচারাধীন। সে একটু আগেই আমাদের বলছিল, কিভাবে জাতীয়তার ভাব সারা দেশের চেহারা বদলে দিয়েছে। কতসব খারাপ ছোকরা, আগে যারা রাস্তার লোফার ছাড়া আর কিছু ছিল না—তারা এখন চমৎকার ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার।... ৬ মাস থেকে ৩ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত ভূপেনের জেল হতে পারে। কী চমৎকার সাহসী সে, কারাবাস নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করছে। তবে একথাও বলছে, 'ও-ব্যাপারটা ভদ্রলোকের পক্ষে মনোরম নয় ; আর জানেনই তো আমি অহংকারী দত্তবংশের ছেলে।' ঠিক একেবারে স্বামীজীর মতো।"

যদিচ নিবেদিতা আশঙ্কা করেছিলেন, ৩ বছর পর্যন্ত ভূপেনের কারাবাস হতে পারে, তথাপি তাঁর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডকে তিনি গুরুদণ্ড মনে করেছিলেন। স্বদেশী যুগের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন : "ভূপেনের শাস্তিতে অত্যন্ত ব্যথিত। বিচার-ব্যাপারে করুণার প্রলেপ দানের চেষ্টা করা হয়েছে, এমন দেখানোর প্রয়াস লক্ষণীয়, কিন্তু সবাই মনে করছে, [ভূপেন] আত্মসমর্থন করলে শাস্তির পরিমাণ কম হত। সে যাই হোক—ভূপেনের 'ওয়ান মোর ফর দি অলটার' প্রবন্ধ অপূর্ব।" [প্রবন্ধটি যতদূর জানি, ভূপেন্দ্রনাথের লেখা নয়—অরবিন্দর লেখা। মনে হয়, নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথের বিষয়ে প্রবন্ধ—এই কথাই বলতে চেয়েছেন]।

ভূপেন্দ্রনাথের মামলাসূত্রে নিবেদিতা সরাসরি শাসকদের রোষদৃষ্টির লক্ষ্য হন, এবং অনেকের অনুমান, বিপ্লবী পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই তাঁর এইকালে ভারত ত্যাগের অন্যতম কারণ। [নিবেদিতা কি রকম আকস্মিকভাবে ভারত ছেড়ে যান, সে-বিষয়ে প্রচুর তথ্য আগেই দিয়েছি]। ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন :

"এই গ্রন্থকারের কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁর [নিবেদিতার] যোগাযোগ ছিল খুব বেশি। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে রাজদ্রোহের অভিযোগে আমার বিচারের কালে ভগিনী নিবেদিতা আমার মামলায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আদালতের দাবি অনুযায়ী তিনি আমার জন্য কুড়ি হাজার টাকা জামিনের প্রতিভূ হিসাবে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁকে দাঁড়াতে হয়নি, অন্যরাই জামিনের প্রতিভূ দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মাসতুতো ভাই চারুচন্দ্র মিত্র, এবং ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা করে জামিনের প্রতিভূ হয়েছিলেন। আদালত শেষে দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। তবুও তৎকালীন বৃটিশ স্বার্থের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' ভগিনী নিবেদিতাকে জাতির প্রতি বিশ্বাসহন্ত্রী রূপে নিন্দা করেছিলেন।"[১০]

নিবেদিতা যে ভূপেন্দ্রনাথের হয়ে জামিনে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তা পূর্বে উদ্ধৃত 'হিন্দু'র সংবাদ থেকেই আমরা দেখেছি। ইংলিশম্যানেও সেই ধরনের কথা আছে। তবে ইংলিশম্যান নিবেদিতাকে

১০ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দ", ১১২।

যে-সংখ্যায় 'a traitor to her race' বলেছিল, সে সংখ্যাটি দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।
ইংলিশম্যান ৯ জুলাই, ১৯০৭, লেখে :

"According to 'Bande Mataram' amongst the people who volunteered to stand surety for the editor of 'Jugantar', who is charged with seditions, is Sister Nivedita. This lady, who, we believe is an American, has longbeen associated with purely philanthropic enterprise in Calcutta, and it is astounding to find her name connected, even indirectly, with the kind of propaganda associated with journals of the type of 'Jugantar'. One hopes that she will promptly issue a contradiction."

ভূপেন্দ্রনাথের মুক্তির আগেই নিবেদিতা ভারত ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয়, ক্রিস্টিনকে তিনি পরবর্তী ব্যবস্থাদি করবার ভার দিয়ে যান। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মুক্তিলাভের পর আমি পরিচয় গোপন ক'রে আমেরিকায় যাই। কারামুক্তির সময়ই একজন সহকারী জেলার আমাকে বিদেশে পালিয়ে যাবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ তা না হ'লে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা ছিল। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধুবর ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কাছে শুনেছিলুম যে, আলিপুর মামলায় আমাকে জড়িত করবার জন্য স্থায়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমার বিরুদ্ধে ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি বিপ্লবী নেতা হরিদাস হালদারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনিও আমাকে সেদিনই কলকাতা ছেড়ে কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এলে আমার মধ্যমাগ্রজ [মহেন্দ্রনাথ দত্ত] আমাকে জানালেন যে, আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছে। ভগিনী ক্রিস্টিন এই পরামর্শটি দিয়েছিলেন। স্নেহশীলা মাতার অর্থানুকূল্যে আমি সেদিন সন্ধ্যায়ই কলকাতা ত্যাগ করি এবং তিন-চার দিন পরে সমুদ্রপথে ইউরোপ হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাই। ইতিমধ্যে পুলিশ বেলুড় মঠে খানাতল্লাসী করে। কারণ তারা মনে করেছিল যে, আমি সম্ভবত ছদ্মবেশে সেখানে আত্মগোপন করে আছি।"[১৪]

ভূপেন্দ্রনাথ লেখেননি, এমন-কি জানি না কেন ইঙ্গিত পর্যন্ত দেননি যে, ভগিনী নিবেদিতা গোটা ব্যাপারটির পিছনে ছিলেন। সিস্টার ক্রিস্টিন কদাপি এ-ধরনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে পারেন না। তাছাড়া পলায়নের ব্যবস্থাদিও খুব পাকা মাথা ছাড়া করা সম্ভব ছিল না। আলিপুর বোমার মামলার সূত্রে বারীন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের বৈপ্লবিক ব্যাপারে যে-প্রকার সরল নির্বোধের চেহারায় দেখা গেছে তাতে সেই দলভুক্ত ভূপেনের পক্ষে নিজে ব্যবস্থা ক'রে মুক্তির দিনই দেশত্যাগের জন্য বেরিয়ে পড়া কল্পনাতীত। পরামর্শদাতা হিসাবে হরিদাস হালদারের নাম ভূপেন্দ্রনাথ করেছেন—আমরাও নিবেদিতার চিঠিতে জনৈক হালদারের ইঙ্গিতময় উল্লেখ পেয়েছি, তিনিই ইনি কিনা জানি না। যাই হোক, অনুমান করতে পারি (অনুমান এখানে প্রমাণের প্রতিবেশী)—নিবেদিতাই ভূপেন্দ্রনাথের

১৪ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দ", ১১০।

এই সূত্রে জানাতে চাই, ভূপেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্বে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত শ্রীরণজিৎ সাহা আমাদের জানিয়েছেন, ভূপেন্দ্রনাথ (এবং মহেন্দ্রনাথ) তাঁদের কাছে বারবার বলেছেন যে, নিবেদিতাই তাঁর পলায়নের ব্যবস্থাদি করে গিয়েছিলেন।

বিদেশযাত্রার ব্যবস্থাদি করে গিয়েছিলেন, কেননা তিনি অবশ্যই জানতেন (জানবার বহু সূত্রই তাঁর ছিল) ভূপেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন্ নূতন মামলা অপেক্ষা করে আছে।

নিবেদিতা কিভাবে পিছন থেকে ভূপেন্দ্রনাথের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে সচেষ্ট ছিলেন, আমেরিকায় ভূপেন্দ্রের আশ্রয়, কাজকর্ম, শিক্ষার জন্য ব্যবস্থাদি করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ নিবেদিতার চিঠিতে আছে। ভূপেন্দ্রনাথের আত্মাভিমানকে সযত্নে রক্ষা ক'রে নিবেদিতাকে এই কাজ করতে হয়েছিল : মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রের অবুঝ বেয়াড়াপনায় বিরক্ত হলেও সেকাজ করে গেছেন—কেননা ভূপেন্দ্র যে স্বামীজীর ভাই—পাশ্চাত্যজগৎ ভূপেন্দ্রের জন্য যদি কিছু করতে পারে সেটা যৎসামান্য হলেও ঋণশোধ। ভূপেন্দ্রের দৃপ্ত পৌরুষ নিবেদিতার প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছিল।

২৩ অগস্ট ১৯০৮, সিস্টার ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে লিখেছিলেন : "ওসানস্ প্রোটেজে'র [ভূপেন্দ্রনাথের] সাহায্য প্রয়োজন। মিস ওয়াল্‌ডো-র উদ্দেশ্যে একটি চিঠি তার কাছে আছে, কিন্তু তিনি মনে হয় গ্রীষ্মকালের ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। ভূপেনের হাতে প্রায় কোনো টাকাই নেই। ওর মার কাছে তখন হাজার টাকা ছিল যেটার সুদের ব্যবস্থা করে তাঁকে দিয়েছিলাম, মাসখানেক কি মাস-দুই সেটা ভাঙানো যাবে না, তার পরে সে টাকা তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তুমি তো জানোই, সেটা ওর [ভুবনেশ্বরী দেবীর] পক্ষে কি পরিমাণ *আত্মত্যাগের ব্যাপার হবে। ওর [ভূপেন্দ্রের] গোড়ায় আশ্রয় চাই, তারপর সে নিজের ব্যবস্থা* করে নিতে পারবে মনে হয়। সেন্ট সারা [মিসেস বুল] তাকে আশ্রয় দেবেন বলে মনে হয়? মিস ওয়াল্‌ডো-রও কিছু করা উচিত। ওর ভাই [মহেন্দ্রনাথ] কিছু আগে তোমাকে লিখতে বলেছিল—সাহায্য জোগাড়ে উদ্যোগী হবার জন্য। আমি কিন্তু এর আগে লিখে উঠতে পারিনি।"

এই চিঠি মিস ম্যাকলাউডকে পাঠিয়ে দিয়ে নিবেদিতা তাঁকে ডাবলিন থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর লিখলেন :

"তোমার এবং ক্রিস্টিনের চিঠি গত রাত্রে এসে পৌঁছেছে। ক্রিস্টিনের চিঠি তোমাকে এইসঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্রিস্টিন যাকে *The Ocean's Protge* বলে উল্লেখ করেছে—তার বিষয়ে আমি তোমাকে লিখছি—সারাকে [মিসেস বুলকে] নয়—কারণ আমেরিকায় হাজির কোনো যুবকের সাহায্যের জন্য পারলে সারাকে অনুরোধ করব না। কিন্তু তাঁর [সারার] কাছে তোমার পক্ষে চাওয়ার কোনো বাধা নেই, যদি চাইতে ইচ্ছা করো। ভূপেন্দ্র এগারো মাস জেলে ছিল, সদ্‌ব্যবহারের জন্য একমাস আগে ছাড়া পেয়েছে। [এ-সংবাদ নূতন ; ভূপেন্দ্রনাথ নিজে এ-সংবাদ জানিয়েছেন বলে জানি না ; এই অগ্রিম মুক্তির জন্যই ভূপেন্দ্রের পক্ষে দেশত্যাগ সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়]। তার চরিত্র অপূর্ব। কিন্তু দেখেছি যে, স্বামীজীর বিরাট মনীষার কোনো চিহ্ন তার মধ্যে নেই। বিজ্ঞানের মানুষটি [ডাঃ বসু] এবং আমার ধারণা—যদি সে মিঃ লেগেট বা মিস্ রোয়েথলিস্‌বার্জার-এর কোনো একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে লেগে যায়, তার থেকে *গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে নেয়, সেইসঙ্গে ব্যবসা-পদ্ধতি শিখে নিতে পারে*—তাহলে উপযুক্ত হয়। কিন্তু তার চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকেই এসব কথা বলছি ; এবং এসব কথায় তুমি খুব বেশি গুরুত্ব দেবে না। যথার্থই চমৎকার মানুষ সে—তার হাসি

অনিবার্যভাবে তার বিরাট ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষোচিত, বীরোচিত তার আচরণ—জেলে গিয়েছিল নিছক অপরদের ঢেকে বাঁচাতে। 'সব দায়িত্ব আমার'—সে বলেছিল, অথচ অভিযুক্ত পত্রিকাটির সে সম্পাদকও নয়, মালিকও নয়। বিয়ের ব্যাপারে সে সর্বদা 'না' করেছে। স্বামীজী যখন তাকে এই ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখেছিলেন, তখন—'বাঃ মস্ত বড় মানুষ'—বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। যাইহোক, তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করার দরকার নেই। ক্রিস্টিনের চিঠি থেকেই দেখতে পাবে, মিস ওয়ালডোর ২৪৯ মনরো স্ট্রীট, ব্রুকলিন, এই ঠিকানা মারফত তার সন্ধান পাওয়া যাবে।"

৩ নভেম্বর, ১৯০৮, মিস ম্যাকলাউড-কে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে যেসব ইঙ্গিত আছে, তার থেকে মনে হয়, নিউইয়র্কের ইণ্ডিয়া হাউসে (যাতে অনেক সময় ভারতীয় বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া হত) ভূপেন্দ্রনাথের অবস্থানের কথা উঠেছিল। নিবেদিতা তা নাকচ করে দেন। তিনি আমেরিকার গ্রীনএকার থেকে লিখেছেন :

"যে-মিটিং-এর কথা তোমাকে বলেছিলাম, তা হয়েছে। খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু আমাদের কেউই যেন তার বিষয়ে ইঙ্গিতেও কথা না বলি। ওটা যেন হয়নি—এমনই মনে করতে হবে।... কিন্তু বুঝেছি যে ইণ্ডিয়া হাউসে থাকা অসম্ভব। আমার নিজের ইচ্ছা ভূপেন্দ্রনাথ যাতে নিজের ভরণপোষণের অর্ধাংশ নিজে রোজগার করে, তা দেখতে হবে—এটা তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। আর সে-কাজ করাতে হলে তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠাতে হবে, যেখানে রোজগার করা সহজতর এবং আবহাওয়া আরও ভালো। আমি আরও মনে করি, পড়াশোনার ব্যাপারে কেউ যেন তাকে সঠিক পথে স্থাপন করতে সাহায্য করে—সাংবাদিকতা শিক্ষায় সাহায্য করে। শুনেছি, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পোলিটিক্যাল সায়েন্স বলে একটি বিষয় পড়ানো হয়। সেই বিষয়টি, কিংবা ইতিহাস, কিংবা সমাজতত্ত্ব, কিংবা সবেরই কিছু কিছু অংশ—তার পক্ষে যথার্থ বস্তু হবে। কিন্তু এসব বিষয়ে তাকে উপদেশ দেবার আগে তার বিশ্বাস অর্জন ক'রে নিতে হবে—খুব কৌশলে, সাবধানতার সঙ্গে। আর যদি সে ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়, তাহলে সেখানে স্বামীজীর নামের সুযোগ না নেওয়াই পুরুষোচিত কাজ হবে ; অন্যরা যেভাবে নিজের চেষ্টায় সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেয়, তারও তাই করা উচিত, আর ইতিমধ্যেই যে-অর্থসাহায্য তাকে করা হয়েছে তাকে যেন মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্তা হিসাবে মিঃ ফেলপস্ একেবারে বুদ্ধিবিবেচনাহীন ; অসৎ নয়, কিন্তু নির্বোধ—সেই ধরনের নির্বোধ—যে আবার ক্ষমতাপ্রিয়।"[১৫]

১৫ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা" প্রথম ভাগ (বাং ১৩৩৩) পুস্তকে লিখেছেন, তিনি বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে ইউরোপ হয়ে আমেরিকার নিউইয়র্কে নেমেছিলেন। "নিউইয়র্কে পদার্পণ করিয়া ক্রমে ভারতীয় দলে মিশিলাম। তথাকার পরলোকগত মইরন এইচ ফেলপস্ স্থাপিত ইণ্ডিয়া হাউস-এ তাঁহাদের একটি আড্ডা ছিল। তথায় যাঁহারা অগ্রে আমেরিকায় আসিয়াছেন তাঁহারা আমরিকানত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং আমার মতো যাঁহারা নূতন আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা হইতেছে। যাঁহারা নূতন ইউরোপে বা আমেরিকায় পদার্পণ করেন তাঁহারা যদি দেশ হইতে পাশ্চাত্ত্য আদবকায়দা না শিখিয়া আসেন, তাহা হইলে সাধারণত তদ্দেশের লোকের সহিত মেশার অসুবিধা হয়, বিশেষত ইংরেজী ভাষার দেশে, কারণ তাহাদের দেশসম্বন্ধে ; আদবকায়দার ছড়াছড়ি।" [পৃ· ৮-৯]।

ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় শ্রমের মর্যাদার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। এ-বস্তু আমেরিকায় গিয়েই ভারতীয় ছাত্ররা শিখে নিত। "আমার সেই দেশে প্রবাসকালে যে দুই-একজন ছাত্র পাঠের জন্য বাড়ি হইতে টাকা পাইতেন, অথবা কোনোপ্রকার স্কলারশিপ পাইতেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বাবলম্বী ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধায় নতশির হইতেন।" [১১]।

"অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" (১৯৫৩) গ্রন্থের মুখবন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ মাইরন ফেলপস্-এর বিশেষ সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এই সূত্রে বিদেশে বিপ্লবী ছাত্রদের সম্বন্ধেও প্রশংসা করা হয়েছে :

"বৈপ্লবিকরা দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার রাজনীতিক দলের সহিত কার্য করিয়াছেন।... এই কার্যে বিদেশস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এইসকল ছাত্ররাই ভারতের স্বাধীনতাস্পৃহার প্রতীক হিসাবে বিদেশে কার্য করিয়াছেন। তাঁহারাই

১০ নভেম্বর, ১৯০৮, চিঠিতে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ভূপেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতার প্রয়োজনের বিষয়ে জোর দিয়ে লিখলেন :

"দত্তের বিষয়ে কিছু করতে পারছি না—করতে চাইছিও না। কিন্তু তার জন্য কোন্ উপদেশ সম্ভবত প্রয়োজন তা আমি পেয়ে গেছি—কিভাবে পেয়েছি তা চিঠিতে বলা যাবে না। নির্দেশ তোমাকে পাঠাচ্ছি, তুমি সুযোগ না আসা-পর্যন্ত ব্যবহার করবে না—আর যখনই করো অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে, নিজের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সে কাজ করবে। [উপদেশগুলি কী, তা আমরা জানবার সুযোগ পাইনি]। কি ভাবে এই ধরনের উপদেশ স্বচ্ছন্দে দিতে হয় তা তুমি জানো বলে, তদুপরি তোমার সঙ্গে পূর্বাহ্নেই কথাবার্তা বলা আছে বলে, আমি এটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেন্ট সারাকে নয়—যিনি হয়ত তার চুলের মুঠি ধরে—হয় এই-পথ নিতে, না-হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ নিতে তাকে বাধ্য করবে—আমার কথাসূত্রে যখন যেরকম খেয়াল তাঁর মাথায় চাপবে তদনুযায়ী তিনি করবেন। দত্ত অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর চরিত্র—নচেৎ তার কর্মজীবন নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকত না। সে যাই হোক, জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তার আছে, আর তাকে জানতে হবে, বস্তুর মধ্যে 'ঝুটা' অংশ কোথায়। এক্ষেত্রে কোনো-কোনো জিনিস তুমি তাকে ধরিয়ে দেবে। এর চেয়ে সদুপায়ের কথা জানি না। মনে হয়, এসবই তুমি বুঝবে। কত কি আছে যাদের বিষয়ে চিঠিপত্রে আলোচনা করা যায় না—চিঠি খুলে পড়া হবে, এই ভেবে একথা বলছি না—কাগজপত্রে ওসব কথা লেখা প্রাজ্ঞোচিত হবে না। আমি অবশ্য চাই না যে, তুমি *উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তবে তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো সময়ে দেখা* হবেই। এই সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কিছু চিন্তা তোমার মনে থাকলে ঐকালে সেসব দরকারী বোধ হবে।"

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯, চিঠিতে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের কাছে ব্যগ্রভাবে ভূপেন্দ্রনাথকে সাহায্যের প্রসঙ্গটি তুললেন :

"আমি গোপনে তোমাকে 'কালী' [দি মাদার] বই থেকে প্রাপ্ত একটি চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটি স্বামীজীর ভাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হোক, তাই চাই। তুমি জানো আমি তাকে লিখতে পারি না। যখন আমি ভাবি যে, স্বামীজীর লোকেরা আমার ভাইয়ের জন্য কি করেছেন, তখন তাঁর রক্তের ভাইয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়া নিশ্চিত উচিতকার্য মনে করি।" ['স্বামীজীর লোক' বলতে নিবেদিতা এখানে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতির ইঙ্গিত করেছেন, যাঁরা নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ডকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন]।

বৈদেশিকদের বুঝাইয়াছেন, ভারতে 'জুলুমশাহী' ইংরাজশাসনের স্বরূপ কি, এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন কেন? তাঁহারাই ইংলণ্ডের হাইণ্ডম্যান, ফ্রান্সের জয়রে, এবং লংগে, জার্মানীতে অধ্যাপক রুডলফ্ অটো, আমেরিকার রেভারেণ্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড এবং মাইরন ফেল্পস্, জর্জ ফ্রিম্যান প্রভৃতি নানা দেশের বড়-বড় মনীষীদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। মাইরন ফেল্পস্ নিউইয়র্কে 'ইণ্ডিয়া হাউস' স্থাপন করেন। *রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন লণ্ডনের বক্তৃতায় ভারতে ইংরাজ* শাসনের প্রশংসা করেন তখন তিনি (মাইরন ফেল্পস্) বহু খ্যাতনামা লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ইনি অবশেষে গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভারতে আগমন করেন এবং সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভারতের মাটিতেই দেহরক্ষা করেন।"

ফেল্পস্ আমেরিকায় স্বামীজীকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐর পরিচয়ও হয়েছিল, এবং শান্তিনিকেতনের বিষয়ে উদ্যোগী লেখক ছিলেন। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় *ঐর সম্বন্ধে লেখা বেরিয়েছে।*

এখানে স্মরণ করিয়ে দেব—পরাধীন অবস্থায় যে-কোনো বিদেশীয় সমর্থনকে ভারতবর্ষ বহু মান দিত এবং ভারতীয় কাগজে তাদের বিস্তারিত বিবরণ বেরুত, কিন্তু ভিতরকার কথা সবসময়ে জানা থাকত না।

ভূপেন্দ্রের মর্যাদারক্ষার জন্য নিবেদিতার উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। একই চিঠিতে লিখলেন : "ভূপেনের বই, জামাকাপড়, ট্রামভাড়া ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন—এবং ওসব যাতে তাকে চাইতে না হয়, তার থেকে [অর্থাৎ সেই গ্লানি থেকে] সম্ভব হলে নিশ্চয় তাকে অব্যাহতি দিতে হবে।"

এর পরে নিবেদিতা পুনশ্চ ভূপেন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রসঙ্গ তুললেন :

"আমি চাই, সে ইতিহাস পড়ুক এবং পাশাপাশি যদি সে চায়—সাংবাদিকতার জন্য তৈরী হোক। একটির শিক্ষা অন্যটিকে সাহায্য করবে। আমি এই কল্পনা না করে পারি না—ভারতবর্ষের যে-বিরাট ইতিহাস লিখিত হবার অপেক্ষায় আমরা আছি, তা রচনার সামর্থ্যযুক্ত মানুষ ঐ পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক সংস্কৃতিবোধ তাকে অর্জন করতে হবে, যার সম্বন্ধে এখনো পর্যন্ত সে সচেতন কিনা সন্দেহ। বই, মিউজিয়ম, শিল্পনিদর্শন, এবং শেষত ঐতিহাসিক স্থানসমূহের দর্শন—এ সকলই ভূপেনের শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হোক।"

৬ এপ্রিল, ১৯১০, একই জনকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথের সম্ভাবনার বিষয়ে খুবই প্রশংসা করেছেন :

"তাঁর [স্বামীজীর] ভাই ডিগ্রি পাবার জন্য ইচ্ছুক নয়, একথা ভাবতেই পারছি না। ওর [ভূপেন্দ্রের] আবেগ এবং কল্পনাশক্তি, দুইই আছে। এখানে [ভারতবর্ষে] বর্তমানে যে-বিশেষ মননগত প্রয়োজন রয়েছে, তার দিক দিয়ে ঐ দুটি গুণ মূল্যবান অথচ বিরল। ভবিষ্যৎ ব্যাপারটা সর্বদাই সমস্যা ও সুযোগের অধীন—কিন্তু আমার ধারণা, কোনো-কোনো দিক দিয়ে ওর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ এবং আশাপ্রদ।"

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১২ মে, ১৯০২, চিঠি থেকে দেখা যায়, মিসেস বুল ভূপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে উৎসুক, আর সে ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন সিস্টার ক্রিস্টিন, যিনি ভূপেন্দ্রনাথকে খুবই পছন্দ করেন।

মিসেস বুলের শেষ অসুখের কালে জরুরী আহ্বান পেয়ে নিবেদিতা ১৯১০-এর শেষ ও ১৯১১-এর গোড়ার দিকে কিছু সময় আমেরিকায় ছিলেন, তখন ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়। এই পর্বে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯১০, চিঠিতে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে পুনশ্চ লিখেছেন, তিনি স্বামীজীর ভাইকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, এবং সে-কাজ করতে পেরেছেন। ২৮ ডিসেম্বর একই জনকে চিঠিতে বিস্তারিতভাবে ভূপেন্দ্রনাথের কথা বলেছেন, যার মধ্য থেকে ভূপেন্দ্রের চমৎকার চরিত্রছবি পেয়ে যাই, এবং নিবেদিতার আত্ম-প্রক্ষেপও :

"বেচারা ভূপেন গত রাত্রে এখানে [ব্রুকলিন] এসেছিল। বড়দিনের সময়ে ক্রিস্টিনের দেখা না পাওয়ার দুঃখকথা খুবই আবেগের সঙ্গে বলছিল। কোনো-কোনো দিক দিয়ে কী সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার ভিতরে বস্তু ঢেলে দিতে কী-যে চেয়েছিলাম কি বলব, কেননা এখন সে প্রস্তুত যন্ত্র। কিন্তু আহাম্মকি ও যুক্তিতর্কে সময় বা শক্তি ব্যয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর এখানে এমন কেউ ছিল না যে-ব্যক্তি তার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এই কথাগুলি বলবে : 'শোনো, তোমাকে ইনি সত্য দিতে পারেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করো।' আমার সম্বন্ধে অপরের কাছে ঐ ধরনের কাজ অতীতে সদানন্দ করেছেন ; স্বামীজীর সম্বন্ধে আমার ক্ষেত্রে সে-কাজ তুমি করেছ। যিনি তোমাকে সত্যই কিছু দিতে পারেন তাঁকে বাজে বকবকানির ধাক্কা দিতে পারো না, বা সে ধাক্কা খেতেও পারো না। সত্য কখনো আহাম্মকিকে নিজের সমকক্ষ বলে গ্রহণ করতে, বা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা

করতে পারে না।

"হয়ত তুমি ভাবছ, কি আত্মম্ভরিতা—যেন কেবল আমারই আছে সত্যে অধিকার! একদিক দিয়ে কিন্তু কথাটা ঠিক। স্বামীজী, সূত্রের এক প্রান্ত আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি তার অনুসরণে অগ্রসর হতে চেয়েছি। দু' বছর আগে ভূপেনের সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার মধ্যে কাব্য ও কল্পনার সম্ভাবনা দেখেছিলাম। তারপর থেকে সে উৎসাহের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আর আজ তার মন কর্ষিত ক্ষেত্রের মতো। কিন্তু তাতে বীজ বপন করতে হবে। অথচ সে সত্য-বস্তুর সঙ্গে নানা প্রকারের অস্থায়ী বস্তুর পার্থক্য বোঝে না। মানসিক শৃঙ্খলাবোধ ও তৎপরতা দানেই কেবল অস্থায়ী বস্তুগুলির মূল্য।... সেন্ট সারা ক্রীসমাস-দিনে ভূপেন ও সুবোধকে দেখেছেন; ওরা আমার কাছে কতখানি মধুর, তাও অনুভব করেছেন। শায়িত অবস্থাতেই [মিসেস বুল তখন শয্যাশায়ী] তিনি বললেন, 'অনপনেয় ওদের মাধুর্য।'... তাই ভূপেন সম্বন্ধে যখন ডাঃ কোলটার-এর বার্তা এল, তখন তিনি তাতে সুখী হলেন। সিরি-র কাছে ভূপেন সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তা বললাম—ভারতীয় নারী-শিক্ষার বিষয়ে উচ্চাভিলাষ ভূপেনের আছে, আর এই তরুণী নারীকে এ-ব্যাপারে সহকারিতার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে। এই সংবাদ সারাকে আনন্দিত করল। সারা বললেন, 'মার্গট! ভারতীয় নারীর জন্য ভূপেনের কাজ করার ইচ্ছা আছে এবং সে-ব্যাপারে তোমার সাহায্য থাকবে—এরই ভিত্তিতে আমি ভূপেনের জন্য কিছু করতে আগ্রহী।'... আমি উত্তরে বললাম, 'হাঁ সেন্ট সারা, ঠিক, তবে তার মতো স্বভাবের মানুষের কাছে শর্তারোপ ক'রে কোনো কিছু প্রস্তাব করলে ফল হবে না। সেক্ষেত্রে সে বিদ্রোহ করবে।' 'সে কথা অবশ্যই ঠিক', সারা আন্তরিকভাবে বললেন, 'আমি পৃথিবী উল্টে গেলেও শর্তের কথা তুলব না। তবে আমি তাকে সাহায্য করতে চাই এই ভিত্তিতে—'...

"আমি ভূপেনকে সত্যই সাহায্য করতে চাই। অনুভব করি, স্বামীজী আমাকে যা দিয়েছেন, সে তা পাবার যোগ্য। কিন্তু আমি তাকে স্বাধীনভাবে জয় করতে চাই—তার অন্তর্নিহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয়।... ইচ্ছা হয়, ভূপেনকে ডেকে পাঠিয়ে অনুনয় করে বলি, সে যেন আমাকে [স্বামীজীর কাছ থেকে] প্রাপ্ত ভাব অনুযায়ী গ্রহণ করে।... অদ্ভুত লাগে যখন দেখি—এইসব ছোকরারা বুঝতে পারে না যে, পাঠানুশীলনের সুবিধা এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে অথরিটি হিসাবে খ্যাতিসহ আমি হয়ত ওদের তুলনায় ভারতীয় বিষয়সমূহ আরও ভালোভাবে জানি, যার জন্য আমার মতামত অন্যের সমমূল্য নয়। ওরা না বুঝলেও কথাটা সত্য। মিঃ র‍্যাটক্লিফ বা খোকার [জগদীশচন্দ্রের] মতো মানুষেরা যে-প্রকার তৎপর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনে গেছে—তার দ্বারা সত্য [আমার ভিতর থেকে] প্রবাহিত হয়ে অজস্রভাবে [অন্যের] মনের উপর ঝরে পড়েছে। তারা এই কাজ ক'রে আমার মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, ভূপেনের সম্ভাবনা প্রচুর, আর—অবশ্যই সে অতীব প্রিয়।"

নিবেদিতার বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ একাধিকবার লিখেছেন। তার বেশ কিছু অংশ, যথা, ক্রপটকিন, ওকাকুরা প্রভৃতির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ককথা ইতিমধ্যে উৎকলিত হয়েছে। অতিরিক্ত এই পেয়েছি:

"ভারতে নিবেদিতার কাজকর্ম ও বক্তৃতা বৃটিশ-ভারতের পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক করে। একবার তো বাংলা সরকারের কুখ্যাত অফিসার মিঃ কার্লাইল স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ডের ফেনিয়ান দলভুক্ত কিনা?"[১৬]

১৬ ভূপেন্দ্রনাথ, 'স্বামী বিবেকানন্দ', ১১৫।

১৯০৭ সালে জেলে যাবার আগে ভূপেন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে তাঁর অনুপস্থিতিকালে তাঁর মাকে দেখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। নিবেদিতা সে অনুরোধ রক্ষা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ সানন্দে এই সংবাদ জানিয়েছেন।[১৭]

১৯০৯ সালে নিউইয়র্কে তাঁদের দেখা হলে নিবেদিতা কথাবার্তার সময়ে অরবিন্দ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ফাঁসির দড়ি পশ্চাদ্ধাবন করলেও অরবিন্দ তার ভয়ে ভীত নন।"[১৮] অরবিন্দকে কেন নিবেদিতা বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেকথাও ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন। [সে প্রসঙ্গ পরে আসবে]।

"এই সময়েই [ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন] নিবেদিতা এবং অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, যিনি তখন বস্টনে ছিলেন,আমার জন্য আমার শিক্ষাপীঠ নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে আণ্ডার গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে কোন্ পাঠ্যধারা গ্রহণ করব, তা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।"[১৯]

১৯১১ সালে আমেরিকায় নিবেদিতার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কিছু কথাও ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন। তার মধ্যে তিক্ত কৌতুকের ঘটনাও আছে। ঐ কালে সিস্টার ক্রিস্টিন নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে ভারতের জন্য যাত্রা করেছিলেন—তাঁকে জাহাজঘাটায় বিদায় দিয়ে নিবেদিতাদির সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ যখন ফিরছিলেন, তখন একটি ট্যাক্সিকে দ্রুত তাঁদের দিকে আসতে দেখে এক ভারতীয় সঙ্গী উত্তেজিতভাবে ভূপেন্দ্রনাথকে ফুটপাতে উঠে পড়তে বলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, আরে ভয় নেই, এটা আমেরিকা, এখানে জীবন ভারতের মতো সস্তা নয়। সেকথা শুনে নিবেদিতাহাসতে-হাসতে বলেন, একথা ঠিক। তারপর নিবেদিতা বাগবাজারের রাস্তায় খ্যাপা ষাঁড় তেড়ে এলে কিভাবে জনৈক বাঙালী সাহিত্যিক [দীনেশচন্দ্র সেন] সকলকে ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন, সে কথা বর্ণনা করার পরে বলেন, আনন্দের কথা, ভূপেন্দ্রনাথ ঐ আচরণ করেননি।[২০]

এই পর্বে নিবেদিতা পুনশ্চ ভূপেন্দ্রনাথকে "বারংবার ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বলেন,কারণ [ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন] ইতিহাস-জ্ঞান হচ্ছে আমাদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য।"[২১]

বৈপ্লবিক রাজনীতির গন্ধযুক্ত কিছুকিছু কথাবার্তার বিবরণও এই পর্বসূত্রে ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, যার অংশবিশেষ জানি না কেন তিনি পেট্রিয়ট-প্রফেট গ্রন্থের বাংলা সংস্করণে বাদ দিয়েছেন, যে-বাংলা সংস্করণে তিনি অহেতুক উত্তেজনায়, বলা উচিত অন্যের প্ররোচনায়, নিবেদিতার বৈপ্লবিক সংস্রবের বিষয়ে ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তেমন পরিত্যক্ত এক অংশ এই :

"ব্রুকলিনে ১৯১১ সালে যখন তিনি তাঁর একটি প্রিয় থিয়োরী বর্তমান লেখককে শোনাচ্ছিলেন—অ্যাসিরিয়ার রাজা আসুর-বান-ই-পাল হলেন পুরাণ-কথিত বাণাসুর—তখন তাঁর সেই অনুমানকে গলাধঃকরণ করতে না পারায় বর্তমান লেখককে তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলেন : 'ভূপেন যখন আমি ফাঁসি যাব, তার পরেই তুমি আমার কথা মানবে।' তাতে তাঁকে চোখা উত্তর দিলাম : 'আপনাকে কদাপি ফাঁসিতে ঝুলতে হবে না।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' লেখক বললেন, 'আপনার চামড়ার রঙই আপনাকে বাঁচাবে।' তিনি সদুঃখে বললেন, 'সে কথা সত্য'। কথা আর অগ্রসর হয়নি।"[২২]

১৭ পেট্রিয়ট প্রফেট, ১২০।
১৮ ঐ, ১২০।
১৯ ঐ, ১২০।
২০ ঐ, ১১৯।
২১ ঐ, ১২০।
২২ ঐ, ১১৮।

অনেকখানি কথা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। নিবেদিতা হঠাৎ নিজের ফাঁসির কথা তুললেন কেন? তা কি নিছক কথার কথা? লক্ষণীয়, ভূপেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করবার সময়ে, নিবেদিতা ফাঁসিতে যাবার মতো কাজ করেননি, একথা বলেননি। নিবেদিতা সে-কাজ করলেও, ভূপেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, ইংরাজ হিসাবে তাঁর ভারতে ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি এই সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত নিবেদিতার এইকালের পত্রের বক্তব্যগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যার মধ্যে তিনি নিজের দীর্ঘসময় জেলে যাবার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাঁর ছদ্মবেশে যাতায়াতের, বা ফরাসি চন্দননগরে আশ্রয় সন্ধানের অভিপ্রায়ের কথাও স্মরণযোগ্য।

পূর্বোক্ত কথাগুলির সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ আরও কিছু বলেছিলেন, যার তাৎপর্য অনুধাবনের যোগ্য :

"এই সময়ে নিবেদিতা লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের আন্দোলন কেমন চলছে?' লেখক উত্তরে বলেন, 'আমি আপনাকে আপনারই কথা স্মরণ করিয়ে দেব। আপনি পার্টিকে অনুরোধ করেছিলেন—গুপ্ত বিপ্লবের কথা আপনাকে যেন কেউ না বলেন।'"

ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, স্বামী সদানন্দ জাপান থেকে ফেরার পরেই 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার পক্ষে তাঁকে ইন্টারভিউ করার জন্য দেবব্রত বসু যখন নিবেদিতার বাড়িতে যান, তখন নিবেদিতা ঐ কথা বলেছিলেন।[২৩]

ভূপেন্দ্রনাথ যে-বিবরণ দিয়েছেন তার সত্যতা আপাতত স্বীকার ক'রে,নিবেদিতার ঐ কথা বলার তাৎপর্য বুঝে নেবার চেষ্টা করা উচিত। নিবেদিতা বৈপ্লবিক ব্যাপার নিয়ে কথা চালাচালি করাকে নিরতিশয় বিপজ্জনক মনে করতেন। তাছাড়া বারীন্দ্রগোষ্ঠীর খোলা মাঠের গুপ্ত বিপ্লব-চেষ্টার মধ্যে নিরতিশয় সরলতা ছিল, তাও জানতেন। নিবেদিতা তাঁর বৈপ্লবিক চেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে, কিংবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর উচ্চমহলে আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) এই প্রসঙ্গে আমাদের কী বলেছেন, তা আগেই জানিয়েছি। নিবেদিতা যদি ভূপেন্দ্রনাথকে তাঁদের আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে থাকেন—তা করেছেন আমেরিকাতে, এবং ভূপেন্দ্রনাথের যে অবিলম্বে দেশে ফিরে কাজ করার সম্ভাবনা নেই, তা বুঝেই। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ নিবেদিতার বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরেই ঐ মন্তব্য করেছেন।

অথচ এইকালেই ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবীর সঙ্গে বিপ্লবীর আদানপ্রদানের ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতাও দেখিয়েছেন :

"এই সময়ে একদিন নিবেদিতা এবং আমি মিস ফিলিপস্-এর বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ভোজনান্তে কথাবার্তার সময়ে নিবেদিতা বললেন, 'ভূপেন আমি তোমাকে উৎসর্গীকৃত বলে মনে করি। তুমি বিয়ে করো না।' 'ফাঁসির দড়ি অরবিন্দের পশ্চাদ্ধাবন করছে', এবং 'ভূপেন, তুমি উৎসর্গীকৃত'—তাঁর এই কথাগুলির গূঢ় তাৎপর্য কেবল বিপ্লবীরাই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ। এ হল একজন বিপ্লবীর উদ্দেশ্যে আর এক বিপ্লবীর উক্তি। এর তাৎপর্য আমরা উভয়েই জানতাম।"[২৪]

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বিদেশিনী নিবেদিতার কথা বলবার সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ অনেকখানি জায়গা নিয়ে আমেরিকায় নির্বাসিত বৃদ্ধ আইরিশ বিপ্লবী জর্জ ফ্রিম্যানের কথা বলেছেন। এঁর কথা

২৩ ঐ, ১১৮।
২৪ ঐ, ১২০-২১।

আগেই বলেছি। ভূপেন্দ্রনাথের মুখে ফ্রিম্যানের কথা শুনে নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে আলাপে আগ্রহী হন। পরবর্তী ঘটনা এই :

"নিবেদিতা [ফ্রিম্যানের] সংবাদ মিসেস বুলকে জানালেন। মিসেস বুল তখন ব্রুকলিনে মিসেস ই সোয়ানানডার-এর বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী। তিনি এক রবিবারে নৈশভোজে উপস্থিত থাকার জন্য ফ্রিম্যানের কাছে আমন্ত্রণ পাঠালেন। এইভাবে ওঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে শুনে আমি ভগিনী নিবেদিতাকে চিঠিতে লিখে পাঠালুম—ফ্রিম্যান অ্যাংলো-স্যাকসন ও ইহুদী-বিষয়ক সবকিছুকে দারুণ ঘৃণা করেন, সুতরাং মিসেস বুল যেন কথাবার্তার সময়ে একটু সতর্ক থাকেন। পরে নিবেদিতা বর্তমান লেখককে বলেন, এই সময়োচিত সাবধানবাণীর জন্য মিসেস বুল ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

"নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে ফ্রিম্যান তাঁকে বলেন—এখন যদিও তিনি ভারতের বন্ধু কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি যে-সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাকে ভারতে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু সিয়েরা লিয়ন পর্যন্ত গিয়েই তাঁদের বাহিনীকে থেমে পড়তে হয়, আরও এগোবার আদেশ আসেনি ; তার ফলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুর্ভাগ্য থেকে তাঁকে অব্যাহতি পেতে হয়েছিল।"

নিবেদিতার সঙ্গে ফ্রিম্যানের কথাবার্তার আর কোনো বিবরণ ভূপেন্দ্রনাথ দেননি। গুরুতর কোনো আদানপ্রদান হয়ে থাকলে নিবেদিতা সেকথা ভূপেন্দ্রনাথকে না জানাতেই পারেন। তবে বিশেষ-বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ফ্রিম্যানের দারুণ বিতৃষ্ণা বা আক্রোশ নিয়ে উভয়ের হাস্যপরিহাসের কথা পেয়েছি।[২৫]

ভূপেন্দ্রনাথ ফ্রিম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। ১৯২২ সালে বার্লিনে অবস্থানকালেও তিনি ফ্রিম্যানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে এক আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে তিনি ফ্রিম্যানের মৃত্যুসংবাদ পড়েন। তিনি ঐ সংবাদ থেকে জেনেছিলেন যে, ফ্রিম্যান ওঁর প্রকৃত নাম নয়, নিবেদিতার মতোই তিনি প্রোটেস্টান্ট-বংশোদ্ভূত। জিরালডিন্ বংশের সন্তান তিনি—যে-বংশের প্রধান এক মানুষ লর্ড ফিটজিরাল্ড তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে বিদ্রোহ করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, নিবেদিতারা স্কট-ইংলিশ হয়েও আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থিতির জন্য যেভাবে নিজেদের আইরিশ বিবেচনা ক'রে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন—ফ্রিম্যানও সেই ভূমিকা নিয়েছিলেন। "আয়ারল্যাণ্ডে বসতি স্থাপনকারী এইসব ইংরাজরা আইরিশদের অপেক্ষাও আইরিশ। ফ্রিম্যানের জন্মও ইংলণ্ডে।...সিস্টার নিবেদিতাও একই আলস্টার-গোষ্ঠীর সন্তান।"[২৬]

ভূপেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন :

"অ্যাংলো-স্যাক্সন বংশোদ্ভূত হয়েও তাঁরা [নিবেদিতা ও ফ্রিম্যান] স্বদেশের [অর্থাৎ যে-দেশকে

২৫ ফ্রিম্যান প্রচণ্ডভাবে পাশ্চাত্ত্যবিরোধী, অসহায় প্রাচ্যবাসীর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যের বিকট অন্যায়ের চেহারা তিনি দেখেছেন। ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর আগ্নেয় ক্রোধের চেহারা দেখে ভূপেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেন, তাহলে আপনার শরীরে কিছু কালো রক্ত আছে। ফ্রিম্যান বলেন, 'অবশ্য, অবশ্য, আমার পিতামহী আন্দালাউসীয় মহিলা, আমার পিতামহ ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীনে পেনিনসুলার যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার সময়ে তাঁকে বিয়ে করেন। এই শুনে ভূপেন্দ্রনাথ বলেন, সে ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে সেমেটিক রক্ত আছে। ফ্রিম্যান তা উড়িয়ে দেবার জন্য বলেন, 'আরে না না, ও হল পারসিক রক্ত, কেন না মুর রাজত্বের সময়ে অনেক পারসিক আন্দালাউসিয়াতে বসতি করেছিল।' এই ঘটনা নিবেদিতার কাছে সকৌতুকে বর্ণনা ক'রে ভূপেন্দ্রনাথ বলেন, 'ফ্রিম্যান যেহেতু ইহুদী-বিরোধী, তাই তাঁর পিতামহীর মধ্য দিয়েও কোনো সেমেটিক রক্ত নিজের মধ্যে ঢুকতে দেবেন না ; তাই পিতামহীকে তিনি পারসিক করেছেন যাতে নিজের আর্যরক্তকে বিশুদ্ধ রাখতে পারেন।' শুনে নিবেদিতা হেসে ওঠেন, এবং ভূপেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মেনে নেন।

২৬ পেট্রিয়ট প্রফেট, ১২৩।

নিজ দেশ বলে গ্রহণ করেছেন তার] স্বার্থকেই ধর্ম ও বংশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পরে আমি 'গেলিক আমেরিকান' সংবাদপত্রে লিখেছিলাম—কি করে আয়ারল্যাণ্ডের একটি মেয়ে অন্য দেশ ও অন্য জাতির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তার দ্বারা আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষেই তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।"[২৭]

নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথের সর্বমোট সিদ্ধান্ত:

"ভারতীয় জনগণের উন্নয়নে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী জাগৃতি তাঁর কাছে বিরাটভাবে ঋণী।"[২৮]

২৭ ঐ, ১২৩। এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' ১১৮।
২৮ ঐ, ১২১। এবং ঐ, ১১৬।

ভূপেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষিত ধারাতে চলেছিল কিনা বলতে পারব না; এইটুকু বলতে পারি, ভূপেন্দ্রনাথ হারিয়ে যাননি। ইতিহাসচর্চা তিনি যথেষ্টই করেছিলেন, তবে প্রচলিত ধারায় নয়। সমাজবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানই তাঁর বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল—সেসব সম্পর্কে দেশ-বিদেশে নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ বেরিয়েছে—গ্রন্থও বেরিয়েছে। জার্মানীতে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের উপরে গবেষণা ক'রে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি পান। ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের উপরে তাঁর রচনা ও গ্রন্থ এবং বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থ বহু সমাদৃত।

পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে ভূপেন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ত্যাগ করেন নি। সমাজতন্ত্রে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন, এবং বিদেশেই মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা বলে স্বীকৃত হন। ভূপেন্দ্রনাথের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রকাশক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে জানতে পারি, তিনি আমেরিকায় ব্রঙ্কস্পার্ক (Bronxpark) সোস্যালিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন; প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত বার্লিন কমিটির পক্ষে ইউরোপের নানা স্থানে বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই পর্বের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কিছু বিবরণ তিনি 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থের ১৯৫৩ সংস্করণে দিয়েছেন। কর্মাদর্শ নিয়ে তাঁর সঙ্গে লেনিনের মতবিনিময় হয়েছে। ভারতে ফেরার পরে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন; এদেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রবর্তনে তাঁর বিরাট প্রেরণা ছিল; দু'বার নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণও করেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের সক্রিয় জীবনের কর্মতালিকা যথেষ্ট, তথাপি তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট দাগ রাখতে পারেন নি। তাঁর দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য—তিনি এমনই আদর্শবাদী ছিলেন যে, অন্য ব্যক্তি বা জাতির ভাবধারা সম্বন্ধে মন খোলা রেখেও মাথা নত করতে পারেন নি। তার ফলে বিপ্লবের ইতিহাসেও তাঁর নাম বড় অক্ষরে লেখা নেই, কিংবা ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসেও নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর জাতীয় বিপ্লবনীতি তাঁকে রাশিয়ার তাঁবেদার হতে বাধা দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার সন্ধানে বিদেশে গিয়ে সেখান থেকে পরাধীনতা কিনে আনার ইচ্ছা তাঁর হয়নি। আসল কথা, এই ব্যক্তিত্ববাদী মানুষটির রক্তে বিবেকানন্দ বর্তমান ছিলেন, নিবেদিতার আদর্শে তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন—অথচ সে-বস্তুকে আত্মমর্যাদার অভিমানে অগ্রাহ্য করার দুশ্চেষ্টায় কেবলই নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও আনুষঙ্গিক অসংলগ্নতা জমিয়ে তুলেছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথকে উপযুক্ত কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত-শিষ্যগণ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিদ্যালয়ে ভূপেন্দ্রকে চাকরি দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের মতো ছাপমারা বিপ্লবীকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে অসামর্থ্য জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরুপায় দুঃখের সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে নিম্নের চিঠি লেখেন:

508 W. High Street
Urbana, Illinois
17 Dec. 1912

My dear Miss MacLeod,

It is very difficult for me to make any suggestion as to what opening there could be for Mr. Bhupen Dutt. I have a boarding school in Bengal where I employed as a teacher a man prosecuted for seditious writings and who was on the verge of starvation with his whole family. It nearly wrecked my institution. I had to remove him, making some other provision for his livelihood. I reallydo not see any possible position for Mr. Bhupen Dutt in India, and the best thing he could do would be to accept some professorship in this country [i. e., in America] and wait till the present mood of the Indian Government undergoes a complete change.

With kind regards,
Yours sincerely,
Rabindranath Tagore

এই পত্রের জেরক্স কপি আমেরিকা থেকে আমাকে পাঠিয়েছেন স্বামী চেতনানন্দ।
এ সম্পর্কে আরও তথ্য আছে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে, ৩৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায়।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতা ও বিপ্লবী ত্রিমূলাচার্য এবং তাঁর 'বালভারত' পত্রিকা

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ব্যক্ত বা গুপ্ত, সকল বিবরণীতেই দেখা যায়—মাদ্রাজে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। তারই মধ্যে যেটুকু চরমপন্থী উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল তার মূলে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রবল প্রভাব। গুরুত্বযুক্ত প্রায় সকল বিপ্লব-কর্মীই বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে (১৯৫৩) জনৈক ত্রিমূলাচার্যের [পুরো নাম, 'মাণ্ডেয়ম্ প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ ত্রিমূল আচারিয়া'] বিষয়ে বহুল উল্লেখ করেছেন, যিনি "স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের [ইনি স্বামীজীর শিষ্য আল্যাসিঙ্গা পেরুমলের ভগিনীপতি] আত্মীয়।" এই ত্রিমূলাচার্য যৌবনের প্রারম্ভে লণ্ডনে যান—সাভারকরের সহকর্মীরূপে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মদনলাল ধিংড়া প্রভৃতির সঙ্গে কিছুকাল লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে বাস করেন, ধিংড়া কার্জন উইলিকে হত্যা করলে গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে যান প্যারিসে, তারপর বহু বৎসর ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে বিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবী-রূপে সক্রিয় থাকেন। ভূপেন্দ্রনাথ এঁর বৈপ্লবিক কার্যাবলীর অনেক সংবাদ দিয়েছেন। চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর "রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী" (১৯৭৩) গ্রন্থেও এঁর বহুবিধ কার্য-কথা বলেছেন, যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল—১৯২০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে দু'জন ভারতীয় প্রতিনিধির অন্যতমরূপে [অপরজন অবনীনাথ মুখার্জী] এঁর যোগদান, এবং ১৯২১ সালে তাসখন্দে স্থাপিত ভারতীয়দের কমিউনিস্ট পার্টিতে এঁর সভাপতিত্ব।[২৯]

এই ত্রিমূলাচার্যের বিষয়ে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয় : মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত তামিল পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া'-তে ২৩ ও ২৭ মে এবং ২৭ জুন ১৯০৮ তারিখে প্রকাশিত রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধের জন্য তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের জেল হয় (১৩ নভেম্বর, ১৯০৮) তখন ইণ্ডিয়া প্রেস পণ্ডিচেরীতে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে 'ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হতে থাকে, যাতে রাজদ্রোহের সুর আরও চড়া ছিল। "তার একজন কর্মচারী এম পি তিরুমল আচার্য। এই যুবকটি ১৯০৮ সালে পণ্ডিচেরী ছেড়ে ইউরোপে চলে যান, কিছুসময় লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে থাকেন। ১৯০৯ সালে তিনি পণ্ডিচেরীর ইণ্ডিয়া পত্রিকার এক কর্মচারীকে এক চিঠিতে লেখেন—পণ্ডিচেরীতে থেকে তাঁরা যদি উপযুক্ত কাজ করতে সাহস না করেন তাহলে তাঁদের পক্ষে পরবর্তী উত্তম কাজ হবে কোনো নিরাপদ উপযুক্ত জায়গায় সরে গিয়ে পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা। তিনি [তিরুমল আচার্য] আশা করেন যে, সে-ধরনের কাজ ওঁরা শীঘ্রই করতে পারবেন।"[৩০]

ইণ্ডিয়া কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একজন চরমপন্থী ত্রিমূলাচার্যের কথা আমরা

২৯ সেহানবীশ জানিয়েছেন, তাসখন্দের এই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপনের পটভূমিকায় ছিল সোভিয়েত সরকারের হস্তক্ষেপ। তাসখন্দে ভারতীয়রা মিলিটারী স্কুল স্থাপন করলে ইংরেজ সরকার হুমকি দিয়ে বলে যে, ওটা ভেঙে না দিলে তাঁরা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্থাপন করবেন না, অথচ তখন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল ঐ চুক্তি। তাই তাঁরা ভারতীয়দের মিলিটারী স্কুল ভেঙে দিয়ে উপযুক্ত ছাত্রদের মস্কোয় পাঠিয়েছিলেন শ্রমজীবীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও তাসখন্দে গঠিত হয়ে যায়। [১৬৩-৬৯]

অত্যন্ত সুখের বিষয়, এই ধরনের বিচক্ষণতা সোভিয়েত সরকার পরেও দেখিয়েছেন—হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ক'রে এবং 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর শত্রু' সুভাষচন্দ্র বসুকে ঐকালে (১৯৪১) রাশিয়ায় অবস্থান ক'রে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপ করতে না দিয়ে !!

৩০ সিডিশন কমিটি রিপোর্ট, ১৬৪।

জেনেছি—তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত ভক্ত, এবং নিবেদিতার দ্বারা সবিশেষ অনুপ্রাণিত। এই ব্যক্তিও আলাসিঙ্গা এবং রঙ্গাচার্যের আত্মীয়। বেদান্ত কেশরী পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৯৪১ সংখ্যায় তামিল পত্রিকা 'দিনমণি' থেকে অনূদিত আলাসিঙ্গা সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধে ত্রিমূলাচার্যের সঙ্গে আলাসিঙ্গার সম্পর্কের বিষয়ে পাই:

"১৯০৭ সালে ত্রিমূলাচার্য আলাসিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেন ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকাকে ভালভাবে পরিচালনার জন্য। কিন্তু ত্রিমূলাচার্য রাজনীতিতে চরমপন্থী। ব্রহ্মবাদিনে রাজনৈতিক বিষয় আমদানী করলে সরকার পত্রিকাটির ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কায় ত্রিমূলাচার্য ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস থেকে আর একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা আরম্ভ করলেন, তার নাম, 'ইণ্ডিয়া'। কিছুদিন পরে ইণ্ডিয়া তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। আলাসিঙ্গা লেখায় তেজ-বীর্য চাইতেন, তাই ইণ্ডিয়াতে তিনি কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আনালেন। ভারতী তখন স্বদেশমিত্রম্-এ কাজ করছিলেন।"[৩১]

সুব্রহ্মণ্য ভারতী আলাসিঙ্গার মৃত্যুর পরে ইণ্ডিয়া কাগজে তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে যা লেখেন, তার মধ্যে নিম্নের কথাগুলিও ছিল:

"তাঁর [আলাসিঙ্গার] হৃদয়ে ছিল অনির্বাণ দেশপ্রেমের অগ্নি। বর্তমান লেখককে [ভারতীকে] আলাসিঙ্গা প্রভূত সাহায্য করেছেন; তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের সহায়তা আমি পেয়েছি। এই 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা যাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি যখন কলকাতায় বলেছিলাম—'মাদ্রাজে আপনার মতো বয়সের কোনো দেশপ্রেমিক নেতা নেই যিনি আমাদের মতো তরুণদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারেন, এক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন ?' —ভগিনী তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আলাসিঙ্গা তো রয়েছেন ! জনজীবনের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে, তাঁর কাছ থেকে তা তোমরা পরিষ্কার বুঝে নিতে পারবে।'"[৩২]

আলাসিঙ্গার সহযোগী এই ত্রিমূলাচার্য কি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা সিডিশন-কমিটি উল্লিখিত 'মাণ্ডেয়ম প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ ত্রিমূল আচারিয়া ?' তা নাও হতে পারে। কিন্তু উভয় ত্রিমূলাচার্যই ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সম্ভবত ভাই-ভাই। এখানে "এস এন ত্রিমূলাচার্য" কর্তৃক নিবেদিতাকে লিখিত ১৬ এপ্রিল, ১৯০৭, তারিখের একটি পত্র উপস্থিত ক'রে পরবর্তী বক্তব্যে উপনীত হব।—

৩/৭ কার স্ট্রীট,
ট্রিপলিকেন, মাদ্রাজ
১৬-৪-১৯০৭

পূজনীয়া মাতা,

কয়েক বৎসর আগে ১৭ বোসপাড়া লেনে আপনার আশ্রমে দুজন জ্ঞাতিভ্রাতাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেছিলাম। তারপরে আপনার সঙ্গে জনজীবন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমার কিছু পত্রালাপও হয়েছে; সেজন্য আপনার কাছে নিজেকে পরিচিত করাবার প্রয়োজন আর নেই। আমি আলাসিঙ্গা পেরুমলের ভ্রাতুষ্পুত্র [ভাগিনেয় ?]। আপনি যাতে আমাকে স্মরণ করে চিনতে পারেন সেজন্য আমার চেহারার দুটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা জানাচ্ছি—বেঁটে-খাটো যুবক, চোখে চশমা। আমি কে, বোঝাবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

আশা করি, আমার 'বালভারত' পত্রিকাটি, যার মালিক আমিই, আপনার দিব্য আবাসে নিয়মিত পৌঁছচ্ছে। পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সি সুব্রহ্মণ্য ভারতী যথার্থ উৎসাহী এক সামাজিক চরিত্র—তাঁর

৩১ 'সমকালীন', ৫ম, ২২।
৩২ ঐ, ২৩।

সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। আপনি তাঁকে যে-চিঠি লিখেছেন, তা তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। মাতঃ! এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আমরা যে ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে চালাতে পারছি না, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। এই ধরনের একটি পত্রিকা চালানোর মূল উদ্দেশ্য : আমাদের জনগণের সামনে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের আদর্শ উপস্থিত করা, যা তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত। আমার আশা ও বিশ্বাস, পত্রিকাটি জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে কিছু কাজ করছে।

আমাদের মাতৃভূমির কোনো-কোনো অংশে যে-নীতিতে কার্যকলাপ চলেছে, সেই ধারায় পত্রিকাটি চালাতে আমি ইচ্ছুক ; আর আমি এটিকে সর্বতোভাবে আপনার অভিপ্রায়ের অনুগত করতে চাই—যাতে এটি আরও ভালোভাবে ব্যবহৃত ও পরিচালিত হয়। এর উন্নতির জন্য মাঝে-মাঝে আপনার উপদেশ-নির্দেশ পেতে চাই। আপনি যা স্থির ক'রে দেবেন সেই ধারাতেই একে চালনা করতে প্রস্তুত। খুবই দুঃখের বিষয়, স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত কোনো যথার্থ মানুষের আবির্ভাবে মাদ্রাজ ধন্য হয়নি। 'প্রগতির দল' বলে মাঝে-মাঝে যাদের উল্লেখ করা হয়, এখানে তাদের আদর্শের একমাত্র পত্রিকা 'বালভারত'—আর যথার্থ আগ্রহী কোনো মানুষ যদি একে মাঝে-মধ্যে সাহায্য না করেন তাহলে এই ধরনের কাগজ চালানো সত্যই দুষ্কর।

সুতরাং ম্যাডাম, আপনার কাছ থেকে আপনার সুবিবেচনামতো যে-কোনো বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ পেতে ইচ্ছা করি। এই পত্রিকার জন্য মূল্যবান রচনাসকল পাঠিয়ে আপনি যে-আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য আমি, এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পত্রিকার উৎসাহী সম্পাদক ভারতী—উভয়েই অতীব কৃতার্থ ; এবং আপনি যদি 'ঘুমন্ত দক্ষিণ দেশকে' জাগাবার মতো আরও কিছু লেখা পাঠান তাহলে এই সমগ্র অঞ্চলের মানুষ আপনার কাছে বিপুল পরিমাণে ঋণী হয়ে থাকবে। আমি যদি স্তাবকতার কোনো কথা বলে থাকি (সে রকম কথা আমি সযত্নে পরিহার করেছি) তার জন্য অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন ; এবং যে সম-আদর্শে আমরা বিশ্বাসী তার স্বার্থে—অসাড় দাক্ষিণাত্যকে জাড্য থেকে উত্তোলন করবার জন্য যে-প্রয়াস আমরা গ্রহণ করেছি তার প্রয়োজনে—আপনাকে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করতে হবে।

সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্রোত্তরের প্রত্যাশাসহ,
হে অতি পূজনীয়া মাতা,
আপনার অনুগত সেবক,
এস এন ত্রিমূলাচার্য

বালভারত পত্রিকার মালিক এই ত্রিমূলাচার্য, এবং ভূপেন্দ্রনাথ ও সিডিশন কমিটি-কথিত 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ত্রিমূলাচার্য যদি এক ব্যক্তি নাও হন, তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়, উভয়ে একই মতাদর্শের মানুষ। এঁরা বিবেকানন্দ-ভক্ত এবং নিবেদিতার অনুগামী। যে-গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্পূর্ণ আনুগত্যের ভাবে, ত্রিমূলাচার্য উদ্ধৃত পত্রে কথা বলেছেন, তার পরে এঁদের উপরে নিবেদিতার প্রভাবের বিষয়ে আর কিছু বলা বাহুল্য।

বালভারত পত্রিকা রাজরোষে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। তার পুরো ফাইল দেখার সুযোগ পাইনি। মাদ্রাজ আর্কাইভস্-এ যে-কটি সংখ্যা দেখার সুযোগ হয়েছে তাদের সবকটিতেই নিবেদিতা-প্রদর্শিত পথে জাতীয়তার পক্ষে প্রবল প্রচার লক্ষ্য করা যায়। এতে ঘোষিত হয়েছে—স্বামী বিবেকানন্দের

আদর্শকে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাদের উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, সংবাদপত্রের চেহারা তার, আরম্ভ হয়েছিল ৩ নভেম্বর, ১৯০৬। ঐ আকারে তাকে চালানো সম্ভব হয়নি। পরে কর্তৃত্ব বদল হয়ে মাসিক পত্রিকা হয়, যার আরম্ভ নভেম্বর ১৯০৭, দীপাবলী দিবসে। আমরা শুরু থেকে পাঁচ মাসের পত্রিকা দেখার সুযোগ পেয়েছি। যেহেতু পত্রিকাটির নীতি-নিয়ামক ছিলেন নিবেদিতা, তাই সংক্ষেপে সংখ্যাগুলির পরিচয় দেব এবং এগুলি দুষ্প্রাপ্য বলে অংশবিশেষের মূল ইংরাজি উদ্ধৃত করব।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, প্রথমে তাই উপস্থিত করা যায়। নিবেদিতা ওঁদের কাছে সাক্ষাৎ ঋষি। নিবেদিতার "ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম্" গ্রন্থসূত্রে ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ সংখ্যায় লেখা হয়:

"True to her name, the Sister Nivedita holds herself, and, indeed, has realised herself as one 'sacrificed' unto the Mother. Born of and brought up among a race whose mental frame and general concept of things are, in most affairs, utterly diffrent from those of the*Bharata Jati*, the revered Sister has yet, by the power of her *Atmatyaga*, been able to identify herself with the classic genius of our country. Some of her writings read as if one of our own *Rishis* should have written them in a foreign tongue."

মাসিক বালভারতের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে একজন নগ্নগাত্র, কটিমাত্র-বস্ত্রযুক্ত, দৃঢ়গঠন যুবকের ছবি আছে, সে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট একটি দীর্ঘ পতাকাদণ্ড ধরে আছে—পতাকায় লেখা:

BALA-BHARATA
OR
YOUNG INDIA

তার নীচে:

"Arise, Awake And Stop Not Till The Goal
Is Reached"—Vivekananda.

পতাকার তলায় আর একটি ছবি—বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগ গ্রন্থের জন্য যে-কুলকুণ্ডলিনী চিত্র প্রস্তুত করিয়েছিলেন সেটি তারই অনুকরণ। কুণ্ডলিনীর শীর্ষে সহস্রার পদ্মের উপরে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা:

Unbounded Light Of Liberation
আর একেবারে নীচে লেখা:
Kundalini Of National Consciousness.

[এই পত্রিকার বিবেকানন্দ-বিষয়ক রচনার বিস্তৃততর পরিচয় দিয়েছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে]

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে প্রচ্ছদের লেখাগুলির অংশবিশেষ আছে; অতিরিক্ত আছে—
A Monthly Organ of national regeneration.

এই প্রথম পৃষ্ঠার সমস্তটিতে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাংশ উদ্ধৃত :

PROCLAIM THE MOTHER

(A Prophet's Vision and Exhortation to Young India)

[পরবর্তী যে-কটি সংখ্যা দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি সব কটিতেই প্রথম পৃষ্ঠায় একইভাবে স্বামীজীর রচনাংশ দেওয়া হয়েছে]।

প্রারম্ভিক সম্পাদকীয়তে বলা হল : জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈদান্তিক চিন্তার প্রয়োগই আমাদের উদ্দেশ্য। "কয়েক বছর আগে বিবেকানন্দ যখন পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তারাজ্যে বেদান্ত ধর্মের অমর বাণীর দ্বারা নব উন্মাদনার শিহরণ এনে দিয়েছিলেন, তখন এই শহরে প্রবুদ্ধ ভারত নামে একটি মাসিক পত্রিকা শুরু হয়।" প্রবুদ্ধ ভারত জাতীয় প্রতিভার মৌল তত্ত্বসূত্রগুলিকে প্রকাশ ক'রে চলেছে, সেখানে বালভারত পত্রিকার উদ্দেশ্য হ'ল, তরুণ ভারতবাসীদের সামনে বেদান্ত-ভিত্তিক জাতীয়তার উপস্থাপনা ও তার কর্মপদ্ধতির রূপায়ণ।

পত্রিকার মধ্যে জাতীয়তা-প্রকাশক প্রবন্ধাবলী কোন্-কোন্ আকারে প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত তা জানানো হয়েছিল,—সেইসঙ্গে নিজেদের বিশ্বাসের ভিত্তি-ধারাগুলি।

'দি ন্যাশনাল রিভাইভ্যাল' নামক সম্পাদকীয়ের মূল বক্তব্য ছিল—প্রথম অনুচ্ছেদেই :

"An eminent thinker once wrote to us: 'What we require is not Reform, but Revival—our Revival should be dynamic and not static. The Revival of Mahabharata—heroic India—the Revival not of ancient *custom,* but ancient *character.*'"

নিবেদিতার ভাষা প্রায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে :

"We want to revive originality of thought and of conception, spontaneous action not stimulated from outside, daring to execute great responsibilities, in short, we want to revive *National Will.*"

স্বামীজী নেতিবাচক কোনো কিছুকে সহ্য করতে পারতেন না। মন্দ দূর করার উপায়, তাঁর মতে মন্দের নিন্দা নয়—শুভের দ্বারা তার বিতাড়ন। এই ভাবটি ***The Vedantin's Attitude Towards Evil*** রচনার বিষয়বস্তু, যার শেষ লাইন :

"In all ways, and under all conditions, he [Vedantin] is a man-maker, not a mere Devil-denouncer."

Our Mission On Earth, Nationalism And Spirituality প্রভৃতি রচনায় একই ভাবাদর্শকথা ছিল ; ***To India*** **(By a Hindu Lady)** কবিতাতেও তাই। উদ্ধৃত হয়েছিল, **Thoughts *From Mazzni.***

পত্রিকার শেষ সম্পাদকীয়তে ['এডিটোরিয়াল নোটস্'] দুঃখ করে বলা হয়, হায় দক্ষিণদেশে জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব এখন হচ্ছে না। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, নিবেদিতার কাছে পত্রে ত্রিমুলাচার্য এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন :

"In these latter days, Southern India has been remarkably barren of great men, great in the national sense of the term. Men we have had, who

have been famous for culture, *i. e.*, the type of culture imparted to us by our Universities and who have adorned *creditably the various* departments of the alien administration. But none has been living here, in recent years, who could, by inherent genius and the right divine, strike upon an original path of enquiry or thought and do world-shaking work at home."

এই সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে নিবেদিতার উক্তির উদ্ধৃতি ছিল। কেবল সেই উদ্ধৃতিগুলিই নয়, উদ্ধৃতিচিহ্ন না দিয়েই রচনামধ্যে নিবেদিতার আরও কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল—নিবেদিতার ভাষা ও চিন্তাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা তা স্বচ্ছন্দে বুঝবেন। উপরে ত্রিমূলাচার্যের যে-কথাগুলি হাজির করেছি তার সঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত কথাগুলির রচনারীতিগত পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান। নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয়ের অংশ পুরোপুরি নিবেদিতারই লেখা :

"Every man, doing the best that is in him, will hold himself son and *servant* of the one great cause. This will give relation and significance to his efforts. This will inspire new efforts and new lives. In the light of this thought of nationality, each man in his own place will find himself, capable of being a hero, a martyr, an apostle. There is room in this Remaking of the nation, for each man's special gift, every man's *individual taste, nay, there is need of all. Let each man say to himself,* 'Worthless as my effort appear to myself, it may be that just this worthless trifle is what my country needs of me.'

"The task is not to become one. It is to avail ourselves of our unity. The task is not to learn resistance. It is merely to organise resistance.

"Says Nivedita: 'Open your eyes, men of India, open your eyes to the facts of life! On all sides of you are the signs of hope that is yours! On every land are heard the messages of the gods for your awakening. Time and Truth are with you. Who shall be against?'

"The greatest creation of a nation is its language. National revivals almost always begin with language revivals. There never was a great man, who was not trained to think in his mother-tongue. When we find confusion of thought, we may always trace the disease back to the first elements badly laid. Clear conceptions at the beginning are the secret of all high *achievement in* every branch of human effort. Therefore, it is our duty to see that nationality is rendered into every Indian Tongue, and carried into every Zenana, farm-house and cottage. The national consciousness expresses itself into history. Let history become the common talk in every verandah. Let us have historic drama. Let us not shun *the history of the last hundred years. We want to see the problems* of our own day, not those of some better, living on the stage before us. Dramas of union between Hindus and Mahomedans, of passionate love for country, people, and soil, etc. etc.

"The Indian people have an enormous faculty for 'passive resistance' so called. It is this already existing faculty which we propose to utilise for our own good. We propose to organise it, to use it consciously, to direct it intelligently to definite ends.

"Passive resistance does not end in saying 'no'. It takes up new

positions, ever advancing and by its moral force drives encroachment backwards.

"Passive resistance is a higher and more irrestible form of warfare than battle. This is because it is commensurate with moral power and advancement. It produces martyrs, not butchers. Its leaders are a priesthood, not a brutehood. Its followers are heroes, not slaves.

"Vivekananda's Gospel was of dignity of man. If I am *That*, I am certainly, also great. Even in the worldly sense I am That. What shall I not dare? Death itself cannot divide us from That existence. What is there on Earth then worthy to be feared?

"'Man, the infinite dreamer dreaming finite dreams!' Yes, we do; we cannot help it. But let the finite dreams be great! Let us at least dream of a country restored to greatness and to her own place, of a people redeemed from fear and servility and littleness, of a vast co-operation of the Indian races for the doing of great deeds and the solving of great problems!

"Let us dream of a service so pure, so vast, so daring, that in all our life, from the first moment to the last there shall not be found a single thread of self!

"In every question that comes before you, make it your rule to assume that *India has the essential.* She has only to learn how to use it.

"She has unity: must organise and direct it. Has passionate love of country —must avail herself of it. Has abundance of democratic sense and method, must discover how to make use of it."

ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ-বাণী :

Unfurl The Banner Of Love

Vivekananda's Trumpet Call To The Young Men Of India

এই সংখ্যার "দি আইডিয়া অব ন্যাশন্যালিটি" লেখাটি নিবেদিতার জাতীয়তামূলক বক্তব্যের তরলীকৃত রূপ। এর মধ্যে বলা হয়েছে—চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, আকবরের সময়ে ভারত 'নেশন' হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তা টেকেনি, কারণ তার মূলে ছিল ব্যক্তিগত প্রয়াস। তাই এখন চাই 'সমষ্টির ইচ্ছাশক্তি।' এই সমষ্টির ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করতে পারে শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার। তা কেবল সর্বজাতিকে অঙ্গীভূত করবে না—জাতিচ্যুতকেও আকর্ষণ করে আনবে নিজের মধ্যে।

এই লেখায় তারপর ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতার মহিমা। যথা:

"A free man *in a free society* is not an aggressor. But where others are not free, it is freedom to die on behalf of liberty."

"দি ক্রীড্ অব এ ডিমোক্র্যাট" লেখায় উক্ত ক্রীড্-এর নানা ধারা উপস্থাপিত। তার কয়েকটি :

"I rebel.

I rebel against all forms of fettering, whether of my body, mind or soul.

I adore liberty.
Liberty is the breath of my life, my salvaion, my Deity.
I have a love for revolutions, physical, intellectual, or spiritual.
All revolutions lead society on to a purer and grander life.
Revolutions are the constant struggles of mankind towards Godhood.
I delight in popular upheavals, social, religious or political, for they are the tokens of the health and vitality of the Collective Will.

"য়ু হ্যাভ নো পলিটিকস্" লেখাটির মধ্যে—স্বামী প্রেমানন্দ ভারতী একটি বক্তৃতায় আয়ারল্যাণ্ডের সিন্ ফিন্ মুভমেন্টের প্রশংসায় যা বলেছিলেন তা সযত্নে উদ্ধৃত হয়েছিল।
"এডিটোরিয়াল নোটস্"-এর মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য ছিল। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল—জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বক্তব্যসহ।

"এক্সট্রাক্ট" অংশে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার উদ্ধৃতি ছিল—যা বয়কট দমনে নিষ্ঠুর সরকারী পীড়ননীতিকে উদ্‌ঘাটন করেছিল। এই সংখ্যায় একটি চমৎকার কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতাটিতে ব্যঙ্গের জ্বালা, সেইসঙ্গে আত্মবোধের প্রত্যয়।

VANDE MATARAM
OR
THE CHILDREN'S SONG

They call us restless, Mother Dear,
They think us all half crazed;
From such a mob they've naught to fear,
And still they look amazed!

They think we'll run amuck, Dear,
And play some savage sport;
So just to keep their conscience clear,
Our Lalas they depot!

Our speech they call sedition, Dear,
They think we rant and rail;
So just to hush our lips with fear,
Our Pals they march to jail!

Our Congress meets too often, Dear,
From East and West, and North and 'South'
We fret and fume year after year,
And so they now would gag our mouth!

Old England's Honest Johnny, Dear,
Regrets he has no moon,
To cheer our hearts and wipe our tear,

To dance us like a tame Baboon!

Enough we've played, O Mother Dear,
With these outlandish boys,
And now we would to Thee keep near,
And in Thy smile rejoice!

For now we long, O Mother Dear,
To share our Mother's Love,
That feeds our strength and kills our fear,
And turns our hearts to God above!

"কনটেমপোরারি ওপিনিয়নস্"-এর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল বালভারত সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকার মতামত। বালভারত নিজেকে বেদান্তপন্থী পত্রিকা বলেছে, অথচ সে প্রচণ্ড কর্ম ও আন্দোলনপন্থী। সেটা কিভাবে হতে পারল, তা ব্যাখ্যা করেছিল 'মাইসোর হেরাল্ড' পত্রিকা। তার মধ্যে আছে :

"There are Vedantins in India who care more for their salvation than for the salvations of their Indian brothers and sisters. That is not the Vedanta of the Editors of this patriotic journal. The Vedanta of *Bala Bharata* is the material, moral and spiritual salvation of every Indian Prince or peasant, Hindu, Mahomedan, Brahmin or Pariah."

বেশ বোঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র তাঁর নববেদান্তের তত্ত্ব ও তাৎপর্যকে চিন্তাক্ষেত্রে অন্তত অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

১৯০৮, জানুয়ারি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার বিবেকানন্দ-বাণী :

The Will Is Almighty
What We Want Is Character, Strengthening This Will
And Not Weakening It.
(A Forgotten Truth Unearthed By Swami Vivekananda)

এই সংখ্যার একটি প্রবন্ধের নাম :

Vivekananda, the Real Pioneer of the New Movement

১৯০৮ সালের এই প্রথম সংখ্যায়—১৯০৭ সালের হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে জাতীয়তার ক্ষেত্রে মহাকীর্তিসমূহের উল্লেখের কালে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল পত্রিকাটি। তারই তিনটি অনুচ্ছেদ তুলছি—১৯০৭ সাল কী দিয়েছিল—তারই সমকালীন স্বীকৃতি হিসাবে।

"There is hope for the country where men can be found to face the terrors of persecution, imprisonment and exile for the sake of their convictions, whatever those convictions may be, and that hope was first generated in modern India in the wonderful year that has just died away, but whose achievements bid fair to remain immortal. The year of the exile of Lajpat and Ajit, the memorable declaration of Brahmabandhava, the cheerful sacrifice of Bipin Chandra, the incarceration which was

received with a sacred smile by Vivekananda's brother—the pure Bhupendra—is certainly worthy of our deepest veneration and truest love.

"The creed of self-help, almost forgotten and considered useless by a number of previous generations, received a firm foothold in our country last year. In 1907 again, was true Swadeshi, as honest as you please, established on a firm, solid ground—the ground of suffering and sacrifice.

It was a great year, for, in it was *Navya Bharata*—new India—visibly born and proclaimed her birth to the nations of the world. In it, was Her sacred voice first heard, and Her *will* understood and obeyed.

"দি ওল্ড অর্ডার চেন্‌জেথ্‌" লেখার মধ্যে 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার অংশ উদ্ধৃত হয়, যাতে প্রবল ভাষায় নূতনের—অধীর, উৎসাহী, বেপরোয়া উদ্দাম নূতনের—আত্মঘোষণা ছিল।

কী-কী গুণ থাকলে যথার্থ দেশপ্রেমিক হওয়া যায়, তা বর্ণিত হয়েছিল "ইফ আই ওয়্যার এ ট্রু পেট্রিয়ট" রচনার মধ্যে।

"ন্যাশনাল রিজেনারেশন্‌ ইন ইণ্ডিয়া" রচনার মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছিল মাৎসিনীর উক্তি, তাতে বড় অক্ষরে ছাপা ছিল :

THE NATION IS THE SOLE SOVEREIGN

১৯০৮, ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ-বাণী :

'SIVOHAM' (I Am He)

"I Never Had Death Nor Fear"

"Strengthening is the great medicine for the World's disease."

Swami Vivekananda.

"দি ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া" রচনার মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা প্রচারের বিষয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ করা হয়—তার একটি—এই আন্দোলন শ্বেতজাতিবিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখাটির মধ্যে নিবেদিতার উক্তি উদ্ধৃত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মননগত সংকীর্ণতার বিষয়ে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁরা নিম্নের কথাগুলিতে মনোযোগ দিলে কিছু আত্মশোধন করতে পারবেন :

"No, the new movement in India has not the slightest tinge of race-prejudice about it... Our charge against the administration is not merely that it is alien, but that it is irresponsible and bound to be so on account of its being alien... We want to shape our own ends; we protest against others mis-shaping them. If, instead of the present bureaucracy, we had a single class, from among ourselves, say, Brahman, or Parsee, Muslim or Jain, ruling irresponsively and selfishly over the destiny of the whole nation, our protest against it would not be a whit less strong, and our effort to ease that selfish class of its unjust privileges not a whit less strennous, than they are now."

The Congress Split And After নামক রচনার মধ্যে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে ঐক্যের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। শেষ অনুচ্ছেদে ছিল এই দৃঢ় প্রত্যয়িত কথাগুলি :

"Nationalism is the faith and *Bande Mataram* is the *Mantra* of every one of us, whether labelled as a Moderate or an Extremist. Whoever does not subscribe to that faith or does not revere that *Mantra* is none of us...For the rest, whatever may be the shades of their political opinion, the motto is, 'Onward', and the goal —Liberation. 'The Congress is dead: Long live the Congress.'"

"স্বামী বিবেকানন্দ, দি পায়োনীয়ার অব দি নিউ স্পিরিট" নামক উৎকৃষ্ট লেখাটিতে দেখানো হয়েছে—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনে ও বাণীতে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল প্রবাহ সম্মিলিত হয়ে বিশাল মানবতার সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়েছে। পত্রিকাটির ভাববিগ্রহ যে ঐ দুই পুরুষ—তা রচনাটি থেকে যথেষ্টই বোঝা যায়।

১৯০৮ মার্চ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার বিবেকানন্দ বাণী :
Two Sorts Of Courage.

"দি রি-ইউনিয়ন" রচনাটি কংগ্রেসে সংঘর্ষের পটভূমিকায়—সুরাটে 'দক্ষযজ্ঞের' পরে রচিত। এর মধ্যে পাবনা সম্মেলনে সফল ঐক্য প্রচেষ্টা দেখে আনন্দপ্রকাশ করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে, সুরাটের বিষবাষ্প দূরীভূত হবে। এই লেখাতে ঐক্যের জন্য উৎকণ্ঠিত আবেদন ছিল—কিন্তু ছিল না দুর্বলতা। "বিশ্বাসঘাতকতাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করতে হবে।"

জাতীয়তা-জাগৃতিতে বাংলার দানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এই রচনায় :

"The much prayed-for Re-union has come in Bengal, the birth-place as it has been rightly called, of the new incarnation of our national spirit...The nationalist rank is comparatively thinner [in Madras] and we have fewer genuine soldiers of the mother's cause in our province than there are in Bengal."

"দি ডিকাডেন্স অব ইউরোপ" নামক রচনায় জনগণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল :

"Brothers, work among the masses. Our Indian National Congress failed to make legitimate progress during its work of the last twenty years, because our so-called leaders did not take any interest in education; *they seemed to be ashamed to mix with the people, the backbone of a nation.*"

বালভারত পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা থেকে কিছু বিস্তারিত বস্তু-সংকলনের কারণ—এই পত্রিকা দেখিয়ে দেয়—মাদ্রাজের চরমপন্থী যুবকদের মধ্যে নিবেদিতার প্রভাব কতখানি সক্রিয় ছিল। তাছাড়া এই একটি পত্রিকাই সুস্পষ্টভাবে, নীতি হিসাবে, স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক আদর্শকে চরমপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করেছিল—এবং জীবনে তাকে প্রয়োগ করতেও সচেষ্ট ছিল। বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি পত্রিকাও তাই করেছিল, বিবেকানন্দের আদর্শের কথাও সে বলত, কিন্তু বলেনি যে, বিবেকানন্দের আদর্শের প্রয়োগরূপই আমাদের মৌল লক্ষ্য।

॥ ৪ ॥ নিবেদিতা ও সুব্রহ্মণ্য ভারতী

যে 'বালভারত' পত্রিকা থেকে তথ্যসম্ভার উপস্থিত করেছি—তার সম্পাদক ছিলেন সুব্রহ্মণ্য ভারতী। এইসব রচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ অথবা ভগিনী নিবেদিতার কতখানি অনুরাগী। পূর্বে উদ্ধৃত ত্রিমূলাচার্যের চিঠিতে ভারতীর সঙ্গে নিবেদিতার পত্রালাপের কথা আছে।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী আধুনিক ভারতবর্ষে প্রধান কবিদের অন্যতম। নিবেদিতা ভারতীর জীবনের ধ্রুবতারকা। নিবেদিতার প্রভাবই ভারতীকে চরমপন্থী রাজনীতিতে আকর্ষণ করে। তামিলনাড়ুর স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক জীবনে এই দেশপ্রেমিক কবির বিরাট সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সুতরাং নিবেদিতা ও ভারতীর সম্পর্ককথা এক হিসাবে ইতিহাসের উপাদান। সে-কাহিনী বলার আগে ভারতীর জীবনকথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যায়।

১৮৮২, ১৩ ডিসেম্বর, মাদ্রাজ প্রদেশে তিরুনেলভেলি জেলার এট্টায়াপুরম্ গ্রামে সুব্রহ্মণ্য আয়ারের জন্ম ; ['ভারতী' এঁর প্রাপ্ত উপাধি] ; পিতা চিন্নস্বামী আয়ার, মাতা লক্ষ্মীদেবী। পিতা আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন, যন্ত্রশিল্পে আগ্রহী, এট্টায়াপুরমে প্রথম কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই পুত্র একই বিষয়ে উৎসাহী হবার মতো পড়াশোনা করুক। কিন্তু পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহারা সুব্রহ্মণ্য শৈশব থেকে সাহিত্য প্রতিভার ঝলক দেখালেও (সে মুখে-মুখে কবিতা রচনা করতে পারত) বিদ্যালয়-শিক্ষায় অনাগ্রহী, পিতার কঠোর শাসনে অসন্তুষ্ট, স্বপ্নাতুরতা ও দুরন্তপনার বিপরীত ঝোঁকে আন্দোলিত। অস্থির বালকটির মধ্যে কিছু মননগত ধীরতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলেন তার পিতামহ—প্রাচীন তামিল কবিতার পাঠ দিয়ে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়াশোনা না এগোনোয় তাকে তিরুনেলভেলি হাইস্কুলে পাঠানো হয় ; যেখানকার প্রাণহীন রসহীন জীবনকে পরবর্তীকালে ভারতী জীবনের 'সর্বাধিক অন্ধকার পর্ব' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিন বৎসরের বিদ্যালয়জীবনে কবিতা রচনায় তীব্র আগ্রহ ও পড়াশোনায় বিতৃষ্ণার পরিণতিতে যখন বালক এনট্রান্স পরীক্ষার নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না, তখন পিতা তাকে ফিরিয়ে আনলেন নিজ স্থানে—এবং স্থানীয় রাজা-উপাধিক জমিদারের কাছে চাকুরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। সুব্রহ্মণ্য অচিরে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন, বিদ্রূপকারী বিরোধী কিছু লোকের সঙ্গে প্রকাশ্য তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে 'ভারতী' উপাধি পেলেন [যা তাঁর 'আয়ার' পদবীকে চিরদিনের জন্য স্থানচ্যুত করল], ১৮৯৭ সালে বয়স যখন ১৫ তখন পিতার ইচ্ছায় বিয়েও করলেন ৭ বৎসরের কন্যা চেল্লামলকে, কবিতা লেখা চলতে লাগল অব্যাহতভাবে। বড়ই সুখের এই সময়, কিন্তু বড়ই ক্ষণস্থায়ী, কারণ ১৮৯৮ সালে মারা গেলেন পিতা, যিনি উদ্যমী কিন্তু আর্থিকভাবে অসফল শিল্পোদ্যোগী। তাঁর মৃত্যুর পরে বিপর্যয় এল পরিবারে। দারিদ্র্যের কারণে ভারতীর পত্নী গিয়ে আশ্রয় নিলেন পিতৃভবনে আর ভারতী চলে গেলেন বারাণসীতে, এক সহৃদয় ধর্মপ্রাণ আত্মীয়ের আহ্বানে। সেখানে তিনি সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে পড়ে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করলেন, মশগুল রইলেন শেলী প্রমুখ ইংরাজ কবিদের কবিতার রসে, এখনো রাজনীতিতে আগ্রহী নন, তবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাস এসেছে। এই পর্বে অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁকে কাটাতে হয়েছে, তা দূর হল যখন পূর্বোক্ত রাজার চাকরিতে ফিরে এলেন, কিন্তু বেশিদিন তাঁর পক্ষে রাজার কুরুচি ও মন্দ অভ্যাসকে সহ্য করা সম্ভব হল না (অবশ্য নিজেও আফিম নামক অভ্যাসটি গ্রহণ ক'রে ফেললেন), চলে গেলেন মাদুরায়, সেখানে কয়েক মাস স্কুলশিক্ষকের অস্থায়ী চাকরি করলেন (১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে), প্রায় সেই সময়েই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কবিতা 'বিবেক ভানু' নামক তামিল পত্রিকায়। ভারতী সার্থকতর জীবনে প্রবেশ করলেন যখন প্রখ্যাত জাতীয় নেতা জি সুব্রহ্মণ্য

আয়ারের দ্বারা সম্পাদিত তামিল দৈনিক 'স্বদেশমিত্রম্'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ পেলেন। এই চাকুরিকালে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল, উপার্জন তাতে সামান্যই কিন্তু অপর বস্তুর অসামান্য অর্জন। এইখানেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ; তা তখন মধ্যপন্থী, কারণ সম্পাদক তাই ছিলেন ; প্রখর গতিশীল তামিল গদ্য রচনার ক্ষমতা অর্জন করলেন, যেহেতু অবিরাম তাঁকে ইংরাজি থেকে তামিলে অনুবাদ করতে হত (বিবেকানন্দের উদ্দীপক রচনার প্রচুর অনুবাদও করেছেন) ; তার দ্বারা তামিল গদ্যের ক্ষেত্রে প্রবলতা ও প্রত্যক্ষতার পথ-সূচনাও ক'রে দিলেন। তাঁর মন কিন্তু মডারেটী পিছুটানে বাঁধা থাকতে চাইল না, কারণ বাংলায় প্যার্টিশন হয়েছে, সেখানে বিদ্রোহের লাভাস্রোত নামছে। ভারতী অগ্নির জয়ধ্বনি দিলেন ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখে —'বন্দে বঙ্গ' কবিতায়। স্বদেশমিত্রম্-এর পক্ষে তিনি সাংবাদিক হিসাবে ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে গেলেন, সেই তাঁর জীবনে প্রথম কংগ্রেস। পরের বছর কলকাতা কংগ্রেসেও গেলেন—আর সেখানেই ঘটল—ভারতীর জীবনীকার বলেছেন—"তাঁর জীবনের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি।"[৩৩]

সুব্রহ্মণ্য ভারতী নিবেদিতার সাক্ষাৎ পেলেন।

১৯০৬ সালের শেষ ভাগে নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থতার পরে আরোগ্যোত্তর বিশ্রামের জন্য দমদমের 'ফেয়ারী হল' নামক আনন্দমোহন বসুর বাগানবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন একদিন ভারতী তাঁর কাছে হাজির হলেন।

নিবেদিতা দেখলেন (ভারতীর তখনকার চেহারা ও হাবভাব সম্বন্ধে তাঁর জীবনী থেকে যা পাচ্ছি তদনুযায়ী)—মোটামুটি দীর্ঘাকার এক দক্ষিণ ভারতীয় যুবক, কিন্তু মাথায় উত্তর ভারতীয় পাগড়ি, রঙও দক্ষিণীদের তুলনায় গৌর, মুখে দাড়ি ও সযত্নচর্চিত গোঁফ, খাড়া শরীর, প্রফুল্ল—চোখ দুটি সবচেয়ে লক্ষণীয়, বিস্ফারিত এবং দীপ্ত। দেখামাত্র নিবেদিতা-নাম্নী শিখা ঝলসে উঠলেন। তারপর কি হল, তা ভারতীর জীবনীগ্রন্থ থেকে সংকলন করা যাক :

> "প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতার মধ্যে মহাশক্তিকে ভারতী চিনতে পারলেন। তার পূর্বে কিন্তু নিবেদিতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না।
>
> "কথাবার্তার সূচনায় নিবেদিতা অনুভব করলেন—তিনি বিদেশী বলে ভারতী যথেষ্ট মন খুলে কথা বলতে পারছেন না। নিবেদিতা নিজেকে বিদেশী বলে মনে করতেন না। তিনি তীক্ষ্ণভাবে বললেন, দেশসেবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভারতবাসী যেন সাদাচামড়া বিদেশীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে।
>
> "নিবেদিতা প্রশ্ন ক'রে ভারতীর জীবনের বিষয় জানতে চাইলেন। ভারতী কি অবিবাহিত, না বিবাহিত ? ভারতী বললেন, তিনি বিবাহিত, তাঁর পত্নী ও এক কন্যা আছে। নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ শুধোলেন—তাহলে পত্নীকে আনোনি কেন ? হঠাৎ প্রশ্নে থতমত খেয়ে সংকোচের সঙ্গে ভারতী বললেন : 'আমাদের সমাজে স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে সভায় যাবার রীতি নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রী তো রাজনীতির কিছুই জানে না।' নিবেদিতা সে কথা শুনে জ্বলে উঠলেন : 'বৎস, গভীর দুঃখের সঙ্গে আরো একজন ভারতীয়কে দেখতে পেলাম, যে নারীকে ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশি-কিছু ভাবে না। তোমার শিক্ষার কী মূল্য আছে যদি তুমি তোমাদের নারীজাতিকে নিজের স্তরে উন্নীত করতে না পারো ? জাতির অর্ধাংশ কিভাবে

৩৩ Prema NandaKumar, *Subramania Bharati* (1968). ভারতীর জীবনসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রধানত এই বইটি থেকে সংগ্রহ করেছি।

স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে যদি তা অপরার্ধকে পরাধীন করে রাখে? বুঝতে পারছ না—দেশের অর্ধাংশ অজ্ঞ, পশ্চাদ্‌পদ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে দেশ কখনো অগ্রসর হতে পারবে না। যা গেছে তা যাক, কিন্তু এখন থেকে তোমার স্ত্রীকে তোমার থেকে পৃথক-কিছু ভেবো না। নিজের হাত যেভাবে তুলে ধরো সেইভাবে তাকে তুলে ধরবে, তাকে দেবদূতীর মতো স্তুতি জানাবে।'

"ভারতী একথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন ও ক্ষমা চেয়ে নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন—ঐ প্রকার কাজ ভবিষ্যতে কখনো করবেন না। নিবেদিতা তাঁকে আরও বললেন—ভুলে যাও জাতিভেদ, সকল ভারতবাসীকে সমভাবে ভালবাসো। ভারতী সে প্রতিজ্ঞাও করলেন। ভারতীর কাছে আবেদন জানাবার সময়ে নিবেদিতার উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন।

"বিদায়ের আগে নিবেদিতা ভারতীকে অভাবিতপ্রকার 'প্রসাদ' দিলেন—হিমালয়-ভ্রমণকালে সংগৃহীত একটি শুষ্ক পত্র। সেটিকে ভারতী জীবনের একেবারে শেষদিন পর্যন্ত পরম যত্নে রক্ষা করেছিলেন—নিতান্ত দারিদ্র্যের সময়ে, ঐ পত্রটির বিনিময়ে প্রচুর অর্থদানের প্রস্তাব করা হলেও, সেটি হস্তান্তরিত করেননি। সেই পবিত্র পত্রটি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে হারিয়ে যায়।

"ভারতীকে বিদায়ের আগে আশীর্বাদ জানিয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন: 'বৎস, মনের সকল বাধা দূর করো। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি বর্বর ভেদাভেদ ত্যাগ করো। হৃদয়ে প্রেম আনো। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুমি দিব্যরূপে অঙ্কিত হবে।'।"[৩৪]

ভারতীর উপরে এই সাক্ষাতের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার বলেছেন:

"এই মহীয়সী মহিলার মধ্যে ভারতী দেবীশক্তিকে দর্শন করেছিলেন এবং পরবর্তী সমগ্র জীবনে এঁকে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শিকা মনে করেছেন। ভারতের সামাজিক জাগরণের পথ ওঁর কথা থেকে ভারতী খুঁজে পেয়েছিলেন। নিবেদিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁকে রাজনৈতিক চরমপন্থা গ্রহণে প্রণোদিত করেছিল, কারণ, নিবেদিতা তাঁকে বলেছিলেন—ভারতবর্ষকে দেখবে শৃঙ্খলবদ্ধ রোরুদ্যমানা জননীরূপে। ভারতী স্থির করেন—যাঁরা ঐ শৃঙ্খলছেদনের সংগ্রামে নিয়োজিত তাঁদের দলে তিনি যোগদান করবেন।....ভারতী বারবার বলেছেন—ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরু। ভগিনী একটিমাত্র সাক্ষাৎকারে তাঁর মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার মনপ্রাণ নিমজ্জনকারী উপলব্ধি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।"[৩৫]

একথাও বলা হয়েছে: "ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশ ভারতী যে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা জোর দিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীর অনেক কবিতাই, বিশেষ নারী-বিষয়ক কবিতাগুলি, আমাদের সমাজে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সমুচ্চ ধারণার কাছে

৩৪ নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীর সাক্ষাতের চিত্রবৎ বর্ণনা দিয়েছেন ভারতীর কন্যা থঙ্গম্মল ভারতী—ভারতী-বিষয়ক একটি গ্রন্থে। ভারতী তাঁর এক অনুরাগী ডুরাইস্বামী আয়ারের কাছেও নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের অল্পদিন পরে বিবরণ দিয়েছিলেন। এই সকল বিবরণ সরাসরি অনূদিত আকারে পাইনি। আমি প্রেমা নন্দকুমার-লিখিত ভারতীর জীবনী এবং "ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে" পি এন বেঙ্কটাচারী-লিখিত নিবেদিতা ও ভারতী বিষয়ক প্রবন্ধ—উভয়ের প্রদত্ত বিবরণ থেকে উপরের সাক্ষাৎ-বিবরণ উপস্থিত করেছি।

৩৫ প্রেমা নন্দকুমার, ১৮।

অসংশয়িত ঋণে আবদ্ধ। আধুনিক তামিল কবিদের ধারায় ভারতীর মতো আর কাউকে নারীমুক্তির জন্য উদ্দীপনা-সঞ্চারে নিয়োজিত দেখা যায়নি।"[৩৬]

নিবেদিতার কাছ থেকে ভারতী যখন মাদ্রাজে ফিরে গেলেন, তখন তিনি "সম্পূর্ণ রূপান্তরিত এক মানুষ।" "চাপা উত্তেজনায় ফুটছেন; কাজ চাইছেন—কাজ।" স্বদেশমিত্রম্ কাগজ কিন্তু তাঁর নবোদ্বোধিত অগ্নিময় চেতনার বাণীবাহী হতে রাজি হল না। কোন্ পত্রিকায় তিনি হৃদয়ের রক্তপদ্ম স্থাপন করবেন? অবশেষে সুযোগ পেলেন। দুঃসাহসী মাদ্রাজী দেশপ্রেমিক, এবং অর্থশালী, মাণ্ডেয়ম্ ত্রিমূলাচার্য, তাঁর সমস্ত সম্পদ স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ ক'রে প্রকাশ করেছেন তামিল পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া', ১৯০৬, এপ্রিল মাসে—ভারতী সেই পত্রিকার জন্য সম্পাদকীয়, রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ও কবিতা লিখতে শুরু করলেন। পূর্বোক্ত 'বালভারত' পত্রিকা, যা ১৯০৬ নভেম্বরে ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে আরম্ভ হয়েছিল—তা কিছুকাল বন্ধ থাকার পরে মাসিক পত্রিকা হিসাবে পুনরারম্ভ হয় ১৯০৭ নভেম্বরে—তার সম্পাদনাও ভারতী করতে লাগলেন। এখন তিনি চরমপন্থী রাজনীতিতে নিরতিশয় জড়িয়ে পড়েছেন। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ-অঞ্চলে বিপিন পালের স্বদেশী বক্তৃতার আয়োজনে তিনি বড় ভূমিকা গ্রহণ করলেন; ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গে উপস্থিত থাকলেন; তিলক, লাজপত রায়, অরবিন্দের মতাদর্শের সপক্ষতা করতে লাগলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

ভারতীর নিরাপত্তা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল। সরকারের পক্ষে এখন তিনি বিপজ্জনক চরিত্র। গ্রেপ্তার এড়াতে গোপনে চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে, সে যাত্রার কথা এমন কি তাঁর স্ত্রীও জানলেন না। ভারতীই পণ্ডিচেরীতে প্রথম স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ভারতীয় রাজনীতিক।

ইতিমধ্যে পুলিশী নজরের কারণে ইণ্ডিয়া পত্রিকা মাদ্রাজ থেকে প্রকাশ করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মাণ্ডেয়ম-ভ্রাতারা অতি কৌশলে ইণ্ডিয়া পত্রিকার প্রেসটি পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করতে পারলেন। পণ্ডিচেরীতে পৌঁছবার পরে ভারতী প্রথমে অত্যন্ত কষ্টে ছিলেন—এবার সেখান থেকে ইণ্ডিয়া পত্রিকা সম্পাদনার ভার পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। পত্রিকাটি অবিলম্বে তামিলনাড়ুর সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং তা এমন আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করল যে, মাণ্ডেয়ম-ভ্রাতারা দৈনিক "বিজয়" পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত করলেন—তারও সম্পাদক ভারতী। বালভারতও পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত। তারও সম্পাদক ভারতী। কার্টুন পত্রিকা চিত্রাবলী প্রকাশের আয়োজনও চলতে লাগল। বলা বাহুল্য সরকারের কাছে অসহ্য এই সাফল্য, কেন না মারাত্মক এই সাফল্য। সুতরাং বৃটিশ সরকার মার্চ, ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়া পত্রিকাসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত পত্রিকা বন্ধ করাতে পারলেন—কূটনৈতিক চাপে। ভারতী নিক্ষিপ্ত হলেন "বাধ্যতামূলক নৈষ্কর্ম্যে।"

এই পর্বের মধ্যে ভারতী অজস্র দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছেন—সে সমস্ত কবিতাই নিবেদিতার ভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীর দেশাত্মবোধক কবিতা প্রকাশের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তামিল সাহিত্যে তাঁর প্রবর্তকের ভূমিকা। এবং একথা সর্বথাস্বীকৃত, তিনিই অদ্যাবধি তামিল সাহিত্যে সর্বোত্তম দেশপ্রেমের কবি। তাঁর কবিতা ও গান মাদ্রাজের গৃহসঙ্গীত, সভাসঙ্গীত, প্রার্থনাসঙ্গীত। ১৯০৬ সালে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে উদ্দীপ্ত ভারতী—স্বদেশমিত্রম্ কাগজে কবিদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের কবিতা আহ্বান ক'রে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন—কিন্তু তিনি সাড়া পাননি। কবিরা বিপজ্জনক ব্যাপারে জড়িয়ে

৩৬ বেঙ্কটাচারী, ৬৯।

পড়তে গররাজি। তখন ভারতীর কলম একাই রক্তরেখা টেনে এগিয়ে চলল। তাঁর সেসব কবিতা প্রকাশ করবার জন্য বিশিষ্ট কেউ এগিয়ে এলেন না। কিন্তু আগ্রহ বোধ করলেন তরুণ প্রকাশক জি এ নটেশন। তিনিও নিজে প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না—ভারতীকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনজীবী ও মডারেট নেতা ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ারের কাছে। এঁকে ভারতী যদিও নিয়মিত সংবাদপত্রে আক্রমণ ক'রে গেছেন, এবং ইনিও চরমপন্থীদের উন্মাদ বজ্জাত ভিন্ন কিছু মনে করতেন না—তথাপি ভারতীর প্রতিভায় মোহিত হবার মতো অনুভূতিশক্তি এঁর ছিল, আর ছিল নিজ বিশ্বাসকে কর্মে প্রকাশ করার মতো দৃঢ়তা। ইনিই ভারতমাতার বন্দনাসূচক ভারতীর তিনটি কবিতা পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে ১৫,০০০ কপি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ভারতীর সেই প্রথম কবিতা পুস্তক, বা পুস্তিকা। এটি ১৯০৭ সালের ঘটনা।

ভারতী ১৯০৮ সালে মোটামুটি আকারের একটি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করলেন, তার নাম—"স্বদেশ গীতঙ্গল"। এর মধ্যে ১৪টি গান আছে। ভূমিকায় লিখেছিলেন :

"ভারতমাতার চরণতলে এই পুষ্পগুলি অর্পণ করছি। ভারতমাতা ঐক্য ও নবযৌবনের প্রতিমা। আমি ভালই জানি যে, আমার এইসকল পুষ্প নির্গন্ধ। কিন্তু মহাদেব কি নীচ অন্ত্যজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডও গ্রহণ করেন না? সেইভাবেই ভারতমাতা যেন সদয় হয়ে আমার এই পুষ্পগুলি গ্রহণ করেন।"

ভারতী বইটি নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেন। তার মধ্যে আত্মউন্মোচন করেছিলেন এই বলে :

"আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার শিক্ষাদাত্রীর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম, যিনি আমাকে ভারতমাতার ভাবমূর্তি দর্শন করিয়েছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যথার্থ আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, সেইভাবে আমার মধ্যে দেশাত্মবোধ অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন।"

পরের বৎসরে (১৯০৯) আবার ভারতীর কবিতার বই বেরুল—"জন্মভূমি"। তার ভূমিকায় ভারতী বললেন :

"স্বাধীনতার আলোকের জন্য আমার ভালবাসার নিদর্শনরূপে আমি ভারতমাতার চরণে কিছু কাব্যপুষ্প স্থাপন করেছিলাম। সানন্দ বিস্ময়ে দেখেছি যে, ভক্তরা তাদের উত্তম বিবেচনা করেছেন। মাতা আমার অর্ঘ্যকে গ্রহণ করেছেন। তার দ্বারা লব্ধ আত্মবিশ্বাসে আমি আরও কিছু পুষ্প এনেছি মাতার পাদমূলে।"

ভারতী যে, তাঁর এইকালের সমগ্র কাব্যপ্রেরণার সরস্বতীরূপে নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছিলেন তা দেখা যায় এই গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রেও—নিবেদিতাকেই পুনশ্চ এটি উৎসর্গিত। উৎসর্গপত্রে ভারতী লেখেন :

"এই গ্রন্থখানি আমি ভগবান্ বিবেকানন্দের ধর্মপুত্রী শ্রীমতী নিবেদিতা দেবীকে উৎসর্গ করছি। তিনি শব্দমাত্র উচ্চারণ না ক'রে, এক ক্ষণমুহূর্তে, আমাকে দেশমাতার জন্য যথার্থ সেবার রূপ এবং আত্মোৎসর্গের মহিমা অনুধাবন করিয়ে দিয়েছিলেন।"

ভারতী পণ্ডিচেরীতে দশ বৎসর স্বেচ্ছানির্বাসনে কাটিয়েছিলেন। প্রথম দু' বৎসর বাদ দিলে বাকি সময় দারিদ্র্য, পুলিশী নজর, হয়রানি ইত্যাদির মধ্যে নিতান্ত যন্ত্রণায় তাঁকে কাটাতে হয়।

১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পৌঁছান। আরও একজন চরমপন্থী ভি ভি আয়ারও সেখানে গিয়েছিলেন। এঁরা তিনজন সাহিত্য ও ধর্মের আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। তার ফলে ভারতীর শূন্য কর্মজীবন পূর্ণ কবিজীবনে রূপান্তরিত হয়েছিল, কারণ পরবর্তী তিন বৎসর তাঁর অনেকগুলি প্রধান রচনার সৃষ্টিকাল। এই সময়ে তিনি বেদ-নির্ভর ও যোগ-নির্ভর অনেক কাব্যকবিতা লেখেন, পৌরাণিক বিষয়েও লেখেন, যার মধ্যে কিন্তু রাজনৈতিক মাত্রা লুকানো থাকেনি। শেষ তিন বৎসর দারিদ্র্য ও নৈঃসঙ্গ্য তাঁকে এমনই বিদ্ধ করে যে, ঝুঁকি নিয়ে তিনি মাদ্রাজে চলে আসেন ; গ্রেপ্তার হন ; তবে প্রভাবশালী বন্ধুদের চেষ্টায় মুক্তিও পান ; চলে যান পত্নীর বাসভূমি কদায়ামে। কিন্তু "যেহেতু তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতিভেদ মানতেন না, সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে আহারাদি করতেন ;...পত্নীর হাত ধরে পথে হাঁটতেন," এবং তাঁর গৃহে অভ্যাগতদের মধ্যে খ্রীস্টান, মুসলমান, অচ্ছুত সবাই থাকতেন, তাই রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন—সেজন্য গ্রামান্তের নির্জন স্থানে বাস করতে হল তাঁকে। পরে আবার যোগ দিলেন স্বদেশমিত্রম্ কাগজে (১৯২০), এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নবোদিত তারকা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁর অহিংস আন্দোলনকে উদার অভ্যর্থনাও জানালেন, যদিও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সুরের ঐক্য ছিল কিনা সন্দেহজনক।[৩৭]

ভারতীর জীবনান্ত হয় দুঃখজনকভাবে। তিনি শেষ জীবনে বৈদান্তিক আদর্শকে একটু বেশিমাত্রায়, বলা চলে পরিমাপ হারিয়ে, অনুসরণ করছিলেন। তেমনি আবেগে একদিন ট্রিপলিকেনে পার্থসারথি মন্দিরের হস্তীকে ভ্রাতা সম্বোধন ক'রে একেবারে নিকটে গিয়ে ফলাহার করাতে চেষ্টা করেন। বিরক্ত হস্তীর শুণ্ডাঘাতে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। [শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত হস্তী-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণের গল্প তাঁর পড়া না-থাকার জন্য, বা পড়া থাকলেও তার উপদেশ অগ্রাহ্য করার জন্যই এই দুর্ঘটনা।] অল্পদিনের মধ্যে (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২১) তাঁর দেহান্ত হয়।

কবিরূপে আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্বে নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীর পরিচয় ঘটে। যে-প্রভাব তিনি লাভ করেন তা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। সে-প্রভাব কেবল উন্মাদক দেশপ্রেমের ব্যাপারেই নয়—আরও গভীরে প্রবেশ করেছিল—দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা ও সাধনার কেন্দ্রে। এখানে অবশ্য নিবেদিতার অপেক্ষা তাঁর গুরু স্বামীজীর প্রভাব অল্প নয়। আগেই বলেছি, ভারতী স্বামীজীর বহু লেখার অনুবাদ করেছেন। বিবেকানন্দের গ্রন্থ তাঁর প্রিয় পাঠ্য। আর ভারতীর কালের দক্ষিণ ভারতীয় এমন কোনো বৃহৎ সাংস্কৃতিক পুরুষ বোধহয় পাওয়া যাবে না যাঁর উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব নেই।[৩৮] ভারতীর জীবনী থেকে জানতে পারি, তিনি সর্বদেবদেবীর বন্দনাকারী হলেও শক্তিই তাঁর ইষ্টদেবী। সে শক্তিকে তিনি নানা রূপে দেখেছেন, শুভঙ্করী ও ভয়ঙ্করী উভয় রূপেই ; আনন্দ, আতঙ্ক আঘাত ও আশীর্বাদের উৎস তিনি। ভারতীর অজস্র শক্তিবিষয়ক গানে ও কবিতায় বিবেকানন্দের এবং নিবেদিতার সবিশেষ প্রভাব ; তাঁর মনোজীবনে স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' কবিতা ও নিবেদিতার একই নামের গ্রন্থের প্রভাবের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ দু'এক বৎসর কেবল 'মৃত্যু'-র ধ্যান করেছেন, কালীই সেই মৃত্যু। একইসঙ্গে তিনি এই পর্বে বৈদান্তিক, সর্ব বস্তুতে একই সত্তা দর্শন করছেন, জীবন্ত দেখছেন সৃষ্টি-প্রপঞ্চকে—তাঁকে

৩৭ *Subramania Bharati: The Tamil Tagore*, by Jamunaa, *Statesman*, Nov. 22, 1981.

৩৮ রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ভাববাহী স্বামী শুভেদানন্দ যখন ১৯০৬ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ভারতী তাঁর

রাজাগোপালাচারীর মতো গভীরদর্শী মানুষ আপাদমস্তক বেদান্তে নিমজ্জিত বলে অনুভব করেছেন। বিবেকানন্দের ভাষাকে কণ্ঠে তুলে নিয়ে তিনি মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

অর্থাৎ ভারতী তাঁর অন্তর্গহনের দিশারী রূপেও বিবেকানন্দ ও নিবেদিতাকে পেয়েছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর জগতে ভারতীর মুখ্য পরিচয় জাতীয়তার মহাকবি রূপেই। স্বদেশী আন্দোলনকালে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। যেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি দেশ-সঙ্গীত লিখেছেন, (দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত পিছিয়ে ছিলেন না), সেখানে সাহিত্যমান কোন্ স্তরে উঠেছিল তা বোধগম্য। কিন্তু একথা স্বীকার্য, এঁরা কেউই সুব্রহ্মণ্য ভারতীর মতো সর্বাত্মকভাবে জাতীয়তার কবি নন। আমরা এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শনের কথা বলে এসেছি। সেই জাতীয়তা-দর্শনকে—ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক সংস্থান, জাতিপ্রেম, শ্রেণীসাম্য, সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ—ইত্যাদি সকল ধারণাকে একত্রিত আকারে ভারতীর মতো কেউই কাব্যবদ্ধ করতে পারেননি।

ভারতীর চরিত্রমহিমার প্রতি এই শ্রদ্ধা আমাদের জানাতেই হবে—স্বদেশী যুগে তাঁর মতো আর কোনো মহৎ সাহিত্যিকের কথা জানি না যিনি এতখানি পুলিশের রক্তচক্ষুর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। দেশপ্রেমের মূল্য তিনি দিয়েছেন অপরিসীম দুঃখদারিদ্র্য সহনের দ্বারা। কারাগারের কালো ছায়া বৎসরের পর বৎসর তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছে। আর তিনি গান গেয়ে গেছেন মুক্তির।

এই ভারতীকে নিবেদিতা দান করেছিলেন ভারতবর্ষের স্বরূপ। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান এই কবির মৌল শক্তিকে নিবেদিতা জাগিয়েছিলেন—এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে অধিকার ক'রে রেখেছিলেন। নিবেদিতার শক্তিমহিমার আর কোন্ বৃহৎ পরিচয় সম্ভব?

[অবশ্য নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকেও প্ররোচিত করেছিল নিবেদিতার কিছু আদলে গোরা-চরিত্র চিত্রণে, কিংবা অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালকে—উমা-চিত্র অঙ্কনে]।

নিবেদিতার উপরে ভারতীর একটি কবিতা আছে, যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'রত্নমাণিক্যতুল্য।' প্রবল ভাবানুভূতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাতে; হীরকোজ্জ্বল কতকগুলি শব্দে ঐ কবিতা দ্যুতিময়। সমালোচকরা বলেছেন—কবিতাটির ভাষান্তর অসম্ভব। তবু তার ইংরাজি রূপান্তর হয়েছে। আমি

উদ্দেশ্যে ভাবোদ্দীপ্ত একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার মুক্তানুবাদের অংশ:

Blameless and perfect in his knowledge
  of Veda and the rich rare Upanishads,
Transfigured by the splendorous light,
  The Bliss of Brahman,
And endowed with gifts exceptional,
  He adventured into a Land
Where darkness reigns at noon
  To radiate the Light of Truth...

As if great Sankara, flaming minister,
  Whose flame reached up to the sky,
As if Sankara himself returned
  To revisit this hoary land,
There came Vivekananda
  The shining light. And when it ceased,
You came forward to make good the loss,
  And continue his healing works among men...

[*Vedanta Kesari*, May 1958]

রোমান অক্ষরে মূল কবিতাটি, সেইসঙ্গে তার ইংরাজি অনুবাদের এক অযোগ্য বাংলা অনুবাদ উপস্থিত করছি :

ARULUKKU NIVE TANAMAY ANPINUKKOR
KOYILAY, ATIYEN NENGIL
IRULUKKU NAYIRAY EMATUYAR
NATAM PAYIRKKU MAZHAIYAY, INGU
PORULUKKU VAZHIYARIYA VARINRKKUP
PERUM PORULAYP PUNNAMAIT TATAC
CURULUKKU NERUPPAKI VILANKIYA TAY
NIVETITAIYAIT TOZHUTU NIRPEN.

নিবেদিতা—মাতা, ওগো মাতা।
প্রেমের মন্দিরে দেবী চির সমর্পিতা।
সূর্য তুমি, আমার আত্মার তমোহারী,
জীবনের মরুভূমে তুমি বারিধারা।
স্নেহের নির্ঝর তুমি অসহায় তরে
কল্যাণমন্দির মাঝে অয়ি তপস্বিনী,
নিত্য জাগো সত্যরূপে তুমি শিখাময়ী,
নমামি নমামি মাতঃ—মাতা নিবেদিতা।[৩১]

॥ ৫ ॥ নিবেদিতা ও পরমেশ্বরলাল

নিবেদিতার চিঠিতে পরমেশ্বরলালের উল্লেখ আছে। অরবিন্দ-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারুচন্দ্র দত্ত, আই-সি-এস-এর রচনা অনুযায়ী (চারু দত্তর লেখায় চারু দত্তই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র), "বেশ জোয়ান ও সাহসী" বলে প্রতীয়মান "তরুণ বিহারী" পরমেশ্বরলালকে "সুরেনবাবু [সুরেন ঠাকুর] ও ওকাকুরা" দিল্লীর দরবারী শোভাযাত্রাকালে লর্ড কার্জনকে গুলি করার জন্য নির্বাচন করেন, কিন্তু

৩১ রেমি-সংগ্রহে 'কলাইমগল' নামক তামিল সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিবেদিতা ও ভারতী' প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ আছে। তার মধ্যে দেখি—নিবেদিতা ভারতী-সম্পাদিত 'বালভারত' পত্রিকায় অনেক উদ্দীপক রচনা প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীর প্রথম সাক্ষাতের স্থান, এই রচনা অনুযায়ী—কলকাতা নয়, আলমোড়া। নিবেদিতা 'এসো, পুত্র মোর' বলে ভারতীকে অভ্যর্থনা জানান—এবং ভারতীর দুই হাত নিজের হাতে ধরেন। —"অনন্ত প্রেম এবং করুণা!—ভারতী অনুভব করলেন—তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। মাথার কেশ কণ্টকিত, স্তম্ভিত দেহ, নয়ন থেকে গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্রু। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভারতী যেন আত্মসংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। ঘটনার বহুদিন পরেও যখন তিনি আমাকে ঐ অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন [প্রবন্ধ লেখক বলেছেন] তখনো তাঁর মুখ আনন্দে জ্যোতির্ময়। ভারতী বললেন, 'সেদিন আমি শাস্ত্রকথার সত্যতা বুঝেছিলাম : গুরুর স্পর্শে শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিচেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়।' ভারতী নিবেদিতার কাছে দুদিন কাটান। নিবেদিতার প্রেরণাবাণী তিনি ঐ সময়ে শুনেছেন আর ভাবোন্মাদ হয়ে গেছেন। প্রশ্নের দ্বারা তিনি পত্রিকা পরিচালনা, মাতৃভূমির জাগরণ ও অন্যান্য বিষয়ে মূল্যবান বাস্তব নির্দেশ লাভ করেছিলেন ; ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা ক'রে নিজের অনেক সন্দেহমোচন করেও নিয়েছিলেন। ঐ দুই দিনের প্রেরণাবাণী ভারতীর মনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দিয়েছিল, এবং তাঁর পরবর্তী জীবনগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।"

লেখাটির তথ্যগত বাস্তবতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে, বিশেষতঃ নিবেদিতা-ভারতীর প্রথম সাক্ষাতের স্থান সম্বন্ধে। ভারতীর সঙ্গে কথাবার্তার কথা স্মৃতির উপরে নির্ভর ক'রে ইনি লিখেছেন, ঈষৎ স্মৃতিভ্রান্তি ঘটতে পারে না তা নয়, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা যে ভারতীর উপরে প্রায় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার পক্ষে আর একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

"কার্যকালে তাঁর রক্ত হিম হয়ে" যায়, এবং তিনি পলায়ন করেন।[৪০] ওকাকুরা-গোষ্ঠীর "কনিষ্ঠতম বিদ্রোহী" বলে আত্মপরিচয়দানকারী চারুচন্দ্র দত্তর এই অশ্রদ্ধাসূচক বক্তব্যের সঙ্গে উক্ত গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পরিচালক ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্যের পার্থক্য ঘটেছে। দিল্লীর দরবারের কয়েক মাস পরের এক চিঠিতে তিনি পরমেশ্বরলালের প্রশংসাই করেছেন দেখতে পাই। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ লিখেছেন :

"তোমাকে জানানো উচিত যে, ঠিক এখন লণ্ডনে আমার [দলের] একটি চমৎকার মানুষ রয়েছে—নাম পরমেশ্বরলাল। বেশী শীতের সময়টিতে সে ফ্রান্সে, বা আরও দক্ষিণাঞ্চলে কাটাতে ইচ্ছুক। সে জন্য মঁসিয়ে নোবেলের উদ্দেশ্যে তাকে একটি চিঠি দিয়েছি। তার সঙ্গে যদি তুমি লণ্ডনে দেখা করো, কৃতজ্ঞ হব। আমার মা যে-কোনো সময়ে তার সন্ধান তোমাকে দিতে পারবে।"

এর অল্পদিন পরে লেখা এক চিঠিতে পরমেশ্বরলাল তাঁর উপরে নিবেদিতার প্রভাবের বিষয়ে মুক্ত স্বীকারোক্তি করেছেন। ওর মধ্যে পি মিত্র ইত্যাদির অন্তরঙ্গ উল্লেখ থেকে পরমেশ্বরলালের রাজনৈতিক মতিগতির আভাসও মেলে। ২১ অক্টোবর, ১৯০৪, তিনি নিবেদিতাকে লণ্ডন থেকে লেখেন :

"আপনার পত্রের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। যতদিন-না যথেষ্ট সময় পেয়ে ঠিক কী বলব নির্ধারণ করতে পারি ততদিন আপনার পত্রের পুরো উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। বর্তমানে আমি আপনাকে কেবল অর্ধাংশে বুঝতে পেরেছি—তাও পেরেছি কি? সংবাদের জন্যও ধন্যবাদ। জেনে আনন্দিত যে, [ভারতে] শিল্প-জাগরণ সত্যই হয়েছে, কেবল বাইরের হৈ-চৈ নয়। ইউনিভার্সিটি বিল, শিক্ষার উপরে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কোনো ভয় নেই। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল একটা ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোটাধিকার হরণ—এরা আমার জানা অন্য যে-কোনো কারণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমাগত ভয়ানক বিপদ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ও উদ্বোধিত করে তুলবে। মন্দ থেকেই শুভের জন্ম—শিব, মৃত্যু ও জীবন উভয়েরই দেবতা।

"আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, একদিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও আপনার বিরাট আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ—আমারও গুরু। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে একেবারে আশাহীন ছিল আমার জীবন। আপনিই আশা দিয়েছেন—তার দ্বারা আমার নৈরাশ্য কিছুটা দূরীভূত। এ-বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা খুবই সত্য।

"মিঃ পি মিত্রের অসুস্থতার সংবাদ শুনে আমি দুঃখার্ত। আশা করি, এর পরে যখন চিঠি লিখবেন তার মধ্যে ওঁর বিষয়ে ভালো সংবাদ দেবেন। মিস সরলা ঘোষালের অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোনো অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানাবেন কি? শুনলাম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে আন্তঃপ্রাদেশিক স্পোর্টস সংগঠনের অভিপ্রায় তাঁর আছে। তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা কি রকম?"

কিছুদিনের মধ্যে লেখা এক চিঠিতে (২৬·১·১৯০৫) নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের কাছে পরমেশ্বরলালের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার রূপকে দু'চার আঁচড়ে পুরো ফুটিয়েছিলেন :

"তোমার কাছে পরমেশ্বরলাল নিজেকে মেলে ধরুক, এই আমার ইচ্ছা। রিচ [নিবেদিতার ভাই] মনে করে—পরমেশ্বরলাল নেতা-চরিত্রের, আর বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় রক্তে তার জন্ম। সে যেন তোমাকে তার পিতামহের কাহিনী শোনায়। সে কিন্তু আবার অনেক সামরিক ব্যক্তির মতো মতামতের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্র ও সংকীর্ণ। এ ধরনের লোক প্রশাসনিক কার্যের জন্যই জাত—মননগত

৪০ চারুচন্দ্র দত্ত, 'পুরনো কথা—উপসংহার', (১৩৫৯), ৯-১০।

বিচার-বিশ্লেষণের জন্য নয়। এরা অন্যের মতের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই নির্ধারিত। ভারতের প্রয়োজন কিন্তু এক নতুন ধরনের মনঃপ্রকৃতি। সেটা এলেই তবে প্রযুক্তি-কার্য নিরাপদ হতে পারবে। সেইপ্রকার মন এসে গেলে—কাজ সঙ্গে না-এসে পারবে না। তবে এসব বিষয় বুঝবার সামর্থ্য অর্জন করতে হলে পরমেশ্বরলালকে আরও অনেক পরিণতিলাভ করতে হবে। তার অসামর্থ্য বর্তমানে আরও জটিল ধরনের, যেহেতু তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কেবল আইনজীবী হিসাবেই, আর তা মানুষকে পৌরুষলাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ক'রে ফেলে। তুমি বলেছ, সে আমার অনুগত—শুনে আমি খুশি। সে আরও অনুগত হোক—হবে কি। এই তার একমাত্র সুযোগ। আমি চাই সে খাতে ঢুকে পড়ুক—একই রক্তধারায়।"

পরমেশ্বরলাল নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষিত ধারায় কতখানি প্রবেশ করেছিলেন জানি না। তিনি কি সত্যই বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন? তাও আমাদের অজ্ঞাত। তবে দেখি, ১৯০৭ সালে লণ্ডনে ভারতীয় সমাজে তিনি বিশিষ্ট চরিত্র। রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার জুলাই, ১৯০৭ সংখ্যায় একটি সাক্ষাৎকার-বিবরণী বেরিয়েছিল—বিষয় মর্লে-র প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার।[৪১] ওর মধ্যে দেখি, পরমেশ্বরলাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি "ইণ্ডিয়ান সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট," এবং "চতুর, স্থিরমস্তিষ্ক ব্যারিস্টার।" এই সাক্ষাৎকার-বিবরণ থেকে দেখা যায়—পরমেশ্বরলাল চড়া মডারেটী ভঙ্গি নিয়েছেন—তিনি মর্লে-র সমালোচনা ক'রে বলেছেন, প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপনকালে মর্লে যথেষ্ট উদার ছিলেন, পরে একেবারে গুটিয়ে যান ; তাঁর এই পশ্চাদ্‌অপসরণ ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পরমেশ্বরলালের এই বাহ্য মডারেটী ভঙ্গি ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত, ঠিক বলতে পারব না। তিনি তখন ভারতে ফেরার পথে, সুতরাং উগ্র রাজনৈতিক মত প্রকাশ ক'রে যাত্রা বিঘ্নিত করতে হয়ত চাননি। তাছাড়া, মর্লে-প্রস্তাবের আদি রূপকে স্বাগত জানিয়ে, পরবর্তী বিকৃত রূপান্তরকে আক্রমণ ক'রে, তিনি শাসকদের কথা ও কাজের অসঙ্গতি প্রমাণে সচেষ্টা ছিলেন কিনা, তাও জানি না। তবে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখব—নিবেদিতা মর্লে-সহ ভারতের বৃটিশ প্রশাসকদের উদ্‌ঘাটিত করতে একই ধরনের কৌশল নেবার কথা ভেবেছিলেন।

পরমেশ্বরলালের উদ্ধৃত পত্র, এবং নিবেদিতার পত্র দেখিয়ে দেয়, উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সেসব চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে পরমেশ্বরলালের একটি লেখায় নিবেদিতার প্রতি তাঁর সুগভীর ভক্তির কথা পেয়েছি। তিনি অকুণ্ঠে বলেছেন, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায়, নিবেদিতাই ছিলেন জাতীয় চেতনাসৃষ্টির প্রধান উৎস।

হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকার ১৯১৬ অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায় নিবেদিতার "রিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম" নামক মরণোত্তর পুস্তকের দীর্ঘ আলোচনা পরমেশ্বরলাল করেন। তার মধ্যে জাতীয় জাগরণে নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে তিনি অনেক কিছুই বলেছিলেন। যথা :

"ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলাদেশের নূতন জাতীয় আন্দোলনের একেবারে প্রাণ-প্রতিভা ও প্রতিমার মতো ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর রচনা, দৃষ্টান্ত, ও কথোপকথন কলকাতার তরুণদের মনে জাতি-মর্যাদা, জাতীয় আত্ম-ঘোষণা, এবং জাতির বিরাট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগানোর ক্ষেত্রে নব ভাবসঞ্চারে যে-ভূমিকা নিয়েছিল, তার তুল্য ভূমিকা অন্য কিছুর ছিল বলে

৪১ *Review of Reviews*, July, 1907, "Interviews On Topics of The Month," *An Indian Policy For India : Mr Parmeshwar Lall.*

জানা নেই। কার্জনী অপশাসনের সেই অন্ধকার দিনগুলিতে—জাতীয় কংগ্রেস যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ, যখন দারুণতর অধঃপতন ভিন্ন ভারতের কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য গোচর নয়—তখন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আধ ঘণ্টার আলাপ আমাদের মধ্যে যে-প্রকার আশা ও আলোক এনে দিত, তার রূপ এখন উপলব্ধি করা বা বর্ণনা করা, কোনোটাই সম্ভব নয়।"

নিবেদিতার রচনায় প্রাণশক্তি অসামান্য, তাঁর অপরিচিত মানুষেরা তার থেকে উদ্দীপনা ও মনঃপ্রকর্ষ অবশ্যই লাভ করবেন, কিন্তু পরিচিতজনেরা সেই লেখাগুলির সঙ্গে রচয়িত্রীর ব্যক্তিত্বকে যুক্ত ক'রে আশ্চর্য অগ্নিস্পর্শ পেতেন, তার কথা পরমেশ্বরলাল বিশেষভাবে বলেছেন :

"আমাদের মতো যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের কাছে ভগিনীর বইগুলি এবং রচনাগুলি (হায়, তারা কতই ক্ষুদ্রাকার!) স্বভাবতই অতিরিক্ত অর্থ বহন ক'রে আনে। সে পরিচয়ের অর্থ কি, তা যাঁরা তাঁকে সাক্ষাতে জানেন নি, তাঁরা যত বিদগ্ধই হোন, শীতল অক্ষরে নিবদ্ধ রচনাগুলি কেবল পড়ে উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই ক্ষুদ্র বইটির পৃষ্ঠা যখন উল্টে যাচ্ছি তখন মনে ভেসে আসছে তাঁর বাগবাজারের ক্ষুদ্র বাড়ির উপরতলার ঘরটির দৃশ্য—তাঁর সেই জ্বলন্ত বাক্যের প্রবাহ, যার দ্বারা শ্রোতাদের মনে সর্বাধিক মহৎ, সর্বাধিক পৌরুষপূর্ণ অনুভূতিকে তিনি জাগরিত করে দিতেন।"

১৯০২-১৯০৫ পর্বে ভারতীয় জাতীয় জাগরণে নিবেদিতার বিশেষ ভূমিকার বিষয়ে ইতিপূর্বে যেসব তথ্যপ্রমাণ দিয়েছি, তার সঙ্গে পরমেশ্বরলালের নিম্নের সাক্ষ্যকে যোগ করে দেওয়া যায় :

"নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভিক বৎসরগুলির নৈরাশ্যের মধ্যে—যখন এমন-কি [রাশিয়ার উপরে প্রাচ্য] জাপানের বিজয় ভারতীয় জাতীয়তার প্রেরণা সঞ্চার করেনি, তারও আগে—যখন আমরা তাঁর বাগবাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতাম তখন নব জাতীয়তার চেতনায় আমরা উজ্জীবিত ; তখন আমরা গর্বিত যে, আমাদের জন্ম হয়েছে ভারতভূমে।"

নিবেদিতা কিভাবে স্বাধীনতার জন্য অসহ্য বাসনা যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতেন, সে প্রসঙ্গে পরমেশ্বরলাল লিখেছেন :

"[আমাদের] একজন [তাঁর কাছে] বৃটিশ-মহিমার কথা বলেছিল—সেই শাসন আমাদের দেশে ধন-প্রাণের ক্ষেত্রে কোন্ নিরাপত্তা এনেছে, সেকথাও। তা শুনে নিবেদিতা ফিরে একটি ক্ষুদ্র খাঁচার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন,—খাঁচাটিতে কয়েকটি ক্যানেরি পাখি ছিল। তিনি বললেন, 'এই খাঁচাটি হল তোমার মঙ্গলময় বৃটিশ-শাসন, তোমরা ক্যানেরি পাখি, খাওয়া পাচ্ছ, নিরাপদে আছ, কিন্তু তা ক্ষণিকের সুখসেবন ছাড়া কিছু নয়। না না,পালিত রক্ষিত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হওয়ার চেয়ে দুঃখ-যন্ত্রণার স্বাধীনতা অনেক ভালো [এই ধরনের ঘটনার পরে] তিনি নির্মমভাবে বৃটিশ শাসনের তথাকথিত আশীর্বাদের স্বরূপ খুলে ধরতেন। তথ্যগুলি নূতন ছিল না। তথ্য নূতন হয় না। কিন্তু যেভাবে তিনি তাদের উপস্থাপিত করতেন সে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি—অনিবার্য তাদের শক্তি।"

পরমেশ্বরলাল তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই ভবিষ্যৎবাণী ক'রে :

"ভারতীয় জাতীয়তার জন্মে সহায়তা করেছেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মহাদিন যখন আসবে তখনি কেবল তাঁর রচনাবলীর সামগ্রিক প্রভাবের রূপ পুরোপুরি সমাদৃত হতে পারবে। তখনই কেবল তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এবং, ভারতীয়

জাতীয়তার মন্দিরে ঐ বিরাট বাঙালী সন্ন্যাসীর আসন থেকে খুব বেশি দূরে তাঁর শিষ্যার স্থান নির্ধারিত হবে না।"[৪২]

॥ ৬ ॥ নিবেদিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশ : অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় ঠিক কখন, কোথায় হয় আমরা জানি না। তবে সে পরিচয় ১৯০২ সালের প্রথম ভাগ থেকে 'বিশেষ' রাজনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাতে সন্দহ নেই, কারণ চিত্তরঞ্জন, নিবেদিতা-ওকাকুরার প্রাথমিক বিপ্লবচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে অরবিন্দের চেষ্টায় সংগঠিত পাঁচজনের বিপ্লব-পরিষদের সহ-সভাপতি রূপে নিবেদিতার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠতর যোগ হয়, তাও বুঝতে পারি। চিত্তরঞ্জন অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে সাক্ষাৎ বৈপ্লবিক সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতির ইতি হয়নি। আর সে কী সাহায্য, তুলনা নেই তার। বৎসরের পর বৎসর আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বিপ্লবীদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন—এবং নানা পরিমাপে তাতে সফল হয়েছেন। ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকার শক্তিতে বলব—ফাঁসি বা দ্বীপান্তর থেকে অরবিন্দকে বাঁচিয়ে পৃথিবীর জন্য তাঁকে দান করেছেন চিত্তরঞ্জনই। চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে নিবেদিতা সেই কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছেন।

নিবেদিতার চিঠিতে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বেশী না হলেও দু'একটি অন্তত মূল্যবান মন্তব্য আছে। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন :

"চিত্ত দাশ [আলিপুর মামলার] আপীল কেসে অপূর্ব কাণ্ড করছেন। উল্টোদিকে প্রতিদিন এই বিস্ময় বাড়ছে—নর্টনকে কিভাবে কারো পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত করা হল।" [নর্টন ব্যারিস্টার হিসাবে অপদার্থ]।

আলিপুরের মামলা নিষ্পত্তির পরে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ২৫ নভেম্বর, ১৯০৯, লিখেছেন :

"মঙ্গলবার শাস্তিঘোষণা করা হয়েছে। চিত্ত প্রাণদণ্ডের ধারা থেকে যে-অবধি তাদের মুক্ত করতে পেরেছিল, তখন থেকে প্রাণদণ্ডাদেশ অসম্ভব বিবেচিত হয়। যাই হোক, শাস্তিগুলি যৎপরোনাস্তি মন্দ।

"চিত্ত দার্জিলিঙয়ে ছিল—মস্তিষ্কের ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন। যখন প্রথম এল তখন মৃতের চেহারা—এখন একটু ভালো।"

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এইকালে নিবেদিতা ও চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎকারের ক্ষুদ্র অথচ চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন :

"দার্জিলিঙ-এ... রাস্তায় একদিন ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার [চিত্তরঞ্জনের] সাক্ষাৎ হয়। ভগিনী নিবেদিতার হাতে একটি বড় লাল গোলাপ ফুল ছিল। নিবেদিতা হাসিতে-হাসিতে মিঃ দাশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সেই গোলাপ ফুলটি মিঃ দাশের কোটের বোতামের ছিদ্রে

৪২ স্বদেশী আন্দোলনকালের বিশিষ্ট এক ব্যক্তির এই আশা, বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, স্বাধীনতালাভের পরে বেশ কিছু বৎসর অতিক্রান্ত হলেও পূরণ হয়নি, বরং দেখা যাচ্ছে, অতীতের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে অনুভূতিযোগে যুক্ত নন এমন কিছু ঐতিহাসিক পূর্বকালের তথ্যভিত্তিক সাক্ষ্যকে সংহার করবার জন্য কলমকে কুকরির মতো ব্যবহার করছেন॥

গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি আপনাকে মহৎ বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহা জানিতাম না।'" [পৃ· ৭৬১-৬২]

চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজনৈতিক সংস্রবের জন্য কতখানি ঝুঁকি নিয়ে চলছিলেন, তার উল্লেখ আছে নিবেদিতার চিঠিতে। ২ অগস্ট, ১৯১০, তিনি র‍্যাটক্লিফকে লেখেন:

"তোমাকে কি বলেছি—[প্রধান বিচারপতি স্যার লরেনস্] জেনকিনস্ কয়েক সপ্তাহ আগে চিত্তকে বলেছেন যে, তার নির্বাসনের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছিল, হতে প্যারেনি কেবল তাঁর [জেন্‌কিনসের] হস্তক্ষেপে ! এ ধরনের জিনিস আপাতত অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা জেন্‌কিনসকে বিশ্বাস না ক'রে পারি না। নির্বাসনের কারণ ? ওরা দেখতে পেয়েছে যে, (স্পষ্টত চিঠিপত্র খুলে পড়ে) চিত্ত কিছু লোককে টাকা পাঠিয়েছে, যাদের—মন্দ গন্ধ !!!"

নিবেদিতা ও চিত্তরঞ্জনের সম্পর্কের বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ দিয়েছেন উভয়ের বিশেষ পরিচিত বিপিনচন্দ্র পাল। সে সম্পর্ক কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়—আধ্যাত্মিক জগতে। চিত্তরঞ্জন তাঁর ধর্মবোধের দার্শনিক অংশে নিবেদিতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার চিত্তরঞ্জন স্মৃতি সংখ্যায় (১ জুলাই, ১৯২৭) *Chittaranjan's Religion* নামক প্রবন্ধে বিপিন পাল সেই কথাই বলেছেন। পারিবারিকভাবে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন দাশ উগ্র ব্রাহ্ম ; পিতা ভুবনমোহন নাতি উগ্র কিন্তু স্থিরবিশ্বাসী ব্রাহ্ম। তথাপি চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মধর্মে অনুৎসাহী, ইংলণ্ড থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে অজ্ঞেয়বাদী, 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থের কবিরূপে দেহবাদী, সেজন্য ব্রাহ্মসমাজে নিন্দিত, পরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-প্রদর্শিত নব ব্রাহ্মধারার অনুরাগী সমর্থক, যার মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে জাতীয়তার সমন্বয়চেষ্টা ছিল এবং স্বীকৃত হয়েছিল মানবের স্বাধীনতার অধিকার। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে 'বিজাতীয়' ভাবের প্রসারে ইতিমধ্যেই বিতৃষ্ণাবোধ করেছেন—এখন ব্রজেন্দ্রনাথের মতবাদে আশ্বস্ত হবার সুযোগ পেলেন। এর পরেই তিনি জড়িত হয়ে পড়লেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে—সরাসরি এসে গেলেন নিবেদিতার প্রভাবে। বিপিনচন্দ্র দেখাবার চেষ্টা করেছেন—নিবেদিতার সান্নিধ্য তাঁকে সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যের অস্তিত্ববোধে এমনভাবে জাগ্রত করতে পেরেছিল যে, পরবর্তীকালে নিখিলবিস্তারী বৈষ্ণবীয় প্রেমচৈতন্যের জগতে তাঁর উত্তরণ সম্ভবপর হয়েছিল। (চিত্তরঞ্জনের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বিপিন পাল এখানে বলেননি। সে-বিষয়ে যেসব সংবাদ পেয়েছি, তাদের উপস্থিত করেছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে)।

চিত্তরঞ্জনের উপরে নিবেদিতার প্রভাব সম্বন্ধে বিপিন পালের রচনাংশে এই (অনূদিত):

"স্বদেশী আন্দোলন চিত্তরঞ্জনকে [ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-প্রবর্তিত] ব্রাহ্ম-চিন্তার এই ধারার উৎসাহী সদস্য করেছিল। [স্বদেশী আন্দোলনের] নব জাতীয়তার আহ্বান চিত্তরঞ্জনের জাতীয় চৈতন্যকে গভীরতর করে তুলল—তাঁকে উদারতর ও পূর্ণতর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দান করল—যা পূর্বে ছিল না। তাঁর ধর্ম এখন তাঁর রাজনীতির অংশ হয়ে গেল, এবং রাজনীতি হল তাঁর ধর্মজীবনের অঙ্গাঙ্গি বস্তু। সেইসঙ্গে পূর্বের মতোই এখনো 'স্বাধীনতা' মৌল সুর হয়ে রইল। আমাদের আধুনিক ইতিহাসের স্বদেশী আন্দোলন পর্বে চিত্তরঞ্জন ভগিনী নিবেদিতার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ভগিনী নিবেদিতার সুতীব্র আবেগময় প্রকৃতি। আমি যখনই তাঁর মুখোমুখি

বসেছি, সর্বদাই এমার্সনের কথাগুলো মনে না পড়ে পারেনি—'তাঁর শরীর পর্যন্ত চিন্তা করে।' নিবেদিতার ক্ষেত্রে চিন্তা কেবল মানস-প্রক্রিয়া নয়, তা একইসঙ্গে সজীব সচল শারীর ক্রিয়া। নিবেদিতার সমগ্র অস্তিত্ব যেন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর ঐকতানে যুক্ত। যাকে আমরা জড় প্রকৃতি বলি তা নিবেদিতার কাছে মানুষের মতোই প্রাণময় ভাবময়। আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তমান রূপ এই অনন্য চৈতন্যময়ীর দেহ ও মনে অপূর্ব অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাত। আমি মনে করি, চিত্তরঞ্জন পরবর্তীকালে প্রকৃতির সঙ্গে যে-প্রকার সাযুজ্য বোধ করতেন—তা নিবেদিতার সান্নিধ্যের ফল। চিত্তরঞ্জনের মনের এই পর্যায়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর 'সাগর সঙ্গীত' কাব্যে; আত্মার বিবর্তনের প্রকাশও সেখানে। 'সাগর সঙ্গীতে'র জগৎ—যেখানে অনন্তের বুকে বারি ও ঝঞ্ঝার বন্য শক্তির নিত্যলীলাকে আদর্শায়িত ও অধ্যাত্মভাবমণ্ডিত করা হয়েছে—সেখান থেকে বৈষ্ণবীয় ভাব ও শিল্পের জগতের ব্যবধান সামান্যমাত্র।"

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক মামলা সূত্রে, তার পূর্বেও, অনেক দেশহিতৈষী আইনজীবীর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ হয়। এঁদের অগ্রণী একজন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি থেকে আগেই দেখেছি, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সমিতির সঙ্গে প্রথমাবধি যুক্ত। ডঃ সুমিত সরকার তাঁর পূর্বকথিত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের কথা বলেছেন, বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগের কথা। সুমিত সরকারের রচনা থেকে আমরা জেনেছি: অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯৪৫) ইংলণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসেন, কলকাতায় পসার জমেছিল, রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে ইণ্ডিয়ান মিরারে রাজনৈতিক পত্রাদি লিখেছেন, ১৯০৩ সালে কুমিল্লায় বক্তৃতা করতে গিয়ে শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার ডাক দিয়েছেন, ১৯০৪ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে অংশ নিয়েছেন, পি মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, অনুশীলন সমিতির আদি ভব্য পর্বে তার সঙ্গে যুক্ত, জ্বলন্ত বাগ্মী, স্বদেশী মামলায় অভিযুক্তদের আইনজীবী, সর্বোপরি স্বদেশী আন্দোলনকালে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, (অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্বকুমার ঘোষ, প্রেমতোষ বসু), বার্ন কোম্পানীর, সরকারী প্রেসের, চটকলের, ট্রামের, ধর্মঘট-সংগঠক। অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর চরমপন্থা বেশিদিন বজায় রাখতে পারেন নি। ১৯০৬ সালে এই বয়কট-সমর্থকের কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হয়ে ঢুকে পড়া অনেকের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। এই পর্বেও তাঁর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়নি। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তখনো বজায় ছিল, কারণ নিবেদিতা সহজে বন্ধুত্ব ছেদন করতেন না, বিশেষত যদি স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক মানুষ তিনি হন। শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবিশ অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা নিবেদিতার দুটি চিঠির প্রতিলিপি আমাদের দিয়েছেন (বিস্ময়ের কথা, সুমিত সরকারের মতো সন্ধানী গবেষকের চোখ এড়িয়ে গেছে চিঠি-দুটি, যিনি একই সংগ্রহ ব্যবহার করেছেন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ ছিল এমন ব্যক্তিদের নামের লম্বা এক তালিকা দিয়েছেন, যার মধ্যে নিবেদিতার নাম নেই!)—তার থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার সৌহার্দ্যের রূপ বোঝা যায়। একটি চিঠির উল্লেখ আগেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে করেছি। আর একটি চিঠিতে (১ অগাস্ট, ১৯০৭) নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "দুঃখী মানুষদের সাহায্য করতে যাওয়ার" বিষয়ে কিছু বলেছেন, কিন্তু তার সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ আমরা জানি না। এই চিঠিতেই নিবেদিতা তাঁর বাসভবনে বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন:

"[অগাস্ট] মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে [আমাদের] বাড়ি নিশ্চয় খোলা থাকবে। আমি ও সিস্টার ক্রিস্টিন একযোগে আপনাকে উত্তপ্ত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—যাতে আপনি আপনার চিন্তাভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জানবার সুযোগ আমাদের দিতে পারেন। আপনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেন—'অসংশোধনীয় অলস'—অবশ্যই তা নন, এবং একথাও সত্য, প্রত্যেক মানুষের এমন সঙ্গ চাই যেখানে তার হৃদ্য আদর্শের স্বীকৃতি আছে—যদি সে নিজ জীবনকে মহৎ ও বৃহৎ করতে চায়।"

এই চিঠি নিবেদিতা যখন লিখেছেন তখনো অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নিন্দনীয়' কাজটি করেন নি। পুলিশী রিপোর্টে যিনি একদা 'সবচেয়ে বিপজ্জনক' ব্যক্তি বলে বিপিন পালের সঙ্গে বন্দীবদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ১৯০৭ নভেম্বর মাসে ক্ষমা চেয়ে রাজদ্রোহ অভিযোগ থেকে ছাড়ান নিলেন। "ইনি কি সেই অশ্বিনীবাবু যিনি একদিন ধর্মঘটী প্রেস-কর্মচারীদের জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষুকের মতো সাহায্য চেয়ে ফিরেছেন,"—'নবশক্তি' ১২ নভেম্বর, ১৯০৭ তারিখে লিখেছিল। এঁর এবং ট্রেড-ইউনিয়নে উৎসাহী অন্য নেতাদের পশ্চাদ্‌অপসরণ বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটিকে দুর্বল করেছিল। নিবেদিতা সোৎসাহে একদিন বার্ন কোম্পানীর ধর্মঘটের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পরে আর সেই প্রকার উৎসাহজ্ঞাপনের সুযোগ পাননি। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের এই বিচ্ছেদ তুলনায় কটু বিপরীত চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল যখন দেখা গেল, তিলকের শাস্তির পরে মহারাষ্ট্রের শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে বাংলার শ্রমিকরা অনড়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এদেশের গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক-সহযোগ তুলনায় সামান্য, তার জন্য জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী, সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাই দায়ী। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ তারিখের নবশক্তি, বিপিনচন্দ্র পালের কারাদণ্ড সূত্রে যা লিখেছিল তা পরবর্তীকালের বহু ঘটনার সম্বন্ধে নমুনা-মন্তব্য বলে গৃহীত হতে পারে, "যদি এই [শ্রমিক] ইউনিয়নগুলি কিছু সক্রিয় পন্থায় বিপিনবাবুর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে [নবশক্তি লিখেছিল] তাহলে তা সমগ্র দেশে প্রেরণার কারণ হবে এবং জনগণের ঐক্যকে জোরদার করবে। আমরা আশা করি, বাবু অপূর্বকুমার ঘোষ এবং বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারায় কিছু করবেন। শ্রমিকরা যে-পর্যন্ত-না এইসব বিষয়ে আত্মত্যাগ শিক্ষা করছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের শৃঙ্খলমোচন হবে না। উৎপীড়নের কালে কিভাবে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাতে হয়, আজ তা রাশিয়ার শ্রমিকরা পৃথিবীকে শিখিয়ে দিচ্ছে—ভারতীয় শ্রমিকরা কি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে না?" [সরকার, ১৯৪, ১৯৬, ২১০, ২৫১]।

অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯০৭ সালের পরে নিবেদিতার কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা জানি না। বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন—প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যের পরে তা এক দীর্ঘ ছায়াজীবন।

চতুর্থ অধ্যায়

নিবেদিতা : বিপিন পাল : শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা : অ্যানী বেশান্ত

॥ ১ ॥ নিবেদিতা ও বিপিনচন্দ্র পাল : বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বর্ণান্তর

স্বদেশী আন্দোলনের যে-কোনো ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) নাম বড় অক্ষরে লেখা আছে। এই আন্দোলনের চরম উত্তেজনার সময়ে বছর-দেড়েক অন্তত তিনি বাংলা ও ভারতের অন্যতম প্রধান জাতীয় নেতা বলে স্বীকৃত। আবার দেখা যায়, ঐ পর্বের পরে দীর্ঘদিন জীবিত থেকে, যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়ে এবং লিখেও, রাজনৈতিক জীবনে কোনো দাগ তিনি কাটতে পারেন নি। তাঁকে আস্থাভাজনদের তালিকা থেকে যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিপিন পালের শক্তির কথা কেউই অস্বীকার করেন না—এবং সে শক্তি প্রধানত বক্তৃতার। স্বদেশী যুগে কিছুকাল তাঁর বাগ্মিতা বিস্ময়কর আকার ধারণ করেছিল—পরে অবশ্য তা বজায় থাকেনি—একথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন।[১] স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার আগে বিপিন পাল ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক-বক্তা, লেখক, এবং পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে আবার বৈষ্ণবধর্ম ঢুকে গিয়েছিল, কারণ পূর্বে-ব্রাহ্ম পরে বৈষ্ণব-আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বিপিন পালের আমেরিকায় একবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পাল তাঁর 'মার্কিনে চারি মাস' গ্রন্থে দিয়েছেন। সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর কাছেও লিখে পাঠিয়েছিলেন—জগদীশচন্দ্র তা আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখে পাঠান। শেষোক্ত পত্রের অংশ আগেই উপস্থিত করেছি।[২] বিপিন পালের লেখায় এই সংঘর্ষের জন্য স্বভাবতই দোষভাজন হয়েছেন নিবেদিতা। নিবেদিতার চিঠিতে এই বিষয়টির উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত বিবরণ নেই। যেটুকু আছে, তার থেকে বোঝা যায়, এ-ব্যাপারে নিবেদিতা পরবর্তী চিন্তাতেও নিজেকে দোষী মনে করেন নি। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিপিন পাল ও নিবেদিতা উভয়েই নিজ-নিজ ধারণার প্রতি অটুট আনুগত্য দেখিয়েছেন !!

নিবেদিতা ১৮৯৯ সালে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকার বস্টন শহরে মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে যখন অবস্থান করছিলেন—তখন সেখানে বিপিন পালও ছিলেন—ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকের ভূমিকায়। মিসেস বুলের বাড়িতে একদিন প্রাতরাশের সময়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, কারণ, পাল লিখেছেন : "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার [নিবেদিতার]

১ 'কথাবার্তা', ৫৪।
২ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৫৭৪।

একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার স্বচ্ছ-চিত্তে কখনও কোনো মনোভাব ঢাকা পড়িত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিলেন।"

বিবৃতিটি নিবেদিতার পক্ষে প্রশংসাসূচক নয়, এবং যে-আকারে প্রদত্ত সেই আকারে সত্য কিনা সন্দেহজনক। কেননা আমরা জানি, ব্রাহ্মমত ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নিবেদিতার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, যদিও ঐ শ্রদ্ধার অর্থ নয় তিনি মতভেদ বোধ করতেন না।

যাই হোক, বিপিন পালের বর্ণনা অনুযায়ী সংঘর্ষ একাধিকবার হয়েছে। মিসেস বুলের বাড়িতে বস্টনের বিদ্যালয়-শিক্ষয়িত্রীদের এক সম্মেলনে বিপিন পাল মিশনারিদের একটি অতি প্রিয় নিন্দার সমর্থন করলেন, যে-নিন্দায় ভারতবর্ষকে তখন অবিরাম লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল আমেরিকায়—জাতিভেদ হিন্দুসমাজের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে ইত্যাদি। বিদেশের হাটে বসে ঘরের কেচ্ছা গাইবার এই সাধু সরলতার মধ্যে নিবেদিতা ব্রাহ্ম সংস্কার-আন্দোলনের আত্মনিন্দার বিশ্ববিস্তার লক্ষ্য করেছিলেন বলেই ক্রুদ্ধ হন। তাছাড়া 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' হিন্দুসমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন দেখিয়ে বিদেশীর কাছে খাতির কুড়োবার প্রবণতা অনেক ব্রাহ্মের মধ্যেই এইকালে দেখা গিয়েছিল [এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়েছি]। এই জন্যই নিবেদিতা পালকে বলেছিলেন, "আপনি ব্রাহ্ম বলে হিন্দুধর্মকে নিন্দা করছেন।" পাল কিন্তু পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিবেদিতার উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে মন্দ আলোকে স্থাপন করেছেন। পালের সঙ্গে নিবেদিতার আরও সংঘর্ষ হয় যখন পাল স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দুদের স্বীকৃত ধর্মগুরু না বলে রামমোহন প্রভৃতির ন্যায় ধর্মসংস্কারকমাত্র বলতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা বলেন, ওটা একেবারেই মিথ্যা কথা ; হিন্দুরা স্বামীজীকে ধর্মগুরু বলে গ্রহণ করেছে। এখানেও স্মরণ করব—আমেরিকায় মিশনারি ও ব্রাহ্মপ্রচারের কথাগুলি : বিবেকানন্দ ভারতে স্বীকৃত ধর্মপুরুষ নন, তিনি নিজে গেরুয়া চড়িয়েছেন, একজন ভাগ্যান্বেষী ইত্যাদি। এ সম্পর্কেও 'সমকালীন' গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা আছে। [বিচিত্র কথা হল, একই বিপিন পাল পরবর্তীকালে অনবদ্যভাবে দেখিয়েছেন—বিবেকানন্দ হিন্দুদের যথার্থ ধর্মগুরু।[৩]]।

এইসব কথাবার্তায় নিবেদিতা অত্যন্ত আহত হন ; ভারতবর্ষ এবং নিজ গুরুর অসম্মান বলেই একে গ্রহণ করেন। ৬ মার্চ, ১৯০০, মিস ম্যাকলাউডকে এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সংবাদ দিয়েছেন :

"মিঃ পাল এবং আমি গত রাত্রে প্রকাশ্য সভায় একেবারে সরাসরি পরস্পরের কথার প্রতিবাদ করেছি। আমি মনে করি তাঁরই দোষ। তবে জানতে আগ্রহী, এ-ব্যাপারে ডাঃ ফ্যানার কী মনে করেন—তিনি উপস্থিত ছিলেন। জীবনে এত লজ্জিত কখনো হইনি কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম একই স্থানে অতিথি। প্রায় একশো লোক গোগ্রাসে আমাদের কথা গিলছিল।"

মিসেস বুল যে, এ-ব্যাপারে নিবেদিতার দোষ দেখেছিলেন, তাও একই চিঠি থেকে দেখা যায় :

"গতকাল প্রথম সুযোগেই তিনি [মিসেস বুল] আমাকে বলেন যে, [নিবেদিতা লিখেছেন] আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সবকিছু জানি, আমার এই ধারণা তাঁর মতে অনিষ্টকর ও বিভ্রান্তিজনক, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেন্ট সারার এসব কথা উত্তম, কিন্তু তিনি যদি একই সঙ্গে রমাবাঈ ও অন্যান্যদের

৩ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ· ২৭-৩৭ দ্রষ্টব্য।

প্রচারের সম্বন্ধে অসমর্থন জানাতেন !... যাইহোক বেচারা মিঃ পালও এই হৈ-চৈ-এর জন্য এতই লজ্জিত যে, আমার মনে হয় তিনি ভবিষ্যতে আরও বন্ধুভাবাপন্ন হবেন।"

[এইকালে আমেরিকায় মিশনারি-সমর্থিত পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের মুখগহ্বর থেকে কদর্য ভারতনিন্দার স্রোত বইছিল ; সে বিষয়ে 'সমকালীনে'র পঞ্চম খণ্ডে যথেষ্ট তথ্য দিয়েছি। বিপিন পালও সেই নিন্দায় অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। কিন্তু উল্টোদিকে তিনিই আবার রমাবাঈয়ের পক্ষে এখানে সংবাদ জোগান দিলেন !!]।

বিপিন পালের চড়া বক্তব্য নিবেদিতার দার্শনিক চিন্তাপুষ্ট ও অনুভূতি-স্পৃষ্ট বক্তব্যের এতই বিপরীত ছিল যে, তিনি সভায় পালের মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, বলা যায় আতঙ্কিত। [নিবেদিতাও আতঙ্ক বোধ করতে পারেন তাহলে !]। ৩০ মে, ১৯০০, নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রস্তাবিত "আওয়ার অবলিগেশন্ টু দি ওরিয়েণ্ট" বক্তৃতার খসড়া-রূপ দেবার পরে বলেন : "আমার আগে মিঃ পাল বলবেন—'মুক্ত ধর্মচিন্তায় ভারতের দান' সম্বন্ধে। য়ুম, আমার হাত নার্ভাস্‌নেসে কাঁপছে।"

এক্ষেত্রে নিবেদিতার আতঙ্কের মতো ব্যাপার ঘটেনি। পাল, ভারতের 'মুক্ত ধর্ম চিন্তার' কথা বলতে গিয়ে তাঁর বা তাঁদের বিবেচনামতো 'বদ্ধ ধর্মচিন্তা'গুলির উপর সগর্জনে ফেটে পড়েন নি। নিবেদিতা তা দেখে কতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন, পাল স্বয়ং তার বিবরণ দিয়েছেন :

"আমি যখন [বস্টনের এই] কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস্-এ বক্তৃতা করিতেছিলাম তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরবকাহিনী শুনিয়া নিবেদিতার দেহ-মন-প্রাণ-সকল গরবে ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক, নিবেদিতা তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। [পালের পুনশ্চ একটি অনুচিত উক্তি। জগদীশচন্দ্র বসু-সহ অনেক ব্রাহ্মসমাজীই ইতিমধ্যে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁদের কেউ-কেউ নিবেদিতার মুখের উপর নিজেদের ধর্মমতের পক্ষে এবং নিবেদিতার মতের বিপক্ষে বলেছেন]। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার গুরুনিন্দা করিয়াছি বলিয়া [পাল তাহলে স্বীকার করলেন, নিবেদিতার গুরুর তিনি নিন্দা করেছিলেন !] আমার উপরে যে-রাগ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত তাঁহার মনে রহিল্ না। ভারতের কীর্তিগাথা বিদেশীদের নিকটে গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চক্ষে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।"[৪]

নিবেদিতার ভারতপ্রেম এবং তুলনারহিত আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বিপিন পাল অন্যত্রও বলেছেন। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, পাল অন্য অনেকের মতোই বিশেষ জোরের সঙ্গে লিখেছেন : নিবেদিতার তুল্য ভারতপ্রেম এমনকি ভারতবাসীর মধ্যেও বিরল। নিবেদিতার সঙ্গে পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষের কথা মনে রাখলে, পালের এই ধরনের রচনার মধ্যে উদারতার পরিচয় আছে স্বীকার্য। পাল তাঁর 'সোল্ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মনোভঙ্গির মধ্যে দুস্তর পার্থক্যের উল্লেখের পরে বলেছেন : যদি কেউ পারিপার্শ্বিকের বন্ধন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেন, সংকীর্ণতার উপরে উঠে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আত্মিক সাযুজ্যকে অনুভব করতে পারেন, তবেই তিনি ভিন্নদেশীয় সভ্যতার যথার্থ বিশ্লেষণে সমর্থ হবেন। ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এই দুরূহ কাজ বিদেশীরা করতে পারেন নি।—

৪ *The Soul of India*. p. 38.

"আমার জানা একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে [পাল লিখেছেন]—মিস মার্গারেট নোবল—সারা ভারতে যিনি তাঁর গৃহীত নাম 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' নামে পরিজ্ঞাত এবং ভালবাসার সামগ্রী। নিবেদিতার আত্মবিলয় প্রায় সর্বাত্মক। এই বৃটিশ নারী ভারতের জন্য যে-প্রকার সর্বগ্রাসী ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ছিলেন, তার তুল্য ভালবাসা খুব কম ভারতবাসীর মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে, দেখা গেছে। নিবেদিতা যেভাবে আমাদের কাছে এসেছিলেন, সেইভাবে আর কোনো ইউরোপীয় আসেন নি। বিজ্ঞ রূপে নয়—জ্ঞানার্থী রূপে, আচার্য রূপে নয়—শিক্ষার্থী রূপে তিনি এসেছিলেন।... তিনি কদাপি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন নি, বিশেষ কোনো সম্মান নয়। এই ভারতবর্ষ ও তার মৃত্তিকার যে-রূপছবি তাঁর গুরু তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন, তারই সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সতী-হৃদয়ের ভালবাসায় তিনি পূর্ণ ছিলেন ; আমাদের মধ্যে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন ; সেই আত্মহারা ভালবাসার দ্বারা নবরূপে নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন ; হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সত্তা ও সংস্কৃতির যথার্থ দ্রষ্টা।"

নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে প্রচণ্ডতা ছিল, ভিতর থেকে অসহ্য শক্তির স্ফুরণ ঘটত—এর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেকেই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। *ফ্রেজার ব্রেয়ার* তাঁকে *'অগ্নিবজ্রবাহী'* রূপে দেখেছেন। নেভিনসন মনে করেছেন, নৈসর্গিক শক্তিসমূহের সমতুল তিনি, অগ্নির মতোই, যা ধ্বংস ও সৃষ্টিকারী, ভয়ঙ্কর ও কল্যাণকৃৎ। এঁরা কিন্তু কিভাবে, কোন্ মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে ঐ চরিত্র গঠিত হয়েছিল, তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি। যেটুকু ব্যাখ্যা দেখেছি, তা সাধারণভাবে নিবেদিতার উগ্র আইরিশ পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সমাপ্ত ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল আরও গভীরে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন। সর্বাংশে গ্রাহ্য বিবেচিত হোক বা না-হোক তাঁর বক্তব্য অনুধাবনের যোগ্য। তিনি নিবেদিতার মধ্যে সরাসরি গ্রীক প্যাগান-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। অবশ্য প্যাগান ভোগবাদ নিবেদিতার ক্ষেত্রে সত্য নয়, কিন্তু পালের মতে, প্যাগানীয় রক্তমাংসময় বাস্তবতা নিবেদিতার ধর্মবোধে প্রকাশিত ছিল। নিবেদিতা কেন প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গে পাল বলেছেন, ধরাবাঁধা নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ খ্রীস্টান ধর্ম মানবব্যক্তিত্বকে পঙ্গু ক'রে দেয়—সেই শীতল দেবতায় তুষ্ট থাকা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পালের বক্তব্য [যা তিনি 'ক্যারেকটর স্কেচেস্' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নিবেদিতা-বিষয়ক রচনায় প্রকাশ করেছেন]—ইহুদীদের জিহোবা কোনো-কোনো দিক দিয়ে খ্রীস্টানদের ঈশ্বরের চেয়ে ড্যায়নামিক। প্যাগান-ধর্ম ইহুদী-ধর্মের চেয়ে ড্যায়নামিক। নিবেদিতা, যিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করেছেন, বিজ্ঞানের বিমূর্তবাদ কাকে বলে জানেন, যিনি একই সঙ্গে আবেগপ্রবণ কাব্যিক চেতনার অধিকারিণী—তিনি খ্রীস্টীয় অথবা ইহুদী ধর্মপ্রকৃতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিকের বস্তুব্যাখ্যারীতির আংশিক সত্যতাকে মাত্র স্বীকার করতেন ; কিন্তু বিজ্ঞান তো প্রত্যক্ষের অতীত অপ্রত্যক্ষ রহস্যকে ব্যাখ্যায় সমর্থ নয়। গ্রীক প্রকৃতি-ধর্ম অবশ্য সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির সজীব রূপের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে—তার সারূপ্য নিবেদিতার স্বভাবে ছিল—এই অর্থেই তিনি প্যাগান। এবং নিবেদিতার সেই "চরম ড্যায়নামিক ব্যক্তিত্ব"—হিন্দুধর্মের একাংশে তাঁর মনোস্বভাবের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দর্শন করে তার অনুগত হয়ে পড়েছিল।

বিপিন পাল তারপর লিখেছেন :

"নিবেদিতা হিন্দুদের কালী-তত্ত্বের মধ্যে ধর্মসমূহের ক্ষেত্রে ড্যায়নামিক উপাদান সর্বাধিক লাভ করেছিলেন। ও-বস্তু আর কোথাও কালী-দর্শনের তুল্য আকারে পূর্ণাত্মকভাবে উপলব্ধ ও অভিব্যক্ত হয়নি। বস্তুতপক্ষে আমি সর্বদাই অনুভব করেছি যে, নিবেদিতা মর্মে-মর্মে চরমার্থে প্যাগান।

আক্ষরিকভাবে তিনি প্রকৃতির দুলালী। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসা প্রাচীন গ্রীকদের মতোই অতি আবেগময় ও ব্যক্তিগত। ভারত অথবা ইউরোপের আধুনিক নরনারীদের মধ্যে আমি এমন কোনো পুরুষ অথবা নারীর দর্শন পাইনি যাঁর সমগ্র অস্তিত্ব—শরীর মন আত্মা—বহির্গত প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সঙ্গে নিবেদিতার মতো একতন্ত্রীতে বাঁধা—যদিও শুনেছি, এই ধরনের কোনো-কোনো হিন্দুভক্ত নাকি আছেন। নিবেদিতার সমগ্র দেহযন্ত্র যেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সাড়া দেবার উপযোগী ক'রে নির্মিত—আমার তাই মনে হয়েছে।

"একদা নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসে চা-পান করছিলাম—বিচিত্র চেহারার স্বদেশী কাপে ক'রে। সহসা আকাশ ঢেকে গেল ঘোর কৃষ্ণভয়ঙ্কর মেঘে—গ্রীষ্মসন্ধ্যায় যেমন ঘটে থাকে। আর তখনি—গৃহকর্ত্রীর হাবভাবে সুস্পষ্ট পরিবর্তন। দারুণ গতি-স্পন্দিত নিসর্গ প্রকৃতির প্রতিফলন নিবেদিতার মুখমণ্ডলে। নূতন আলোকের উদ্ভাস সেখানে—ভয়ঙ্কর অথচ মনোহর। স্তব্ধ হয়ে তিনি উপবিষ্ট ; আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন অসচেতন, জানলা দিয়ে একাগ্র চোখে দেখছেন আকাশ ও পৃথিবীতে ঘনাচ্ছে কোন্ সর্বনাশের সংকেত, যেন সমাহিত হয়ে শুনছেন আসন্ন ঝঞ্ঝার ক্রমোচ্চ গর্জনধ্বনি। আর তখনি, যেই ঝলসালো প্রথম বিদ্যুৎ, বিদীর্ণ হল প্রথম বজ্র, নিবেদিতা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন—কালী।

"আমি সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, দৈববশে খ্রীস্টানদের মধ্যে জন্মপ্রাপ্ত কিন্তু স্বরূপে প্যাগান এই নারী কোন্ আকর্ষণে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। নিবেদিতা অত উৎসাহে যে আমাদের কালীকে গ্রহণ করেছিলেন, তার মূল কারণ, তিনি কালীর মধ্যে যাকে বলা যায় নৈসর্গিক শক্তি-ধর্ম (Nature Religion)—তারই সবচেয়ে নিখুঁত রূপ দেখতে পেয়েছিলেন।"

বিপিন পালের এই ব্যাখ্যা সর্বথা স্বীকার্য অবশ্যই নয়। কালীকে পাবার জন্যই নিবেদিতা ভারতে আসেন নি, ভারতে আসার পরেই তিনি কালীকে পেয়েছিলেন। তাছাড়া কালীর মধ্যে তিনি নৈসর্গিক প্রকৃতি-ধর্মই কেবল দেখেন নি—সেখানে সর্বোচ্চ বৈদান্তিক চিন্তার ব্যবহারিক প্রকাশও দেখেছিলেন—এক-সত্যের রূপ বোঝাতে সৃষ্টি ও ধ্বংস যেখানে সমসত্যের আকারে উপস্থাপিত। তথাপি বিপিন পালের রচনায় প্যাগানিজম্-এর আধুনিক বিশুদ্ধ রূপের আকার, এবং নিবেদিতার চরিত্র ব্যাখ্যায় তার প্রয়োগ যেভাবে দেখা গেছে, তা সত্যই চিত্তাকর্ষক।

পূর্ব প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাক। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় সংঘর্ষের পরে ব্যাপারটিকে নিবেদিতা উভয়ের মানসিক বিচ্ছেদে পর্যবসিত করতে চাননি। কিছুদিনের মধ্যে ইংলণ্ডে নিবেদিতার মায়ের সঙ্গে বিপিন পালের সাক্ষাৎ হয়—পাল ভারতীয় রীতিতে নিবেদিতা-জননীকে শ্রদ্ধা জানান। নিবেদিতার কাছে তা গভীর কৃতজ্ঞতার কারণ হয়। উইম্বলডন থেকে নিবেদিতা ২৯·৯·১৯০০, মিসেস বুলকে লেখেন :

"মনে হয়, তুমি জানো যে, কোনো এক জায়গায় মায়ের সঙ্গে মিঃ পালের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আমাকে জানেন কিনা ? মিঃ পাল যে, তাঁর বিরাট জনপ্রিয়তার ক্ষণেও, আমার মাকে প্রাচ্যরীতিতে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সময় ক'রে নিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর প্রতি সত্যই সুগভীর প্রীতিবোধ করছি।"

আমরা আরও দেখি, স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক আগে নিবেদিতা তাঁর 'ওয়েব' গ্রন্থের কিছু অংশ পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।[৫] তিনি নিবেদিতার উক্ত গ্রন্থের কোন্ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, তাও আগে জানিয়েছি।

বিপিন পাল তাঁর উল্লিখিত 'সোল্ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন: "এই কংগ্রেস অব রিলিজিয়নস্-এর অধিবেশনে ভারতের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত মতভেদ সত্ত্বেও চিরদিন অটুট ছিল।" এই ধরনের কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। কিন্তু পাল আবার উভয়ের অবিরাম সংঘর্ষের কথা বলেছেন। "আমাদের ফলিত জ্যোতিষে মানুষের একটা 'গণ' নির্দিষ্ট থাকে—কেহ দেবগণ, কেহ নরগণ, কেহ-বা রাক্ষসগণ। নিবেদিতার কোন্ 'গণ' ছিল জানি না, আমারই বা কি 'গণ', সে কথাও মনে নাই। কিন্তু আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই সেই প্রথমদিন অবধি যেরূপ দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে নিবেদিতার দেবগণ এবং আমার রাক্ষসগণ—এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুন উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় কোনো বৈরিতার লেশমাত্র জাগে নাই।... স্বর্গীয় পি মিত্র মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, নিবেদিতা আমার কথা উঠিলেই বলিতেন—'পালের দাঁতগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? ঐ দাঁত দেখিলেই আমার মনে হয়, তাহার ভিতরে বাঘ লুকাইয়া আছে'।" ['মার্কিনে চারি মাস']

বিপিনচন্দ্রের লেখা থেকে মনে হতে পারে, উভয়ের সংঘর্ষ বুঝি কেবল ধর্মীয় বা সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে হয়েছিল। না, তা সত্য নয়। পালের বলা উচিত ছিল—ঐ সংঘর্ষ শেষের দিকে প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ঘটে। নিবেদিতা, আমরা ধরে নিতে পারি, রাজনীতিতে পালের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। মডারেট থেকে একসট্রিমিস্ট ভূমিকায় পালের রূপান্তর—অরবিন্দর আগেই ভারতে চরমপন্থী আন্দোলনে পালের নেতৃত্ব[৬]—এ সবই তিনি দেখেছেন। বয়কট প্রস্তাবের পক্ষে পাল প্রধান ও প্রচণ্ড প্রচারক—কংগ্রেসকে দিয়ে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করাবার জন্য তাঁর সবিশেষ চেষ্টা—তাঁর বক্তৃতায় দেশের নানা দিকে উন্মাদনার স্রোত—'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার লেখকরূপে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার শক্তি—নিবেদিতা প্রত্যক্ষে জেনেছেন। পালের ভূমিকা সম্বন্ধে অরবিন্দর সমকালীন প্রশংসাপূর্ণ মনোভাব তাঁর না-জানার নয়। অরবিন্দর মতে, বিপিন পাল ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তায় সমর্থ। স্বদেশী যুগে পালের দ্বারা উদ্ভাবিত 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-তত্ত্বের সূত্রেই অরবিন্দের এই সিদ্ধান্ত। অরবিন্দ বলেছেন:

"Srijut Bepin Chandra Pal, the Prophet and first preacher of passive resistance."[৭]

এই ধরনের কথা অরবিন্দ আগেও বলেছেন। হরিদাস মুখার্জি ও উমা মুখার্জির 'শ্রীঅরবিন্দ অ্যাণ্ড দি নিউ থট্ ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিকস্' গ্রন্থে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা থেকে অরবিন্দর বলে যেসব রচনা সংকলিত হয়েছে তাদের অনেকগুলিতেই উপরিউক্ত ধরনের প্রশংসাসূচক উক্তি পাই। ১২

৫ আত্মপ্রাণা, ২৪৩।
৬ রমেশ মজুমদার, ২য়, ১৫৪।
৭ কর্মযোগিন্, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০। গিরিজাশঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭০।

সেপ্টেম্বর ১৯০৭, 'দি মার্টারডাম্ অব বিপিনচন্দ্র' রচনায় বলা হয়েছে :

"...The Nationalist orator and propagandist, the most prominent public figure in the New Party in Bengal...the man with a historic mission..."

এই লেখায় একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ছিল—বিপিন পাল বন্দেমাতরম্ মামলায় সাক্ষ্য দিতে যে অস্বীকার করেছেন তা বয়কট-নীতির অনুসরণে নয়—বিবেকের নির্দেশে। বয়কট-পদ্ধতির ওহেন প্রবল সমর্থক—রাজনৈতিক বয়কট-নীতির বদলে অরাজনৈতিক ও অস্পষ্ট বিবেক-নীতির অনুসরণ করেছিলেন কেন—তার কারণ অবশ্যই আইনগত। এখানে নিউ পার্টির নেতার কথা ও কাজে যে-ফারাক দেখা গেল, তাকে জোড়া দিতে অরবিন্দকে চমৎকার কিছু বাক্য রচনা করতে হয়েছিল, যার থেকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কৃতকার্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় যথেষ্টই পাই, কিন্তু নিউ পার্টির নেতার কৃতকার্যের যৌক্তিকতা বুঝতে পারি না :

"It was distinctly declared by Bepin Babu that it was not as a boycotter, not with the political intention of making the working of the bureaucratic law-courts impossible, that he declined to give evidence or take the oath...A few men like Bhupendra Nath Dutt have realised freedom in their souls and refuse to be bound by any limitations of an alien making, may decline to have anything to do with the law which the nation has no hand in framing and the courts over which the nation has no control, *but this has not yet become the adopted policy of the New Party and there was no moral compulsion on its leader to make any such refusal.*"

পার্টির নেতা যে-তত্ত্ব প্রচার করছেন, তাকে তিনি পালন করবেন না, কেননা তা পার্টির দ্বারা গৃহীত পলিসি নয়, এবং এ-বিষয়ে তাঁর কোনো 'নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই'—বিচিত্র যুক্তি বটে। ইতিপূর্বে ২৮ জুলাই ১৯০৭, বন্দেমাতরম্ পত্রিকা—আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত ভূপেন্দ্রনাথের 'অপূর্ব নিক্রিয়তা' সম্বন্ধে কোন্ মন্তব্য করেছিল, তা আগেই দেখেছি। যাই হোক, বিপিন পালের 'বিবেকের ব্যক্তিগত তাগিদ' নামক নড়বড়ে বস্তুটিকে মেরামত করতে অরবিন্দকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। লেখাটির শেষ অনুচ্ছেদে তিনি পালের উপরে যেসব বিশেষণ বর্ষণ করেছিলেন—তাদের দ্বারা যে, পালের বিরুদ্ধে নিজ দলের একাংশের কঠোর অভিযোগকে ঢাকা দেবার চেষ্টা ছিল, তাও দেখতে পাই :

"The country will not suffer by the incarceration of this great orator and writer, this spokesman and prophet of Nationalism, nor will Bepin Chandra himself suffer by it. He has risen ten times as high as he was before in the estimation of his countrymen ; *if there are any among them, who disliked or distrusted him,* they have been silenced, for good we hope, by his manly, straight forward and conscientious stand for the right as he understood it." [149-53]

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় 'দি গ্লোরি অব গড্ ইন ম্যান' (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সম্পাদকীয়তে পালের মনস্বিতা বিষয়ে বলা হয় :

"Srijut Bepin Chandra Pal is the most powerful brain at present at work in Bengal." [267].

1902 [illegible] Amraoti. [illegible]

In the morning while I was studying [illegible]
[illegible] sent a note enclosing a letter from Sister Nivedita, saying that
she would arrive here today at 11-30 a.m. I had to make great
haste and hurry up the necessary arrangements. I got Ambadi's [illegible]
which Mrs Annie Besant was lodged, made ready for Sister
Nivedita, and after a hurried breakfast went to the Railway
station to receive her. Bapuji brought my big carriage [illegible]
for her. She came with a Bengal gentleman. She is
nice looking person with very good and engaging manners.
I sent her & Babu to my house. [illegible] was in the train.
I went to Court. But there was busy with a part heard appeal
So I sat there, and ultimately came away requesting Judge
to obtain adjournment in my case. I had also to
be able to make arrangements for the proper re-
-ception of Sister Nivedita. I went to D.J.'s office for a
few minutes, gave a legal opinion, and returned home.
I had a long talk with Sister Nivedita and the
Babu who is a Swami. We settled the programme
and I sent off a few telegrams at her request.
In the evening I arranged seats for her in the
upper verandah, and a number of people came
to her. Bodhankar, V. R. Kale, [illegible], and a
large number of others came. She speaks very
well & is a votary of Swami Vivekananda [illegible]
The Swami is very good & contemplative. She
lives in complete Indian style. After dinner
we sat speaking for a long time on religious
subjects.

G. S. Khaparde

জি এস খাপার্দে ছিলেন তিলকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং চরমপন্থী। নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০২ সালে অমরাবতীতে, এবং ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেসে তাঁর পরিচয় ও আলাপের কথা তিনি ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। স্বামী বিদেহাত্মানন্দের সৌজন্যে তার কিছু পৃষ্ঠার ফটোকপি পেয়েছি। পরপর ৮ পৃষ্ঠায় ৯ দিনের ডায়েরির প্রতিলিপি দেওয়া হল।

তারিখগুলি হল : ১৯০২-এর ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ অক্টোবর ; এবং ১৯০৫-এর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ডিসেম্বর ; এবং ১৯০৬-এর ১ জানুয়ারি।

স্বদেশী যুগের ত্রয়ী—লাল-(লালা লাজপত রায়) বাল-(বালগঙ্গাধর তিলক) পাল (বিপিনচন্দ্র পাল)

BALA BHARATA

OR

YOUNG INDIA.

A Monthly Organ of Indian National Regeneration.

Arise, Awake, and Stop not till the Goal is reached.—Vivekananda.

Vol. I. No. 1. — DECEMBER, 1907. — Subs. Rs. [illegible] per annum [illegible]

UNFURL THE BANNER OF LOVE.

Vivekananda's Trumpet Call to the young Men of India.

Young men of India, raise once more that wonderful banner of Advaita, for on [illegible] other ground can you have that all-embracing love, until you see that the same Lord is present in the same manner everywhere; unfurl that banner of love. "Arise, awake and stop not till the goal is reached." Arise, arise once more, for nothing can be done without renunciation. If you want to help others, your one little self must go. In the [illegible] Christians you cannot serve God and mammon at the same time. Have *vairagya*. [illegible] tors gave up the world to do great things. At the present time there are men who [illegible] world to help their own salvation. Throw away everything, even your own salvation [illegible] and help others. Aye, you are always talking bold words, but here is practical Vedanta [illegible] you. Give up this little life of yours. What matters if you die of starvation, you and I and thousands like us, so long as this *nation* lives? The nation is sinking, the curse of unnumbered millions is on our heads, to whom we have been giving ditch-water to drink when they have been dying of thirst, while the perennial river of water was flowing fast; the [illegible] millions whom we have allowed to starve in sight of plenty; the unnumbered millions whom we have talked of Advaita and whom we have hated with all our strength; the [illegible] heral millions to whom we have talked theoretically that all are one, and that all are the same Lord, without even an ounce of practice. O my friends, must it only be in the [illegible] and never in practice?

Wipe off this blot. Arise and awake. What matters it if this little life goes; every one has to die, the saint or the sinner, the rich or the poor. The body never remains for any one. Arise and awake and be perfectly *sincere*. What we want is *character*, that [illegible] and character that make a man cling to a thing like grim death. "Let the sages blame [illegible] them praise, let *Lakshmi* come to-day, let her go away, let death come just now, [illegible] hundred years; he, indeed, is the sage who does not make one false step from the [illegible] right." Arise and awake, for the time is passing and all our energies will be frittered away [illegible] vain talking. Arise and awake, let minor things and quarrels over little details, and fights over little doctrines be thrown aside, for here is the greatest of all works, here are the sinking millions. Therefore, arise, awake, with your hands stretched out to protect the spirituality of the world. And first of all, work it out for your own country. What we want is not so much spirituality, as the bringing down of a little of Advaita into the material world, first bread and then religion. We stuff them too much with religion, when the poor fellows have been starving. No dogmas will satisfy the cravings of hunger. There are two curses here; first our weakness, second our hatred, our dried-up hearts. You may talk doctrines by the thousands, you may have sects by the hundreds of thousands; but it is nothing until you have the heart to feel, feel for them as your Veda teaches you; till you find that they are parts of your own bodies, till you realise that you and they, the poor and the rich, the saint and the sinner, all are parts of one Infinite whole which you call *Brahman*.

বালভারত-এর ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা—বিবেকানন্দের বাণী সংকলিত। প্রত্যেক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতে বিবেকানন্দ-বাণী থাকত।

A36

7 [illegible] Street, Triplicane
Madras 16/4/07

Revered mother,

It needs no further attempt on my part to introduce myself to you after my personal interview with some years back with two of my Cousins in your Ashrama at the 17 Bose Para Lane and after a few correspondence concerning matters about the public affairs. I am the nephew of Mr Alasingaperumal and for your recognition & recollection I may point out two of the prominent features in me – Short young man with a pair of spectacles. So far it is sufficient to give you an idea of myself.

My paper Bala Bharat of which I am the proprietor is I hope regularly reaching your divine residence. Sri C. Subramania Bharati who is the Editor of that paper is a really a social & energetic man with whom you are personally acquainted. He has shown me the letter which you have written him. You must excuse us, mother, for our incompetency in conducting a weekly journal on a business line and my object in having a journal of that kind is to disseminate ideals of Right and duty which our people have entirely forgotten. I hope it, really, is doing something in the work of National Regeneration.

I want to conduct it upon the principles already working in some quarters in our mother land and I would like to place it entirely at your will in order that it may be better used and handled. I would like that some occasional suggestions are made by you for it

বালভারত পত্রিকার স্বত্বাধিকারী এবং পরিচালক বিপ্লবী এস এন ত্রিমূলাচার্যের ১৬-৪-১৯০৭ তারিখের পত্র—নিবেদিতাকে। পত্রে তিনি নিবেদিতাকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্রিকা পরিচালনার পূর্ণভার নিতে অনুরোধ করেছেন। পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বিখ্যাত তামিল কবি ও দেশপ্রেমিক সুব্রহ্মণ্য ভারতী।

[পর পৃষ্ঠায় একই পত্র]

সেফ মাৎসিনী। নিবেদিতা এই বিখ্যাত ইতালীয় বিপ্লবীর ভাবধারার একান্ত অনুরাগী ছিলেন—এবং বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে মাৎসিনীর আত্মজীবনী প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

ASSASSINATION AT ALIPORE.

BABU Ashutosh Biswas, Government Pleader and Public Prosecutor, who took an active part in the prosecution of the men now under trial before Mr. Beachcroft, was shot dead on the 10th February at 4.45 P.M., in the precincts of the Alipore Suburban Magistrate's Court, by a Bengali youth, who was immediately arrested.

The deceased had, as usual, appeared on that day in the bomb conspiracy case under trial before Mr Beachcroft, Sessions Judge, Alipore. After lunch the deceased proceeded to the Court of Moulvi Abdullah, Deputy Magistrate of Alipore, and conducted, on behalf of the prosecution, a counterfeit coin case. When he left the court at about 4.40 P.M., a Bengali youth, whose age appears to be about 16 or 17 and who had been among the spectators, rushed out after him, drew a revolver from under his shirt and fired at Ashutosh Babu. The bullet passed through the lung. The unfortunate victim then endeavoured to turn and escape, but the assassin again fired and shot him through the back. Ashu Babu reeled and fell to the ground, his murderer firing another shot, which, however, was ineffectual.

Babu Ashutosh Biswas came of a respectable Kayastha family of Mathurabati in the Howrah district. He was a man of absolute integrity

THE *late* BABU ASHUTOSH BISWAS,
Government Pleader and Public Prosecutor, Alipore.

and upright character, and was much beloved in Indian circles, and respected and esteemed by all Europeans with whom he came in contact. Babu Ashutosh received his early education in Hare School and passed his Entrance Examination in 18[illegible] and joined the Presidency College, from where, after passing the intermediate examination, he came out as an M.A., B.L., and joined the [illegible] Before this, however, Babu Ashutosh was a teacher (Assistant Head Master) in the South Suburban School when Pandit Sivanath Shastri was the Head Master. During that time he had among others Mr. Justice Ashutosh Mukerjee as his pupil.

In his younger days Babu Ashutosh was an enthusiast in politics, and in Babu Surendra Nath Banerjea's company made a political tour in the United Provinces in 1877-78. For long he was the joint-editor of the *Bengalee* (then a weekly). He was for some time Vice-Chairman of the South Suburban Municipality, and when the suburban area was amalgamated with the Calcutta Municipality, he was a Commissioner of the Corporation. With success at the Bar, he seceded from politics and pursued his own vocation, in which he attained to the topmost rung in the Alipore District Court. He had brought out a Bengali edition of the Indian Penal Code and some of the local Acts.

পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 'এমপ্রেস' পত্রিকায়—ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ ।

যুগান্তর পত্রিকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। (পর পৃষ্ঠাতেও একই পত্রিকার প্রতিলিপি।) (আনন্দবাজারের সৌজন্যে)

যুগান্তর মামলা থেকে মুক্তি পাবার পরে ভূপেন্দ্রনাথ। (শ্রীরণজিৎকুমার সাহার সৌজন্যে)।

Babu Bhupendranath Dutt, the Editor of the *Yugantar*, has been sentenced to one year's rigorous imprisonment. This talented young man has been sentenced to hard labour for sedition. There is, indeed, much that is heroic and pathetic in the way in which he has gone to jail to suffer like a common criminal. When he was first arrested, some of the most leading gentlemen of Bengal offered to stand surety for him. Sister Nivedita was also among those who kindly came forward. The sympathy that was felt for him was extremely note-worthy. His youth, his culture, his patrioitism and his kinship to Swami Vivekananda were the cause of this remarkable sympathy. But he needed not the sympathy of any one. The blood of the martyr is in his veins. He was threatened with criminal proceedings by Government but he heeded not and persisted in what seemed to him to be the most proper course for one of his patriotism. He was then charged and put up before the Magistrate for an offence under Section 124-A of *I. P. C.* What was his answer? :—"I am solely responsible for all the articles in question. I have done what I have considered in good faith to be my duty by my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny. I do not wish to make any other statement or to take any further action in the trial." He refused to plead. He has in him the stuff of which heroes are made. In a free country the reward for such a man would been astonishingly great; but in India it is only the jail. Mr. Dutt knew of it and unhesitatingly submitted to it. Attempts are now being made to crush the *Yugantar*. The Sadhana Pre

where the *Yugantar* is printed has been ordered to be confiscated. In the history of sedition trials in this country, the case of the *Yugantar* is, we believe the first of its kind, where the incriminated Editor, instead of trying to twist the facts or the law in his favour in the least, has courageously stood by what he said and fearlessly met what he knew to be certain punishment in a Court of law. If only a few editors should court imprisonment in this fashion, either there would be no sedition trials in future or patriotic newspaper as a body will cease to exist.—*The Hindu*.

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় (৪-৮-১৯০৭) ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড বিষয়ে মাদ্রাজ 'হিন্দু' পত্রিকা থেকে সংকলিত সংবাদ।

The Bengalee,
ESTD 1880.

70, COLOOTOLA STREET,

Calcutta. 26/7—1907.

My Dear Mr Banerjea

A paragraph appeared in yesterday's Empire saying that the accused in the "Jugantar" Case had submitted a petition to Government praying for forgiveness and promising never to repeat the offence. It is further stated that a copy of the petition was in the brief. Is there any truth in this

Kindly reply

Yours v. sincerely

Surendranath Banerjea

আইনজীবী-দেশসেবী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬-৭-১৯০৭ তারিখের পত্র। প্রসঙ্গ : এম্পায়ার কাগজে নাকি বেরিয়েছিল, যুগান্তর মামলার আসামী সরকারের কাছে মুচলেকা দিতে প্রস্তুত। ই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন পত্রে।

Kali The Mother.

The stars are blotted out.
Clouds are covering clouds.
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics,
Just loosed from the prison-house,
Wrenching trees by the root,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray.
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.
Scattering plagues & sorrows,
Dancing mad with joy.
Come, Mother, Come!
For Terror is Thy Name.
Death is in Thy breath,
And every shaking step.
Destroys a world for e'er.
Thou "Time" the All-Destroyer!
Then come, O Mother, Come!

Who can misery love;
Enjoy destruction's dance,
And hug the form of Death, —
To him the Mother comes.

V.

Sept. 30th 1898.

নিবেদিতা তাঁর 'কালী দি মাদার' গ্রন্থে স্বামীজীর একই নামের কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বইটির পাণ্ডুলিপিতে নিবেদিতার হস্তাক্ষরে স্বামীজীর কবিতা। নিবেদিতার দার্শনিক ও বৈপ্লবিক চেতনায় স্বামীজীর কালী-দর্শনের প্রবল প্রভাব ছিল। (নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের সৌজন্যে)।

A DAILY ASPIRATION FOR THE NATIONALIST.

I believe that India is one, indissoluble, indivisible.

National unity is built on the common home, the common interest, and the common love.

I believe that the strength which spoke in the Vedas and Upanishads, in the making of religions and empires, in the learning of scholars, and the meditation of the saints, is born once more amongst us, and its name to-day is Nationality.

I believe that the present of India is deep-rooted in her past, and that before her shines a glorious future.

O Nationality, come thou to me as joy or sorrow, as honour or as shame! Make me thine own!

অরবিন্দের প্রস্থানের পরে নিবেদিতার সম্পাদনকালে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয়তাবাদীদের দৈনন্দিন প্রতিজ্ঞাপত্র। (৩৬ সংখ্যা, পৃ. ৮)

KARMAYOGIN

A WEEKLY REVIEW

OF

National Religion, Literature, Science, Philosophy, &c.,

Vol. I. | 5th CHAITRA, 1316. | No. 9.

PASSING THOUGHTS.

—ooo—

Ramakrishna Paramahamsa.

The utsava of Ramakrishna Paramahamsa is an event that annually stirs Calcutta to its depths. Year after year the number increases, of those who believe that the birth of the sage of Dakshineshwar has been the critical event of the present age, in India. Some believe this, for one reason; others for another. The devotee sees in him the last of the Avatars. The historian sees the key-stone of the idea that constitutes Hinduism. The partisan feels that he satisfies all parties and conflicts with none. The philosopher finds him the living embodiment of the highest Vedanta. And even amongst the workers, there are some who derive from the spectacle of his birth, the faith that inspires and sanctions all their struggles.

What is a Nationalist?

For a nationalist may be described as one who believes that the light has already shone upon us. He is not waiting for someone to arrive, for God to remember His India, for the leader of the age and the heroes to be born. In the eyes of the nationalist, all this has been done for us already, and it remains with us to work out the trust laid upon us. We have every opportunity that a people ever had. We have nothing more to ask for, nothing more to wait for. Ours is only to love and work and suffer, and struggling to the last with all our might, secure in the conviction that the Great Power which bore us will bear others also, and round out in fulness of fruition the lives brought forth.

Some such faith is an absolute necessity, to those who pledge themselves to a cause, for life and for death. Our own action is limited and guided by our own vision, our own opinion, our own knowledge. Others, with a different, or a defective experience act variously; some in ways of which we do not approve; some in ways that are proved mistaken; and others by methods that are mutually destructive. A certain hope and joy is essential to all work. It would take a Titan like Bhishma himself, to throw his whole heart into a losing cause, a cause that he knew belonged neither to God nor the future. Mere mortals are not so made. The nation-maker, therefore, works to his utmost; but he must be free to realise the while that very little depends on him, that his work achieves significance only from that immense current of destiny that is working through him and his efforts, and that, whatever outward form it might take, it would, so long as it was warm-hearted and sincere be carried on the self-same way, on that self-same stream.

Super-consciousness the ground of action.

In other words, behind the best work lies a quiet super-consciousness —knowledge that the work itself is not the great thing, but the spirit that speaks in it. It is the purpose of help and redemption, the pitying love, the steadfast hope, that determines the value of the act. The deed itself, the work performed, is merely apparent, and does not count, in comparison with the thought-force sent out, and the spiritual energy generated. God is working through many people to-day, in different ways, and though mistakes may entail suffering, and hatred is a mistake, yet even these defeats cannot retard the onward march of what has been begun.

Who then, are to be condemned?

Are we then to condemn no one? Are all to be held equally useful, equally valuable, since, whether they will or not, God works through all equally? Is the renegade to be pardoned, and the traitor treated as a saint? Very much the contrary. We are not to ask that a man stand with us, but we are always to demand that he stand with God. Here there must be no slackness. The politician and extremist, the religious and the Swadeshi worker, the social reformer and the ultra-orthodox can all co-operate, so long as they can heartily respect each other's characters. Integrity in the,

নিবেদিতার সম্পাদনাকালে কর্মযোগিন্ পত্রিকার ৫ চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যার প্রতিলিপি। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার এই উচ্চাঙ্গের রচনায় জাতি-জীবনে এবং জাতীয়তার উদ্বোধনে রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের সুগভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যাত। এরই শেষাংশে নিবেদিতা—রামকৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবের মাত্র কয়েক বৎসর পরেই অরবিন্দের নব-অবতার কামনার বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করেছেন।

'পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

only possible foundation for common faith and work. Once let the character be found questionable, however, and the worker is better passed on one side. If the heart of a man be divided in its allegiance, that man is not the mouthpiece of God. Honest convictions and sincerity of purpose are all that is necessary; but conversely, we cannot be too stern and clear in our condemnation of dishonesty, treachery, or insincerity.

Nationality will be the synthesis of all righteous forms of effort, but it has neither hope nor heaven to offer to the man who makes and teaches a lie. On the one side infinite charity, on the other unrelenting condemnation. Idling is bad enough in the day of our need and opportunity. But deceit and falsehood of intention are not to be condoned.

Common Fallacies.

A lie that we often hear, is the lazy man's promise that God will some day send us an Avatar to rouse and aid us. These are the fallacies of sluggards, who would fain turn over in their comfortable beds, and dream that they are safe. Face to face with the great life of Dakshineshwar, it is difficult to put up with such fatuous self-assurance. Said the pots, discussing their future destiny, and alarmed at the prospect of possible breakage, "Tush! the potter is a good fellow! It will be well!" Of this quality is the faith of the man who is looking for a future divine revelation, before he stirs. The revelation will come. The world throbs with such, hourly. But it will pass the slumberer by. "Rascal!" said Tota Puri to—"Fire is burning before your door, and you have come to the sands of the Nerbuda for heat!" The world could not bear a second birth like that of Ramkrishna Paramahamsa, in five hundred years. The mass of thought that he has left, has first to be transformed into experience, the spiritual energy given forth has to be converted into achievement. Until this is done, what right have we to ask for more? What could we do with more?

The place of religion in India.

Religion always, in India, precedes national awakening. Sankaracharya was the beginning of a wave that swept round the whole country, culminating in Chaitanya in Bengal, the Sikh Gurus in the Punjab, Sivaji in Maharasta, and Ramanuja and Madhavacharya in the South. Through each of them, a people sprang into self-realisation, into national energy, and consciousness of their own unity. Sri Ramkrishna represents a synthesis, in one person, of all the leaders. It follows that the movements of his age will unify and organise the more provincial and fragmentary movements of the past.

Ramkrishna Paramahamsa is the epitome of the whole. His was the great super-conscious life which alone can witness to the infinitude of the current that bears us all ocean-wards. He is the proof of the Power behind us, and the future before us. So great a birth initiates great happenings. Many are to be tried by fire, and not a few will be found to be pure gold; but whatever happens, whether victory or defeat, speedy fulfilment or prolonged struggle, the man that has been born and lived here in our midst, in the sight and memory of men now living, is proof that

> God hath sounded forth the trumpet
> That shall never call retreat!
> He is sifting out the hearts of men
> Before His judgment seat;
> Oh, be swift my soul, to answer Him;
> Be jubilant, my feet!
> While God is marching on!

THE BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC.

BY

JULIA WARD HOWE.

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord,
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword,
His Truth is marching on!

I have seen Him in the watch-fires of a hundred circling camps;
They have builded Him an altar in the evening dews and damps;
I can read His righteous sentence by the dim and flaring lamps:
His day is marching on!

He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat,
He is sifting out the hearts of men before His judgment-seat;
Oh, be swift my soul to answer Him, be jubilant my feet!
Our God is marching on!

• • • •

THE NEW HINDUISM.

Every new period in our political history creates a new period in Hindu worship. The ideas that surround us from our birth are like geological strata, piled one upon another, and each bearing the marks of the time in which it rose. A crisis so important as the present, must, in its turn, leave a deep impression on our religion, thought and customs. It is, of course, understood that the new, if it is to be persistent, must be constituted by a return upon the old. It must form a development, not an invention. This is why we do not notice that we are living in the midst of a new Hinduism. The new Hinduism is merely the old, finding new utterance and application. When we read the great pronouncements of Vivekananda, they are so like the words of our own grandparents heard in our childhood, that we fail to remember that they are being spoken in the midst of a foreign people, and falling upon strangers. The fact that our religion now stands before the world demanding its rightful place, determined to find the souls that belong

ASWINIKUMAR DATTA.

Author, educationist, philanthropist, great Swadeshi-boycott leader, saviour of starving Barisal in 1905, to whom Barisal owes the honour of being the only district in India proclaimed under the Seditious Meetings Act.

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত—বরিশালে ঐ আন্দোলনকে সফল করার অপরাধে নির্বাসিত হন।
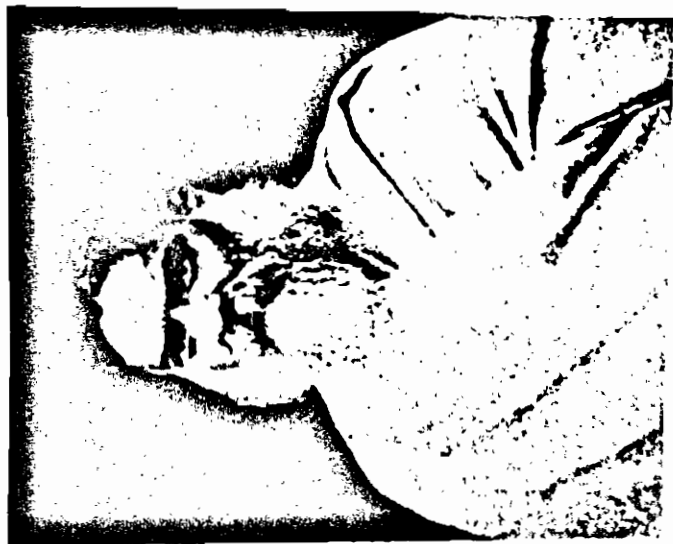
MANORANJAN GUHA THAKURTA,
ONE OF THE DEPORTEES.

KRISHNAKUMAR MITRA.

(বামে) নির্বাসিত নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ।
(ডাইনে) নির্বাসিত স্বদেশী নেতা, সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র । ইনি অরবিন্দের মেসোমশাই ।
অরবিন্দের পক্ষে মামলা-পরিচালনায় ইনি বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন ।

ভারতীয় রাজনীতির ‘বৃদ্ধ পিতামহ’রূপে কথিত দাদাভাই নৌরজীর ৮২ বৎসর পূর্তিতে হিন্দী পাঞ্চের
… পতি হন।

বন্দেমাতরম্ অধ্যায়ের পরেও অরবিন্দ, বিপিন পালের প্রশংসায় অপ্রশমিত। একই সঙ্গে বিপ্লবীদের সমালোচনা থেকে পালকে রক্ষা করতেও চেষ্টা করেছেন। তার ভিতর থেকেই পাল সম্বন্ধে বিপ্লবীদের সাধারণ ধারণার রূপ দেখা গেছে। যেমন কর্মযোগিন্-এর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সংখ্যায় অরবিন্দ লিখেছেন :

"[He was] most detested and denounced by the Indian Revolutionary organisations now active at Paris, Geneva and Berlin."

অরবিন্দ লেখেন নি কিন্তু লিখলেও পারতেন—কেবল প্যারিস, জেনেভা বা বার্লিনে কর্মরত ভারতীয় বিপ্লবীদের চোখেই বিপিন পাল 'সর্বাধিক ঘৃণিত ও ধিক্কৃত ব্যক্তি' নন—তাঁর নিজ দেশের বিপ্লবীদের মধ্যেও পাল সম্বন্ধে অনুরূপ ঘৃণার মনোভাব ছিল। বিপ্লবীরা পালের মধ্যে দুটি জিনিস অত্যন্ত অপছন্দ করেছিলেন—এক, সাহসের অভাব, দুই, পুলিশের ভয়ে মত বদল।

বিপিন পালের সাহসের অভাব সমকালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কারণ হয়—সে কথা ঐ কালের যুবক কর্মী সুকুমার মিত্র (কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র) ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বলেছিলেন। গিরিজাশঙ্করও এ-বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। ১৪ এপ্রিল ১৯০৬ তারিখে "বরিশালে পুলিশের লাঠির গুঁতোয়" রাজনৈতিক সম্মেলন ভেঙে গিয়েছিল। নেতৃবৃন্দ কলকাতায় ফিরে এসে পুলিশী অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ করেন। বিডন উদ্যানে, গোলদিঘিতে, প্রস্তাবিত ফেডারেশন-হল মাঠে, বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে মস্ত-মস্ত সভা ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা হয়। "আন্দোলন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে আবার নরমপন্থী দলের মুখপত্র 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ চরমপন্থী দলের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্রের ব্যঙ্গচিত্র হিতবাদীতে প্রকাশ করিলেন। ঐ ব্যঙ্গচিত্রের দুইজন চরমপন্থী নেতা বরিশালে কনস্টেবলের ভয়ে দৌড়িয়া পালাইতেছেন—চিত্রে এইরূপ অঙ্কিত করা হইল। কাব্যবিশারদ ছড়া লিখিলেন : 'আত্মশক্তির পরিণাম—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। চম্পটে চটপটে হয়—পগার-পারে চলল—ঐ গো ডিডি ধল্লে'।"[৮]

১৯০৭ সালের মে মাসে মাদ্রাজে বক্তৃতা করে বিপিন আগুন ছড়িয়েছিলেন—এ কথা সকল সংশ্লিষ্ট রিপোর্টেই দেখা যায়। কিন্তু সেই আগুন যখন তাঁর দিকে ফিরে ধাওয়া করল তখন তিনি তা একেবারেই পছন্দ করেন নি। মাদ্রাজ সফরের সময়ে বিপিন পাল লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের খবর শোনেন এবং তিনি "কলকাতায় যাবার প্রথম যে ট্রেনটি পেলেন [বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন] তাতেই চড়ে বসলেন—লাজপত রায়ের বরাতে যা জুটেছে তার থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছাতেই বোধহয়।"[৯]

রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হবার পরেই বাকি সফরসূচী বাতিল করে বিপিন পালের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের কথা আছে। রিপোর্টের ঐ অংশ উদ্ধৃত করার পরে গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন :

"বিপিনচন্দ্রের এই ত্বরিত-গতির কারণ কি? তিনি কি নিজের নির্বাসনও এই সঙ্গে আশঙ্কা করিয়াছিলেন? আশ্চর্য নয় কিছুই, অসম্ভবও নয়।"[১০]

৮ গিরিজাশঙ্কর, ৪৪২-৪৩।
৯ বিমানবিহারী, ৬৩।
১০ গিরিজাশঙ্কর, ৫৫০।

বিপিন পালের সবচেয়ে সাহসিক কাজ বলে যেটি সাধারণে স্বীকৃত, যার জন্য অরবিন্দ আপাতত শিরোপা দিয়েছেন—বন্দেমাতরম্ পত্রিকা-মামলার সময়ে কে ঐ পত্রিকার সম্পাদক(অর্থাৎ অরবিন্দ সম্পাদক কিনা ?) সে-বিষয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা—তার ফলে আদালত অবমাননার জন্য জেলে যাওয়া—এই ঘটনাটির পিছনের ব্যাপার যাঁদের জানা ছিল তাঁরা এ ক্ষেত্রে পালকে অত্যন্ত সাহসী বিবেচনা করেছিলেন কিনা সন্দেহ। ঘটনা এই

"মিঃ সি আর দাশ তখন বিপিনচন্দ্রের অনুগ্যামী, অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। মিঃ দাশ বিপিনবাবুকে বলিলেন যে, দেখুন আপনি মাদ্রাজে যে-প্রলয়ঙ্কর বক্তৃতা চারি মাস আগে দিয়াছেন তাতে লাজপত রায়ের মতো আপনাকে গভর্নমেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য মান্দালয় দুর্গে নির্বাসনে পাঠাইতে পারে। (লাজপত তখন মান্দালয় দুর্গে বন্দী ছিলেন)। আর যদি এই মোকদ্দমায় আপনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন তবে আদালত-অবমাননার জন্য আপনার বড় জোর ৬ মাস জেল হইবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য মান্দালয় দুর্গে বন্দী হওয়ার চেয়ে ৬ মাস জেল অধিকতর লোভনীয় শাস্তি। আবার অন্য দিকে দেখুন, আপনি সাক্ষ্য না দিলে পুলিশ প্রমাণাভাবে অরবিন্দকে জেলে দিতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, পুলিশ বন্দেমাতরম্ পত্রিকাখানিকেও বাজেয়াপ্ত করিতে চায়। আপনি সাক্ষ্য না দিলে কাগজখানিও বাঁচিয়া যায় এবং বাংলায় নূতন চরমপন্থী দলও জখম হয় না। সুতরাং দেশের জন্য এই vicarious martyrdom আপনি করুন। কিছুটা ইতস্তত করিয়া বিপিনবাবু রাজি হইলেন। বিপিনবাবুর সাক্ষ্য না দেওয়ার কৈফিয়তের খসড়া রাতারাতি মুসাবিদা হইয়া গেল। মুসাবিদায় মিঃ দাশের মুন্সিয়ানা ছিল।"[১১]

২৬ অগস্ট, ১৯০৭—বিপিন পাল যখন কিংসফোর্ডের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন—তার বেশ কয়েক মাস আগেই তিনি বন্দেমাতরমের সম্পাদনা ত্যাগ করেছেন, কারণ অরবিন্দের অনুগামী বিপ্লবীদের দ্বারা গোপনে প্রচারিত 'গোল্ডেন বেঙ্গল' নামক বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী পুস্তিকাটিকে তিনি বন্দেমাতরম্ কাগজে ৩ অক্টোবর, ১৯০৬ তারিখে কঠোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "পাগলা গারদের বাইরে এমন কেউ নেই যে ভারতবর্ষে সহিংস বা অবৈধ পন্থা গ্রহণের চিন্তা করবে, বা সে-বিষয়ে পরমার্শ দেবে।" তিনি এমন কথাও লিখেছিলেন, "বর্তমানে কোনো গুপ্তসংস্থার গঠন কেবল কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেবে ; সেই সঙ্গে গুপ্ত সমিতিগুলি তাদের স্বভাবগত গোপনতার কারণে আমাদের জনজীবনের কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই যে দুর্নৈতিকতা কর্কট রোগের মতো প্রবেশ করে আছে—তাকে বাড়িয়ে তুলবে।"

[এমপ্রেস পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সংখ্যায় ঐ 'গোল্ডেন বেঙ্গল' (সোনার বাংলা) পুস্তিকার বিষয়ে লেখা হয় :

'GOLDEN BENGAL' AN INFLAMATORY CIRCULAR

The following is a translation for which we are indebted to the *Englishman*, of the seditious circular issued from Chinsurah by a so-called Secret Society of Bengali agitators. It may be the production of a "lunatic", or of a "schoolboy", according to the views taken by different papers which have commented on the precious effusion. The terms, now a days appear synonymous. But in any case the document is calculated to arouse the evil passions of the fanatical and ill-disposed :—

'What is the good of crying any more ? The only thing is to give our blood from

১১ গিরিজাশঙ্কর, ৬১৪-১৫।

the heart. Give your heart's blood—brothers, whenever you are "assembled together." You promise that you will break the nests of the Feringhi babui-birds, tearing them into pieces and throwing them into the water ofGangesUntil we do this we shall not see our interests looked after. All is our fault, brother. Only for our trifling interests our Golden Bengal, our hearts mother is given into Feringhi hands, and we are looking to be assaultedin this way.No more ! Come, brothers, wherever you are, Brahmin, Kayastha, Sudra, Chandal, Mussalman, Christian, who is thinking it glory to style himself a son of Bengal, come brothers, assemble together, let us forget all mean self-interest. Why are we blind not to see before us how unfortunate we are ; the Feringhis are making our mother naked. Why does not the blood flow from our eyes ? Our golden mother is going to be insulted and still we do nothing. Come, brothers, for the sake of the honour of our mother let us see how we can easily give our lives. Let us show to all the peoples of the world how we can do this ; let them all see. The Bengalis are hated of all because they are slaves. They know how to preserve the mothers honour, but they are not ungrateful. This is the time for the Bengali to show the people of the world that he can do. The Bengalis are not cowards or ungrateful. Brothers, Hindus, Mussalmans, gird your loins for the honour of your mother. Since all must one day die, why fear? Make strong your hearts, you will see that a crore of people will come and stand by you. You will see that by the exertion of a crore of people the guns, bullets and bayonets of the Feringhi people will disappear. What can be happier than a death like this? A death for the sake of the mother By the death we shall gain everlasting bliss. Setting aside all questions of gain or loss, all private quarrels, all litigation, being the sons of our mother, brothers, stand all together. The mother with tearful eyes, looks on your faces hopefully. Show that you are the true sons of the mother. No more, bear no more. The coward who is afraid of a slight blow let him arouse himself, let him go away. Let those men come who can really call themselves men, who are ready to die. Let these come. We will all assemble, village by village, field by field, market by market, city by city, let them run together. Our brothers who are ready to die, who know and love our mother—Bengal, take these with you. Assemble and give loud cries, beat the sahibs of the city and drive them away. We will govern our own country. We will give satisfaction to our mother in every possible way.

'Mussalman brothers, our mother has great hopes of you. Do not fear to die, you are strong men, you have broad chests, your wrists are strong. Brothers, for the sake of our mother, take anything you can get at the moment—lathis, spears, guns. Once shouting Din Din Allah-u-Akhbar vou conquered the cities. When you rise, your Hindu brothers will rise with you. Rise ! brothers, awake ! awake ! Hindus ! many thousand years you have been talking about the glories of Hinduism. Sacrificing your self-interest show to the world the power of the Brahmins and the Kshattriyas for the sake of the mother whose glory is higher than the heavens, show your power. At any rate you can gather together for Golden Bengal, by money, honour, life, Chandal, Sudra, Brahmin, Mussalman—forgetting the trifling differences between you, being of one mind in one life from to-day make a gathering for Golden Bengal. Whoever for the sake of the mother promises, from this day, village by village, city by city, husbandmen, gentlemen, illiterate people, poor people and wealthy people being all together, make a gathering for the sake of Golden Bengal. Do not care for the police, do not fear guns and bayonets. Give your lives, give your heart's blood. Women, men, children, youths, old men, all assemble for the sake of Golden Bengal. In any possible way, with, two, ten or fifty comrades assemble together. From so small an assembly great crowds will grow. Whoever is not willing or afraid to come to such an assembly, or who will work against it, deal with him severely. Join in one assembly all races. Hindu or Mussalman, loudly shouting, "Jai Bengal." Bhikary, Boisnab,

Fakir, let all these assemble. Let them all bewail the mother's sorrows. Let them excite the sons and daughters of the mother by such sad songs, by which they will banish the fear of death. Delay not. Delay not. Delay will ruin all. There is still time, rise all.

'সোনার বাংলা'র পায়োনীয়ার-কৃত এই অনুবাদ উপস্থিত করেছি এইজন্য যে, এর থেকে পাঠক গোপন উত্তেজক রচনার আভাস কিছুটা পাবেন, সেইসঙ্গে এদের বিষয়ে অবহিত করার জন্য সাহেবী কাগজগুলির প্রচেষ্টারও রূপ দেখবেন।

৩ অক্টোবর, ১৯০৬-এর সম্পাদকীয় লেখার জন্যই বিপিনচন্দ্রকে বিপ্লবী গোষ্ঠীর চাপে অচিরে পদত্যাগ করতে হয়—একথা বিপিনচন্দ্রই ১৯২০ জুলাই মাসে এলাহাবাদের 'ডিমোক্র্যাট' পত্রিকায় লিখেছিলেন।[১২]

'ভাগ্যের পরিহাস' কথাটার অব্যর্থ নমুনা আমরা এখানে পেয়ে যাই। বিপিন পাল গুপ্তসমিতির সদস্যদের লিখিতভাবে কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিলেন—তাঁর সেই কাজ উল্টোপক্ষে বিপ্লবীদের কাছে চূড়ান্ত কাপুরুষতা মনে হল—অথচ ঐ 'কাপুরুষতাপূর্ণ' রচনাটির সাহায্যেই চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর বোমার মামলার সময়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, এবং আদালতের দৃষ্টিতে তাতে সফলও হলেন—অরবিন্দ গুপ্ত বিপ্লব-আন্দোলনের সমর্থক নন!! গিরিজাশঙ্কর চমৎকারভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন:

"মিঃ সি আর দাশ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কতকগুলি বিখ্যাত প্রবন্ধ [আদালতে] পাঠ করেন এবং প্রবন্ধগুলি হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, অরবিন্দ গুপ্তসমিতির বিরোধী ছিলেন। প্রবন্ধগুলির নাম ও তারিখ হইতেছে *That Sinful Desire,* ১৯০৬, ১৮ সেপ্টেম্বর, (এইটি বিপিনবাবুর লেখা, অরবিন্দর নয়), এবং *Golden Bengal Scare,* ১৯০৬, ৩ অক্টোবর (এইটিও বিপিনবাবুর লেখা, অরবিন্দর নয়)। এই প্রবন্ধটিতে বিপিনবাবু গুপ্তসমিতির বিরুদ্ধে লেখেন।...এবং তাহারই ফলে বিপিনবাবু প্রধান সম্পাদকের পদ ছাড়িয়া দেন। অথচ আদালতে মিঃ সি আর দাশ বিপিনবাবুর এই লেখাটি অরবিন্দর লেখা বলিয়া অম্লানবদনে চালাইয়া দেন। এবং অরবিন্দ যে গুপ্তসমিতির বিরোধী, তাহা এই লেখা হইতে প্রমাণ করেন। সুতরাং মিঃ সি আর দাশ যে বলিয়াছেন, আমি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় বিপিনবাবুর লেখা দিয়া অরবিন্দকে খালাস করিয়াছি, ইহার প্রমাণ হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, নারায়ণ তাঁহাকে খালাস করিয়াছেন। তাহা যদি করিয়া থাকেন তবে সেই নারায়ণও বিপিনবাবুর প্রবন্ধ দিয়াই তাঁহাকে খালাস করিয়াছিলেন, অন্য কোনো অলৌকিক উপায়ে তিনি খালাস পান নাই।"[১৩]

দেখা যাচ্ছে, বিপিন পাল দু'বার অরবিন্দকে বাঁচিয়েছেন—প্রথম, বন্দেমাতরম্ মামলায়, দ্বিতীয়, আলিপুর মামলায়। জানি না এই জন্যই কিনা, অরবিন্দ পরবর্তীকালে পাল সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেছেন। না, সমকালেও তিনি সবিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। অরবিন্দর অনুপস্থিতিতে তরুণ বিপ্লবীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে পাল পদত্যাগ করেন—অরবিন্দ সেজন্য উক্ত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "আমি যখন অসুখে পড়ি, তাঁকে সরানো হয় এবং আমার নামও তাতে জড়ায়। আমি সহকারী সম্পাদককে তলব করে এই অন্যায়ের জন্য দারুণ শাস্তি দিই, অবশ্য আলঙ্কারিক অর্থে। কিন্তু ক্ষতি যা তা হয়ে গেছে।"[১৪]

১২ গিরিজাশঙ্কর কর্তৃক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কংগ্রেস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ৫৭২।
১৩ গিরিজাশঙ্কর, ৫৯৪-৯৫।
১৪ 'কথাবার্তা', ৫৪।

একটি ব্যাপারে অরবিন্দ বিপিন পালকে সহমর্মী পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। বন্দেমাতরম্ মামলার পর থেকেই অরবিন্দ উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে রাজনীতিতে ঈশ্বরদর্শন করতে থাকেন, যা আলিপুর মামলার পরে এমনই বৃদ্ধি পায় যে, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নির্জন-প্রস্থান করেন। বিপিনচন্দ্র পালও দেখা যায়, কারাবাসের মধ্যে ঈশ্বরের দিকে বিশেষ ঝুঁকেছিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক ধারণার বদল ঘটায়। অরবিন্দ বিপিন পালের ঈশ্বর-আক্রান্ত রাজনীতিকে সহর্ষ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের পরে বক্সার জেল থেকে বিপিন পাল মুক্তি লাভ করলে, বন্দেমাতরম্-এ ১০ মার্চ ১৯০৮, অরবিন্দ 'ওয়েলকাম টু দি প্রফেট অব ন্যাশন্যালিজম্' সম্পাদকীয়টি লেখেন। বিপিনচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কোন্-কোন্ বস্তু দেবে, তার বিষয়ে নানা কথার মধ্যে এই কথাগুলিও অরবিন্দ বলেন :

"The voice of the prophet will once more be free to speak to our hearts, the voice through which God has more than once spoken. We shall remember once more that the movement is a spiritual movement for prophets, martyrs and heroes to inspire, help and lead, not for diplomats and pinchbeck Machiavels...Bepin Chandra stands before India as the exponent of the spiritual force of the movement... We welcome back to-day not Bepin Chandra Pal, but the speaker of a God-given message, not the man but the voice of the Gospel of Nationalism." [হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, ২৮৪-৮৫]

কারামুক্ত বিপিন পালের সংবর্ধনার জন্য ফেডারেশন-হল মাঠে অনুষ্ঠেয় সভার পূর্বদিন, ২৭ মার্চ ১৯০৮, বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদকীয় 'টু-মরোজ্ মিটিং'-এর মধ্যে বলা হল : "বিপিন পাল পূর্বে বক্তৃতা করতেন ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে, এবার বক্তৃতা করবেন দ্রষ্টার কণ্ঠস্বরে। তিনি এমন একজন চিন্তাবিৎ যাঁর চিন্তাস্রোত তাঁর নিজের ভিতর থেকে নির্গত নয়—তা আন্তর সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" বিপিন পাল সম্বন্ধে অতঃপর সর্বোচ্চ ভাষায় স্তুতি ছিল : "আগামীকাল জাতীয়তার জীবনধারা তার মহাশক্তিশালী গতিকে পুনশ্চ লাভ করবে।" বিপিন পাল নামক আলোক আবৃত হয়ে থাকায় প্রায় অন্ধকারে তাঁরা ছিলেন, অনিশ্চিত ও বিভ্রান্ত, দুর্বল হস্তে ধরা ছিল পতাকা, সম্মানের আসনগুলিতে উঠে বসেছিল অপরীক্ষিত সমর্থকরা—এ কথা বলার পরে অরবিন্দ লেখেন—কিন্তু এখন আর ভয় নেই, বিপিনচন্দ্র এসে গেছেন, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভূখণ্ডে যিনি প্রেরণার লাভাস্রোত বইয়ে দিতে পারেন, জাতীয় জীবনকে নানা তাপমাত্রায় আঘাত করে উৎকৃষ্ট ইস্পাতে পরিণত করতে পারেন, যে-ইস্পাতে প্রস্তুত অস্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ প্রভু সারা পৃথিবীতে অজ্ঞতা ও বর্বরতাকে ধ্বংস করতে পারবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অরবিন্দর ধর্মাশ্রিত রাজনীতির সমর্থনসূচক বক্তৃতা বিপিনচন্দ্র অতঃপর করে চললেন, এবং অরবিন্দও উত্তরোত্তর আবেগাশ্রিত হলেন তাঁর সম্বন্ধে। বন্দেমাতরম্-এ ৭ এপ্রিল ১৯০৮, "দি নিউ আইডিয়াল" নামক সম্পাদকীয়তে বললেন, "ঐ আদর্শ হল—ঐশ্বরিক মানবতা এবং মানবে ঈশ্বরত্বের বোধ—যা সনাতন ধর্মের প্রাচীন আদর্শের বর্তমান প্রয়োগরূপ্—যা ইতিপূর্বে কখনো রাজনীতি বা জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে করা হয়নি।...শ্রীযুক্ত বিপিন পাল এমন এক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে বক্তৃতা করছেন যার সংবরণে তিনি সমর্থ নন। জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শুনতে চায়—সেইসব পুরাতন বিষয়ে তিনি

তুলনাহীন বাগ্মিতা দেখিয়েছেন, তিনি নিজেও হয়ত ঐসব বিষয়ে বলতে ইচ্ছুক—কিন্তু প্রফেটের কণ্ঠ তো তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রিত নয়—সে কণ্ঠ অন্যের—সেই অন্যের কথা প্রফেটকে বলতেই হবে।"

এই লেখার শেষ ভাগে অরবিন্দ নিজের ভূমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজন ছিল প্রথম জাগরণ ঘটাবার জন্য—এখন প্রয়োজন সর্বজয়ী বিশ্বাসের ভাষা, যা বিপিন পাল দিতে সমর্থ। আর যদি বিপিনচন্দ্র তা না-দিতে পারেন, তাহলে অরবিন্দ তা নিজেই দেবেন—এমন আভাস এই রচনায় ছিল।

বিপিন পালের চরিত্র ও কীর্তি বিচারে নিবেদিতা ও অরবিন্দর ধারণার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। পাল সম্বন্ধে নিবেদিতার সমকালীন মনোভাব তিক্ত ও কঠোর। বিপিন পালকে যেসব বিপ্লবী সন্দেহ করেছিলেন, নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম। মায়াবতী থেকে ৮-৯ জুন, ১৯০৭ তারিখে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে বিপিন পাল সম্বন্ধে এই মারাত্মক কথাগুলি লেখেন :

"বিপিন পাল, আমার বিবেচনায়, [সরকারের সঙ্গে] বোঝাপড়া করে ফেলেছে। গোড়া থেকেই সে কাপুরুষ, পুলিশের কাছ থেকে দু'একটি শাসানির কথাই তার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ভালই, কারণ আগে বা পরে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতই।

"কিন্তু যতই এইসব কথা মনে জাগে ততই হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ে। কতজন শেষ পর্যন্ত খাঁটি থাকবে? আমরা যেন মহাবিচারের দিনের সমীপবর্তী—মানুষের চরিত্রনির্ণয়ের এই যথার্থ ক্ষণ। সে যাই হোক, আমার ধারণা—চিন্তার বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তারের মধ্যেই রয়েছে আসল আশা।"

জেল থেকে বেরুবার অল্প পরেই পাল ইংলণ্ডে যান। সেখানে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টায় যে-পরিবর্তন দেখা যায় তাতে নিবেদিতার আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে পাল বিপ্লব-আন্দোলনের বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লাগেন। ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় যুবকদের তীব্র বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রশমিত করাকে জীবনের এক প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করেন। আর সেই কারণে যুবকদের তীব্র ঘৃণাও অর্জন করেন। নিবেদিতার পত্রে প্রসঙ্গটি আছে।

র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, নিবেদিতা লেখেন :

"তুমি কি এই চিঠি পাবার পরে মরক্কোয় ইউ-কে লিখে বলবে—সে যেন দত্ত নামক একটি বালকের সন্ধান করে। বালকটি বিপিনের তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু বিপিনের অকারণ কাপুরুষতা দেখে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়েছে[১৫]—ভারতবর্ষে দুঃসাহসিকতার যুগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায়। বালকটি উল্লাসকরের ভাই—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দুজনের অন্যতম যে-উল্লাসকর—সুতরাং তার বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।"

বিপিন পাল ইংলণ্ডে থাকাকালে বৈপ্লবিক বোমার বিরুদ্ধে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত স্বরাজ পত্রিকায় কী-ধরনের প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা উইলিয়ম স্টেড প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। এই সূত্রে 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার অক্টোবর ১৯১১ সংখ্যায় বিপিন পালের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার-বিবরণের উল্লেখ করতে পারি—*Mr. Bipin Chandra Pal : Nationalist-Imperialist.* এর মধ্যে পাল বলেছেন :

"যখন আমি ইংলণ্ডে হাজির হয়েছিলাম, তখন দেখি যে টিপিক্যাল ভারতীয় ছাত্ররা…শ্বেতজাতি সম্বন্ধে—বিশেষত সেই শ্বেতজাতি সম্বন্ধে যার হাতে রয়েছে ভারতীয় শাসনকর্তৃত্ব—আশা-বিশ্বাস

১৫ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (১৯৫৩) গ্রন্থে লিখেছেন, পাল প্যারিসে উপস্থিত হয়ে বহু বক্তৃতা করেন, এবং তাদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যের নিন্দা করেন। (পৃ. ১২৪)।

একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তারা···তাদের নৈরাশ্যকে এতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে, হৃদয়গভীরে তারা শ্বেতমানুষকে মানবসমাজে অচ্ছুত মনে করছিল। ওটা অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা, যাকে সংশোধন করা বেশ কঠিন। আমাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধীরে অগ্রসর হতে হয়েছে। যে-ধরনের ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল তাতে সরাসরি আক্রমণ করলে সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যেত।"

না, পাল নির্বোধ ছিলেন না, মুখোমুখি আক্রমণ না ক'রে পিছন থেকে আঘাত ক'রে পরাভূত করার কৌশল তিনি জানতেন। তার প্রয়োগ ক'রে, পাল বলেছেন, "আমি গর্বিত যে, তাদের এই হিংস্র, অ-দার্শনিক মতামতকে পুনর্বিবেচনা করাতে সমর্থ হয়েছি।" কিভাবে সে-কাজ পাল করেছিলেন, তার বিবরণও দিয়েছেন। ভারতীয় ছাত্রদের প্রথমে তিনি দেন মানবতার শিক্ষা ; তারপর জানান—সমগ্র মানবজাতিই ঈশ্বরোদ্ভূত। তিনি বুঝেছিলেন যে, যতক্ষণ না মানবতায় আস্থা আসে ততক্ষণ উগ্র ভারতীয় ছাত্রদের কাছে ইংরেজের সমর্থনে কোনো কথা বলা সম্ভব নয়। তিনি তাদের শেখাতে পেরেছিলেন—যত অন্যায়কারী, অত্যাচারীই হোক, ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত মানুষ। বিপিন পাল আধ্যাত্মিক চেতনার বিস্তারেও সচেষ্ট ছিলেন। ভারতের শাসনপদ্ধতি যেন ভারতীয় হয়—এই তাঁর কামনা। তারপর পাল—ভারত ও ইংলণ্ড কিভাবে সহযোগিতা করবে, এবং সেই সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর কোন্ মঙ্গল ঘটবে—সেই থীসিস্ উপস্থিত করেন। ভারত ও ইংলণ্ডের সহযোগিতা ঘটলে শ্বেতজাতি ও কৃষ্ণজাতির সংঘর্ষ নিবারিত হবে, দূরীভূত হবে প্যান্ ইসলামের আক্রমণভীতি। এইসব নানাপ্রকার উচ্চ চিন্তার পরে পালের আসল কথাগুলি বেরিয়ে পড়েছিল—বৃটিশ সম্পর্কচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে তিনি চান না—তিনি ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান। অন্তর্ভুক্ত থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষ কোন্ মহামর্যাদা ভোগ করবে, সে-বিষয়ে যথেষ্ট ভাবগর্ভ চিন্তা পাল করেছিলেন, কিন্তু মোট কথাটা হল—ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া খুলবে না।—

"Let us suppose that the British Government in India were to be reconstituted on a basis which could give the freest possible scope of self-fulfilment to India, and yet continue the Association known now as the British Empire. It would be a federal constitution, the freedom of the federated parts being realised in and through the unity of the federal whole. *Such a partnership between Great Britain and India, speaking as a man who has the broadest interests of humanity at heart, would be preferble to an isolated independence for India.*"

নিজের দারুণ তত্ত্বটি বলে ফেলার আনন্দে উদ্দীপ্ত পাল এমনও বললেন : "ধরা যাক, সর্বশক্তিমান ভগবান একদিকে আমাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভারতবর্ষকে দান করলেন, অন্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের কোনোই সম্পর্ক নেই—অন্য দিকে তিনি দিলেন এমন একটি ভারতবর্ষকে যা গ্রেট বৃটেন ও তার কলোনিগুলির সঙ্গে এবং মিশরের সঙ্গে, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার-নির্ভর, আনুগত্যসম্পন্ন অংশীদারিত্বে যুক্ত, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়কেই বেছে নেব।"

এইসব জটিল বচনের মধ্য থেকে শাসক ইংরাজ ও শাসিত ভারতবাসীদের পক্ষে আসল কথাটি পেয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি। ইংরেজ বুঝেছিল—পাল পূর্ণ স্বাধীনতা ছেড়ে এখন সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকতে চাইছেন, যদিও তাতে সমানাধিকার ইত্যাদির মুখশুদ্ধি আছে : ভারতবাসীও বুঝেছিল—পাল আর পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষী নন, শর্তসাপেক্ষে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ থাকতে ইচ্ছুক, যে-শর্তগুলিকে ছেঁড়া কাগজের মতো জঞ্জালে নিক্ষেপ করতে শাসকদের অসুবিধা নেই।

নিবেদিতা মনে করেছিলেন—এ সব জিনিস সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই পাল করেছেন। নিবেদিতার কাছে, এটা বিশ্বাসঘাতকতা।

পরবর্তীকালেও পাল সাহেবী সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক হিসাবে সাম্রাজ্যমহিমা বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন।

বিপিনচন্দ্র পালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে নিবেদিতার কঠোর মনোভাব দেখলাম। পুলিশের ভয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন বলেই নিবেদিতা রুষ্ট। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছেন (আগেই দেখেছি) অরবিন্দ ফাঁসির ভয় করেন না। অরবিন্দরও রাজনৈতিক মতের বদল হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী অনুকূল মতের কথা আমরা জানি। বস্তুত মতের পরিবর্তন নয়, পরিবর্তনের পশ্চাতের কারণই বিবেচ্য। বিপিন পালের ক্ষেত্রে সেই কারণ গৌরবজনক ছিল না বলেই নিবেদিতার ক্ষোভ ও ক্রোধ।

তথাপি বিপিন পাল সহানুভূতি পাবেন, যা সামান্য মাত্রাতেও পাবেন না বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলার বিপ্লবী যুগের অগ্নিনেতার মহাগৌরব যাঁর উপরে এখনো অর্পণ করা হয়। বিপিন পাল যে, প্রথমাবধি বৈপ্লবিক পন্থার বিরোধী, তা আমরা দেখেছি। 'সোনার বাংলা' পুস্তিকার সমালোচনার জন্যই বারীন্দ্র-গোষ্ঠীর চাপে পড়ে তাঁকে 'বন্দেমাতরম্' ছাড়তে হয়। এহেন বারীন্দ্রকুমার পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী ও বিপ্লবপন্থা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন, তা পড়ে শিহরিত হয়ে উঠতে হয়। এক জীবনে এতখানি রূপান্তর কল্পনাতীত। যৌগিক বা অযৌগিক যে-কোনো উপায়েই হোক, বারীন্দ্র নিজ সত্তার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন।

অবশ্য উদ্ভট ও অনুচিত ঘটানোর প্রতিভা বারীন্দ্রের মধ্যে প্রথমাবধি বিদ্যমান। অসংযত আবেগ, বিবেচনাহীন বুদ্ধি, অহেতুক ঈর্ষা, অদম্য নেতৃত্ব-লালসা—এই সকলই বারীন্দ্র-চরিত্রের সাধারণ গুণ। কিন্তু একটি দারুণ সদ্‌গুণে ঐ সকল বদ্‌গুণ ঢাকা পড়েছিল—তাঁর ছিল বেপরোয়া সাহস, যা জীবনের এক পর্বে অন্তত মৃত্যুর পরোয়া করেনি। ফাঁসি বা তার কাছাকাছি শাস্তি অবধারিত জেনেও বারীন্দ্র তাঁর কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে বৈপ্লবিক আয়োজন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের দায়িত্ব পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিলেন, যার ফলে সত্যই তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল : সে ফাঁসির শাস্তি হ্রাস পেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে, তিনি সহযোগীদের সঙ্গে বৎসরের পর বৎসর আন্দামানে নারকীয় জীবন যাপন করেছেন ; তাঁদের সেই আত্মত্যাগী পৌরুষের জন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে—এটা ঐতিহাসিক সত্য, কারো সাধ্য নেই একে অস্বীকার করে। কিন্তু এই সকল কাজ করার সময়েও বারীন্দ্র কতখানি দায়িত্বহীন ছিলেন, তাও দেখে নেওয়া উচিত।

চড়াভাবে বলতে গেলে—বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে-শাস্তি নরেন্দ্র গোস্বামীর বরাতে জুটেছিল, বৈপ্লবিক নীতি অনুযায়ী সেই শাস্তি বারীন্দ্রেরও প্রাপ্য। নেতা হয়েও তিনি মন্ত্রগুপ্তির শপথ ভেঙে সহযোগী বিপ্লবীদের নাম ফাঁস ক'রে দেন। ঐকালে যাঁদের মাথায় সামান্যতম সহজবুদ্ধি সক্রিয় ছিল, তাঁরা কেউই বারীন্দ্রের ঐ উদ্‌ঘাটনী পাগলামিতে সায় দেন নি। যেমন সায় দেন নি হেমচন্দ্র কানুনগো, বা দলের সর্বোচ্চ নেতা অরবিন্দ। বারীন্দ্র এঁদের কারো কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কারণ, তিনি স্থির ক'রে ফেলেছিলেন : "আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"[১৬] ও-বিষয়ে ব্যস্ত বারীন্দ্র—ইতিমধ্যেই কয়েক বছর যিনি বিপ্লবী জীবন

১৬ "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী : ধরপাকড়ের যুগ" (১৩২৯), ৫০-৫১।

বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি রক্ষার নীতি বারীন্দ্রকুমার জানতেন না, এমন দুর্নাম তাঁকে পাছে কেউ দিয়ে ফেলে, সে জন্য নির্বিকারভাবে লিখেছেন :

"অরবিন্দ নিজে আমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান। তার মর্ম হচ্ছে—'দেহে যতদিন জীবন আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটে—ততদিন এই বিপ্লব-ব্রত পালন করে যাব। যদি কখনো এই গুপ্তসমিতির কোনো কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি, বা সমিতির অনিষ্ট করি, তাহলে চক্রের গুপ্তঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে।" ['অগ্নিযুগ', ১ম খণ্ড, ৩১]

বারীন্দ্রকুমার দলের গুপ্ত সংবাদ ফাঁস করার পরেও, গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ না দিয়ে, উল্টোপক্ষে একই দোষে দুষ্ট অন্যের প্রাণহরণের ব্যবস্থা ক'রে, শেষোক্ত কার্যের গৌরবরস সানন্দে পান করার পরে, সোৎসাহে উপরের কথাগুলি লিখেছেন।

যাপন করে ফেলেছেন—নিজের 'মিশন' 'ওভার' করার প্রেরণায় জেলখানায় কয়েকজনকে জমতে এনে ফেলেছিলেন। মনোরম সরলতার সঙ্গে কাহিনীটি পরবর্তীকালে বারীন্দ্র লিখেছেন : "পরদিন সকালে প্রথমে উপেন ও উল্লাস আসিল। পরামর্শ করিয়া আমরা স্থির করিলাম—আমি, উপেন, বিভূতি, ইন্দু, সমস্তই নিজের ঘাড়ে লইয়া সব স্বীকার করিব। হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সে রাজি হয় ভালই, না-হয় আর কাহারও নাম করা হইবে না। হেমচন্দ্র আসিল এবং কোনো কথাই স্বীকার করিতে রাজি হইল না। সে সংসারের পাকা ঝানু জীব, অনেককাল পাউণ্ড-ইনস্‌পেক্টাররূপে পুলিশ চরাইয়া খাইয়াছে, সে বরঞ্চ আমাদেরই এই বেকুবি করিতে মানা করিল। পুলিশ বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সরাইয়া লইল।"[১৭] হেমচন্দ্রের কথা অবশ্যই ঐকালে বারীন্দ্র শুনতে পারেন না, তার কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন : "নিজের অনুষ্ঠিত এতবড় লোভনীয় রণরঙ্গী ব্যাপারখানা বলিতে বসিয়া মানুষের বলার রোখ চাপিয়া যায়। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে। দেশের জন্য আমরা যে শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ-তপস্যাই করিনা কেন, তাহা যে বারআনা আশার নেশারই মৌতাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন তাহা বুঝি নাই, কারণ তখন সংযমের বয়স নয়, তখন জীবনের চৌরাস্তায় বোল ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইবার বয়স।"[১৮]

গাড়ি হাঁকাবার সময়ে পথের উপর কেউ এসে পড়লে তাকে চাবুক খেতে হয়, এমন কি অরবিন্দকেও খেতে হয়েছিল, অন্তত বাক্যের চাবুক। বারীন্দ্রের খোলামেলা বিপ্লব-খেলা দেখে হেমচন্দ্র আশঙ্কিত হন; অরবিন্দও হন এবং বারীন্দ্রকে সতর্ক করেন। কিন্তু বারীন্দ্র ফিরে অভিযোগ করেন—হেমচন্দ্ররা "শক্ত কোনো কাজে হাত দিতে চায় না বলেই দিনরাত কেবল পুলিশের স্বপ্নই দেখছে।" হেমচন্দ্র লিখেছেন, "ক-বাবু [অরবিন্দ] বারীনের অন্য সব কথার মতো এ-কথাও খুব সঙ্গত বলেই মেনে নিয়েছিলেন।"[১৯] মজঃফরপুরে বোমা ফাটার পরে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়ে দলের সকলকে সতর্ক করে দিতে বলেন, আড্ডা থেকে সরিয়ে দিতেও বলেন। "কিন্তু কোনো আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোনো খবর না দিয়ে ম্যানিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলবার, গুলি, সেল আদি পুঁতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল।...ঐ সময় নাকি পুলিশের কে একজন এসে এইরকম ইঙ্গিত দিয়েছিল, 'সকালে অনেক পুলিশ আসবে, সাবধান।' একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসেনি।"[২০] এরপরে সদলবলে বারীন্দ্র প্রভৃতির গ্রেপ্তার, ও পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তি। এই স্বীকারোক্তির মারাত্মক ফল কি হতে পারে, হেমচন্দ্র জানতেন, অরবিন্দও জানতেন। হেমচন্দ্র বারীন্দ্রকে দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করাতে চেষ্টা করলেন। "আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়েছিল, [হেমচন্দ্র লিখেছেন] কি করে বারীন্দ্রকে দেশের এহেন উৎকট মঙ্গল করবার ব্যাধি হতে অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করা হতে মুক্ত করা যেতে পারে। যে-একটা টোটকা ব্যবস্থা করেছিলাম তা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর [অরবিন্দর] নাম ক'রে কিছু বললে তা রাখলেও রাখতে পারে, এই আশায় তার বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম—অরবিন্দবাবুর সহিত আমাদের পাঁচজনের দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে, যারা কনফেশন্ দিয়েছে তাদের, বিশেষত বারীনের সঙ্গে দেখা হলে যেন বলে দি—তারা যা-কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে তা যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়।··· Retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও যখন বারীন ভিজল না তখন বলেছিলাম—বিবেচনা করে দেখা উচিত, তার এ-রকম স্বীকারোক্তি দেশদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারে কিনা? এই কথা শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা বলেছিল তার মর্ম হচ্ছে—সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে তা বোঝবার ক্ষমতা সেজদা (অরবিন্দ) বা কোনো উকিলের নেই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। 'অরবিন্দ এসব কী বোঝে?' (বারীনের মুখের কথা)। এইরকম অনেককিছু শোনবার পর, বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করলে কেন, তা জিজ্ঞেস করায়

১৭ ঐ, ৫৪।
১৮ ঐ, ৫৪-৫৫।
১৯ হেমচন্দ্র কানুনগো, "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা", ২৬৮; গিরিজাশঙ্করের গ্রন্থে উদ্ধৃত, ৭৩২।
২০ হেমচন্দ্র, ২৬৮; গিরিজাশঙ্কর, ৭৩২।

বলেছিল—সে মিথ্যে কথা বলতে আমাদের মতো অভ্যস্ত নয়।"[২১]

বাজে কথা। বারীন্দ্র 'মিথ্যে' বলতে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। এবং তাঁর 'মিথ্যে' অনেকগুলি লোকের অকারণ মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। বারীন্দ্র তাঁর দলের মূল নেতা অরবিন্দর নাম করেন নি। প্রশংসনীয় তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতি, কিন্তু অনুরূপ প্রীতি ছিল না স্বদলের লোকেদের প্রতি। তিনি পুলিশের কাছে অযথা নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলে দিয়েছিলেন। "এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া [বারীন্দ্র লিখেছেন] খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল। তাহার শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে তাহা তখন কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, আমরা বুঝি নাই।"[২২]

নরেন গোঁসাইয়ের কুকীর্তির ঘোষণায় সকলেই উচ্চকণ্ঠ—আমরাও তাতে নিজেদের কণ্ঠস্বর যোগ করছি। অনেকেই নরেন গোঁসাইকে পুলিশের চর বলে পরে বুঝতে পেরেছেন,তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনাশীল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও আছেন। অরবিন্দ ঐ "অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা ফর্সা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়" যুবক নরেন্দ্র গোঁসাইয়ের "চোখের ভাব কুবৃত্তি-প্রকাশক" দেখেছেন।[২৩] সবই ঠিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি অরবিন্দর অন্য সূত্রে কথিত কথার প্রতিধ্বনি ক'রে নরেন গোঁসাই সম্বন্ধেও বলা যায়—**He was murdered 'for telling the truth with too much emphasis'**—তাহলে কথাটা অনুচিত হয়ই, কারণ বারীন্দ্রের অন্যায় নরেন গোঁসাইয়ের দুষ্কার্যের সাফাই হতে পারে না। তবে ইতিহাসের বিচিত্র চেহারাটা খুলে ধরবার জন্য বলতেই হবে—বারীন্দ্র যেমন সত্যের ঘোরে ছিলেন (উদ্দেশ্য সৎ), ততোধিক সত্যের ঘোরে ছিলেন নরেন গোঁসাই (উদ্দেশ্য অসৎ)। নরেন গোঁসাই সম্ভবত মনে করেছিলেন—বারীনের মিশন্ যদি পুরো সফল করতে হয় তাহলে পুরো সত্য জানানো দরকার, পুলিশকে বলা উচিত, এসব ব্যাপারে আসল নেতা অরবিন্দ—এবং অরবিন্দ ফাঁসিকাঠে ঝুললে বা দ্বীপান্তরে গেলে বারীন্দ্র প্রভৃতির শাস্তিতে প্রাপ্তব্য ফলের তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা !!![২৪]

কথাগুলি তিক্ত কিন্তু বারীন্দ্রের অপকীর্তির তুলনায় নয়। বারীন্দ্র ও নরেন গোঁসাইয়ের কাজের পার্থক্য দেখাবার উদ্দেশ্যে গিরিজাশঙ্কর বলেছেন, বারীন স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের গলা ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আর নরেন গোঁসাই তার দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। খুব ঠিক কথা। বারীনের সুদীর্ঘ দ্বীপান্তর শাস্তির কথাও মনে রাখছি। কিন্তু হায়, তারপর ? মুক্তির পরে বারীন্দ্র কী করলেন ? কদর্য সে ইতিহাস। বারীন্দ্র গোটা বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন—তিনি ইংরাজ সরকারের তাঁবেদার প্রচারক হয়ে দাঁড়ালেন। ঐ কালে নরেন গোঁসাইয়ের প্রেতাত্মা বারীন্দ্রের শরীরে নৃত্যগীত করেছিল—আর ঘৃণায় শিহরিত হয়েছিল কানাইলাল দত্ত বা সত্যেন বসুর দেবাত্মা।

মুক্তি পাবার পরে বারীন্দ্র সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারে, ঠিকভাবে বলতে গেলে, তার কুৎসা প্রচারের জন্য, প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা করতে থাকেন। ইংরাজ সরকারের সে-রকম স্তুতি এবং বিপ্লবীদের সে-রকম নিন্দা আমরা অল্পই দেখেছি।

"শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ" ১৯৩৬ সালে "ভারত কোন্ পথে" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক লেখেন ও প্রকাশ

২১ হেমচন্দ্র, ২৮৭-৮৮;
২২ বারীন্দ্র, 'আত্মকথা', ৫৫।
২৩ অরবিন্দ, 'কারাকাহিনী', গিরিজাশঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত, ৭৪০।
২৪ বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তিই নরেন গোঁসাইকে ধরিয়েছিল। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়া পত্রিকার ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সংখ্যায় পাই :

"The approver, who belonged to a well-known family at Serampore, was not arrested in the first hatch of conspirators, and was, in fact, implicated by the confession of Barendra kumar Ghosh, one of the leaders of the secret society who stated that Gossain was one of the party which was sent to murder the Mayor of Chandernagore."

নরেন গোঁসাই অরবিন্দকে জড়িয়েছিল, সে সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া পত্রিকার ২৪ জুলাই, ১৯০৮, সংবাদ :

"The *Manchester Guardian* published on Wednesday last (July 22) an article from its Calcutta correspondent, in which it is noted with regard to the Anarchist Trial in Calcutta, that while the informer [Gossain] has mentioned names freely, he has not brought any recognised leader into his story except Mr. Aurobindo Ghose, and has referred to no single Congress man of any standing."

করেন—৪বি, বৃন্দাবন পাল বাই লেন, শ্যামবাজার থেকে। এই বইয়ের অনর্গল বৃটিশ প্রশস্তি এবং অভ্রান্ত স্বাধীনতা অন্দোলনের নিন্দার সামান্য কিছুই মাত্র এখানে তুলছি :

"এতদিন মানুষ ভণ্ডামীকে বীরত্ব বলে ভুল করেছে। যে যত বেশি মানুষের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে পেরেছে সেই ছিল তত বড় বীর।... দেশে-দেশে আমাদের কবিরা, চারণরা, পুরাণকারেরা এই গুণ্ডামী ও কসাইবৃত্তির প্রশংসায় চিরদিনই পঞ্চমুখ।... এ বীরত্ব ও মিলিটারিজম্, এই বর্বর অসভ্যের আচরণ এতদিন সভ্যতার চিহ্ন বলে পূজা পেয়ে এসেছে। পরাধীন জাতিমুক্তির নামে, দেশপ্রীতির নামে, নররক্তে দেশ ভাসিয়ে [মানুষ] এতদিন স্বাধীন হয়েছে, পূজা পেয়েছে। সে দিন কিন্তু আর নাই। জিঘাংসা ও ক্রুরতার অন্ধ ঝটিকা তুলে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে ক্ষিপ্ত করে জগৎ আর চলতে পারবে না।" [১৫-১৬]

"ভারতের মুক্তির সংগ্রাম তবে কি নরমেধ যজ্ঞ ? এর উত্তরে হয়ত বলা হবে, বিজেতার হাতে অসি ও আগ্নেয়াস্ত্র—তবে আমরাই কি শুধু ব্যর্থ প্রেমের মন্ত্র আওড়াব ? এর জবাবে আমি বলব, ওরা বিজেতা নয়, ওরা দেবতার আশীর্বাদরূপে ভারতে এসেছিল শত্রুর মুখোশ পরে, ওদের স্পর্শে তোমরা বেঁচে উঠেছ। শক, হুন, মোগল, পাঠানের স্পর্শে তোমরা নিছক গোলাম হয়েছিলে—এতবড় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, গণতন্ত্রের বাহন তারা ছিল না।... এ জাতি পররাষ্ট্রগ্রাসী হলেও অসভ্য নয়, এশিয়া-গ্রাসোদ্যত লুব্ধ জাপানী ড্রাগন নয়। এরা সভ্য প্রাণবান মুক্তির পূজক। বৈধ অহিংস পথে, দৈবী শৌর্যে এদের জয় করা যায়, শত্রুর মুখোস এদের এরই মধ্যে খসে গেছে। এখন দিন এসেছে এই অপূর্ব কর্মকুশলী রাজস-সাত্ত্বিক জাতির সাহায্যে ও সাহচর্যে এই পতিত দেশকে গড়ে তোলার।" [১৬-১৭]

"[ইংরাজের সঙ্গে] সহযোগ আমরা করি নাই, করে দেখি নাই যে, ও-পথে সিদ্ধি আছে কিনা ?... আমরা জানি শুধু নাকে কাঁদুনি, শুধু পোশাকী পলিটিক্স, শুধু নিরাশার সহজ বুলি। মণ্টেগু রিফর্ম খারাপ, ডায়ার্কি খারাপ, এখন আবার নূতন কনস্টিটিউশন খারাপ—ভালো শুধু পরের দেওয়া স্বরাজ—ফাঁকা এজিটেশনে লভ্য স্বরাজ।" [১৯-২০]

"'তোমার পিতা জল ঘোলা করছিল বলে আজ আমি তোমার রক্ত খাব'—এ যুক্তি বনের বাঘের যুক্তি, মানুষের নয়। কবে কোন্ অতীত যুগে আরও দশটা দেশলুণ্ঠকের সঙ্গে বণিকবেশে কয়েকজন ইংরাজ এসে অরাজকতার অবসরে পতিত এ দেশ জয় করেছিল বলে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে ঘৃণা করা বা শাস্তি দেওয়া সেই নেকড়ে বাঘেরই যুক্তি, অসভ্য আফ্রিদির বংশপরম্পরাগত রক্তের নেশা blood feud-এরই সগোত্র। বয়কট শাসকের উপর চাপ দেবার অস্ত্র হতে পারে, কিন্তু বয়কট যে দু'দলকেই উৎসন্ন করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা আমরা বারবার করে এবং ঠেকে বুঝেছি।... শোষণ ও প্রতিহিংসা, **Exploitation and Retaliation** একই জঘন্য বৃত্তির দুই দিক মাত্র।" [২১]

"ভারত ও বৃটেন, দুই দেশের মিলন যখন বিধির বিধানে হয়েছে তখন বৃটেনকেই করতে হবে আমাদের গঠনের মন্ত্রগুরু।" [২২]

"ইংরাজ মুক্তির দূত ; যেখানে যায়, সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, মুক্তির বীজ বপন করে। তাই আজ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ারল্যাণ্ড—স্বাধীন ; মিশর এবং ভারতও স্বাধীনতার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমরা জাতীয়তার কুজ্ঝটিকায় অন্ধ নেতার মুখে ইংরাজের অনেক অপগুণের কথা শুনেছি, তাদের চরিত্রের অন্য দিকটাও আমাদের বোঝা ও শোনা উচিত।" [২৪]

"উগ্র জাতীয়তার মোহমুক্ত হয়ে সমবিচারশীল দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, ইংরাজ ছাড়া ইউরোপের আর কোনে জাতিই কোনো দেশকে বাহির থেকে পরাধীন করেও তার আত্মাকে—তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে—এমন করে জাগিয়ে দিতে পারেনি।" [২৭]

"সন্ত্রাসবাদ জন্মেছে নৈরাশ্যে ও বিফলতার ক্ষোভে। গুপ্তঘাতকের ছোরা ও বিস্ফোরক বোমা রাজনীতিতে আমদানী করলেই কি তার হীন পাশবতা ঘোচে ? আসুরিক যা, অন্ধ জিঘাংসু যা, তা মানুষের চরিত্রকে পাশব ও নিষ্ঠুর করে দেয়, মানুষের অন্তরের মহত্ত্বকে ম্লান করে আনে। গুণ্ডা সর্বত্রই গুণ্ডা—মেছোবাজারের গুণ্ডা, ধর্মের গুণ্ডা, রাজনীতির গুণ্ডা—এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ কোথায় ?" [৩৮]

"১৯০৫ সালে ভারতের রাজনীতিক মুক্তির উপায়স্বরূপ আমিই দেশে বোমা ও সন্ত্রাসবাদের প্রথম প্রবর্তন করেছিলাম। সেই থেকে আজ অবধি আমাদের রাজনীতিক জীবনের তলে-তলে এই পঙ্কিল গুপ্ত অন্তঃস্রোত বয়ে চলেছে, এবং মাঝে মাঝে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করছে। দেশের, বিশেষত বাংলার একদল তরুণ এই বাঁকা পথের মোহ ছেড়ে কিছুতেই বাহির হতে পারছেন না আমাদের প্রথম বিপ্লববাদমূলক সংবাদপত্র যুগান্তরের যুক্তিগুলি দুরপনেয় হয়ে এঁদের অন্তরে আজও জেগে আছে। ভারত বদলেছে, আমি বদলেছি, কিন্তু এঁরা বদলান নাই। তাই সময় এসেছে যখন আমাকেই মুক্তকণ্ঠে দেখাতে হবে এ-পথের জঘন্যতা, এ-উপায়ের ব্যর্থতা।" [৩৯]

"আমাদের 'যুগান্তর' বোমাকে স্বরাজলাভের উপায় বলে কখনো প্রচার করে নাই ; 'যুগান্তর' কখনো লেখে নাই যে, গুপ্তহত্যায় দেশের মুক্তি আসবে। 'যুগান্তর' ছিল অকপট বিপ্লবাত্মক পত্রিকা ; সে বলত ব্যাপক বিদ্রোহের কথা ; এখন-তখন গুটিকতক রাজকর্মচারীকে হত্যা করে ভারত স্বাধীনতা পাবে, এ-কুযুক্তি যুগান্তর কখনো জাতিকে দেয় নাই।... যাঁরা সে সময়ের গুপ্তসমিতির মর্মকথা জানেন, তাঁরা জানেন—কিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের রাজনীতিক গুপ্তহত্যার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের গুপ্তচক্রের নেতারা, যাঁরা সবাই ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যের কোলে লালিত যাঁদের গায়ে বিপদের কোনো আঁচ লাগবার সম্ভাবনাই তখন ছিল না—তাঁরা এই গুপ্তহত্যাকেই করেছিলেন আমাদের কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য করবার একমাত্র শর্ত। দেশের মুক্তিযজ্ঞের এই-যে প্রচার, এই-যে আয়োজন, এ-কাজে তাঁরা তবেই টাকা দেবেন যদি আমরা অমুক অত্যাচারী রাজকর্মচারীকে, অমুক গভর্নরকে, অমুক জজকে হত্যা করতে পারি। তাঁরা চলতেন আপাত ক্রোধের ও দ্বেষের বশে।" [৪৩-৪৪]

"১৯০৩ সাল থেকে একদল অন্ধ ভাবুক আমরা এই স্বপ্ন দেখেছিলাম [যে, দেশে অবিলম্বে বিপ্লব এনে ফেলব।] দেশব্যাপী সশস্ত্র জাগরণ সম্ভব বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল, তার আর এক কারণ, আমাদের গুপ্তচক্রের নেতারা বলতেন, মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত মুক্তিসমরের জন্য একেবারে প্রস্তুত, বাংলার প্রতীক্ষায় তারা পথ চেয়ে আছে, এখন বাংলার আয়োজন সম্পূর্ণ হলই হয়। [এই কথাগুলি প্রধানত অরবিন্দই ছড়িয়েছিলেন, তা আমরা আগেই দেখেছি]। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের ভাঙনের সময়ে যখন আমি নিজে গিয়ে মহারাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বচক্ষে দেখে এলাম যে, একথা কত ভূয়া, কতখানি মিথ্যা, তখনই বাংলায় আরম্ভ হল এই অসাধ্যসাধনে একা দাঁড়াবার, একা আয়োজন করবার পাগল সংকল্পের।" [৪৫]

"এই বেদরদী ইস্তিচেয়ারী নেতাদের তাড়নায় আমাদের সহায়সম্বলহীন বুভুক্ষু দলটি নিছক অন্নবস্ত্রের অভাব মেটাবার জন্যই বাংলার জনপ্রিয় লেফট্‌ন্যান্ট গভর্নর স্যার এনড্রু ফ্রেজারের গাড়ির তলায় মাইন পুঁতে তা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। [ফ্রেজার জনপ্রিয় গভর্নর !!!!!] যে-দারুণ অভাবের বশে আমরা অকালে এমন করে বোমার অপপ্রয়োগে বাধ্য হলাম সেই অভাবই আমাদের পরিশেষে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতিতে লিপ্ত করেছিল। যুগান্তরের দল গুপ্তহত্যার মতো ডাকাতি, লুণ্ঠন ও দেশের ধনীর অর্থ বলপ্রয়োগে গ্রহণ সমর্থন করত ঠিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বের জন্য, তখন দেশে অরাজকতা আনবার জন্য। দেশবাসীর সর্বস্ব, সাধারণ চোর-ডাকাতের মতো অপহরণ করে, দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারানো এ-দলের মত কখনো ছিল না। আপদ্ধর্ম হিসাবে ধনীর টাকা বা অর্থবান ব্যবসায়ীর টাকা যা কেড়ে নেওয়া হবে তা দেশে স্বরাজ স্থাপিত হলে প্রত্যর্পণ [করা] হবে, এই ছিল আমাদের ধারণা। গভর্ণমেন্টের ট্রেজারি লুণ্ঠন অবশ্য বিপ্লবীর চোখে আমরা বৈধই মনে করতাম ; কিন্তু ঢাকার অনুশীলন দল ও অন্যান্য দলেরা যে-হীন রাহাজানি ও গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ আরম্ভ করল, সে কেবল সরকারী অর্থ লুঠ করা কঠিন ব্যাপার বলেই। যুগান্তর দল দু'এক জায়গায় কঠিন দারিদ্র্যের জ্বালায় নিতান্ত অনিচ্ছায় এ-চেষ্টা করেছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সফল হয় নাই। অনুশীলন দলের দ্বারা এই হীন চেষ্টা সফল হবার পর থেকে আর *দেশহিতব্রতী ও সাধারণ চোর-ডাকাতের কোনো পার্থক্যই রইল না।* এই ডাকাতি দ্বারা লব্ধ অর্থ খুব কম জায়গায়ই দেশের কাজে লেগেছিল। এ-পাপের ধন গেছে বেশ্যালয়ে অথবা গেছে স্বার্থপরের উদরে, কিংবা গেছে মোকদ্দমায় উকিল ব্যারিস্টারের পেটে।" [৪৭]

"আমি তোমাদের বলছি, কম্যুনিস্ট রাশিয়া মানবের পূর্ণ মুক্তি আনতে পারবে না, কারণ তাদের এতবড় আদর্শেরও পন্থা বা উপায় হচ্ছে সেই পশুবল, সেই হানাহানি ও শ্রেণীবিদ্বেষ, সেই মিলিটারিজম্ ও নরহত্যা।" [৬১]

"দেশবন্ধুর প্রেমিক কবিপ্রাণের উন্মাদনা ও বাণী হাজারে-হাজারে আনাড়ি ছাত্রকে পাঠিয়েছিল পল্লীর অস্বাস্থ্যকর দৈন্যে, অন্ধকারে ; লক্ষ-লক্ষ টাকা জলে দিয়ে তারা ফিরে এসেছিল ভগ্নমন ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে। আমরা বনের অজ্ঞ বানরের মতো গিয়েছিলাম জীবনের জটিল বিপুল যন্ত্র মেরামত করতে। এই হচ্ছে আমাদের কংগ্রেসী গঠন, স্বরাজের ভিত রচনা। কারণ এখন আমরা ভাবি, দেশ থেকে ইংরাজ তাড়ানো সহজ ও প্রথম কাজ কিন্তু দেশের দৈন্য ও অশিক্ষা নিবারণ বড় কঠিন ব্যাপার, ওসব স্বরাজের পরে পশ্চাতে দেখে নেওয়া যাবে। আমাদের দেশের কাজে স্টিম জোগাতে পারে এক প্রবল বিদেশী বৈরী। এ-রাজনীতিক শত্রু যদি কখনও মিত্রে পরিণত হয় তাহলে আমাদের বিদ্বেষমূলক জাতীয়তা বেলুনের মতো ফেঁসে যাবে—এই ভয়ে এই শত্রুকে আমরা দেশকল্যাণের সহযোগী করতে আদৌ প্রস্তুত নই। অসহযোগের মনটাকে কাজেই নানা উপায়ে চাবুক মেরে-মেরে জাগিয়ে রাখা আমাদের কর্মবিমুখ, আন্দোলনলোভী রাজনীতির অবশ্য কর্তব্য।" [১০০]

"নেতারা যে বলেন যে, স্বরাজ তাদের কল্যাণ করবে, এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর নাই।" [১০০]

"শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা, দেশবন্ধুর পল্লীসংগঠন, মহাত্মাজীর অর্থনীতিক প্রচেষ্টা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ—সবই সমান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ ওঁরা সকলেই উপেক্ষা করেছিলেন দেশের [ইংরাজ] শাসনশক্তিকে, ব্যবস্থাপকমণ্ডলীকে, legislative ও executive শক্তিকে। তাঁরা গেছিলেন হাওয়ায় রাজপ্রাসাদ গড়তে, ভাবের চোরাবালুর উপর দেশযজ্ঞের ভিত্তি রচনা করতে। তাই স্বায়ত্তশাসনে নাগরিক স্বাধীনতা দিতে হয়েছিল ঐ বহুলাঞ্ছিত স্যাটানিক গভর্নমেন্টের সাহায্যে নরমপন্থীর রাজা ঐ সুরেন্দ্রনাথকেই। বাংলার দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের যত শক্তি, যত চেষ্টা ও স্থায়িত্ব, সবই মডারেটের দান সেই কর্পোরেশনেরই প্রসাদাৎ।... বিদেশীরা অমানুষ আর আমরাই মানুষ—এ বৃথা গর্ব আঁকড়ে আমরা বহুদিন কাটিয়েছি। তার ফলে দেশ চলেছে অধোগতির পথে। আমাদের এই মলিন অহমিকা, দ্বেষ ও ঘৃণাবুদ্ধি, বিদেশী শাসকের মাঝে যদি জাগিয়ে তোলে ক্রোধ ও দলনপ্রবৃত্তি—সেটা কি খুবই অস্বাভাবিক?" [১০৪-০৫]

উপরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের যেসব রচনাংশ উদ্ধৃত করলাম সে-ধরনের লেখা প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত খুব নিম্নশ্রেণীর রাজভক্তও লিখবেন না। সুতরাং 'বোমারু বারীনের' এইসকল উদ্গারের মূলে কোন্ আহার্য ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। অনুমানের প্রয়োজন নেই—বিহারের গভর্নরকে লেখা বারীন্দ্রের নিম্নের পত্রটি সেই আহার্যের সন্ধান দেবে। পত্রটি পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজখানায় রক্ষিত :

Home (Pol.) Fl. No. 367/21/1921 Confidential

[Petition, without date, from Barindra Kumar Ghose (Iswar House, Samaj Street, South Tharpakhna, Ranchi) to His Excellencey the Governor of Bihar]

I hope your Excellencey will be graciously pleased to read these few humble lines from me and design to consider my petition favourably. I am Sri Aurobindo's youngest brother, bron in Croydon, in the year 1880. It was I who started the revolutionary movement in Bengal in 1905, which later on, degenerated into terrorism. After coming back from the Andamans I realised the folly of persistence in these violent acts so far as India's political development was concerned. So I began writing a series of articles in the Statesman against this, persuading my fellow workers to desist from such futile and mad acts. These writings were later collected and expanded into a book under the title 'Wounded Humanity.' It served to win over many hot-headed youths to sever politics and renounce terrorism.

I prepared a scheme for the Government of Bengal for giving scope to detenues to change their ways and earn their livelihood through semi-government

agricultural and industrial training centres. This scheme was adopted by the Government and I was made an unofficial visitor to help change the mind of these misguided youngmen. I was also an employee in the Government Publicity Department and worked there for fifteen months until the advent of the New Party Government. I am attaching two out of Lord Zetland's numerous letters to me for your information and also a cutting from the Statesman.

All these facts I take the liberty to place before you as I have come intending to settle down in Ranchi, I wish to secure a plot of land and build my cottage and spiritual Ashrama there and pursue my yoga practices. I should like to know whether the Government of Bihar approve of my setlling down here and without their approval and support my movements may easily be misunderstood. I am taking the liberty to present your Excellency with a copy of my book which was so highly spoken by Lord Zetland. As Governor of Bengal he had the kindness to meet me and became thenceforward my patron. Sir John Anderson also had the grace to meet me more than once. The present Police Commissioner of Calcutte, Mr. Fairweather knows me intimately and take a very kind interest in me. A reference to the I. B. Dept. of Calcutta will show to the Government of Bihar how I am above suspicion now and have renounced politics altogether. I crave for your Excellency's personal protection and active interest in me. I shall explain things personally if I am honoured with an interview.

Sd. Barindra Kumar Ghosh.[২৫]

॥ ২ ॥ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রসঙ্গে নিবেদিতা

১৯০৫-১১ পর্বে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা এবং মাদাম কামা-র নাম সুপ্রচারিত। নিবেদিতার চিঠিতে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার উল্লেখ আছে, তবে তা সমাদরসূচক নয়।

নানাদিক দিয়ে কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭-১৯৩০) ঐতিহাসিক পুরুষ হবার যোগ্য। প্রতিভাবান ছাত্র তিনি—একদিকে বিরাট সংস্কৃত পণ্ডিত, অন্যদিকে ইউরোপীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন (অক্সফোর্ডের এম-এ ; বার-অ্যাট-ল)। একসময়ে স্বামী দয়ানন্দের বিশ্বস্ত সহকর্মী ; পরে ভারতের একাধিক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। ইংরাজ শাসকদের চক্রান্তে জুনাগড়ের লোভনীয় দেওয়ান-পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠেন, এবং ১৮৯৭ সালে তিলকের শাস্তির কালে ভারতে বসবাস করা নিরাপদ মনে না করে ইংলণ্ডে চলে যান। সেখানে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' (১৯০৫), এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের আবাসভবন 'ইণ্ডিয়া হাউস' স্থাপন করেন। ১৯০৫ জানুয়ারি থেকে তাঁর 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' পত্রিকার শুরু। কৃষ্ণবর্মার আন্দোলনের আদি চরিত্র সম্বন্ধে টি শ্রীরামুলু মডার্ন রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ১৯০৯ সংখ্যায় লিখেছিলেন :

"প্রথম আড়াই বছর এই সোসাইটি ও তার মুখপত্র অনেক ভালো কাজ করেছিল। ১৯০৭ সালে রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরের দাঙ্গা ও তৎসূত্রে গ্রেপ্তার ও চালান ইত্যাদির ফলে··কৃষ্ণবর্মার মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি বৈপ্লবিক পদ্ধতির বিষয়ে অনুমোদন ও সমর্থন ক'রে কথাবার্তা বলতে ও লিখতে শুরু করেন। তার আগে তিনি কদাপি বৈপ্লবিক পদ্ধতির সমর্থন করেননি।"

শ্রীরামুলু নিজ বক্তব্যের সমর্থনে ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকার অক্টোবর ১৯০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত কৃষ্ণবর্মার উক্তি উদ্ধৃত করেন :

"আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছি [কৃষ্ণবর্মা লিখেছিলেন]—ইংলণ্ড ও ভারত শান্তিপূর্ণভাবে,

২৫ এই পত্রটি এবং 'ভারত কোন্ পথে' বইটি সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছি ডঃ শিশির করের সৌজন্যে।

বন্ধুত্ব বজায় রেখে, সম্পর্কচ্ছেদ করবে। সক্রেটিসের উপদেশ মনে রেখো। তিনি বলেছিলেন, যদি কোনো কিছু পেতে চাও তাহলে বলপ্রয়োগে নয়, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেটি আদায় করো, কারণ তা করলে তুমি অধিকন্তু বন্ধুত্ব পাবে ; আর বলপ্রয়োগ করলে পাবে শত্রুতা ; অথচ উভয়ক্ষেত্রে একই বস্তু পাচ্ছ।"

এলাহাবাদের পায়োনীয়ার কাগজ যখন তাঁর আন্দোলনকে বৈপ্লবিক বলে নিন্দা করেছিল, তখন জানুয়ারি ১৯০৬ তারিখে কৃষ্ণবর্মা ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট-এ লেখেন :

"পায়োনীয়ার বলেছে, আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের মূল কথা হল : 'আমাদের দেশের সঙ্গে বৃটিশ সম্পর্ককে আমরা এমন অভিশাপ বলে মনে করি যে, বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা সম্ভব হলে বৃটিশকে বলপ্রয়োগে দূর করাই বাঞ্ছনীয়।' পায়োনীয়ারের এই কথায় আমরা গভীর আপত্তি করছি। আমরা কদাপি আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বলপ্রয়োগের পক্ষে প্রচার করিনি।"

একই বছরের অগস্ট মাসেও কৃষ্ণবর্মা শান্তিপূর্ণ উপায়ের সমর্থনে হুবহু একই কথা বলেছেন।

কৃষ্ণবর্মা প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইসব ছাত্রের কয়েকজন (সুবিখ্যাত বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁদের মধ্যে ছিলেন) কৃষ্ণবর্মার চারিদিকে জোটেন। সেন্ট নিহাল সিং রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় কৃষ্ণবর্মার বিষয়ে উচ্ছ্বসিত বিবরণের মধ্যে বলেন, এইসব ছাত্রদের কাছে "কৃষ্ণবর্মা বিদেশে…দেবাদিদেব।" (এই কথার আংশিক সত্যতাই মাত্র স্বীকার্য)। ইনি আরও লিখেছেন : "ভারতে বৃটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণবর্মা অশ্রান্ত সর্বাত্মক সংগ্রামী। এক বৎসর আগে তিনি এমনই সক্রিয় ছিলেন যে, তাঁর নাম পার্লামেন্টে আলোচনায় উঠেছিল ; তাঁর কাগজ ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট বাজেয়াপ্ত হয় ও ভারতে তার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই অদম্য সম্পাদক…পত্রিকাটি প্রকাশ ক'রে যেতে ও তাকে ভারতে পাঠাতে থাকেন,….অনুমান করি, ডাকে চিঠির আকারে। ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট ক্ষুদ্র চারপাতার মাসিক পত্রিকা।…বৃটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ বিষাক্ত।"

১৯১১ সালের পরে কৃষ্ণবর্মার বৈপ্লবিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে, এবং জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে তিনি নিঃসঙ্গ শূন্য জীবন যাপন করেন।[২৬]

কৃষ্ণবর্মার যথেষ্ট বিদ্যা ছিল, যথেষ্ট অর্থ ছিল, এবং তিনি ভারতের পলাতক রাজনৈতিকদের সাহায্য করতে সচেষ্ট ছিলেন (যদিও তাঁর প্রদত্ত বৃত্তির টাকা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে শোধ করতে হবে, এমন শর্ত ছিল)—সুতরাং তাঁর মেজাজও যথেষ্ট উগ্র ছিল, যার জন্য অন্য কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হত। লাজপত রায়ের মতে, কৃষ্ণবর্মার মেজাজ রাজকীয়—তাঁর সঙ্গে অন্যের মতভেদের অধিকার তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[২৭] বিপ্লবীদের জন্য কৃষ্ণবর্মার দানের বহু প্রচারিত তথ্যটিও অনেকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে চান।[২৮]

২৬ রমেশ মজুমদার, ২য়, ৩১২।

২৭ বিমানবিহারী, ১৪১।

২৮ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' (১২৮-২৯) কৃষ্ণবর্মা-প্রদত্ত বৃত্তির কথা বলেছেন, যা স্বয়ং তিনি, সুবোধচন্দ্র বসু (মেদিনীপুরের শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাই), ও তারকনাথ দাস পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিপ্লবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে কৃষ্ণবর্মার আন্তরিকতার অভাবের কথাও তিনি বলেছেন। কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী তাঁর ত্রিশ মিলিয়ন ফ্রাঙ্কের বিপুল সম্পত্তি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন : "বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিতেন যে, কৃষ্ণবর্মা কোনো বিপ্লবীকে বা কোনো বৈপ্লবিক কর্মে কিছু সাহায্য দান করেন নাই।"

কৃষ্ণবর্মার মতো উগ্র আত্মাভিমানী কোনো মানুষকে সহ্য করা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুদূর ইউরোপে বাস ক'রে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা চালিয়ে, কিছু বিপ্লবীকে সাহায্য ক'রে, বা প্ররোচিত ক'রে, ভারতবর্ষের ন্যাশন্যালিস্ট দলের প্রধান নেতা হয়ে বসা যায়—একথাও নিবেদিতা মানতে পারেননি। কৃষ্ণবর্মার ওহেন স্বয়ং-ঘোষিত ভূমিকা বিষয়ে তিনি র‍্যাটক্লিফকে লেখা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ তারিখের চিঠিতে তীব্র মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে কেবল কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক ভারতীয় ন্যাশন্যালিস্টদের নেতা সাজার হামবড়াই-ভাবের প্রতিবাদই ছিল না—বৈপ্লবিক কাজের ব্যাপারে অসতর্ক আচরণের সমালোচনাও ছিল।

নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে পূর্বোক্ত পত্রে লিখেছিলেন :

"কৃষ্ণবর্মা শ্যামজীকে শেষ পর্যন্ত গলা টিপে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—একথা শুনলে আমি কতখানি খুশি হব তা বলে বোঝাতে পারব না। একেবারে জঘন্য কাণ্ড—সে ঐভাবে কথা বলতে সাহস করে—যেন সে জাতীয়তাবাদীদের স্বীকৃত নেতা। এই ডাকে তুমি অবশ্যই মডার্ন রিভিউ-এ ঐ ভ্রান্তির মুখোশ খুলবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখে পাঠাবে। 'ন্যাশন্যালিজম্' এই মুহূর্তে কোনো সংগঠিত দল নয়। আর তা যদি হয়ও, তার নেতৃত্বে কৃষ্ণবর্মার কোনো দাবিই নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, লোকটিকে সরকারের ও পুলিশের এজেন্টরা ঘিরে আছে; তারাই তার মুখপাত্রের কাজ করছে। ঐসব লোকগুলি, কৃষ্ণবর্মা যতদূর যেতে পারে তার থেকেও তাকে ক্রমাগত ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য পরিষ্কার—প্লট ও বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করা। তার লণ্ডন শাখার সম্বন্ধে এই জিনিসটিকে আমি সত্য বলে জানি, কারণ সেইসব লোককে, তাদের কিছু সংখ্যককে অন্তত, আমি এডিনবরায় দেখেছি।"

কৃষ্ণবর্মার বিরুদ্ধে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এ লিখবেন বলেছিলেন—লিখেছিলেনও—এপ্রিল ১৯০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোট—"দি মর্লে স্কীম অ্যাণ্ড দি সিচুয়েশন্।" [আইন বাঁচাবার জন্য রামানন্দ লেখাটিতে কিছু রদবদল করতে পারেন]। ঐ লেখার প্রথম দুই অনুচ্ছেদ :

"গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে লিখিত, লণ্ডন থেকে প্রেরিত একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি—টাইমস পত্রিকা লর্ড মর্লে-র নতুন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ বিল-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার চালাচ্ছে, সেইসূত্রে সে এক বিশেষ সংবাদদাতার জন্য অনর্গল টাকা খরচ ক'রে যাচ্ছে, এবং লর্ড মর্লে টাইমস্ পত্রিকার ভয়ে একেবারে থরহরি। এর সঙ্গে যোগ করা যাক—গত ২০ ফেব্রুয়ারি টাইমসে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামক আকাট নির্বোধ এবং অপরের কাজে গণ্ডগোল-সৃষ্টিকারী লোকটির প্যারিস থেকে প্রেরিত একটি চিঠি বেরিয়েছে যার মধ্যে ইংরাজদের প্রকাশ্যে সতর্ক ক'রে বলা হয়েছে—তাঁরা যেন এখন ভারতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন না করেন। সকল ভারতীয় ন্যাশন্যালিস্টের অভিপ্রায় খুন করা—এমন কথাও সেখানে আছে!!! এইভাবে ভারতীয় ন্যাশন্যালিজম্ প্রকাশ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে খুনের সঙ্গে যুক্ত হল!!! এটা এতই উদ্ভট যে, গুরুত্বের সঙ্গে এর প্রতিবাদ করা, বা একে অগ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই।...

"ন্যাশন্যালিজম্ এখনো ভারতে কোনো সুসংগঠিত দল নয়। তা যদি হতও তথাপি প্যারিসে অবস্থিত এবং অবিবেচনার জন্য কুখ্যাত কোনো এক রিফিউজিকে এক মুহূর্তের জন্য তার নেতৃত্বের দাবিদার হতে দেবার সম্ভাবনা নেই। ন্যাশন্যালিজম্-এর মতাদর্শ নির্ধারণের কোনো অধিকারই ঐ ব্যক্তির নেই; অন্তত এই একটি কারণে—লণ্ডনে, বোধহয় ভারতবর্ষেও, যারা ওঁকে ঘিরে আছে ও ওঁর মুখপাত্রের কাজ করছে, তারা সুগভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্র; যেসব সৎ লোক ওঁদের

সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা ওঁদের অ্যামেচার 'আজেফ'গণ বলেই মনে করেন।"

"Nationalism is not as yet an orgainsed party in India. If it were, it is extremely unlikely that a certain rash and notoriously thoughtless refugee in Paris would be allowed for a single moment to lay claim to its leadership. He has no right whatever to lay down the doctrines which determine Nationalism, if only for the reason that many of those who surround him and represent him in London and perhaps India, are regarded with profound suspicion and distrust by all honest men who come in contact with them, as amateur *Azeffs." [Modern Review,* April 1909].

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'আজেফ' বাহ্যত ছিলেন রাশিয়ায় জার-আমলে সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারি পার্টির অ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা, যাঁর নির্দেশে বা ব্যবস্থাপনায় উচ্চপদস্থ প্রশাসকদের পর্যন্ত খুন করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তি অপরদিকে রাশিয়ার সিক্রেট পুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যাঁর কাজ ছিল বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে উস্কানিদাতার ভূমিকা নিয়ে, ভিতরের সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা গোয়েন্দা পুলিশের গোচর করা। আজেফ, রাশিয়ার বৈপ্লবিক ইতিহাসে কুখ্যাত একটি নাম।]

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অগস্ট ১৯০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক কার্জন উইলির হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ক'রে যে-মন্তব্য করা হয়, তার একাংশে নিবেদিতার হাত থাকা বিচিত্র নয়। নিবেদিতার ধারণা হয়েছিল, কৃষ্ণবর্মা সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে ধরা দিয়েছেন, এবং টাইমস পত্রিকা কৃষ্ণবর্মার চিঠি ছেপে, ভারতে সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলে, শাসন সংস্কার বন্ধ করার চেষ্টা করছে। মডার্ন রিভিউ-এর উক্ত নোট-এর শেষ অনুচ্ছেদ এই :

"টাইমস কেন মিঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কাছে পত্রস্তম্ভ খুলে দিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পক্ষে প্রচারের সুযোগ ক'রে দিয়েছে, তার কারণ আমরা জানি, বা অনুমান করতে পারি। সেইসঙ্গে রয়টার কেন ওঁর মতামতকে ভারতে তারবার্তায় পাঠাবার জন্য বিশেষ মনোযোগী, তার কারণও অনুমান করতে পারছি। টাইমস ও রয়টার কৃষ্ণবর্মাকে ভারতীয় ন্যাশন্যালিস্টদের প্রতীক দাঁড় করিয়ে ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষতিসাধনে ইচ্ছুক। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—যে-সরকার ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট-এর প্রচার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, মুদ্রাকরকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন—তাঁরা কেন টাইমস বা রয়টারের জ্ঞানোদয়ের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়? ওরা কি সরকারের পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত শক্তিশালী? নাকি অন্যতর কোনো উদ্দেশ্য আছে?"

নিবেদিতার ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধির, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বুদ্ধিরই, প্রমাণ এখানে আছে।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতা : অ্যানী বেশান্ত : বেশান্ত কর্তৃক স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা—তার বিরুদ্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনা

নিবেদিতা যখন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার দায়িত্বহীন প্রকাশ্য প্রচারের সমালোচনা করছেন (ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালানোর কোনো দায় যে-কৃষ্ণবর্মার ছিল না)—ঠিক তখনি তিনি গুপ্ত সংবাদপত্রের পক্ষ সমর্থন করছেন, তাও আমরা আগে দেখেছি। একদিকে ছিলেন প্যারিসের

নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থিত, প্ররোচক কৃষ্ণবর্মা—অন্যদিকে অ্যানী বেশান্ত, যিনি ভারতীয়দের উপর ক্রিয়াশীল তাঁর প্রভাবকে লাগাচ্ছিলেন ভারতে বৃটিশ স্বার্থের সংরক্ষণে। অ্যানী বেশান্তের কার্যকলাপকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে নিবেদিতা মনে করেছিলেন।

অ্যানী বেশান্ত কখন কিভাবে থিওজফি আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভারতে এসে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমি অন্যত্র লিখেছি।[২৯] সেখানে তথ্যযোগে আরও দেখিয়েছি—১৮৯৫ সালের ৯ মার্চ, কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতাকালে তিনি যেভাবে বৃটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় প্রজাদের চিরকর্তব্যের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটা বেঙ্গলীর মতো মডারেট কাগজের কাছেও 'অযৌক্তিক' এবং 'সুস্পষ্টভাবে বজ্জাতিতে পূর্ণ' বলে মনে হয়েছিল। এর পরে ১৮৯৯ সালে পায়োনীয়ারে চিঠি লিখে বেশান্ত জানিয়েছিলেন—তাঁর উদ্দেশ্যে "ভারতে সেই অপূর্ব রাজভক্তির পুনর্জাগরণ ঘটানো, যার জন্য এই দেশের সন্তানেরা একদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তার অবশেষ এখনো এই দেশের মানুষকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজে শাসনযোগ্য ক'রে রেখেছে।" ঐ সময়ে বেশান্ত আরও বলেন—ভারতবর্ষে গণতন্ত্র অচল ; যদি সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহলে "শিক্ষিত ভারতবাসী অশিক্ষিতদের দ্বারা চাপা পড়ে যাবে।"

তারপরে স্বদেশী আন্দোলনের কালে ভারতীয়দের রাজভক্তি দারুণ চিড় খেল, তখন বেশান্ত ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে যথাসম্ভব সহযোগিতা করতে লাগলেন উক্ত বস্তুর মেরামতে। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা থেকেই তিনি তার ঘোর শত্রু। নিজ অপকর্ম ঢাকতে তিনি যেসব কৌশলী বচনবিন্যাস করেছেন, তাদের আবরণ মোচনে অবশ্য বুদ্ধিশীলদের অসুবিধা হয়নি। ১৬ অক্টোবর জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করায় বেশান্ত তাদের বিশেষ তিরস্কার করেন। তাঁর সেই কাজ সমালোচিত হলে কৈফিয়ত হিসাবে তিনি বলেন, রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষাকে জড়িত করা উচিত নয়, কলেজের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে মান্য করা উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। পুনার মরাঠা এই প্রসঙ্গে ৫ নভেম্বর ১৯০৫, মন্তব্য করে :

"যখন সমগ্র বাঙালী জাতি ১৬ অক্টোবর দিনটিকে শোকদিবসরূপে পালন করেছে, তখন [বেনারস] সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্রদের ঐ কাজ করার জন্য—'কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়'—বলে তিরস্কার করা অযৌক্তিক।...লখনৌ-এর অ্যাডভোকেট পত্রিকা বলেছে, ঐ সকল প্রদেশসমূহের কাছে বেশান্তের আচরণ নৈরাশ্যজনক বলে প্রতীয়মান। তাছাড়া অন্য কী মনে হতে পারে, আমরাও জানি না।"

নিবেদিতার চিঠিতে বেশান্তের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে বেশি উল্লেখ নেই, কারণ বেশান্ত যখন ইংলণ্ডে অবস্থান ক'রে সবাধিক ক্ষতিকর কাজগুলি করছিলেন, তার অনেকখানি সময়কালে নিবেদিতা ও র‍্যাটক্লিফ (যাঁর কাছে লেখা নিবেদিতার রাজনৈতিক পত্রই আমরা বেশি পেয়েছি) ইংলণ্ডে কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। তবে নিবেদিতার মনোভাবের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭, (তখনো তিনি ইংলণ্ডে যাননি) র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে। অত্যন্ত ব্যঙ্গের সঙ্গে নিবেদিতা লেখেন :

"মিসেস বেশান্ত তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তার আলোকে একটুও বুদ্ধিমতী বা মহীয়সী বলে প্রতীয়মান হচ্ছেন না। দেখে আমোদ লাগছে যে, জাতীয় আন্দোলনের ধাক্কায় থিওজফির মুকুট টলমল করছে। এক ব্যক্তি বলতে চেয়েছেন—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি 'মহাত্মাদের' যে-প্রকার

২৯ 'সমকালীন', ৩য়, ৩৯-১১৩।

প্রগাঢ় ভালবাসা তাতে মনে হয়, ওঁরা ক্লাইভ বা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত ছাড়া কিছু নন।"

[বেশান্তের ক্ষেত্রে 'মহাত্মা' কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। বেশান্ত থিওজফিস্ট। থিওজফিস্টরা একপ্রকার বিশেষ ধরনের মহাত্মার রূপ-গুণের বহু বর্ণনা করেছেন। সেইসকল মহাত্মা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সূক্ষ্ম শরীরে যত্র-তত্র গমনে, যে-কোনো বেশ ধারণে, এবং অসম্ভব কাণ্ড সম্পাদনে সমর্থ। তিব্বত ঐদের প্রিয় বাসভূমি। ঐরা অনেক সময়ই পত্রযোগে নির্দেশাদি মানবসমাজে দান করেন, অবশ্য নির্ধারিত ব্যক্তিদের মারফত, যাঁদের মধ্যে মাদাম ব্লাভাৎস্কি, কর্নেল অলকট, অ্যানী বেশান্ত প্রমুখরা আছেন। এইসব গগন-ডাকঘরের পত্রসাহিত্যের কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতা নিয়ে উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রচুর হৈ-চৈ হয়েছে।]

পত্রে অধিক না লিখলেও আমাদের ধারণা, মডার্ন রিভিউ-এর একাধিক বেশান্ত-বিষয়ক লেখায় নিবেদিতার হাত ছিল। এইকালে বেশান্তকে আক্রমণ না করে উপায় ছিল না, এমনই দুরভিসন্ধিপূর্ণ কথাবার্তা তিনি বলছিলেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি বৃটিশ সরকারের এজেন্টের কাজ করেছেন। উপরে উদ্ধৃত পত্রের অব্যবহিত পরে, মার্চ ১৯০৭ সংখ্যার মডার্ন রিভিউ-এ "মিসেস অ্যানী বেশান্তস্ পোলিটিক্যাল ডিক্টা" নামক একটি লেখকের নামহীন প্রবন্ধ বেরোয়, যেটি ষাণ্মাসিক সূচীপত্রে সম্পাদকের লেখা বলে উল্লিখিত। এই লেখাটির মধ্যে নিবেদিতার ভাষাভঙ্গি ও চিন্তাভঙ্গি এতই প্রকট যে, কিভাবে সেটি সম্পাদকের লেখা হতে পারে তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত হয়েছিল। বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার হল—ঐ লেখাটি যে, নিবেদিতারই, তার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত "টুআর্ডস্ হোম রুল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে একটি লেখা আছে, নাম—"ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসি"—তার লেখক, "নিবেদিতা ও রামানন্দ"।[৩০] এই লেখাটি পূর্বোক্ত "অ্যানী বেশান্তস্ পোলিটিক্যাল ডিকটা" প্রবন্ধের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের ঈষৎ সংশোধিত রূপ ছাড়া কিছু নয়!! এখানে মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম বদল করা হয়েছে, শেষের অত্যন্ত বক্র বিদ্রূপাত্মক অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রথমাংশে উল্লিখিত অ্যানী বেশান্তের নামও বাদ, এবং বর্জিত হয়েছে মধ্যবর্তী অংশের কিছু তিক্ত শব্দও। আমাদের ধারণা, এমনকি মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশকালেও রামানন্দ নিবেদিতার চড়া লেখাকে ঝাড়ামোছার দ্বারা সহনীয় করেছিলেন।

মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ-সূচনায় ছিল :

"To an interviewer of the *Madras Mail* Mrs Besant is reported, among other things, to have said: 'English democracy cannot be planted in India. India is not fitted for it.' This famous pronouncement chiefly shows that foreigners do not usually take the trouble to grasp the Indian national point of view."

"টুআর্ডস হোম রুল" গ্রন্থভুক্ত "ইণ্ডিয়ান ডেমোক্র্যাসি" রচনাটির শুরুতে আছে :

"To an interviewer of the *Madras Mail* a certain distinguished person of Western descent is reported..."

৩০ *Towards Home Rule*, part I, (1917) ("Edited and mostly written by Ramananda Chatterjee"). Page. 52-59: "*India and Democracy*, by the Sister Nivedita and the Editor."

নিবেদিতা প্রবন্ধটির মধ্যে বেশান্তের দুটি বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন, যার প্রথমটি, উপরে-উল্লিখিত 'বিলেতি গণতন্ত্র ভারতে বসানো যাবে না, ভারত তার যোগ্য নয়।' দ্বিতীয়টি—'ভারতের চাই, রয়্যাল ভাইসরয়।' এই দুটি বক্তব্যের খণ্ডনে ধারালো যুক্তি উপস্থিত করা হয়। বিস্তৃত তথ্যযোগে দেখিয়ে দেওয়া হয়—অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্তমান ছিল। কেবল তাই নয়, ভারতে রাজনৈতিক জীবনেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। ভারতের কাব্য-পুরাণ-ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত যোজনার পরে নিবেদিতা বলেন—এইসব কারণের জন্য ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এনে, 'বসানোর' কথা ওঠে না। গণতন্ত্রের চেতনা ভারতে আগেই ছিল, এবং ভারতবর্ষ যে সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে প্রচলন করতে সমর্থ, কংগ্রেসের কার্যাবলীতে তা ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। ভারতবর্ষ ইংরেজি ধরনের গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়, একথা বলে অ্যানী বেশান্ত বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার গণতন্ত্রেরই অনুপযুক্ত প্রমাণ করবার ব্যস্ততা দেখিয়েছিলেন—তার উত্তরে নিবেদিতা বলেন, ইংরেজি ধরনে গণতন্ত্র দরকারই বা কি—জাতীয় গণতন্ত্রই তো আমাদের প্রয়োজন। আসলে চাই স্বরাজ—আত্মনিয়ন্ত্রণের মানবিক অধিকার-প্রতিষ্ঠা :

"*Swaraj* does not mean an attempt to plant 'English democracy' in India. It means the human right of Indian democracy to find self-expression in its own country and amongst its own people in its own way."

"যেহেতু বিদেশী তাই ভারতের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের পরিশ্রম করতে প্রস্তুত নন"—এমন যে অ্যানী বেশান্ত, সেই তিনি ভারতীয় বিক্ষোভ-ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে "রাজবংশীয় ভাইসরয়" প্রয়োগের বিধান দিয়েছিলেন—সে-বস্তুকে নিবেদিতা "শিশু-কল্পনা-উত্তেজক" বলে চিহ্নিত করেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা অনেকখানি লেখেন—যা রামানন্দ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধটি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেন। নিবেদিতা বলেছিলেন, ভারতের সমস্যা যদি গভীরে প্রবিষ্ট ক্যানসারের মতো হয়ে থাকে তাহলে পাগড়িতে রাজ-মাণিক্য বসালে তা সারবে না। আর যদি সে-রকম সংকট না থাকে, তাহলে "কোনো জাতি কুঁড়ে মেয়ের মতো রাজবংশীয় ভাইসরয়-নামক চক্‌চকে খেলনার জন্য ঘ্যান্‌ঘ্যান শুরু করলে তাকে আচ্ছা ক'রে চাবকানোই কি ঠিক কাজ নয়?" ভারতীয়দের 'লয়্যালটি' নিয়ে তখন বেশান্তের মাথাব্যথার অন্ত ছিল না। নিবেদিতা বললেন্ : "লয়্যালটির প্রশ্নে তাত্ত্বিকভাবে বলতে পারি, কোনো জাতি কদাপি কোনো রাজবংশ সম্বন্ধে আনুগত্যে দায়বদ্ধ নয়। তার আনুগত্য তার নিজ ভূমি ও ঐতিহ্যের প্রতি—ভারতবর্ষে যাকে বলা হয় 'ধর্ম', অর্থাৎ জাতীয় বিবেক ও ন্যায়ের *(national righteousness)* প্রতি।" নিবেদিতা আরও বললেন, ভারতবর্ষে রয়্যাল ভাইসরয় বসাবার পরেও যদি ইংলণ্ডের সুতোর টানে তাঁকে নড়াচড়া করতে হয় তাহলে উক্ত রাজবংশীয় ব্যক্তি 'হেড ক্লার্ক' ছাড়া আর কিছু হবেন না। "ভারতীয় মৃত্তিকায় পদার্পণকারী প্রতিটি ইংরাজ ঔপনিবেশিকের প্রতি সশ্রদ্ধভাবে টাকার নমস্কার জানাতে হয় ভারতবাসীকে"—সেই ভারতবাসীকে বেশান্তের মতো "বিদেশীরা" রাজানুগত্যের নিত্যনূতন প্রেরণা দান করতে উদ্যমী—এঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিতার বাঁকা ছুরির মতো এই লেখা :

"আমরা বুঝতে পারি না কেন বিদেশীরা আমাদের লয়্যালটি বাড়াবার জন্য নব-নব প্রস্তাবের দন্তবিকাশ করেন যখন পুরাতন উত্তম লয়্যালটি-উদ্দীপক বস্তুগুলি বর্তমান রয়ে গেছে !! সেগুলি

এই : পাছে ভারতীয়দের অস্ত্রবহনের পরিশ্রম করতে হয় তাই করুণাভরা অস্ত্র-আইন প্রবর্তিত হয়েছে ; পাছে ছোটখাট সৈন্যদল পরিচালনায় ঝুঁকি নিতে হয় তাই ভারতীয়দের 'কমিশনড্ র‍্যাঙ্ক' থেকে দূরে রাখা হয়েছে ; উচ্চতর পর্যায়ে শাসনভার বহনের ঝঞ্ঝাটও তাদের দেওয়া হয়নি ; সেইসঙ্গে টাকাকড়ির মতো নোংরো জিনিস ভারতবর্ষে এমন অল্প মাত্রায় রাখতে দেওয়া হয়েছে যে, দারিদ্র্যব্রতসহ উচ্চ সন্ন্যাসজীবন যাপন করা তাদের পক্ষে নিরতিশয় সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বেশান্ত, সরকারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য জাতীয়তাবাদীদের অবিরাম পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তার উত্তর :

"আমরা যদিও বন্ধুভাবে ইংরাজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে অতীব আগ্রহী, কিন্তু আমরা কদাপি স্বীকার করি না যে, অন্যায়ভাবে অপরকে পদানতকারী কোনো লাঞ্ছিত জাতিকে 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' লাভের আগে তা পাবার 'সামর্থ্য' প্রমাণ করতে হবে ; যেন ঐ প্রকার প্রমাণ অপহারক জাতির পূর্ণ সন্তোষবিধান ক'রে দান করা সম্ভব !! রাজনৈতিক স্বাধীনতায় প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার আছে। যে-কোনো মন্দ বা অকর্মণ্য স্বদেশী সরকার—কোনো স্বয়ং-ঘোষিত স্বর্গীয় সরকারের চেয়ে অনেক ভালো, যে-সরকারের অনুপস্থিত প্রভুরা দায়িত্বহীন ভৃত্যদের দ্বারা শাসনকার্য চালিয়ে থাকেন।"

অ্যানী বেশান্তের চরম নীচতা দেখা গিয়েছিল যখন তিনি সদ্যোমুক্ত অরবিন্দকে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন (সেইসঙ্গে বিপ্লবীদের উপর তীব্র আক্রমণ)—যা অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার পক্ষে উস্কানি ছাড়া কিছু নয়। বেশান্তের এইসব কথা ভারতের রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হয়েছিল। নিবেদিতা ৩০ জুলাই ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফকে অরবিন্দর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা কথা জানাবার পরে লেখেন : "'ফিমেল পোপ' এ সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন—এ কি সত্য ? কি বিচিত্র, এই মহিলাটি নিজের অতীতের সঙ্গে নিজেকে পুনশ্চ যুক্ত করলেন।"

ডেইলি ক্রনিকলের প্রতিনিধির কাছে বেশান্ত অরবিন্দ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

"চরমপন্থীরা সংখ্যায় অল্প ; কিন্তু তাদের মধ্যে দু'তিনজন বিরাট শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন মানুষ আছেন। সদ্যোমুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মাৎসিনী-প্রকারের লোক—পার্থক্য হল, ইনি ফ্যানাটিক্যাল, মাৎসিনী যা ছিলেন না। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ইনি। ইনি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের মানুষ, একেবারে নিঃস্বার্থ, নিজে কিছু গুছিয়ে নেবার বাসনা নেই, তথাপি মারাত্মক, কারণ বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করতে যে-কোনো পদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তুত।"

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জুলাই ১৯০৯, এই মন্তব্য সম্বন্ধে যা লেখা হয় (ভাষাভঙ্গিতে সেটি স্বয়ং সম্পাদকের বলে অনুমান করি)—তেমন সরাসরি আক্রমণ এই পত্রিকা অল্পই করেছে। তার মধ্যে প্রথমত তথ্যযোগে দেখিয়ে দেওয়া হয়—বেশান্তের ইতিহাসজ্ঞান কিছুই নেই, কারণ মাৎসিনী ইতিহাসে ফ্যানাটিক বলেই কথিত। তারপর এই ব্যঙ্গ : "যদি মহাত্মারা বেশান্তের কাছে অরবিন্দ সম্বন্ধে কোনো তথ্য সরবরাহ ক'রে থাকেন, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ রমণী হিসাবে আলিপুর মামলার সময়ে সাক্ষ্য না দিয়ে—বিচারপতি, অ্যাসেসর ও জনসাধারণের জ্ঞানোদয়ের জন্য প্রাপ্ত তথ্যগুলির উল্লেখ না ক'রে—কর্তব্যচ্যুতির দোষে দুষ্ট হয়েছেন।" বেশান্তকে একেবারে তুচ্ছ করে দিয়ে লেখা হয় : "আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি না দেখাবার জন্য তাঁকে

কেউ দোষ দিতে পারবেন না—কেন না তিনি সেই বিজাতির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ভারতে এসেছেন কল্পতরু নাড়া দিয়ে থলি ভর্তি করার জন্য।" নির্মমভাবে লিখিত এই নগ্ন সত্য : "ঠিক বেঠিক যেভাবেই হোক, ভারতীয়গণের এক বিরাট অংশ তাঁকে সরকারের গুপ্তচর মনে করে—আর সেই ধারণা তাঁর সাম্প্রতিক উক্তিসমূহের দ্বারা দৃঢ়তর হচ্ছে।"

একই পত্রিকার নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় "এ নিউ ডেফিনেশন অব দি টার্ম 'ফ্যানাটিক'" নামক সম্পাদকীয় নোটটি ভাষাভঙ্গিতে নিবেদিতার বলেই মনে হয়। এর শুরুতে ছিল : "অরবিন্দ সম্বন্ধে মিসেস অ্যানী বেশান্তের মন্তব্য ভারতের প্রায় সকল দেশীয় সংবাদপত্রের বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছে।" বেশান্ত ভারতের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে বলেছিলেন—স্বাধীনতা পেয়ে একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার চেয়ে অনেক বড় ভাগ্য বিরাট শক্তিশালী দুর্ভেদ্য সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়া। তার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় নোটটিতে বলা হয় : অংশীদার অবশ্যই—শোষিত হবার জন্য অংশীদার ; সাম্রাজ্যগঠনে ধন-প্রাণ দেবার জন্য অংশীদার, যদিও ঐ সাম্রাজ্যের নাগরিক হবার অধিকারও তাদের নেই—কেন না যে-সব মহাত্মার মুখপাত্র এখন মিসেস বেশান্ত সেই তাঁরা মানব-ভ্রাতৃত্বের কথা বলতে গিয়ে মানব-সাম্যের চিন্তা মনে রাখেন না।—

[Partners, for sooth; partners to be exploited, partners to give their money and lives to build up the Empire in which they will never have the right of citizenship, because the Mahatmas whose mouth-piece Mrs Besant at present is, do not consider brotherhood to mean equality of men."]

নিবেদিতাকে তাঁর অবশিষ্ট প্রায় দুই বৎসরের জীবনকালে অ্যানী বেশান্তের ভারত-বিরোধী আরও বহুপ্রকার প্রচারের চেহারা দেখতে হয়েছিল। বেশান্ত ধারাবাহিকভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধিতা করে গেছেন এবং স্বাধীনতাযোদ্ধাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নিপীড়নমূলক আইনের সমর্থন করেছেন। কিছু নমুনা দেওয়া যায়। ভারত গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয় বা গণতন্ত্র চায় না, সে প্রসঙ্গে বেশান্ত বলেন :

"The sentiment of India was not democratic; it was entirely aristocratic and royalist. The people would like a royal Viceroy." [*India*, 2. 6. 1911].

"It must not be expected that what is here [in England] called democracy will not appear in India, at least for many centuries." [Ibid, 6. 10. 1911].

১৯১১ সালের শেষে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজাকে ভারত সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করা হবে, আর সেটা ভারতবর্ষের পক্ষে কী-না প্রকাণ্ড গৌরবের কাণ্ড হবে, তা বেশান্ত বারবার বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি অধিকন্তু জানিয়েছেন :

"It was the English who had made an Indian nation possible." [Ibid, 23. 6. 1911]

"The Nationalist movement [of India] was a thing of our own creation." [Ibid, 2. 6. 1911] "The conquest of one country by another is not, as many people think, an evil thing." [Ibid, 23. 6. 1911]. "The Indian Civil Service on the whole a splendid service... [which] is trying honestly, bravely, thoroughly, to accommodate itself to the new position." [Ibid. 23. 6. 1911], "The ordinary Englishman is more considerate of the poor, more ready to work to relieve distress than is the ordinary Indian." [Ibid, 18. 8. 1911].

ভারত-প্রেমিকা বলে বিদিত বেশান্তের মুখে চমকপ্রদ এইসব কথা, যার থেকে দেখা গেল, ওঁর মতে, ভারতীয় উচ্চপদযায়ী আমলাতন্ত্র এক অপূর্ব ব্যবস্থা, ভারতীয় কর্মচারীদের চেয়ে ইংরাজ কর্মচারীগণ অধিক

ন্যায়পরায়ণ ও সহৃদয়, এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে পরাধীন করে রাখা সর্বদা অমঙ্গলকর নয় (অর্থাৎ পরাধীনতা ভারতের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলকর)। বেশান্ত এইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী দেশীয় সংবাদপত্রগুলির বহু নিন্দা ক'রে, সরকারের কণ্ঠরোধ নীতির সমর্থন করেছিলেন :

"The press edited by Indians, with one or two honourable exceptions, is curiously irresponsible, printing any amount of annonymous personal abuse, without making the slightest attempt to distinguish truth from falsehood. It is this lack of the sense of responsibility which has rendered the Press Laws necessary." [Ibid, 27. 11. 1911].

"The ['anarchists'] have succeeded in restricting to some extent the liberties before enjoyed in India, but the Seditious Meetings and Press Act are endured without much complaint, because good citizens feel that they are justified by the incitements to murder scattered broadcast by the anarchists." [Ibid, 18. 8. 1911].

বেশান্ত ভারতীয় বিচারকদের ন্যায়বিচারের সামর্থ্য পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন, যার জন্য মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক তারিফ ক'রে লিখেছিলেন, "মিসেস বেশান্ত লণ্ডনে তাঁর ঘোমটা খুলেছেন।" বেশান্ত বলেছিলেন :

"In the administration of justice the Englishman judges fairly between Indian and Indian, where the Indian is swamped by a thousand influences of kindred, caste prejudices, and local customs." [*Modern Review*, Nov. 1911].

ভারতপ্রেমিক বিদেশীদের নামাবলীতে এহেন বেশান্তকে যখন নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে বুনে দেবার চেষ্টা *অল্পজ্ঞাত সরলস্বভাব ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় তখন সমকালীন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আর্তনাদ মনে* পড়ে : "বেশান্ত নেবে সে নৈবেদ্য অর্পিত যা নিবেদিতায়।"

বেশান্ত তাঁর অপধর্মে ও কার্যে অদম্য বেগে এগিয়েছেন। পরবর্তীকালে হোমরুল আন্দোলনে তাঁর সাহসিক ভূমিকা, যার জন্য ঐতিহাসিকরা আবেগতপ্ত—তাও যে ভারতবর্ষকে চিরতরে ইংলণ্ডের ডোমিনিয়ন *ক'রে রাখার কূটকৌশল, আপসহীন স্বাধীনতাযোদ্ধারা সেকথা জানতেন।* ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবী বা দেশনেতারা সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে বেআইনি আইনে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বরাজীদের বিনা বিচারে নির্বাসিত করা হয়েছিল, বেশান্ত তার সমর্থন করেন, সেজন্য ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে তাঁকে ছি-ছি করে বসিয়ে দেওয়া হয়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের স্বাধীনতা-সমর্থনে বিভিন্ন বিদেশীর প্রয়াসের উল্লেখের পরে, বেশান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন :

"এইরূপ পরিস্থিতিতেই অ্যানী বেশান্তের নেতৃত্বে গরম দল হোমরুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের নামান্তর। বৈপ্লবিকেরা যখন দেশে ও বিদেশে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে অস্ত্রহস্তে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন, কিছুকালের জন্য যখন তাঁহারা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়াছিলেন, ইরাকে কয়েদী ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া যখন সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, যখন বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা চলিতেছিল, লাহোর হইতে গৌহাটি পর্যন্ত যুগপৎ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলিতেছিল, যখন কুতালামারার কয়েদী সিপাহীদের বৈপ্লবিক দলভুক্ত করিয়া ভারতে বৈপ্লবিক বাহিনী পরিচালিত করিবার উদ্যম চলিতেছিল, যখন আফগান আমীরের সাহায্যে আফগান সীমান্তে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা চলিতেছিল, যখন গভর্নমেণ্ট সন্ত্রাস দ্বারা দেশকে দাবাইয়া রাখিয়াছিল—তখন দিশাহারা বুর্জোয়াদের লইয়া হোমরুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সাহায্যের পরিবর্তে ব্যাহতই করিয়াছে।"

হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক অ্যানী বেশান্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ বজায় রেখেও বলব, এই আন্দোলন জনচেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বেশান্ত কিন্তু সেই চেতনাকে পূর্ণ স্বাধীনতার খাতে প্রবাহিত করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। ভূপেন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন :

"বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অ্যানী বেশান্তের প্রকৃত রূপ সেই যুগের কর্মীদের অজানা নাই। বিদেশেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস

কমিটির দিল্লী অধিবেশনে তিনি সুবিখ্যাত ইনডিপেনডেন্স্ রেজলিউশন-এর বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। (লেখক সভ্যরূপে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)। ইহা ছাড়াও ভারতকে ইংলণ্ডের সহিত সংলগ্ন রাখিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে নানাপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত করিয়া রাখেন।" ['অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', 'মুখবন্ধ', 'সাত-আট' পৃষ্ঠা]।

পঞ্চম অধ্যায়

নিবেদিতা অরবিন্দ সংবাদ

॥ ১ ॥ নিবেদিতার পত্রে অরবিন্দের উল্লেখ : ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে উভয়ের মতের ঐক্য ও পার্থক্য

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে অনেকবার এসেছে। নিবেদিতার বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে অরবিন্দর উক্তি উপস্থিত করেছি। অপরপক্ষে নিবেদিতা অরবিন্দ সম্বন্ধে কী বলেছিলেন ? নিবেদিতার প্রকাশিত রচনার মধ্যে অরবিন্দর নাম চোখে পড়ে না।

যে-অরবিন্দর কথা নিবেদিতা তাঁর প্রকাশ্য রচনায় প্রত্যক্ষে বলেননি, তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর তৎপর সক্রিয়তার অবধি ছিল না। গুপ্ত আন্দোলনের রীতিনীতি নিবেদিতা যথার্থই জানতেন বলে অরবিন্দর কথা নিজ লেখায় বাদ দিয়েছেন। চিঠিপত্রেও একই কারণে অরবিন্দর নাম এড়িয়ে যেতেন। তবে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন এমন নয়। যেসব চিঠি ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল, সেখানে অরবিন্দর নাম করেছেন, যেমন র‍্যাটক্লিফের কাছে চিঠিতে। সেসব স্থানে সরাসরি 'অরবিন্দ' নাম অপেক্ষা বেশি ক্ষেত্রে ছদ্মনামে বা ইঙ্গিতে তাঁকে চিহ্নিত করেছেন, যেমন—

"A. G." "Recalcitrant Leader (R. L. in future)." "Bengali Mazzini." "Missing Journalist." "Leader of the Nationalists."

নিবেদিতা ও অরবিন্দ পরস্পরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। কারণ স্পষ্ট—উভয়েরই ছিল প্রতিভা, বিদ্যা, রচনাশক্তি—সর্বোপরি অসীম ত্যাগ ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা, সেইসঙ্গে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। মতভেদের ক্ষেত্রও ছিল। অরবিন্দ কেবল নিজের পথ ধরেই চলতে চাইতেন, অপর মতের মানুষদের বিষয়ে অসহিষ্ণু বা উদাসীন ছিলেন ; আর নিবেদিতা নিজের পথে চলবার সময়েও অপর পথের নিঃস্বার্থ মানুষদের যথাপ্রাপ্য দিতে পারতেন। রমেশ দত্তর বিরুদ্ধে অরবিন্দর সমালোচনার প্রতিবাদ তিনি কিভাবে করেছেন, আগেই দেখেছি। ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা মারফত ভারত-সমর্থক ইংরাজরা যে-ধরনের প্রচার চালাতেন, অরবিন্দ তার সমালোচক ছিলেন। এখানেও নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দর প্রথম সাক্ষাৎকালে ধর্মবিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছিল কিনা তা পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ করতে পারেননি। লেডি অবলা বসুর কাছ থেকে এ-সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ গিরিজাশঙ্কর সংগ্রহ করেছিলেন। "স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, [গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন] জগদীশচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের সময়ই পড়িতে

দিয়াছিলেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন।"[১]

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তাঁদের সম্পর্ক ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রেই। অবশ্যই ঠিক। তবু বলা যাবে, একটি ক্ষেত্রে অন্তত উভয়ের মন একতানে বাঁধা ছিল—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রটিতে। নিবেদিতা ছিলেন—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।' আর অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'-এর মানবদেবতা হলেন রামকৃষ্ণ। [ভবানী মন্দিরের রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে]। স্বদেশী যুগে অরবিন্দ অনেকবারই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন ; ওঁরাই যে জাতীয় জীবনের মূল প্রেরণা-উৎস, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ; অনুভব করেছেন, স্বদেশী আন্দোলনের "পিছনে ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শক্তি।"[২] তাঁর শয়নকক্ষে একটি "ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের মাটি রক্ষিত ছিল," যাকে তিনি "ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ" মনে করতেন।[৩] অরবিন্দ পণ্ডিচেরী প্রস্থানের পরে তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবী যখন শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নেন তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী সাধনাতে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।"[৪]

আবার এই ক্ষেত্রটিতেই নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। অরবিন্দ তাঁর বঙ্গদেশীয় জীবনের শেষ পর্ব থেকেই ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে—রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্যের মতো ঈশ্বরের আবির্ভাব মনে করেও—রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণের কার্যকে তিনি "মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য" ক্ষেত্র-প্রস্তুতির কার্য মনে করেছেন—ততোধিক নয়। তাঁর মতে, ভগবান এখনো "সম্পূর্ণ শক্তিকে" প্রকাশ করেননি। সেজন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে লিখেছেন : "কবে সেই দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন ?"[৫] অর্থাৎ অরবিন্দ তখনই আরও বড়ো আকারের অবতারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হেমচন্দ্র কানুনগোর কথা যদি সত্য হয় তাহলে—অরবিন্দ নিজেই সেই ভূমিকা গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিলেন। [হেমচন্দ্র লিখেছেন : "অরবিন্দ অবতার বনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন।"]। অপরদিকে নিবেদিতা 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তত্ত্বকে স্বীকার করেও, পৃথিবীতে অবতারদের দ্রুত যাতায়াতে বিশ্বাস করেননি। আমি জানি না, অরবিন্দের পূর্বোক্ত মনোভাবের পটভূমিকাতে নিবেদিতা কর্মযোগিনে ১৯ মার্চ, ১৯১০ *Passing Thoughts*-এর মধ্যে [এটি নলিনীকান্ত গুপ্তের মতে নিবেদিতার লেখা] এই কথাগুলি লিখেছিলেন কিনা :

"পাঁচশত বৎসরের পূর্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসের তুল্য আবির্ভাবকে সহ্য করার শক্তি পৃথিবীর হয় না। যে-বিপুল চিন্তারাশি তিনি পশ্চাতে রেখে গেছেন, প্রথমে তাদের অভিজ্ঞতাসিদ্ধ করতে হবে ; তাঁর প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তিকে রূপায়িত করতে হবে কর্মে। তার পূর্বে অধিক আকাঙ্ক্ষার কোন্ অধিকার আমাদের আছে ? অধিক প্রাপ্ত হলে তা নিয়ে করবই-বা কি ?"[৬]

১ গিরিজাশঙ্কর, ৮২৭-২৮।
২ 'কথাবার্তা', ৪০।
৩ অরবিন্দ, 'কারাকাহিনী'।
৪ চারুচন্দ্র দত্ত, "পুরনো কথা, উপসংহার", ১০৫।
৫ "ধর্ম ও জাতীয়তা" (১৩১৬ সালের 'ধর্ম' পত্রিকার প্রবন্ধ সংকলন), পৃ ১০০। পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত, ১৩৬৪ সংস্করণ।
৬ NCW, V, 131.

॥ ২ ॥ নিবেদিতার পত্রে রাজনৈতিক নেতা ও লেখক অরবিন্দ : অরবিন্দর গ্রেপ্তার ঠেকাতে নিবেদিতার অন্তরালের চেষ্টা ও সেইসূত্রে কর্মযোগিনে প্রকাশিত অরবিন্দের দুটি খোলা চিঠির ব্যবহার

অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার আসল যোগাযোগ অবশ্য বৈপ্লবিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই। এখানে নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধা অরবিন্দ পেয়েছেন। অরবিন্দকে তিনি ন্যাশন্যালিস্টদের নেতা মনে করতেন, এবং তাঁকে সরকারী রোষ থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই একটি ব্যাপারে বিপ্লবীদের ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঐকমত ছিল। আমরা দেখেছি, অরবিন্দকে বাঁচাতে বিপিন পাল বন্দেমাতরম্ মামলায় জেলে গেছেন, (অরবিন্দর ইচ্ছাতেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তর মামলার সময়ে অনুরূপ ফল ভোগ করেছেন) ; নরেন গোঁসাই স্বীকারোক্তির সময়ে অরবিন্দর নাম ফাঁস করেছিলেন বলে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, এবং উক্ত বিপ্লবী দুজনও ফাঁসিকাঠে ঝুলেছেন (অর্থাৎ অরবিন্দের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা ও তা পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনজনের মৃত্যু !!!)। এমন কি বারীন্দ্রকুমার দাবি করেছেন, অরবিন্দকে বাঁচাবার জনাই তাঁরা স্বীকারোক্তি করেছিলেন।[৭] নিবেদিতাও দেখি, অরবিন্দকে জেলের বাইরে রাখার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁর সতর্কবাণী অনুযায়ী অরবিন্দ কলকাতা ছেড়ে যান (এ-বিষয়ে পরে আলোচনা আছে)। তবে স্মরণ করিয়ে দেব, অরবিন্দ-নামক ব্যক্তিবিশেষকে বাঁচাবার জন্য নিবেদিতা ব্যস্ত ছিলেন না—তাঁর উৎকণ্ঠা বিপ্লবী-নেতা অরবিন্দের জন্য। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, এই বিপ্লবী-নেতা জেলের বাইরে থাকলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। নচেৎ বিপ্লবীর ভাগ্যে কারাবাস বা ফাঁসি ইত্যাদি যে সাধারণ ব্যাপার, তা তিনি জানতেন ; অরবিন্দ সেজন্য ভীত নন, সেকথাও ভূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। নিবেদিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী অরবিন্দ কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বীকার্য—নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষামতো বৈপ্লবিক কার্য তিনি চালিয়ে যাননি।

নিবেদিতার চিঠিতে অরবিন্দের যেসব উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে নিবেদিতা-কৃত প্রশংসা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অরবিন্দর রচনারীতির অত্যন্ত সমাদর তিনি করেছেন। নিবেদিতা স্বয়ং উচ্চাঙ্গের লেখিকা, জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সমাদরের ব্যাপারে বেহিসেবী বদান্য হলেও অন্যের রচনাশক্তি বিষয়ে তা ছিলেন না। অরবিন্দ কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর মুক্ত প্রশস্তি পেয়েছেন। সমকালীন ভারতীয় লেখকদের মধ্যে (ইংরাজিতে যাঁরা লিখেছেন) তিনি অরবিন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। মডার্ন রিভিউ-এর জুন ১৯০৯ সংখ্যায় অরবিন্দর *To the Sea* কবিতাটি বেরিয়েছিল। এর প্রসঙ্গে নিবেদিতা ২৪ জুন র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন : "মডার্ন রিভিউ-এ অপূর্ব কবিতা—*To the Sea* বিপিনের কারাগারের রচনা-ফসলের তুলনায় কত না পৃথক!" কর্মযোগিনে অরবিন্দর রচনা সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফকে ২০ জানুয়ারি ১৯১০, লিখেছেন :

"তুমি যেন প্রতি সপ্তাহে কর্মযোগিন পাও, এটা কিভাবে যে চাইছি কি বলব! আমার মতে, ওতে চিন্তা ও স্টাইলের একেবারে বিজয়ী রূপ। অরবিন্দ অসাধারণ। অপরদিকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে, দল চালাতে হলে কোনো মানুষের পক্ষে তার আদর্শকে তরল করে নিতেই হয়। এই ডাকে আমি কেটিকে [মিসেস র‍্যাটক্লিফকে] দু'কপি পাঠাচ্ছি—বিবাহের পূর্বে। [এখানে ইঙ্গিতে

৭ বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, "অরবিন্দের মতো যুগপুরুষ ও বিপ্লবী নেতাকে বাঁচাবার জন্য আমরা আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হবার পর একে-একে সকল অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে স্বীকারোক্তি করি। তাঁকে বাঁচাতে তখন কে না চায়? তিনি বাঁচলে বিপ্লব বাঁচবে, দেশের একটা গতি হবে। আমাদের মতো শত-সহস্র কর্মীর জীবন বলি দিয়েও তাঁকে বাঁচাবার কথা সকলের মনে স্বতঃই উদিত হয়েছিল।" [অগ্নিযুগ, ১ম খণ্ড, ১০৫]

কিছু বোঝানো হয়েছে]। যদি জিনিসগুলি পৌঁছয়—তুমি বুঝবে। যদি না পৌঁছয়, জানিও।"

পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আপসহীন প্রচারক এবং আইনভঙ্গের প্ররোচক অরবিন্দ—তিনি কর্মযোগিন্-এ আইনরক্ষা করে আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছিলেন—এই পরিবর্তিত ভূমিকার দিকে নজর রেখেই যে নিবেদিতা অরবিন্দ কর্তৃক 'আদর্শকে তরল করে' উপস্থিত করার কথা বলেছিলেন—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যাই হোক, নিবেদিতা অরবিন্দর জাতীয়তামূলক রচনা সম্পর্কে এমনই উৎসাহী ছিলেন যে, সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হন, এবং যেহেতু সেকাজ সহজসাধ্য ছিল না তাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ২৬ জুন ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন :

"সম্ভব হলে অরবিন্দর প্রকাশিত রচনাগুলি, আর সেইসঙ্গে বিচারের কালে উপস্থাপিত অন্য জিনিসগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে—যার শেষে থাকবে খাঁটি হিন্দুধর্মের অসাধারণ নমুনা—*To the Sea.* ভূমিকা অংশে থাকবে বিচারের বিবরণ, সওয়াল ও জবাবের নির্বাচিত অংশ এবং বিচারপতিকৃত সারসংক্ষেপ-বিবরণী। সেইসঙ্গে মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত এই ছবিটি। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করতে পারলেই ভালো—তাতে যদি খরচ দিতে হয়, তবু। তুমি কি ক্রপটকিনের সঙ্গে যোগসাজসে কোনো প্রকাশক জোগাড় করতে পারো—হেইন্‌ম্যান বা অন্য কাউকে ? ইংলণ্ডে প্রকাশের সুবিধা তুমি বুঝবে, আর পুস্তকটি তৈরী হয়ে গেলে তুমি সম্ভবত সাজেশন দিতে রাজি হবে।

"মনে হয়, ফেবিয়ান সোসাইটি বইটি প্রকাশ করতে কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ দিতেও রাজি হবে না!—কিংবা ইণ্ডিয়াও [পত্রিকাও] নয় ?

"যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, তুমি এখন তথ্যগুলি জানলে। অতঃপর আমরা বিষয়টি সম্বন্ধে সবিশেষ অস্পষ্টতার সঙ্গে উল্লেখ করতে পারব।"

নিবেদিতার সমুচ্চ এক সৃষ্টি হিসাবে 'জাতীয়তা-দর্শনের' কথা বলেছি। আগেই জানিয়েছি, নিবেদিতা ১৮ অগস্ট, ১৯১০, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন, "বিবেকানন্দের হৃদয় একে সৃষ্টি করেছে।" "জগদীশচন্দ্র বসু এর মর্ম বোঝেন, তবে নিষ্ক্রিয়ভাবে ; তিনি জনপ্রিয় নেতা নন। মরাঠা [গোখলে] বোঝে কি না সন্দেহ।" নিবেদিতা অরবিন্দকেই এখানে উপলব্ধি ও প্রকাশের সামর্থ্য-গৌরব দিয়েছেন : "অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ যিনি জাতীয়তাকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।" নিবেদিতাকে যখন আমরা ভারতীয় জাতীয়তা-দর্শনের সর্বোচ্চ লেখক বলে মনে করি, মনে করি যে, এক্ষেত্রে অনতিক্রান্ত তিনি—সেখানে অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর প্রশংসার গুরুত্ব কতখানি, তা না বললেও চলে।

নিবেদিতার চিঠিতে অরবিন্দর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা, তৎসহ কিভাবে তাকে ঠেকানো যায়—এইসব প্রসঙ্গই অধিক। নিবেদিতা বৈপ্লবিক রাজনীতির গহন জটিল পথে বিচরণ করতেন, সেখানে অরবিন্দকে তিনি, আমাদের ধারণা, কখনো-কখনো আনাড়ি মনে করেছেন। রামজে ম্যাকডোনাল্ড (বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক-সদস্য, পরে প্রধানমন্ত্রী) কলকাতায় এসে সরকারী কর্মচারী গুর্‌লে-র সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি-রূপে বিবেচিত রামজে ম্যাকডোনাল্ডের ঐ কাজকে নিবেদিতা অনুচিত বিবেচনা ক'রে র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন [২৫-১১-১৯০৯] : "রামজে ম্যাকডোনাল্ড এসেছেন, কলকাতায়

আছেন—গুরলে-র সঙ্গে। এটা অবিজ্ঞোচিত।" কিন্তু অধিক অবিজ্ঞোচিত ছিল অরবিন্দর কাজ : "শুনলাম, অরবিন্দ পর্যন্ত গত রবিবার অপরাহ্ণে ওখানে গিয়েছিলেন! আমাদের কেউই তা করিনি।" নিবেদিতার জীবনীতে পাই, অপরপক্ষে রামজে ম্যাকডোনাল্ড এসেছিলেন নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দেখা করবার জন্য। "নেভিনসন তাঁকে একটি পরিচয়পত্র দেন নিবেদিতার উদ্দেশ্যে ; সেটি নিয়ে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দেখা করেন। নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে তিনি এমনই প্রভাবিত হন যে, অতঃপর একাধিকবার সুযোগ ক'রে নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় আদর্শ ও দর্শন বিষয়ে কথাবার্তা বলেন।"[৮]

মুক্তি পাবার পরে অরবিন্দ নানা জনসভায় খোলামেলা কথা বলছিলেন—নিবেদিতা সে সব কাজও পছন্দ করেননি :

"আমরা কেবল ডেইলি মেল পড়তে পেয়েছি, [নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ইউরোপে অবস্থানকালে লেখেন, ২৪-৬-১৯০৯]। গতকাল (যথার্থত সোমবারে) তাতে বরিশালে অরবিন্দর বক্তৃতার কথা আছে, যার মধ্যে তিনি অশ্বিনীর [অশ্বিনীকুমার দত্ত] প্রশংসা করেছেন এবং বয়কটের প্ররোচনা দিয়েছেন। পুলিশ নোট নিয়েছে।"

ভারতে ফেরার পরেই নিবেদিতা এ-সম্বন্ধে অরবিন্দকে সতর্ক করেন, কিন্তু দেখেন যে, অরবিন্দ নিজেকে ঈশ্বরচালিত ভেবে বসেছেন। নিবেদিতা অবশ্যই দৈবী প্রেরণায় বিশ্বাস করতেন ; তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গে তাতে বাস্তববুদ্ধির কিছু আর্সেনিক বিষ দিয়ে দিলে তা অধিক ফলপ্রদ হয়—এমন ভলটেয়ারী ধারণাও তাঁর ছিল। রাজনীতিকে তিনি নৈকষ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনে করতেন না, এবং অরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মিক আবেগ সত্ত্বেও নিবেদিতার কাছে বিপ্লবী নেতা ছাড়া কিছু নন। তাই অরবিন্দর উক্তপ্রকার ভাবভঙ্গি দেখে মৃদু ব্যঙ্গ না ক'রে পারেননি। ২১ জুলাই, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন :

"আমাকে যদি চিঠি লেখো কদাপি আমার নামোল্লেখ করো না। কারণ আমি এখন ছদ্মপরিচয়ে আছি, এবং যতদিন সম্ভব অনেকের কাছে সেইভাবে থাকব। বন্দেমাতরম্-এর জায়গায় নতুন একটা কাগজ বেরিয়েছে—কর্মযোগিন্। অরবিন্দ ব্যাপক বক্তৃতা ক'রে বেড়াচ্ছেন—আমার বিবেচনায় সেটা বুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। তবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরচালিত মনে করেছেন—সুতরাং গ্রেপ্তার হবেন না! আমরা অনেকেই অবশ্য অনেক সময়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করি—কেন করি, তা শুধু আমরাই জানি। 'আমরা কিছুরই পরোয়া করি না।' কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয় কাউকে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেননি। জোয়ান অব আর্ক এক্ষেত্রে স্থায়ী বিপরীত সাক্ষ্য। কেবল যখন আমরা সকল সহন সয়েছি তখনই আমরা কখনো-কখনো বলি, 'হাঁ, আমার কণ্ঠস্বর ঈশ্বরেরই।'

"কিন্তু তার আগে বলতে পারি, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং [রাজনৈতিক] রণকৌশল কোনোমতেই সমবস্তু নয় এবং তাদের গুলিয়ে ফেলাও উচিত নয়।"

ঈশ্বরচালিত জোয়ান অব আর্ককে পুড়ে মরতে হয়েছিল ; স্বয়ং 'ঈশ্বরপুত্র'কে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে ; সেসব কথা স্মরণে রেখে, তৎসহ অরবিন্দর দৈবনির্দিষ্ট রক্ষাকবচের রক্ষাক্ষমতার প্রতি অজ্ঞেয়বাদী মনোভাব রক্ষা ক'রে, রাজনৈতিক কৌশলের পার্থিব বুদ্ধিতে চালিত নিবেদিতা, বারবার

৮ আত্মপ্রাণা, ২২৭।

অরবিন্দকে তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা জানাতে থাকেন, সেইসঙ্গে কিভাবে তাঁকে বাঁচানো যায়, সেই চেষ্টা চালিয়ে যান। ৩০ জুলাই, ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে তিনি লেখেন :

"শুনছি, তিনি [নতুন লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নর] বাঙালী মাৎসিনীকে ৭ অগস্ট নাগাদ নির্বাসনে পাঠাবার কথা পর্যন্ত বিবেচনা করছেন—পুলিশের কাছ থেকে সরকারীভাবে আবেদন এলেই তা করবেন। ওঁর পূর্ববর্তী লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নরের ইতিহাস, অপরপক্ষে শিকারলক্ষ্য ব্যক্তিটির জনপ্রিয়তা—এই দুটি বিষয় বিবেচনা করলে বলতে হবে—এটা ওঁর [গভর্নরের] পক্ষে চরম যুদ্ধঘোষণা।"

গ্রেপ্তারের গুজব শুনে অরবিন্দ কী করলেন, তা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে তিনি লিখেছেন :

"[নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে] আমার এইপ্রকার এক সাক্ষাতের কালে তিনি আমাকে জানালেন—সরকার আমাকে চালান দেবার মতলব করেছে। তিনি চান, আমি যেন গা-ঢাকা দিই, কিংবা বৃটিশ ভারত ত্যাগ করি, এবং বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাই।··· আমি তাঁকে বললাম, ঐ সাজেশন গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না ; তার বদলে কর্মযোগিনে একটা খোলা চিঠি লিখব, যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। সে কাজ করা হয়েছিল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, এবং আমাকে চালান দেবার বাসনা পরিত্যক্ত।"[৯]

উল্লিখিত খোলা চিঠি কর্মযোগিন্-এ বেরোয় ৩০ জুলাই ১৯০৯। কোনোই সন্দেহ নেই, অরবিন্দ এতে অতীব নম্রসুরে কথা বলেছিলেন। এর সূচনায় তিনি নিজের সম্ভাবিত গ্রেপ্তার-প্রসঙ্গ তোলেন :

"Rumour is strong that a case for my deportation has been submitted to the Government by the Calcutta Police, and neither the tranquility of the country nor *the scrupulous legality of our procedure* is a guarantee against the contingency of the all-powerful fiat of the Government watch-dogs' silencing scrupules on the part of those who advise at Simla."

অরবিন্দ লিখেছেন : তাঁর খোলা চিঠির পরেও যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশ তিনি এর মধ্যে দিয়ে যেতে চান।

অবলম্বিত "পদ্ধতির সবিশেষ সতর্ক আইনানুসারিতার" ঘোষণাযুক্ত এই খোলা চিঠিতে অরবিন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধনীতি, এবং বয়কটের কথাও, কিন্তু বয়কটকে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার না বলে আত্মস্বাতন্ত্র্যলাভের উপায়রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। সে বয়কট আবার সর্বাত্মক নয়। মডারেট দলের সঙ্গে হাত মেলাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। এবং তিনি বা তাঁরা যে, পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ব-ব্যবস্থারূপে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকার করতে প্রস্তুত—সে কথাও বলেছেন। তাঁর সবচেয়ে কঠিন কথা ছিল :

"The Nationalist principle is the principle of No control, no co-operation."

৯ Sri Aurobindo, *On Himself*

কিন্তু অরবিন্দ এত বেশি পরিমাণে এই লেখায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থার কথা বলেছেন যে, সেটা তাঁর সাময়িক পশ্চাদ্‌অপসরণের রণকৌশল, না তাঁর স্থায়ী মতবদলের সূচক, বোঝা শক্ত। অরবিন্দর সে-ধরনের কিছু কথা সরাসরি তুলছি :

***"A respect for the law is a necessary quality for endurance as a nation and it has always been a marked characteristic of the Indian people.* We must therefore scrupulously observe the law while taking every advantege both of the protection it gives and the latitude it still leaves for pushing forward our cause and our propaganda. With the stray assassinations which have troubled the country we have no concern, and, having once clearly and firmly dissociated ourselves from them, we need notice them no further. They are the rank and noxious fruit of a rank and noxious policy and until the authors of that policy turn from their errors, no human power can prevent the poison-tree from bearing according to its kind."**

লক্ষণীয়, অরবিন্দ বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন—এবং সেই 'জঘন্য বিষাক্ত' আগাছার উৎপাদনের জন্য তিনি অনুরূপ বিষাক্ত সরকারী নীতিকে দায়ী করলেন। নিয়মতান্ত্রিক পথে উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনা তাঁর ঐ রচনায় আরও দেখা গিয়েছিল :

"Our ideal of Swaraj involves no hatred to any other nation nor of the administration which is now established by law in this country...Our methods are to...evolve a Government of our own for our internal affairs so far as that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority of the bureaucratic administration... The Nationalist Party stood for democracy, constitutionalism and progress." [*Sri Aurobindo Speeches,* Sri Aurobindo Ashrama, Pondicherry, 1952].

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—তাঁর এই নম্রসুরে বাঁধা খোলা চিঠিতে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে অব্যাহতি দেন ; এবং তাঁর ধারণা সত্য প্রমাণিত বলে ভগিনী নিবেদিতা মেনে নিয়েছিলেন। বহু পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ এই যে-কথা বলেছেন, তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়—নিবেদিতার সমকালীন পত্রই তা দেখিয়ে দেয়। অন্যদিকে দেখি, অরবিন্দর ঐ 'খোলা চিঠিকে' অভিপ্রেত ফলদায়ী করবার জন্য নিবেদিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না। বস্তুতপক্ষে, অরবিন্দর চিঠির জন্য যতখানি, ততোধিক ঐ চিঠিকে নিবেদিতা কর্তৃক কাজে লাগানোর চেষ্টার জন্যই, সাময়িকভাবে অন্তত অরবিন্দর গ্রেপ্তার স্থগিত হয়েছিল।

নিবেদিতার আশঙ্কা হয়েছিল, ঐ খোলা চিঠি ভারতসচিব লর্ড মর্লের কাছে যাতে না পৌঁছায় সেজন্য ভারতস্থ ইংরাজ শাসককুল সচেষ্ট থাকবে। নিবেদিতা তাই সেটিকে ইংলণ্ডের নানা স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন—উদ্দেশ্য : ন্যাশন্যালিস্টদের রীতিনীতি সম্বন্ধে উর্ধ্বতন মহলকে ভুল বুঝিয়ে যাতে অরবিন্দকে চালান দেবার অনুমতি আদায় করা না যায়। তাতেও না থেমে, নিবেদিতা তাঁর ইংলণ্ডের বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচিত করেন—ভিতরে বাইরে চাপ দিয়ে অরবিন্দর গ্রেপ্তার ঠেকাতে তাঁরা যেন সচেষ্ট হন। র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে তিনি ৫-৮-১৯০৯ তারিখে লেখেন :

"মনে হয়, এই সপ্তাহেই তোমাদের কাছে কর্মযোগিন্ পৌঁছবে। আমি অফিসে তা পাঠিয়ে

দিচ্ছি। এর মধ্যে যে 'খোলা চিঠি' আছে, তা ও-মহলে চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। ওর কপি, আমার ধারণা, মর্লে ও সকল সাংবাদিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলো পৌঁছতে না পারে। অ্যালবার্টাকে লেখা চিঠির ভিতরে আমি একটা পাঠাচ্ছি প্রেত-দর্শকের [উইলিয়ম স্টেড] জন্য। সুযোগ করে নিয়ে তুমি অ্যালবার্টাকে অবশ্যই জানাবে : আমি জানি যে, সে *The Hon* নয়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে খামের উপরে নামের আগে তাকে ঐ সম্বোধন করেছি—প্রয়োজনটা কী, তা তুমি তাকে ব্যাখ্যা ক'রে দিতে পারবে। 'খোলা চিঠির' লেখককে যদি চালান দেওয়া হয় তাহলে দিন-দুয়েকের মধ্যেই তা ঘটবে, এবং এই চিঠি পৌঁছবার আগেই তুমি তা জানতে পারবে। তোমার ব্যবহারের জন্য তোমাকে কর্মযোগিনের আর একটি সংখ্যা পাঠাতে চেষ্টা করব।"

এই পত্রের শেষাংশে নিবেদিতা সরকার কর্তৃক অরবিন্দকে গ্রেপ্তার-বাসনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন :

"অরবিন্দ ঘোষকে যদি সত্যই চালান দেওয়া হয় তাহলে তার আসল কারণ তুমি অবশ্যই বুঝবে—৯ জন নেতাকে চালান দেবার পরে সমস্ত দেশ সহসা ঝিমিয়ে পড়েছিল, আর তা দেখে সরকার তার মহাপ্রজ্ঞার মূল্য বুঝেছিল। আবার যে-মুহূর্তে আলিপুর মামলার বন্দীরা মুক্ত হয়েছে অমনি পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখা গেছে। সুতরাং নীতিকথা এই : জাগরণের কর্তাটিকে পাকড়াও, ফাটকে ঠেলে দাও। এই পদ্ধতি তাদের অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে। নৈতিক নয়—কেবল ফৌজদারী আইনের শক্তি। একটা সরকার কতদিন এই নীতি ধরে চলতে পারে? আর তাদের পক্ষে এমন নীতি আরম্ভ করার অর্থই হয় না যদি না একে চূড়ান্তভাবে সর্বাত্মক করে।"

না, শ্রীঅরবিন্দ পরে যেকথা বলেছেন, সেইমতো করে সরকার ৩০ জুলাইয়ের খোলা চিঠির পরে তাঁকে গ্রেপ্তার-বাসনায় ক্ষান্তি দেননি—আর সেটাই ছিল নিবেদিতার দুশ্চিন্তার বিষয়। অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য উপরমহলে কথা-চালাচালি হচ্ছিলই। 'খোলা চিঠি' বেরুবার দু'মাস পরে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন :

"১৬ অক্টোবর যতই কাছে আসছে, সরকার ততই কম-বেশি আতঙ্কের শিকার হচ্ছে।...ন্যাশন্যালিস্টদের নেতাকে গ্রেপ্তারের ও কয়েক সপ্তাহের জন্য জামিন না দেওয়ার সম্ভাবনা।"

শ্রীঅরবিন্দ ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে পবিত্রকে লেখা পত্রে বলেছেন, ১৯০৯, জুলাই মাসে তাঁর গ্রেপ্তার-সম্ভাবনা বিষয়ে নিবেদিতার সতর্কবাণীর সঙ্গে, ১৯১০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে তাঁর প্রস্থানের কোনোই সম্পর্ক নেই। ঠিক। কিন্তু নিবেদিতা যে, মধ্যবর্তীকালে অবিরাম তাঁকে অন্তর্হিত হবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, এবং উভয়ের মধ্যে এ-সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, তাও সত্য। শ্রীঅরবিন্দর উক্তি থেকে মনে হয়, ৩০ জুলাইয়ের পূর্বোক্ত ঘটনার ৭ মাস পরে তিনি হঠাৎ রামচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে সংবাদ পান যে, তাঁর গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা আছে, (যদিও বলেছেন, শামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁকে জড়িত করার কথা তিনি একেবারেই শোনেননি!), এবং দৈবনির্দেশও পেয়ে যান—তদনুযায়ী তিনি কলকাতা ছেড়ে চন্দননগর চলে যান।

"The departure to Chandernagore hoppened later and there was no connection between the two incidents...It was not Gonen Maharaj who informed me of the impending search and arrest, but a young man on the

staff of the *Karmayogin*, Ramchandra Mazumdar, whose father has been warned that in a day or two the *Karmayogin* office would be searched and myself arrested. There has been many legends spread about on this matter and it was even said that I was to be prosecuted for participation in the murder in the High Court of Shamsual Alam, a prominent member of the C. I. D. and that Sister Nivedita sent for me and informed me and we discussed what was to be done and my disappearance was the result. I never heard of any such proposed prosecution and there was no discussion of the kind; the prosecution intended and afterwards started was for sedition only. Sister Nivedita knew nothing of these new happenings till after I reached Chandernagore. I did not go to her house or see her; it is wholly untrue that she and Gonen Maharaj came to see me off at the ghat. There was no time to inform her; for almost immediately I received a command from above to go to Chandernagore and within ten minutes I was at the Ghat, a boat was hailed and I was on my way with two young men to Chandernagore."—*Sri Aurobindo on Himself.*]

এখানে নিবেদিতার পত্রসূত্রে আমরা এইটুকুই বলতে পারি, ১৯০৯ জুলাই মাস থেকে ১৯১০ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে অরবিন্দের সম্ভাব্য গ্রেপ্তার সম্বন্ধে নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে কেবল কথাবার্তা হয়নি, এমন কি দেখি, ঐকালের মধ্যে স্বয়ং অরবিন্দ নিবেদিতাকে তাঁর গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তা বলেছেন—প্রথম খোলা চিঠি বেরুবার চার মাস পরে।

নিবেদিতা ১.১২.১৯০৯ তারিখে র‍্যাটক্লিফদের লেখেন:

"দুর্দম নেতাটি আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—ভারত সরকার তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার অনুমতি দেবার জন্য জনকে [জন মর্লে] তাগিদ দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, জন অপরাপর বন্দীদের মুক্তির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তখন আই-জি ঐ আদেশের 'দায়িত্ব' বিষয়ে তাঁকে সুগম্ভীর সতর্কবাণী শোনান। সেই অল্প শাসানিতেই জন দোলাচলচিত্ত।"[১০]

একই চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন—ম্যাককারনেসের প্রতিরোধচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকিয়েছে:

"আমাদের বন্ধু সহসা উধাওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাককারনেসই এতাবৎ প্রধান রক্ষাব্যূহ হয়েছেন দেখছি।"

১০ অমলেশ ত্রিপাঠী সমকালীন নথিপত্র সন্ধান ক'রে যেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন, তার থেকে দেখা যায়, আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ অব্যাহতি পাওয়ায় সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। ত্রিপাঠী অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের কিছু পরে লেখা বেকার, মিন্টো ও মর্লের চিঠিপত্রের যেসব অংশ উৎকলন করেছেন, তাদের ভিতরে সরকারের মনোভাবের রূপ প্রকাশিত। বেকার ১৯-৪-১৯১০ তারিখে মিন্টোকে লেখেন, "[অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলা থেকে ছাড় পেয়েছেন] কিন্তু তাঁর প্রভাব চূড়ান্ত ক্ষতিকর। তিনি নিছক কোনো যুক্তিহীন অন্ধ ধর্মবিশেষ নন—তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারার সক্রিয় সঞ্চারক। ধর্ম-ধর্মোন্মাদের ভাবে পূর্ণ তিনি, যা তাঁর পথে অন্যকে আকর্ষণ করার বিশেষ প্রেরণাশক্তি। বাংলায়, সম্ভবত ভারতবর্ষেও, রাজদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার বিস্তারে অন্য যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর ভূমিকাই অধিক বলে আমি মনে করি।" মর্লে ৫-৫-১৯১০ তারিখে মিন্টোকে লেখেন, সংবাদপত্রের প্রবন্ধের উপর নির্ভর ক'রে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। মিন্টো সে কথা স্বীকার না ক'রে অরবিন্দের গ্রেপ্তারের জন্য তাগিদ দিয়ে ২৬-৫-১৯১০ তারিখে মর্লেকে চিঠি পাঠান, যাতে বলেন, মানিকতলা হত্যাকাণ্ডে [?] অরবিন্দ অন্যতম উস্কানিদাতা, এবং ছাত্রদের উপর তাঁর দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব রয়েছে। অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য সম্মতি জানিয়ে তিনি বেকারকে চিঠি লেখেন। তাঁকে অবশ্য আগেই জানানো হয়েছিল, অরবিন্দ ফরাসি চন্দননগর হয়ে ফরাসি পণ্ডিচেরীতে প্রস্থান করেছেন। [ত্রিপাঠী, ২১৬]

এর তিন মাস আগে, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, (যে সময়ে তাঁর গ্রেপ্তারের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না বলে শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন) নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে বলেন :

"পরিস্থিতি একেবারে ঠাণ্ডা। যদি অরবিন্দ ঘোষ চালান না গিয়ে থাকেন তাহলে তা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে—ইংলণ্ডে তোমার ও ম্যাককারনেসের কাজের জন্য।"

অর্থাৎ অরবিন্দ-লিখিত ৩০ জুলাইয়ের খোলা চিঠির জন্যই সরকার সুবোধ হয়ে পড়েনি—নিবেদিতার দ্বারা প্ররোচিত র‍্যাটক্লিফ ও ম্যাককারনেসের চেষ্টায় (যাঁরা অবশ্যই অরবিন্দের উক্ত খোলা চিঠি ব্যবহার করেছিলেন) সরকার কিছু সময়ের জন্য নিরস্ত ছিল—অন্তত নিবেদিতা তাই মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তীকালে প্রকাশিত ধারণার সঙ্গে নিবেদিতার সমকালীন পত্রের বক্তব্যের সবিশেষ পার্থক্য।

অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকারপক্ষে চিন্তা ও চেষ্টা অব্যাহত ছিলই। অরবিন্দ তা জানতেন। তাই তিনি ২৫ ডিসেম্বর পুনশ্চ একটি খোলা চিঠি কর্মযোগিনে প্রকাশ ক'রে, তার মধ্যে নিজের মত-পথ সরকারের কাছে ও স্বদলের কাছে পরিষ্কার ক'রে তুলতে চাইলেন। এখানেও তাঁর সুর খুবই নরম। তথাপি এর অংশবিশেষ সরকারের কাছে রাজদ্রোহকর মনে হয়েছিল। তদনুযায়ী, নিবেদিতা লিখেছেন, সরকার অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত করেন। এই চেষ্টাকে ঠেকাতে তিনি উঠে-পড়ে লাগেন। উক্ত প্রবন্ধ নানা স্থানে পাঠিয়ে তিনি ভারত-বন্ধুদের প্ররোচিত করেন—ঐ প্রবন্ধটির কারণে অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে তাঁরা যেন তার বিরোধিতা করেন। প্রবন্ধের একটি লাইনই মাত্র রাজদ্রোহকর বিবেচিত হতে পারে বলে নিবেদিতা মনে করেছিলেন। কিন্তু ঐ রাজদ্রোহের পিছনে আছে নৈতিকতার সমর্থন—তাও তিনি বলেছিলেন। ১৪ এপ্রিল, ১৯১০, তিনি মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখেন :

"সম্পাদককে [মিঃ র‍্যাটক্লিফকে] বলো, একটি লাইনকেই রাজদ্রোহকর বলে সন্দেহ করা যায়, যেটি গত ক্রীসমাসের দিন ছাপা হয়েছিল, 'আমরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক করব, আমাদের কর্ম-নীতি, আইনের মধ্যে আমাদের আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন অনুভব করে কি করে না? বর্তমানে তা আমাদের আইনের মধ্যেই রাখছে।' কিন্তু যেহেতু অন্যায় আইন ভাঙাই নৈতিকতার দাবি, তাই এখানে [এই রচনার জন্য] শাস্তিপ্রাপ্তির কারণ দেখছি না—যদি না আদালত [সরকারের] ভয়ে মাথা নামিয়ে দেয়।"

[অরবিন্দের দ্বিতীয় খোলা চিঠি নিয়ে ইংলণ্ডে র‍্যাটক্লিফ ও ম্যাককারনেসের নড়াচড়ার কিছু বিবরণ ম্যাককারনেস সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে দিয়েছি]।

অরবিন্দর দ্বিতীয় খোলা চিঠি বেরোবার একমাস পরে, ২৪ জানুয়ারি, ১৯১০ পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলম আদালতে খুন হন। ফলে আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিবেদিতা খবর পান—অরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেনই। সেই সংবাদ তিনি অরবিন্দকে জানান। এবং অরবিন্দ কলকাতা ছেড়ে প্রস্থান করেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলেছেন, তা আগেই দেখেছি যে, নিবেদিতার সংবাদের তাগিদে নয়, "ঊর্ধ্বলোকের আদেশলাভ করে" তিনি কলকাতা থেকে চন্দননগর চলে যান। [এ সম্বন্ধে অধ্যায়শেষে আলোচনা আছে]। চন্দননগরে কিছুদিন কাটিয়ে চলে যান পণ্ডিচেরীতে। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে জানিয়েছেন—নিবেদিতা ১৪ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে গিয়েছিলেন। তাঁর চন্দননগর গমন কেন? তাকি নিজের

প্রয়োজনে, কিংবা অরবিন্দের আশ্রয় ব্যবস্থাপ্রয়োজনে, কিংবা আশ্রয়প্রাপ্ত অরবিন্দের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনে ?—এ-বিষয়ে অনুমান ছাড়া সিদ্ধান্ত করার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

অরবিন্দ নিবেদিতার উপর কর্মযোগিন্ চালাবার ভার দিয়ে যান। নিবেদিতা পত্রিকাটি স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার বাসনা বোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—যতদিন পারেন অরবিন্দের নামে পত্রিকাটি চালিয়ে অরবিন্দের আশ্রয়-ব্যবস্থার সংবাদ গোপন রাখবেন। তাঁর সম্পাদনাকালে কর্মযোগিনের শেষের কয়েকটি সংখ্যায় অরবিন্দের পূর্বে-লিখিত রচনা [চন্দননগর থেকে প্রেরিত লেখাও ?] প্রকাশিত হয়েছে—সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবধারাসূচক রচনাও। নিবেদিতা কলাশিল্প সম্বন্ধে অনেক লেখা ছেপেছেন—এবং রাজনীতি-প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন।

র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে অরবিন্দের অন্তর্ধান ও পরবর্তী ঘটনাবলীর কিছু-কিছু কথা আছে। ৭ এপ্রিল, ১৯১০, নিবেদিতা লিখেছেন :

"এই সপ্তাহে কর্মযোগিন্ আক্রান্ত। একই অফিস থেকে 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ছাপা হত। ২০০০ টাকা জামানত দেওয়া না হলে তার ছাপা বন্ধ। জামানত দেওয়া হয়নি। এবং অরবিন্দ ঘোষ ও কর্মযোগিনের মুদ্রককে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যে-প্রবন্ধটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, তার জন্য। তুমি ইংলণ্ডে প্রবন্ধটির প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারবে বলেই বিশ্বাস। এটা কি রাজদ্রোহকর ? অরবিন্দ ঘোষকে পাওয়া যায়নি। ১৮ই মামলার দিন। যদি মুদ্রকের মামলায় জেতা যায় তাহলে অপর ওয়ারেণ্ট [অরবিন্দর বিরুদ্ধে যা জারি করা হয়েছিল] অকেজো হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যে-কোনো ভাবেই হোক, কর্মযোগিনের আরও দুটি সংখ্যা বেরুচ্ছে। মুদ্রকের বিরুদ্ধে অবশ্য [সরকারের] তীব্র বিদ্বেষ রয়েছে। সে অশিক্ষিত, 'নবশক্তি'র মুদ্রক হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল—এক বছরের কারাদণ্ড পায়। শাস্তিটা কঠোর বলে বিবেচিত। কিন্তু জেল থেকে সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ন্যাশন্যালিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে এবং কর্মযোগিনের মুদ্রক হয়, যদিও কর্তৃপক্ষ তাকে সতর্ক করেছিল। এইসব কারণের জন্য তার জামিন অগ্রাহ্য। সুইনহো বিচারক হবে মনে হচ্ছে। গোটা মামলাটির বিচার ক'রে সে বোধহয় ওঁদের মৃত্যুদণ্ড দেবার চেষ্টা করবে। হাইকোর্টে আপীলই একমাত্র উপায়, আর তা অবশ্যই করা হবে।"

১৪ এপ্রিল নিবেদিতা লেখেন, "[কর্মযোগিনের] মুদ্রকের বিচার আরম্ভ হবে আগামী সোমবার।"

২৮ এপ্রিল নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে যা লিখলেন তার মধ্যে পরিষ্কার ইঙ্গিত—তাঁর কথা শুনেই শেষপর্যন্ত অরবিন্দ গা-ঢাকা দেন :

"বেপাত্তা সাংবাদিকের সন্ধান মনে হচ্ছে এখনো মেলেনি। মুদ্রকের বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত। দেখে আনন্দিত যে, ওঁরা ওয়ারেণ্ট এড়াবার তাৎপর্য শিখতে পেরেছেন। মধ্যবর্তীকালে আশা করি তোমার কাছে পাঠানো প্রবন্ধটি পৌঁছেছে এবং তা বারুদ জুগিয়েছে—আর ঐ ধন্য-ধন্য রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাকে জ্বালিয়ে রাখবে। কেয়ারহার্ডি যেভাবে বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে, তা জেনে অপূর্ব লাগছে।"

৬ জুলাই নিবেদিতা লেখেন :

"অরবিন্দ এখনো ধরা পড়েননি, যদিও ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত।"

॥৩॥ অরবিন্দর কলকাতা ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

অরবিন্দর কলকাতা-ত্যাগ এবং তার পূর্ববর্তী ঘটনা নিয়ে নানা ধরনের বিবরণ রয়েছে, সেগুলি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ বিবরণ ঘটনার বহু পরবর্তী কালের স্মৃতিকথার উপর নির্ভরশীল বলে কিছু-কিছু তথ্যভ্রান্তি ঘটাও সম্ভবপর। আমি এখানে ঐ সকল বিবরণের অনবিস্তর সংকলন করব।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র সুকুমার মিত্র (অরবিন্দর মামাতো ভাই, এবং স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী) আমাকে একটি ক্ষুদ্র স্বাক্ষরিত বিবরণ দেন ১১ নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখে। সেটি এই :

"শ্রীসুকুমার মিত্রের সামনে রাম মজুমদার সকালে এসে অরবিন্দকে বলেন, আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে কিংবা নির্বাসন দেবে। সেদিন ১১-১২টার সময়ে [অরবিন্দ] যথারীতি শ্যামপুকুরে কর্মযোগিন্ অফিসে যান। সন্ধ্যায় কর্মযোগিন্ অফিসের দেওয়াল টপকে চলে যান। আহিরীটোলা ঘাটে রাম মজুমদার নৌকা করে দেন। সোজা চন্দননগর যান।"

এটি ঘটনার আংশিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। আর একটি বিবরণ দিয়েছেন সত্যেন্দুসুন্দর চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৫-৮-১৯৬৫) "শ্রীঅরবিন্দ" নামক রচনায়। ওর মধ্যে তিনি "শ্রীঅরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগের ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্যতম" শ্রীমতী মনোরমা দেবীর (শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কন্যা) কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ঐ লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ভ্রাতা গিরিজাসুন্দর চক্রবর্তীর ছাপাখানা থেকে কর্মযোগিন মুদ্রিত হত। [এঁর কথা নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে বলেছেন]। অরবিন্দ গোলদিঘির সামনে তাঁর আত্মীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে থাকতেন। "ভগিনী নিবেদিতা তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সঙ্গে বেশ জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি প্রায়ই [শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর] শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। তাঁর পরনে থাকত কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত মোটা কাপড়ের শাদা গাউন, কণ্ঠে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হঠাৎ দেখলে মনে হত সাক্ষাৎ দেবী।"

সত্যেন্দুসুন্দরের বিবরণে আরও পাই, শামসুল-হত্যার পরে কর্মযোগিনে একটি লেখা বেরোয় যাতে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য সরকারের নিপীড়ননীতিকে দায়ী করা হয়। "এই লেখাটি বেরোবার দুই-একদিন পরেই ভগিনী নিবেদিতা প্রায় রাত দশটার সময়ে কর্মযোগিন-অফিসে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন কাগজের জন্য সম্পাদকীয় লেখায় মগ্ন। ভগিনী নিবেদিতা বললেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে সরকার আবার গ্রেপ্তার করবে। তাঁর পরামর্শ, শ্রীঅরবিন্দকে এখুনি কলকাতা ছাড়তে হবে। তিনি ইতিমধ্যে তাঁর যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু যেতে অনিচ্ছুক। তিনি নিবেদিতাকে বললেন যে, তিনি চলে গেলে দেশের কী হবে, কাগজের লেখাশোনা কে করবে? সকলেই তো এখন বন্দী। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দর ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী গোলদিঘির বাড়ি থেকে সেখানে এলেন এবং জানালেন যে, পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে খুঁজছে। এই কথা শুনে নিবেদিতা কলকাতা ছাড়ার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে আরও জোর করতে লাগলেন এবং বললেন, যে তাঁর এক মিনিটও থাকা চলবে না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে কথা দিলেন যে, কর্মযোগিন যাতে বন্ধ না হয় তিনি সে চেষ্টা করবেন।"

এই বিবরণে আরও পাই, অরবিন্দ, নিবেদিতা, সরোজিনী—সবাই গভীর রাতে ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পাশের বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে যান।

উদ্ধৃত দুই বিবরণেই অরবিন্দর পাঁচিল টপকে পলায়নের কথা আছে। দ্বিতীয় বিবরণে নিবেদিতার কার্যকর ভূমিকার কথা সবিশেষ বলা হয়েছে, যার মধ্যে আমাদের সন্দেহ, সত্য ও সম্ভাব্য সত্যের সীমারেখা কিছুটা মুছে গেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯-৮-৬৮ সুতপা চক্রবর্তীর "অগ্নিযুগের বিপ্লবীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার" রচনায়

মধ্যে সতীশচন্দ্র সরকারের প্রদত্ত বিবরণ সংকলিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র সরকার (যিনি পরে 'পোলিটিক্যাল সাধু' নির্বাণ-স্বামী হয়েছিলেন) শামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। হত্যাকারী বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত ধরা পড়লেও ইনি গা-ঢাকা দিতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা ও অরবিন্দ সম্বন্ধে এঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যদিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কচ্ছেদ এঁর পছন্দ হয়নি, এবং সে জন্য পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তর্কও করেছেন। অরবিন্দের মধ্যে উনি দেখেছিলেন "নেহাত ভালোমানুষ গোবেচারী ভদ্রলোককে।" "অত্যন্ত বিনয়ী, অত্যন্ত নিরহঙ্কারী। কোনোদিন পাণ্ডিত্যের গর্ব দেখিনি তাঁর। দীর্ঘকাল বিলেতে থাকলেও বিলিতি চঙ তাঁর ছিল না। কোনোদিন রাগ দেখিনি।" অরবিন্দের সঙ্গে নানাপর্বে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা ইনি বলেছেন। নিবেদিতা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"নিবেদিতার মতো উচ্চশিক্ষিতা ও উচ্চভাবের মহিলা আজও আমার দ্বিতীয় একটি চোখে পড়েনি। তাঁর সঙ্গে বহু মেলামেশাতেও এটা বুঝেছি যে, তিনি যে-স্তরের তা অসাধারণ। এবং তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সব কথা সব সময়ে বুঝতে পারিনি।"

অরবিন্দের প্রস্থান প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র সরকার বলেছেন, শামসুল হত্যার পরে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে তিনি প্রথমে অখিল মিস্ত্রী লেনে অবিনাশ চক্রবর্তীকে খবরটা দেন, তারপর চলে যান শ্যামপুকুরে কর্মযোগিন অফিসে। হত্যার খবর শুনে অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ চন্দননগর যাবার সিদ্ধান্ত করেন, এবং এঁর ডেকে-দেওয়া গাড়িতে ক'রে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে স্থানত্যাগ করেন। ইনি যোগ করেছেন : "অরবিন্দের এই যাওয়ার পিছনে আরও একটু ইতিহাস আছে। ভগিনী নিবেদিতা ওঁকে এর মধ্যে খবর দিয়েছিলেন—সরকার ওঁকে নির্বাসনে পাঠাবার গোপন চক্রান্ত করছে। সুতরাং এখন তাঁর ভারতীয় এলাকা ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল। ইতিমধ্যে শামসুল হত্যার খবরে শীগগিরই নির্বাসনের সম্ভাবনা দেখে উনি সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে চন্দননগর চলে যান।"[11]

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের সহকর্মী এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সাংবাদিক-জগতে পিতামহরূপে খ্যাত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পরিষ্কারভাবে অরবিন্দের প্রস্থানের পিছনে নিবেদিতার মুখ্য ভূমিকার কথা বলেছেন। উদ্বোধন পত্রিকায় চৈত্র, ১৩৫৮ সংখ্যায় "ভগিনী নিবেদিতা" প্রবন্ধে (প্রবন্ধটি প্রথমে যুগান্তর পত্রিকায় বেরিয়েছিল) তিনি বলেছেন :

"আলিপুর বোমার মামলা হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া অরবিন্দ যখন 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রদ্বয় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন সরকার আবার তাঁহাকে মামলা সোপর্দ করিবার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে নিবেদিতা তাহা জানিতে পারেন। এবং তাঁহারই পরামর্শে ও প্ররোচনায় অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে গমন করেন। ভগিনী নিবেদিতাই তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সে অর্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দিয়াছিলেন।"

অরবিন্দকে চন্দননগরে যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই মতিলাল রায় লিখেছেন :

"তিনি [শ্রীঅরবিন্দ] এইরূপ আত্মগোপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন।"[12]

১১ সতীশচন্দ্র সরকার পরিষ্কার বলেছেন, শামসুল-হত্যার খবর পেয়েই অরবিন্দ প্রস্থান করেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-জীবনের সঙ্গী-সহকর্মী নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'স্মৃতির পাতা' (১ম খণ্ড, পৃ ৮১) গ্রন্থে সতীশচন্দ্র সরকার প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"একদিন বিকেলের দিকে এক যুবক ছুটতে-ছুটতে উপস্থিত শ্রীঅরবিন্দকে খবর দেবার জন্য যে, শামসুল আলম (আমাদের আলিপুর মোকদ্দমার সরকারের প্রধান সহায় পুলিশ ইন্সপেক্টর) খতম হয়ে গেছে হাইকোর্টে—বীরেনের হাতে—সেও সঙ্গে ছিল, সে পালাতে পেরেছে, বীরেন পারল কিনা সন্দেহ। বীরেন ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। ছেলেটি ফেরার হয়ে পড়ে। পরে পণ্ডিচেরীতে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়—কিছুদিন, এক-আধ বৎসর হয়ত থেকেও গেল। আমরা তাকে নাম দিয়েছিলাম কনিষ্ঠ-পাপিষ্ঠ। কিন্তু সে হয়ে উঠেছিল মায়াবাদী, আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার মিল হল না। পরে সন্ন্যাসী হয়ে যায় শুনেছি।"

১২ মতিলাল রায়, 'জীবনসঙ্গিনী'। গিরিজাশঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ ১৫৩। মতিলাল রায় 'শতবর্ষের বাংলা' গ্রন্থেও একই কথা লিখেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও একই ধরনের কথা লিখেছেন :

"উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতাই অরবিন্দকে বৃটিশ-ভারতীয় পুলিশের নাগালের বাইরে অন্যত্র গিয়ে থাকবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।... ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দকে যখন দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করার আশঙ্কা দেখা দিল তখন রামচন্দ্র মজুমদার নামক এক বিপ্লবী তরুণকে নিবেদিতার কাছে পাঠানো হল, অরবিন্দের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য। নিবেদিতা বলেছিলেন : 'নেতার পক্ষে ঘরে থেকে যেমন কাজ করা সম্ভব, দূরে থেকেও তেমনি করা সম্ভব।' ('The leader at a distance can work as much as at home')। এই উপদেশ পেয়েই অরবিন্দ ফরাসি-অধিকৃত ভারতে চলে যান।" ["স্বামী বিবেকানন্দ", ১১৬]

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'অগ্নিযুগ' গ্রন্থে (পৃ· ৬৬) বলেছেন—নিবেদিতার অনুরোধে 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিনে'র কাজ ছেড়ে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে উল্লেখ আগেই করেছি।

এই সকল বিবরণেই অরবিন্দের প্রস্থানের মূলে নিবেদিতার প্ররোচনার কথা আছে। যে-ভাবেই হোক, সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রকার ধারণা গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটি আপাতত এমন কিছু কাণ্ড নয়। নিবেদিতা তৎকালীন বাংলার বিরাট-বিরাট পুরুষদের মান্য পরামর্শদাত্রী ছিলেন—সুতরাং একজন বিপ্লবী নায়ককে রাজনৈতিক কারণে গা-ঢাকা দেবার পরামর্শ দেবেন, এবং তা তিনি গ্রহণ করবেন, এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ব্যাপারটা কিন্তু অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে গেল একটি বিশেষ কারণে—এই প্রস্থানের পরে অরবিন্দ ঘোষ আর বিপ্লবী-নায়ক রইলেন না (অবশ্য পণ্ডিচেরীতে প্রস্থানের পরেও কিছুদিন তিনি বৈপ্লবিক ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন এমন কথা কেউ-কেউ, যথা অরুণচন্দ্র দত্ত, বলেছেন)—হয়ে গেলেন মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। ফলে তাঁর ঐ যাত্রা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লাভ করল। এমন একটি ব্যাপার নিবেদিতার পরামর্শে ঘটে যাওয়া ঠিক যেন মানানসই নয়।

শ্রীঅরবিন্দের অনেক প্রখর অনুরাগীর কাছে আরও একটি জিনিস খুবই আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩৫১, আষাঢ় সংখ্যায় "শ্রীঅরবিন্দের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব" নামক প্রবন্ধে উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের (ইনি প্রাক্তন বিপ্লবী) কথার উপর নির্ভর ক'রে লিখে বসলেন, শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থানকালে প্রথমে বাগবাজারে গিয়ে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করেছিলেন, এবং ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দকে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়ে দেন। অরবিন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে এই সংবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা হয়। বস্তুতপক্ষে স্বামী সুন্দরানন্দ মোটামুটি শোনা কথার উপর নির্ভর করেই ও কথা জানিয়েছিলেন। চারুচন্দ্র দত্ত ফাল্গুন ১৩৫১, উদ্বোধনে, 'প্রতিবাদ'-পত্রে বলেন, চন্দননগর যাবার পথে অরবিন্দ বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে যান নি, প্রণাম করেন নি, তাঁর সঙ্গে সারদাদেবীর কখনই দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। "একথা আমি [চারুচন্দ্র লেখেন] উদ্বোধনের পাঠকমণ্ডলীকে জানাইতেছি শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে।" তিনি আরও বলেন, গঙ্গার ঘাটে নিবেদিতা বা গণেন মহারাজ উপস্থিত ছিলেন না ; ওঁদের কেউই শ্রীঅরবিন্দের কলকাতো-ত্যাগের কথা জানতেন না ; চন্দননগরে পৌঁছবার পরে অরবিন্দ নিবেদিতাকে কর্মযোগিনের ভার নেবার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠান। চারুচন্দ্র দত্ত অতঃপর নিবেদিতার পরামর্শ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 'উক্তি' বলে প্রচারিত উক্তির হুবহু ঐক্য : নিবেদিতা গোড়ায় অরবিন্দকে সতর্ক করেছিলেন, পরে কর্মযোগিনে অরবিন্দ প্রথম খোলা চিঠির উত্তম ফল দেখে "নিবেদিতা নিজেই তাঁকে বলিলেন যে, [চারুচন্দ্র দত্ত লিখেছেন] সরকার আর কিছু করিবেন না, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এই ঘটনার পর ভগিনী নিবেদিতা আর কোনো গূঢ় খবর জানিতেও পারেন নাই, শ্রীঅরবিন্দকে দেশত্যাগী হবার পরামর্শও দেন নাই।" দত্ত এইসঙ্গে যোগ করেছেন : "চন্দননগর যাওয়া এবং পণ্ডিচেরী যাওয়া, এই দুই বিষয়েই শ্রীঅরবিন্দ অন্তরে দিব্য আদেশ পাইয়াছিলেন, অপর কাহারও সূচনা বা নির্দেশমতো কাজ করেন নাই।"

চারুচন্দ্র দত্তের উপরের কথাগুলি সম্পূর্ণ ভুল কারণ নিবেদিতার চিঠি থেকে আগেই দেখিয়েছি যে, কর্মযোগিনে প্রথম খোলা চিঠি বেরোনোর বেশ কয়েক মাস পরেও সম্ভাব্য নির্বাসন নিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে

নিবেদিতার আলোচনা হয়েছে। গিরিজাশঙ্কর উদ্বোধনের একই সংখ্যায় "প্রতিবাদের উত্তর"-এ চারুচন্দ্রের আপত্তির কিছু অংশ মেনে নেন ; কিন্তু একেবারেই মানেন নি—নিবেদিতার পরামর্শে অরবিন্দর কলকাতা-ত্যাগ ব্যাপারটিকে অস্বীকারের চেষ্টাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রবর্তক সংঘের অরুণচন্দ্র দত্তের ১৩.১.১৯৪৫ তারিখের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেছেন :

"আপনার পত্রোক্ত বিষয়ে [অরুণচন্দ্র লিখেছেন] পূজনীয় সংঘগুরুকে [মতিলাল রায়] জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা গেল তাহা এই—হাইকোর্টে সামসুল আলমের হত্যার পর কলিকাতায় প্রবল গুজব হয় শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইতে পারেন বলিয়া। তখন সিস্টার নিবেদিতা তাঁকে কোনো বিদেশে গমন করিতে অনুরোধ করেন।...পূর্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিবার কোনো সত্য কারণ নাই। যাঁহারা এ-বিষয়ে সংশয় তুলিয়াছেন, তাঁহারা এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ কিছুই জানেন না, জানিবার সম্ভাবনাই নাই।"[১০]

গিরিজাশঙ্কর, সুকুমার মিত্রের উক্তিও [যাঁর সাক্ষ্য আমিও তুলেছি] উপস্থিত করেছেন, যাতে দেখা যায়, অরবিন্দ দেওয়াল টপকে পলায়ন করেন, যদিও "পলায়ন করিবার কথা বলায় প্রথমে অরবিন্দ রাজি হন নাই।" গিরিজাশঙ্কর এখানে তির্যক মন্তব্য করেছেন : "Go to Chandernagore—আদেশ পাইয়াই যদি অরবিন্দ পাশের বাড়ি দিয়া পলায়ন করিয়া থাকেন, তবে তাহাই হইয়াছে। প্রথমে যদি [তাহা করিতে] অস্বীকার করিয়া থাকেন তবে সম্ভবত তখনও আদেশবাণী পান নাই। একটু পরে পাইয়া থাকিবেন।"

বিতর্কের শেষ এখানেই হল না। স্বামী সুন্দরানন্দ যাঁদের কথা শুনে ঈষৎ ভ্রান্তিসহ বলেছিলেন—অরবিন্দ চন্দননগর যাত্রাকালে বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম ক'রে যান—তাঁদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের দ্বারা তিনি জানতে পারেন, 'যাত্রাকালে' প্রণাম করার ব্যাপারটি বেঠিক হলেও, দেখাসাক্ষাৎ ও প্রণাম করার ব্যাপারটা বেঠিক নয়—তা ঘটেছিল কিছুদিন পূর্বে। কর্মযোগিন্ অফিসের যুবক-কর্মচারী রামচন্দ্র মজুমদার, যিনি এই যাত্রাকালে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত ছিলেন, এবং যিনি পূর্বে পুলিশী উৎপাতের সম্ভাবনার কথা অরবিন্দকে বলেছিলেন (অরবিন্দ নিজে সেকথা স্বীকার করেছেন বলে কথিত)—সেই রামচন্দ্র মজুমদারের একটি দীর্ঘ লেখা প্রবাসীতে শ্রাবণ ১৩৫২ সংখ্যায় বেরোয়, যেটি উদ্বোধনে ভাদ্র ১৩৫২ সংখ্যায় উৎকলিত হয়। রচনাটির নাম "অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা।" এটি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত এবং প্রবাসীতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, সংখ্যায় প্রকাশিত "অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" রচনার উপর সংশোধনী রচনা। শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে সস্ত্রীক অরবিন্দর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মজুমদার যা বলেছেন তা সংকলন করছি :

"সুরেশ না জানিয়া যে-কথা লিখিয়াছে উহার প্রতিবাদ করিব। সে লিখিয়াছে যে, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে কখনও দেখিতে যান নাই। সুরেশ এ-বিষয়ে কিছু জানে না। এই কথা সে শ্রীঅরবিন্দকেও জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দবাবু একাকী নহেন, সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার চন্দননগরে যাইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল।

১০ মতিলাল রায় এ-ব্যাপারে একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। তিনি পূর্বাবধি জেনেছেন, নিবেদিতার কথাতেই অরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করেন—সেকথা লিখেছেনও। কিন্তু অরবিন্দ আশ্রম থেকে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে যখন বলা হল, ঊর্ধ্বলোকের নির্দেশেই অরবিন্দের কলকাতা-ত্যাগ, তখন পূর্বজানিত তথ্যের মধ্যে, অরবিন্দভক্ত হিসাবে, দৈবাদেশকে একটু ঠাঁই না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। "আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" গ্রন্থে (১৯৫৭) তিনি লিখেছেন :

"সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডে শ্রীঅরবিন্দকে সংজড়িত করার সংবাদ ভগিনী নিবেদিতার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র ভগিনী নিবেদিতার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রায় প্রতি অপরাহ্নেই বেড়াইতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় বন্দী হইতে না হয় তাহার জন্য আচার্য জগদীশ ও সিস্টার নিবেদিতা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে আত্মগোপন করারই অনুরোধ করা হইবে। শ্রীঅরবিন্দের নিকট সেই প্রস্তাব ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার প্রস্তাব শুনিলেন, কিন্তু তখনই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহার অত্যল্পকাল পরেই, তাঁর নিজের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশের বাণী ফুটিয়া উঠিল—চন্দননগর যাও। ইহার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ যখন আলিপুর মামলায় বন্দী হইয়া গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাসভবন হইতে লালবাজারে নীত হন, তখন যে-গাড়িতে চড়িয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষের পুরোভাগে তাহাতে উপবিষ্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তিনি সন্দর্শন করেন, ইহা তাঁর মুখেই আমরা পরে শুনিয়াছি।" [পৃ. ৫৮]।

তারিখ আমার মনে নাই বটে কিন্তু ঘটনাটি এই সেদিন ঘটয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে।— শ্রীঅরবিন্দের উদ্বোধনে আগমন সম্বন্ধে সত্য ঘটনা এই : আমি আসিয়া পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে জানাইলাম, 'অরবিন্দবাবু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে আসিতে চান।' তিনি বলিলেন, 'লইয়া আইস।' কুমার অতীন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ি লইয়া আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়িতে গেলাম। এইসময় অরবিন্দবাবুর স্ত্রী ওখানে থাকিতেন। অরবিন্দবাবু প্রস্তুত ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ও তাঁহার স্ত্রী গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। আমি গাড়ির ছাদে বসিতে যাইতেছিলাম ; তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাক্যহীন তিরস্কারে আমাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি ভিতরে আসিয়া বসিলাম। তেজস্বী অশ্ব বাগবাজার অভিমুখে দৌড়িল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা উদ্বোধন আপিসে আসিয়া পৌঁছিলাম। অরবিন্দবাবু সস্ত্রীক উপরে গেলেন। সেদিন গৌরীমাও উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও উপদেশ দিলেন। অরবিন্দবাবু চৌকাঠের বাহিরে আসিলে গৌরীমা তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্বামীজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন 'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়। হৃদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক, এ জগতে নাহি তব স্থান।' অরবিন্দবাবু কম্পিতপদে কতকটা ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া শরৎ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। ইহাই প্রকৃত ঘটনা। শুনিয়াছিলাম, অরবিন্দবাবুকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা বলিযাছিলেন, 'এইটুকু মানুষ, এঁকেই গভর্নমেন্টের এত ভয়।' আরও শুনিয়াছিলাম যে, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার বীর ছেলে।' আমরা যখন গাড়িতে উঠি তখন কৃষ্ণবাবু (বেদান্ত চিন্তামণি) উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন।

"শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় নাকি শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে লিখিয়াছেন যে, তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) কখনও শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে আসেন নাই। ইহা পড়িয়া আমার মনে হইল, কোনো শিক্ষিত মানুষ এমন কথাও লিখিতে পারেন ? আমি এ-বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি কখনও বলিবেন না যে, তিনি উদ্বোধনে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন নাই।"

রামচন্দ্র মজুমদার অরবিন্দর বিদায়কালে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-চিন্তামণির উদ্বোধনে আগমনের উল্লেখ করেছেন। বেদান্ত-চিন্তামণি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় ৫ জুন, ১৯৫২, চিঠিপত্র কলমে এই প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন [*Sri Aurobindo—An Episode of His Life*]। এর মধ্যে তিনি রামচন্দ্র মজুমদারের মতোই লেখেন—অরবিন্দ প্রণাম করতে গিয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণপূজিতা শ্রীমা সারদাদেবীর মহিমার অতিস্ফীতি ঘটেছে, এমন মনে করার কারণ নেই। তবে বিতর্ক যখন উঠেছে তখন সত্যনির্ণয় প্রয়োজন। বিদান্ত-চিন্তামণি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : "আমি শ্রীঅরবিন্দকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। আমেদাবাদের 'দি পেট্রিয়ট' কাগজ থেকে পদত্যাগ ক'রে আমি কলকাতায় আসি বন্দেমাতরম্‌ কাগজে যোগ দিতে। অরবিন্দ তার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বারীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমি তাঁর অধীনে কাজ করেছি। আমি সিস্টার নিবেদিতাকে জানতাম। স্বামী সুন্দরানন্দজী ও বেলুড় মঠের অনেক সাধুর সঙ্গে আমার নিকট পরিচয়। তাই এই ব্যাপারে আমি যা জানি তা বলে ফেলাই উচিত বিবেচনা করছি।"

বেদান্ত-চিন্তামণি অতঃপর লিখেছেন :

"শ্রীঅরবিন্দ যখন বাগবাজার মঠ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন সেদিন আমি সেখানে পৌঁছাই। স্বামী সারদানন্দ আমাকে বললেন : 'শ্রীঅরবিন্দ যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করছিলেন তখন তাঁর ক্ষুদ্রাকার দেহ দেখে মাতাঠাকুরাণী কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এত ছোট একটি মানুষকে সরকারের অমন ভয়!' শ্রীশ্রীমা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যেকথা বলতেন সেইভাবে 'আদেশ' লাভ করে দুর্ভেদ্য হবার সাধনা করো। অরবিন্দর মাথার উপর হাত রেখে তিনি তাঁকে অভীঃ হবার জন্য আশীর্বাদ করেন। এটাই কি চলতি ভাষায় যাকে হস্তদীক্ষা বলে তাই ? কারণ শ্রীশ্রীমায়ের এই পবিত্র স্পর্শে অরবিন্দর মধ্যে এমন প্রচণ্ড অনুভূতির জাগরণ ঘটে যে, যখন তিনি নীচে নেমে এলেন তখন টলছেন, অর্ধবাহ্য দশা। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে সুস্থির করবার জন্য নীচে একটি ঘরে বসিয়ে খানিক বিশ্রাম করান।"

অরবিন্দর বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে আগমনের কথা প্রাচীন অনেক ব্যক্তিরই জানা ছিল বলে স্বামী সুন্দরানন্দ লিখেছেন। তিনি তৃতীয় প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। ঘটনাকালে

ইনি উদ্বোধনের কার্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী কপিল। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ থেকে ইনি ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২, পত্রযোগে সুন্দরানন্দকে যা জানিয়েছিলেন, তা উদ্বোধনের ভাদ্র সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়:

"শ্রীঅরবিন্দ যে উদ্বোধনে আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজ যে-ঘরে বসিতেন সেই ঘরে যাইয়া তাঁহাকেও প্রণাম করিয়াছিলেন, একথা ধ্রুব সত্য, কারণ এই সকল ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটিয়াছিল।"

এই তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং স্মৃতিশক্তির হীনতা সম্বন্ধে বহুবিধ কটুবাক্যসহ নানা বিস্তারিত রচনা অরবিন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা স্বামী সুন্দরানন্দের সত্যপ্রীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি যে-মুহূর্তে নিজের শোনা সংবাদে ভ্রান্তি ছিল দেখেছেন, তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনাসহ ত্রুটি স্বীকার করেছেন; আবার যখন সুস্পষ্ট তথ্যকে অস্বীকারের চেষ্টা দেখেছেন, তখন আহত বিস্ময়ের সঙ্গে লিখেছেন, ওঁরা কেন এমন করছেন বুঝতে পারছি না।

নিবেদিতার পত্রে স্পষ্টভাবে অরবিন্দের শ্রীমায়ের কাছে আগমনের সংবাদ নেই। তবে ২২ জুলাই, ১৯০১, চিঠিতে আছে:

"মুক্তিপ্রাপ্ত লোকগুলি মাতাদেবীকে প্রণাম করতে আসছেন। তিনি বলেছেন, কী সাহস! কেবল ঠাকুর ও স্বামীজীই এইরকম সাহস সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদেরই তো দোষ।"

নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখি, এইসময়ে অরবিন্দকে চালান দেবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। ৫ আগস্টের চিঠিতে নিবেদিতা পুনশ্চ লিখলেন,

"সকল বড় ন্যাশন্যালিস্টই মাতাদেবীর পাদস্পর্শ ক'রে যান; সকলেই স্বীকার করেন—আহ্বান এসেছিল স্বামীজীর মধ্য দিয়েই।"

১ সেপ্টেম্বরের চিঠিতেও একই কথা, যার আগে-পরে আছে অরবিন্দের গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা:

"সকলেই এখন বলছেন, নতুন ভাবের উৎস হলেন স্বামীজী; তাঁরা মাতাদেবীর চরণস্পর্শ করতে আসেন; সারদানন্দ কোনোমতে কাউকে ফিরিয়ে দিতে রাজি নন।"

জানি না, এইসব উল্লেখের মধ্যে অরবিন্দের শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রণাম করতে আসার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কিনা! নিবেদিতা যখন বলেন, 'সকল বড় ন্যাশন্যালিস্ট'—তখন মনে হয়, ন্যাশন্যালিস্টদের নেতা বলে যাকে মনে করতেন, তাঁকে হিসাবের বাইরে রাখেন নি।

শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং দৈবনির্দেশে কলকাতা ত্যাগের কথা বলেছেন—এ কথা আমরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রচারিত গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। ঐ কথা অস্বীকারের নিঃসংশয় অধিকার আমরা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পরে কথিত শ্রীঅরবিন্দের কিছু বক্তব্যের সঙ্গে নিবেদিতার সমকালীন পত্রনিবদ্ধ বক্তব্যের পার্থক্যও আমরা লক্ষ্য করেছি। সেইজন্য মনে হয়, যে-রামচন্দ্র মজুমদার অরবিন্দকে তাঁর আসন্ন গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, এবং বাগবাজার ঘাটে তাঁকে নৌকায় তুলে দিয়েছিলেন (শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেকথা বলেছেন)—তাঁর প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করা উচিত—যদিও তার অংশবিশেষকে শ্রীঅরবিন্দ গালগল্প বলে অগ্রাহ্য করেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার ভাদ্র ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত রামচন্দ্র মজুমদারের রচনার অংশ এই:

"আমি জনৈক সি-আই-ডি'র নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং খুব সম্ভব শামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ি ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে খবর দিলাম। তিনি ধীরচিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া কর্মযোগিন্ অফিসে আসিলেন। প্রথমে জমিদার

ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে [অরবিন্দর] প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর রাজযোগ উপহার দেন। অরবিন্দবাবু বলিতেন, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দুদর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা কর্মযোগিনে প্রবন্ধ লিখিতেন। যে-সময়ে অরবিন্দবাবু চন্দননগরে লুকাইয়াছিলেন সে-সময়ে নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখিতেন এবং আমিও লিখিতাম। মতিবাবু 'নবতন্ত্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখায় 'ধর্ম' পত্রিকার দুই হাজার টাকার সিকিউরিটি কর্তারা দাবি করেন্। ইহার ফলে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things!' একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, 'Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide.'... এই সংবাদ পাইয়া আমি আপিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন 'All right, arrange!' পরে এ-সম্বন্ধে সুরেশ যাহা লিখিয়াছে তাহা সবই ঠিক। কেবলমাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু যে, ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই। বোধহয় নিবেদিতার সঙ্গে তিনি কর্মযোগিন্ পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, নীচে রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কী কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই। অরবিন্দবাবু ও বীরেনবাবু বাগবাজারের খড়ো ঘাটে সিঁড়ির উপর বসিলেন। আমি ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোলা ঘাট পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান হইতে নৌকা করিয়া বাগবাজার ঘাটে আসিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, 'Be rare in your acquaintances. Seal your lips to rigid secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest.' নৌকা ছাড়িয়া দিল।"

নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রয়াসের চতুর্থ পর্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিবেদিতা, এস কে র‍্যাটক্লিফ ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন

॥ ১ ॥ ভারতে র‍্যাটক্লিফের সাংবাদিক-জীবন, নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়, নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় র‍্যাটক্লিফের প্রয়াস

এস কে র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠিগুলি পড়বার সময়ে মনে হয়েছে—ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ লেখা হয় না, নচেৎ স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে র‍্যাটক্লিফের ভূমিকা অ-চিহ্নিত থাকত না। এই ইংরাজ সাংবাদিক ও লেখক নিজ দেশবাসীর সাম্রাজ্যস্বার্থের বিরুদ্ধে জীবনের এক পর্বে প্রবল যুদ্ধ করেছিলেন—অথচ তাঁর প্রতি কোনো কৃতজ্ঞতা আমরা জানাইনি। এর জন্য দায়ী র‍্যাটক্লিফের মহত্ত্ব—আত্মপ্রচারের দ্বারা তিনি কৃতজ্ঞতা ভিক্ষা করেন নি, তাঁর বন্ধু নিবেদিতার মতোই প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখেন নি।

সামুয়েল কারথার্স র‍্যাটক্লিফের জন্ম ১৮৬৮ সালে, মৃত্যু ৯০ বছর বয়সে, ১৯৫৮ সালে। তাঁর মৃত্যুর পরে লণ্ডন টাইমস ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮, দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধ ছাপে—তার প্রারম্ভিক অংশ থেকে র‍্যাটক্লিফের জীবন ও কার্যের আভাস পাওয়া যায়। "র‍্যাটক্লিফ পুরনো রীতির র‍্যাডিক্যাল জার্নালিস্টদের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতমদের একজন, [লণ্ডন টাইমস লিখেছিল], তিনি কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রাক্তন অ্যাকটিং এডিটর, ভারতীয় ও আমেরিকান বিষয় সম্বন্ধে বহুসম্মানিত লেখক ও বক্তা।" বিবরণ আরও অগ্রসর হয়েছে : "খর্ব এবং অত্যন্ত ভারী শরীর, অদ্ভুত সুন্দর মস্তকের গঠন, রূপালি-ধূসর কোমল কেশ, তীক্ষ্ণ-কাটা মুখের পার্শ্বরেখা ; উদারনৈতিক সাংবাদিক-মহলে সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিদের অন্যতম ; বহুবিধ বিষয়ে মনোহারী বাক্যালাপে সমর্থ ; কথার মধ্যে টুকরো কাহিনী পরিবেশনের অতি হৃদ্য ক্ষমতার অধিকারী।"[১]

সাংবাদিক ও গ্রন্থকার, এই ভূমিকা ছাড়াও র‍্যাটক্লিফ ইংলণ্ডের 'সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি'-র বহু বৎসরের সেক্রেটারি, সেইসঙ্গে 'সোসিওলজিক্যাল রিভিউ'-এর সম্পাদক (১৯১০-১৭) ; লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর লেকচারার : ইউনিভার্সিটি একস্টেনশন লেকচারার।

র‍্যাটক্লিফের প্রায় ৭০ বৎসরের সাংবাদিক-জীবনের মধ্যে পাঁচ বৎসর স্টেটসম্যানের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়েছিল। তার আগে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি লণ্ডনের 'ইকো' [*Echo*] পত্রিকার সম্পাদক। ১৯০৭ সালে স্টেটসম্যান ছেড়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পরে তিনি "ডেইলি নিউজ ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার অবিরাম লেখক, প্রায়শই মুখ্য সম্পাদকীয়

১ লণ্ডন বেদান্ত সেন্টারের স্বামী যোগেশানন্দের সৌজন্যে আমি লণ্ডন টাইমস পত্রিকার শোক প্রবন্ধটির ফটোস্টাট কপি পেয়েছি।

প্রবন্ধের লেখক। তিনি বিভিন্ন সাময়িকপত্রের জন্যও লিখেছেন, এবং কনটেম্পোরারি রিভিউ পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত রচনা ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বেরিয়েছে।...প্রায়ই লিখেছেন নিউ স্টেটসম্যান ও অবজারভার্ পত্রিকায়।...৮০ বছর বয়সে গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রিকায় মুখ্য সম্পাদকীয় রচয়িতারূপে যোগদান করেন—আড়াই বছর সেকাজে নিযুক্ত ছিলেন।" "প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানসচেতন, সমৃদ্ধমন এই পুরুষ বিস্তৃত স্মৃতিশক্তি ও অনন্যসাধারণ স্পষ্ট স্বচ্ছ মনের অধিকারী ছিলেন—সম্পাদকীয় দপ্তরে সর্বকালের আদর্শ সহকর্মীর প্রতীক তিনি।...খুঁটিনাটি বিষয়ে 'এস কে'-এর নির্ভুল ধারণা সুবিখ্যাত—এবং সে খ্যাতি তাঁর যথার্থই প্রাপ্য।"

মে, ১৯০২, র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানে যোগদান করেন ; পল নাইটের অধীনে সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকীয়-লেখকরূপে কাজ করতে থাকেন। ১৯০৩ সালে পল নাইট যখন তাঁর ভাই রবার্ট নাইটের সঙ্গে ইংলণ্ডে চলে যান তখন র‍্যাটক্লিফ কাগজটির 'অ্যাকটিং এডিটর' হন—১৯০৭ সালে পদত্যাগ করা পর্যন্ত তাই থাকেন। স্টেটসম্যানে যোগদানের দু'মাসের মধ্যে, লাউডন স্ট্রীটের এক বাড়িতে এক ইউরোপীয় মহিলার দ্বারা আয়োজিত চা-পান সভায়, র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ। ঐ সভায় বেশ-কিছু ইউরোপীয়, এবং কিছু ভারতীয়, যাঁদের অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ঘটল এক 'অদ্ভুত কাণ্ড'—র‍্যাটক্লিফ অন্তত তাই ভেবেছিলেন। নিবেদিতাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। "মনে পড়ে, বক্তৃতায় তিনি [র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন] ভারতীয় নারীর আচার-ব্যবহার ও আদর্শের বিষয়ে সুগভীর ও ঐকান্তিক প্রশস্তি করেছিলেন, ...সেইসঙ্গে শাসকশ্রেণীর উপর তীব্র আক্রমণ, যেহেতু তারা ভারতীয় সমাজের মূলবস্তু অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এবং তার ধ্বংসসাধনে সক্রিয়।" বলাবাহুল্য কলকাতার ফ্যাশানদুরস্ত পল্লীতে ইঙ্গ-ভারতীয় এক সমাবেশে এই ধরনের বক্তৃতায় আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয় না, নিবেদিতাকে অত্যন্ত বেখাপ্পা মনে হয়েছিল সকলের, "কিন্তু একজন শ্রোতার মনে অন্তত ঐ ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি তখন ভারতে নবাগত [র‍্যাটক্লিফ আরও লিখেছেন], দু'মাসও হয়নি স্টেটসম্যানে যোগদান করেছি। আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই বিচিত্র—ঐ বৈকালী আয়োজন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমাবেশ, সেখানে এক পাশ্চাত্ত্যকণ্ঠ পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ভারতীয়দের কাছে শোনাচ্ছে ভারতের রীতি-নীতি-আদর্শের মহিমা ও শাশ্বত সৌন্দর্যের কথা, যার থেকে ঐ সকল ব্যক্তি নিজেদের ছিন্ন ক'রে দূরে সরে গেছেন।"

"সূচনাটা অবশ্যই আশাপ্রদ নয়, কিন্তু এরই দ্বারা শুরু হয়েছিল এমন এক বন্ধুত্বের", র‍্যাটক্লিফ গভীর আবেগের সঙ্গে স্বীকার করেছেন, "যা আমার ও আমার পত্নীর কাছে সর্বাধিক মূল্যবান ও সর্বাধিক আলোকিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারূপে সর্বদা বর্তমান থাকবে।"[২]

নিবেদিতাই যে র‍্যাটক্লিফ-পরিবারের দেবদূতী (র‍্যাটক্লিফের এক কন্যার গড্-মাদারও তিনি হয়েছিলেন), তা র‍্যাটক্লিফ সর্বদা গভীরভাবে স্মরণ করেছেন। "যেসব নরনারীকে জানবার সুযোগ পেয়েছি [র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন] তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার তুল্য প্রবলভাবে সজীব আর কাউকে দেখিনি। যেসব বস্তুকে অধিকাংশ মানুষ সবচেয়ে প্রিয় বলে গ্রহণ করে, তাদের তিনি ত্যাগ করেছিলেন—সে কারণে তীব্রভাবে ঐকান্তিক হবার এবং অপরের কাছ থেকে ঐকান্তিকতা দাবি করবার অধিকার তাঁর ছিল।...সুতীব্র ভাবপূর্ণ তাঁর অন্তর্জীবন, কৃচ্ছ্রকঠিন এবং একান্ত নিয়ন্ত্রিত। তথাপি তাঁর অপেক্ষা সর্বাত্মকভাবে এবং সুন্দরতরভাবে মানবিক করুণায় পূর্ণ আর কাউকে কখনো দেখা যায়নি ; তাঁর মতো করে অপরের দৈনন্দিন সেবায় ও সুখে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে অংশগ্রহণ

২ S. K. Ratcliffe, "Sister Nivedita: An English Tribute," Modern Review, Dec., 1911.

কদাপি কেউ করেনি।...মহিমা-উদ্বোধক তাঁর বন্ধুত্ব—সে বন্ধু লাভে ধন্য মানুষেরা জানেন—তাঁর থেকে নিখুঁত উত্তম বন্ধু কেউ হতে পারেন না। তাঁর ঐ মহাদানের স্মৃতিকে জগতের সর্বোচ্চ আশীর্বাদ বলেই ওঁরা ধারণ করে রেখেছেন।"[৩]

নিবেদিতার দেহান্তের পরে তাঁর স্মৃতির মর্যাদা রক্ষার জন্য র‍্যাটক্লিফ প্রয়াসী ছিলেন। ইংলণ্ডের কাগজপত্রে নিবেদিতার বিষয়ে যে-সব শোকরচনা বেরিয়েছিল, তার অনেকগুলির পিছনে র‍্যাটক্লিফের হাত ছিল বলেই মনে হয়।[৪] ডেইলি নিউজ পত্রিকায় নিবেদিতার বিষয়ে র‍্যাটক্লিফের লেখাটির বিশেষ উল্লেখ করেছিল ইণ্ডিয়া পত্রিকা।[৫] কিছুদিনের মধ্যেই র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতার যথার্থ স্মৃতিরক্ষায় মূল্যবান একটি কাজে অগ্রণী হতে দেখি—নিবেদিতার অপ্রকাশিত বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত লেখাগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে তিনি সচেষ্ট হন। এ সম্পর্কে তিনি নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন এবং ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মিসেস উইলসনকে লেখা তাঁর এই সম্পর্কিত ৮ মার্চ, ১৯১২ তারিখের চিঠি পূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে।[৬] তাতে দেখা যায়, র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার অসমাপ্ত বই 'ইন্দো আরিয়ান মিথস্', (যেটি তিনি 'হ্যারাপ' কোম্পানী থেকে লেখার ভার পেয়েছিলেন, যা পরে আনন্দ কুমারস্বামী সমাপ্ত করেন, নাম হয়, 'মিথস্ অব দি হিন্দুজ্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস্') প্রকাশের জন্য সচেষ্ট—সে-বিষয়ে ডাঃ বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মাদ্রাজের গণেশন্ কোম্পানী বেআইনিভাবে নিবেদিতার রচনা সংকলন বার করেছেন, এর জন্য র‍্যাটক্লিফ বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। ডাঃ বসু নিবেদিতার 'সিভিক অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল আইডিয়ালস্' বইটি প্রকাশ করেছিলেন, সেইসঙ্গে তিনি র‍্যাটক্লিফের সাহায্যে নিবেদিতার 'স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইসটার্ন হোম' বইটি প্রকাশ করতে চাইছিলেন, তাও জানতে পারি। শেষোক্ত বইটিতে নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করতে আগ্রহী র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তথ্যের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মিসেস উইলসনকে লেখা র‍্যাটক্লিফের ২২ জুলাই, ১৯১২ তারিখের চিঠিতে দেখা যায়, তিনি ডাঃ বসু-প্রেরিত নিবেদিতার রচনা-সংকলন পেয়েছেন, যা নিয়ে তিনি লঙম্যানের সঙ্গে কথা বলবেন।[৭] একই জনকে লেখা ২৯ জুলাই-এর চিঠিতে পাই, র‍্যাটক্লিফের ভূমিকাসহ 'স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' বেরুবে। এই সঙ্গে 'ওয়েব' গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশের বাসনাও দেখা গেল।[৮]

র‍্যাটক্লিফের উদ্যোগে প্রকাশিত 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' গ্রন্থটির মূল্য আছে। গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফের বিশেষ মমত্ব ছিল কারণ তাঁরই অনুরোধে সেগুলি স্টেটসম্যানের জন্য নিবেদিতা লিখেছিলেন। র‍্যাটক্লিফ স্বয়ং সোসিওলজিস্ট, আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে

৩ ভগিনী নিবেদিতার মরণোত্তর "স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম" গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত এই রচনা।

৪ রেমঁ-সংগ্রহে লণ্ডন টাইমস (২৬-১০-১৯১১), নেশন (২৮-১০-১৯১১), ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট (২৬-১০-১৯১১), ডেইলি নিউজ (২৬-১০-১৯১১) ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শোকরচনা আছে। এগুলি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৩৯৪-৯৭) সংকলিত হয়েছে।

৫ *India*, Oct. 27, 1911, *The Sister Nivedita.*
"In the course of an eloquent tribute in yesterday's *Daily News* to her remarkable career, Mr S. K. Ratcliffe writes that it would be true to say that no Englishwoman has ever made for herself a similar place in the affections of the Indian people, or has tried to do the work to which she put her hand."

৬ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩৯৯-৪০০।

৭ রেমঁ-সংগ্রহে রক্ষিত।

৮ ঐ।

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলে র‍্যাটক্লিফ আনন্দিত ছিলেন। বইটির দীর্ঘ ভূমিকা র‍্যাটক্লিফই লেখেন, তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনীটিকে নিবেদিতার প্রথম ইংরাজি জীবনী বলতে পারি। পরিশিষ্টে র‍্যাটক্লিফ সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিবেদিতা-প্রশস্তি যুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেজন্য সর্বোচ্চ মহলে নিবেদিতা সম্বন্ধে কী মনোভাব ছিল, কিছুটা বোঝা সম্ভব হয়।

আরও কয়েক বছর পরে নিবেদিতার আর এক রচনা-সংকলন "রিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম" গ্রন্থের (১৯১৫) ভূমিকাও র‍্যাটক্লিফ লেখেন। তার মধ্যে "ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সর্বাধিক নিষ্ঠাবান ও সর্বাধিক শক্তিশালী এক আধ্যাত্মিক নেতা" হিসাবে নিবেদিতার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'ন্যাশন্যালিজম্', 'রেনেসাঁস্' 'ধর্ম' ইত্যাদি সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে র‍্যাটক্লিফ বিচার করেছিলেন।

এরও ২২ বছর পরে, লিজেল রেমঁ যখন নিবেদিতা-জীবনী রচনায় ব্রতী হন, তখন র‍্যাটক্লিফ কেবল তাঁকে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বলেন নি, তাঁকে লেখা নিবেদিতার এমন সব চিঠি দিয়েছিলেন, যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, এবং সেকথা ইতিপূর্বে বলেছি।

র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে ইংলণ্ড, জেনিভা, প্রাগ প্রভৃতি স্থানে ১৯৩৭ সালের বিভিন্ন সময়ে আলোচনার খণ্ডিত কিছু নোট রেমঁ-সংগ্রহে আছে। তাদের থেকে কিছু সংকলন করে দিচ্ছি :

২৬-৯-১৯৩৭ : 'রেসপনস্ ইন দি লিভিং অ্যাণ্ড নন লিভিং' বসুর প্রথম গ্রন্থ, যা নিবেদিতা লিখেছেন। [অর্থাৎ যার ভাষাগঠন নিবেদিতা করেছেন]। এক সঙ্গে তাঁরা প্রভাত কাটাতেন—যখন বসু নিবেদিতার 'মস্তিষ্ক ব্যবহার করতেন।' নিবেদিতা সর্বদাই ক্রীম রঙের পোশাক পরতেন। তাঁর দ্রুত-লিখিত রচনাগুলি পরিশ্রমযুক্ত লেখার তুলনায় উত্তম। শিবনাথ শাস্ত্রীকে পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিভিল সারভেন্ট—তাঁর পত্নী যেভাবে পর্দার বাইরে এসেছিলেন তার প্রশংসা করতেন—যে অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি পরার পদ্ধতির চল উনি করেছিলেন, তারও। ইংরাজ নন্-কনফরমিস্টদের পছন্দ করতেন না ; মনে করতেন, তাদের চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। নিজের ঘরে কালীর ছবি রাখেন নি। স্যার নীলরতন সরকার ছিলেন ডাক্তার—নিবেদিতা ও বিবেকানন্দকে জানতেন। বিবেকানন্দের এক ভাই ন্যাশন্যালিস্ট, জেলে গিয়েছিলেন, নিবেদিতার দলভুক্ত। বন্দেমাতরমে নিবেদিতা লিখতেন। ১৯০৬, ১৬ অক্টোবরে প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন। ঐ সময়ে স্টেটসম্যানকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলে বিশেষরকম সন্দেহ করা হত। নিবেদিতা স্টেটসম্যানে বেনামে সম্পাদকীয় লিখতেন। খুব ফর্সা, উঁচু চোয়ালের হাড়, প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, ক্ষিপ্রগতি, ঋজুক। যার সম্বন্ধে তাঁর কোনো গভীর অনুভূতি তাকেই সন্তানবৎ দেখতেন। চিকিৎসার ব্যাপারে গোঁড়া পুরনোপন্থী। খুবই সাইকিক্, আমার হাত দেখেছেন। থিয়জফিস্টদের উৎপাত বলে মনে করতেন, তবে স্বীকার্য তারা ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক শব্দাবলীকে পাশ্চাত্যে ছড়িয়েছে। ১৯০৬ সালে একবার ভেবেছিলেন, বসুর কাজ ছেড়ে দিয়ে বিবেকানন্দের কাজ আরও বেশিভাবে গ্রহণ করবেন। 'ইণ্ডিয়া কলিং' গ্রন্থের লেখিকা কর্নেলিয়া সোরাবজি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। নিবেদিতা বললেন, কর্নেলিয়া আমাকে ও ক্রিস্টিনকে তার ঝুলি-সংগ্রহে যোগ করতে চায়। 'দি স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' প্রথম স্টেটস্‌ম্যানে বেরোয়, আমার অনুরোধে লেখা হয়, সাধারণ স্পেস-রেট পান। মডার্ন রিভিউ-এর সূচনা থেকে প্রচুর লিখেছেন। আমার শিশু ব্যাপটাইজড্ হয়নি বলে ওঁর বিশেষ দুঃখ ছিল। লেডি ইসাবেল মার্জেসন নিবেদিতার বিশেষ বন্ধু, সিসেমি ক্লাবে সক্রিয়। অ্যাপারসনও সিসেমিতে ছিলেন। ডাঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কলকাতা সিটি কলেজের বৃদ্ধ অধ্যক্ষ, নিবেদিতার বিশেষ বন্ধু। ফ্রেডরিক হ্যারিসনকে জানতেন। উনি বহু বৎসর বেঁচেছিলেন, নিবেদিতার প্রতি খুবই সদয়। তখন ভারতবর্ষ[এখনকার তুলনায়] খুবই মুক্ত দেশ। গোয়েন্দা-ব্যবস্থা অপ্রচুর। ৭ বৎসরে কার্জন মাত্র দুটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। বোস ইনস্টিটিউটের প্রবেশপথে নিবেদিতার একটি আবক্ষ মূর্তি আছে। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে অখণ্ড জীবনোদ্দেশ্য দান করেছিলেন। নিবেদিতার মধ্যে গভীর ভাবভক্তির দিক

ছিল, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সহানুভূতি। বিবেকানন্দ তাঁকে বিরাট নূতন সুসংগঠিত এক পৃথিবীর সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আর খ্রীস্টীয় ভাবজগৎকে [মনের মধ্যে] ফিরে পাননি, তবে ভার্জিন মেরীর কথা সর্বদাই বলতেন।

২৮-৯-১৯৩৭ : আমাকে নিয়ে নিবেদিতা বৃটিশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কেয়ার হার্ডির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কেয়ার হার্ডি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহী। এক শনিবার অপরাহ্নে উইলফ্রেড ব্লান্টের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ব্লান্ট কবি এবং মিশর থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণ অপসারণের পক্ষে আন্দোলনকারী। 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা আমি কখনো-কখনো সম্পাদনা করেছি। এটি [ভারতের] কংগ্রেস-দলের মুখপত্র। নিবেদিতা এর সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। ১৯০৮, মে কি জুন মাসে নিবেদিতা ভারত সম্বন্ধে অক্সফোর্ড ফেবিয়ান সোসাইটিতে বলেছেন। সভারভিল কলেজে বক্তৃতাটি হয়েছিল। ভালো বক্তৃতা, সভাপতি আমি। মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে নিবেদিতা তখন অক্সফোর্ডে ছিলেন। পরদিন তিনি আর একটি কলেজে ছাত্রদের সভায় বলেন। আমাকে নিবেদিতা এশিয়া কাগজ সম্পাদনা করা থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি এই কাগজে কদাপি লেখেন নি। উইলফ্রেড ব্লান্টের সঙ্গে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত ইজিপ্ট-ডায়েরী বিষয়ে কথা বলেন। নিবেদিতা প্রচুর আনন্দের সঙ্গে তার প্রতিটি লাইন পড়েছিলেন। ইংলণ্ডের কর্তৃমহলের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে নিবেদিতা সাক্ষাৎ করেন স্যাণ্ডউইচ্‌দের মাধ্যমে। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মায়ের গভীর সহমর্মিতা ছিল না ; মা তাঁর ব্রিলিয়াণ্ট কন্যাকে সম্ভ্রম সমাদর করতেন কিন্তু তিনি নিজে এক পাদরীর সাদামাঠা পত্নী ছাড়া কিছু নন। নিবেদিতার স্কুলের সাহায্যার্থে (১৯০৮ সালে ?) মিসেস লেগেট তাঁর বেণ্টন স্ট্রীটের ড্রইংরুমে কনসার্টের ব্যবস্থা করেন, তাতে মাদাম কালভে গান গেয়েছিলেন। ক্রিস্টিন আপাদমস্তক ন্যাশন্যালিস্ট, নিজেকে এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট বলতেন। তরুণরা তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলত। তিনি অনেক জিনিস জানতেন, যা নিবেদিতাও জানতেন না। ক্রিস্টিন কথা কম বলতেন, সবসময়ে উজ্জ্বল, মাঝেমাঝে মজার মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেন, মডারেটদের সম্বন্ধে কোনো ধৈর্য ছিল না ; তবে ব্যক্তিগতভাবে গোখলেকে পছন্দ করতেন। নিবেদিতা সোসিওলজিক্যাল রিভিউ-এর জন্য 'থিংস্ দ্যাট্ আর এক্‌স্‌পেকটেড্ ফ্রম সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'ফার্স্ট ইউনিভার্সাল রেসেস্ কংগ্রেস' হয় জুলাই ১৯১১-তে—তার জন্য একটি পেপার দিয়েছিলেন, বোধহয় সেটি লেখেন ভারতে ফেরার পথে জাহাজে। ঐ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে ; নিবেদিতা সাক্ষাতে যোগদান করেন নি। ১৯০৭ সালে তিনি জার্মানীর মধ্য দিয়ে যান ; অনুভব করেন যুদ্ধ আসছে ; তিনি বলেন 'ঐ সভ্যতা তোমাদের সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করবে ও ধ্বংস করবে।' বোস তাঁর [উইলের] অন্যতম একজিকিউটর। বোস, নিবেদিতার 'মিথস্ অব দি হিন্দুজ্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস্' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন ; টাকাও পেতে চান (হ্যারাপের কাছ থেকে নগদ ৫০ পাউণ্ড)। নিবেদিতা কুমারস্বামী সম্বন্ধে গোড়ায় আকৃষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে তাঁর নৈতিকতার বিষয়ে কঠোর আপত্তি জানান। আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রচণ্ড শ্রদ্ধা।

অক্টোবর, ১৯৩৭ : মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার বিচিত্র আচরণ ; মায়ের সম্বন্ধে অধৈর্য হতেন কিন্তু সর্বদাই 'উত্তম খ্রীস্টান আচরণ' বজায় রেখেছিলেন। ভাইয়ের সম্বন্ধে নিবেদিতার আগ্রহ ছিল, তাকে পুত্রের মতো দেখতেন। কোনো লোকের সঙ্গে কথাবার্তার পরে নিবেদিতা যদি মনে করতেন বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তাহলে তাকে তিনি চিঠি লিখতেন সব জানিয়ে। ওয়েলস্-এর লোকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গোঁড়া মনোভাব ; ওদের দাস মনোভাবসম্পন্ন ও চক্রান্তকারী মনে করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্র ও নির্মম, খ্যাপাদের সম্বন্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা। নির্বিকারভাবে যে-কোনো খাবার খেতে রাজি। তাঁর বিভিন্ন বন্ধুগোষ্ঠী ছিল—তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য একেবারেই ব্যস্ত ছিলেন না। রমেশ দত্ত—অর্থনৈতিক গ্রন্থকার, সিভিল সার্ভেণ্ট—প্রমোশন না পাওয়ায় অবসর নেন ; পরে হন বরোদার প্রধানমন্ত্রী—এঁর সম্বন্ধে নিবেদিতার অত্যন্ত অনুরাগ। ইনি মস্ত পণ্ডিত, আকর্ষক ব্যক্তিত্ব, দীর্ঘকাল লণ্ডনে ভারতীয় সমাজের প্রধান পুরুষ। নিবেদিতা এঁর গ্রন্থের তথ্য ব্যবহার করতেন, উদ্ধৃতি দিতেন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করতেন : 'ইংরেজ এমনভাবে খায় যাতে সে আবার খেতে পারে : আর ভারতীয়রা একেবারে জন্মশোধের খাওয়া খেয়ে নেয়।' মতিলাল ঘোষ ও তাঁর ভাই শিশির ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। মতিলাল প্রায়ই বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার কাছে আসতেন, তবে প্রাতরাশের সময়ে নয়, কারণ নিজের বাড়ির বাইরে

খেতেন না। লোকটি ঝঞ্ঝাট পাকাতে ওস্তাদ, কাউকে বিশ্বাস করতেন না ; কংগ্রেসকে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়েছেন। নিবেদিতা ওঁকে খুবই পছন্দ করতেন। উনি এবং ওঁর ভাই নামী বৈষ্ণব, সে-হিসাবে নিবেদিতার শৈব পরিমণ্ডলীর বহির্বর্তী, হয়ত সেই কারণেই ওঁদের সম্বন্ধে নিবেদিতার আকর্ষণ। নিবেদিতা বৈষ্ণব প্রফেট চৈতন্য সম্বন্ধে বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতেন, তবে শৈবদের সঙ্গে বেদান্ত বিষয়েই আলোচনা করতেন। ধর্ম বিষয়ে কথা বলার সময়ে আমার কাছে মতামত চাওয়ার কোনো অভিপ্রায়ই দেখাতেন না। চরম সত্য জানাবার সময়ে বিবেকানন্দের উক্তি নির্বিচারে উদ্ধৃত করতেন, কারণ সেই শেষ কথা।

॥ ২ ॥ র‍্যাটক্লিফের চিন্তা ও কর্মজীবনে নিবেদিতার প্রভাব : স্টেটসম্যান পত্রিকায় নিবেদিতার রচনা

নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই র‍্যাটক্লিফ যে, নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি আগেই দেখেছি। আর নিবেদিতা, যা তাঁর জীবনের স্বয়ং-স্বীকৃত কর্তব্য, এ ক্ষেত্রে সেটি অবশ্যই সম্পাদন করেন—ভারতবর্ষকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন র‍্যাটক্লিফের মধ্যে। র‍্যাটক্লিফের বুদ্ধি ও রচনাক্ষমতা কতখানি, তা অবিলম্বে বুঝেছিলেন, সেইসঙ্গে প্রভাবশালী একটি ইংরেজি কাগজের প্রধান সম্পাদকীয় লেখকের দ্বারা যে ভারতের বহু স্বার্থসিদ্ধি করা যাবে, তাও ধরে নিয়েছিলেন। র‍্যাটক্লিফকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে নিবেদিতার সাফল্য স্বদেশী আন্দোলনের বহু উপকার করেছিল। স্টেটসম্যানের সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণের ফলে দেশে-বিদেশে ঐ আন্দোলনের বিষয়ে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উভয়ের পরিচয়ের কয়েকমাস পরেই নিবেদিতাকে শিক্ষাদাত্রীর ভূমিকায় দেখতে পাই। র‍্যাটক্লিফকে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০২, লিখেছেন :

"জীবনের শিক্ষা তুমি নেবে সুতীব্র সহনের মধ্য দিয়ে ; তার যন্ত্রণা সইবে যাদের ভালোবাসো তাদের জন্য। তার দ্বারা অর্জিত ফল অগ্নিদগ্ধ হয়ে তোমার চরিত্রে প্রবেশ ক'রে যাবে, ফলে শেষে তুমি এমন বৃহৎ মানুষ হয়ে দাঁড়াবে যা তোমার কল্পনাতেও আসেনি।"

নিবেদিতা যখন এই ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন, তখনো র‍্যাটক্লিফ ভারতপ্রেমিক নন, অথচ নিবেদিতা ভারতবর্ষকেই র‍্যাটক্লিফের ভালবাসার বস্তু করতে চেয়েছিলেন। তাই লিখেছেন :

"কিন্তু তুমি এখনো নিজেকে ভারতবর্ষের জন্য প্রস্তুত করে তোলোনি। ভারত তোমাকে অন্য কিছু একটার জন্য নির্মাণ করবে। কী সেটা, আমি জানি না। তবে তা তোমাতে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে।"

এর অল্পদিনের মধ্যে নিবেদিতা সানন্দে লিখেছেন : "আজ সকালে মিঃ র‍্যাটক্লিফ বাইসাইকেলে করে এসেছিলেন ; আমাদের সকলের সঙ্গে মেঝেয় বসেছিলেন।" [২৬-১১-১৯০২]। একই চিঠিতে লিখেছেন : "মিঃ র‍্যাটক্লিফের ফিয়াসে আসছেন ; দরবারে [অর্থাৎ দিল্লীর দরবার-কালে দিল্লীতে] তাঁদের হনিমুন ; দরবার সম্বন্ধে এইটাই একমাত্র উত্তম জিনিস।"

১৯০২ ডিসেম্বর মাসে র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে কে এম জিভস্‌-এর বিয়ে হয়। মিসেস র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী হয়ে দাঁড়ান। ইনি লেখিকা, 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় নিবেদিতার 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম' গ্রন্থের আলোচনা করতে এঁকে দেখেছি। রাজনৈতিক বিষয়েও ইনি বিশ্বাসভাজন ; নিবেদিতা অনেক সময়ে ঘোরতর রাজনৈতিক পত্র ইনি ও এঁর স্বামী উভয়কে একত্রে সম্বোধন করে লিখেছেন।

র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্ব রাজনৈতিক সহযোগিতায় পৌঁছয়। স্টেটসম্যানের সম্পাদক হিসাবে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার পরামর্শে বহুভাবে চালিত হন। নিবেদিতা যে, স্টেটসম্যানে সম্পাদকীয় লিখতেন তা র‍্যাটক্লিফের উক্তিতে আগেই জেনেছি। ১৯০৪ সালের গোড়ায় (২২-২-১৯০৪) নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে প্রাণচেতনায় স্পন্দিত একটি পত্র লেখেন, যার মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত র‍্যাটক্লিফকে তিনি সুনিবিড় বাণীস্পর্শ দান করেছিলেন। কোনো কারণে মনে হয়, চাকরি ছেড়ে র‍্যাটক্লিফের চলে যাওয়ার কথা

উঠেছিল, যা অবশ্য স্থগিত হয়। নিবেদিতা লেখেন : "হাঁ, তাহলে তুমি থাকছ। শেষপর্যন্ত যদি সত্যই থাকো, তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হব। এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমাদের ছোট্ট গোষ্ঠীটির অঙ্গাঙ্গি অংশ হয়ে গিয়েছ। যদি তোমাকে সত্যই অগত্যা চলে যেতে হয়, তাহলে বুঝব যে, তুমি অধিক দূরত্বে থেকে আমাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করছ।" "তুমি আমার কাছে সহানুভূতি চাও বলেছ। অনুভব করো, তা সম্পূর্ণত তোমার জন্য রয়েছে। দানের অর্থ কি, তা তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। মুক্তদান—মুক্তগ্রহণ। মনে রেখো, যে-পরিমাণে তুমি দিতে দেবে, সেই পরিমাণে আমি কৃতজ্ঞ হব। কারণ, সহযোগিত্বের অর্পণ, কঠিন ভূমিতে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম, ভালবাসার নির্ভয় দান—এই-তো সকলের অনন্ত প্রয়োজন—নয় কি?"

নিবেদিতা তাঁর কাছে রক্ষিত স্বামীজীর এই ধ্রুববাণী র‍্যাটক্লিফকে দান করতে চেয়েছিলেন :

"আমরা আমাদের স্মৃতিতে বিরাট একটি গস্‌পেল বহন করছি ; পুরাতন ডায়েরী ও চিঠিপত্রে তা বিক্ষিপ্তভাবে লেখা আছে। যদি আজ এই সকালে তার থেকে কিছু উদ্ধৃত করি তাহলে তাকে আমার ব্যক্তিগত মেসেজ বলেই গ্রহণ করো। তুমি অরণ্যে উচ্চারিত আর কোনো কণ্ঠস্বরে ধরা দিও না।...'যে-জীবন তুমি যাপন করেছ, ধনী বা দরিদ্রের মধ্যে, বিজ্ঞ বা অজ্ঞের মধ্যে—সে-জীবন যখন বিচারের সম্মুখীন হবে এবং হৃদয় ও মনের মধ্যে সংঘাত বাধবে—তখন হৃদয়কে অনুসরণ করো। ভুল করতেই পারো, তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। ভ্রান্তি ছাড়া অগ্রগতি নেই। মন যদি হৃদয়ের স্থানপূরণ করতে পারে, উত্তম, নচেৎ হৃদয়কে পথ দেখাতে দাও। সে হল নদী। খালপথে তাকে চালিত করতে পারো, সেতুপথে তা পার হতে পারো, কিন্তু নদীই গুরুত্বপূর্ণ। সে সকলই বহন করে, সকলই নির্মাণ করে—তাই হল বস্তুর প্রাণ'।"

নিবেদিতা যোগ করেছিলেন :

"আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব যদি ভারতবর্ষ আমাকে যেভাবে অনুভব করিয়েছে তোমাকেও সেইভাবেই অনুভব করাতে পারে : নিজ প্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখতেই হবে, আমাদের মধ্যে নিজস্ব বস্তু যা আছে তা আমাদের দুর্বলতা নয়, পরন্তু শক্তি।"

নিবেদিতা এইসময়ে স্টেটসম্যানে কেবল নিয়মিত লেখেন নি, স্টেটসম্যানের ব্যাপারে র‍্যাটক্লিফকে পরামর্শও দিতেন। নিবেদিতা একটি চিঠিতে [তারিখহীন, তবে ১৯০৩ সালে লেখা বলেই মনে হয়] বুদ্ধগয়া-মন্দির প্রশ্নে একটি দীর্ঘ বিবরণ দান করার পরে লেখেন, "এটি নোটমাত্র, প্রবন্ধ নয়—পরিশ্রান্ত দিনের শেষে দ্রুত লিখিত। দয়া ক'রে মানিয়ে নিও, সমালোচনা করো না যেন।" পত্রের সূচনায় লেখেন, "দয়া করে জনসাধারণকে [বুদ্ধগয়া] মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা জ্ঞান দিও। মন্দিরটির ইতিহাস এই—।"[১] অর্থাৎ নিবেদিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

১ বুদ্ধগয়া মন্দির শৈব মোহন্তের কর্তৃত্বাধীন ছিল, এবং তা হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্বশ্রেণীর মানুষের অবাধ ধর্মাচরণের ক্ষেত্র ছিল। সিংহলী বৌদ্ধ অনাগারিক ধর্মপাল মন্দিরটির উপরে বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জন্য সচেষ্ট হয়ে সংঘর্ষ বাধান, যা বহু বৎসরের মামলা-মোকর্দমার কারণ হয়। নিবেদিতা বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা মনে করতেন (স্বামীজীর তাই মত ছিল), এবং বুদ্ধগয়াকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থানরূপে গণ্য করতেন, তাই ধর্মপালের চেষ্টা তাঁর কাছে বিশেষ ক্ষতিকর মনে হয়েছিল, সেজন্য বক্তৃতায় ও রচনায় তার প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। শৈব মোহন্তের অধিকার কেড়ে নিয়ে ধর্মপালের হাতে কর্তৃত্ব দেবার জন্য কার্জনের মতলব তিনি গোপন নথি থেকে ফাঁস করে দেন। [এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি 'সমকালীন' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (২৪৫-৭১)] উল্লিখিত পত্রের শেষে, বুদ্ধ কিভাবে ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে মহান আচার্যরূপে স্বীকৃত, সেকথা বলার পরে, নিবেদিতা লেখেন : "এই সকল গণ্ডগোল পাকিয়েছেন ঐ পাজি গোঁড়া ধর্মপাল—বুদ্ধদেবের গৌরব বাড়াবার ভ্রান্ত ধারণায় চালিত লোকটি। এর মূলে তার ইতিহাসজ্ঞানের অভাব এবং ধর্মধারণায় সংকীর্ণতা। নিতান্ত নিরেট ব্যাপটিস্টরা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি'র পুরো কর্তৃত্ব কব্জা করতে চাইলে যা দাঁড়ায়, এখানেও তাই হচ্ছে।" একই চিঠিতে নিবেদিতা কিছু কূট রাজনৈতিক পরামর্শও দিয়েছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য-সংরক্ষণে অভিযুক্ত ইংরেজ শাসকগণ কোন্ ভাষা বোঝে তা তিনি জানতেন। র‍্যাটক্লিফকে লেখেন : "এই সকল [ঐতিহাসিক তথ্য] ছাড়াও তুমি তোমার তীক্ষ্ণ কিন্তু যেন অসচেতন ভঙ্গিতে একটি প্যারাগ্রাফ লিখো, যাতে বলবে : 'ভারতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের জন্য উদ্‌গ্রীব ; কিন্তু সরকার নিশ্চয় সাধারণভাবে বৌদ্ধদের কিংবা কোনো বিশেষ বৌদ্ধ জাতিকে, ভারতে স্বাধীন স্থান দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করবেন না। এক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ ও সরকারের স্বার্থ সমরূপ।' এই মন্তব্য বক্র বলে অধিক শান্তিপূর্ণ, আর এইসব ব্যাপারে ইঙ্গিতই যথেষ্ট।"

সরবরাহ ক'রে, কিভাবে বিষয়টি উপস্থিত করতে হবে, তার নির্দেশ দিলেন। এই ধরনের কাজ করতে নিবেদিতা অভ্যস্ত ছিলেন।

র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার পরামর্শকে বহুমান দিতেন। কিভাবে নিবেদিতার কাছে প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পাঠাতেন, তা নিবেদিতাকে লেখা তাঁর ২৬ অগস্ট, ১৯০৫, চিঠি থেকে বোঝা যায়।[১০] র‍্যাটক্লিফ ভারত ছেড়ে যাবার দীর্ঘদিন পরেও, ২৬ এপ্রিল, ১৯১১ তারিখে তাঁকে নিবেদিতা লিখেছেন :

"সংলগ্ন নোটটি কি তুমি ব্যবহার করতে পারো ? যদি কোনো কারণে মনে করো এটি ভালো হয়নি, তাহলে একই বিষয়ে কি তুমি নিজেই লিখবে, এবং তার দ্বারা আলোচনা আহ্বান করবে ? শিরোনামা বদল করে এইরকম করতে পারো—'প্রাকটিক্যাল থিংস্ ওয়ান হ্যাড একস্‌পেকটেড',—বা তোমার ইচ্ছামতো কিছু। কিন্তু লেখাটির কোনো উত্তর এসেছে কিনা তা অনুগ্রহ ক'রে অবশ্যই জানাবে।"

[ভারত বিষয়ে বিদেশের পত্রিকায় লেখার বিষয়ে নিবেদিতা কি প্রকার নির্দেশ দিয়েছেন, কিছু পরে দেখব]।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতার প্রভাবে স্টেটসম্যানে ভারতীয় জাতীয়তার অনুপ্রবেশ : স্টেটসম্যানের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ : স্টেটসম্যান-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে র‍্যাটক্লিফের মতভেদ ও তাঁর পদত্যাগ : ভারতীয় কাগজে র‍্যাটক্লিফের জন্য নিবেদিতার চাকুরি-সন্ধান

নিবেদিতার প্রভাবে র‍্যাটক্লিফ ১৯০৪-০৬ পর্বে স্টেটসম্যানকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি এতই সহানুভূতি-সম্পন্ন করে তুলেছিলেন, যে, ব্যাপারটা শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে রীতিমতো অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। স্টেটসম্যান খাঁটি ইংরাজের কাগজ, ইংরাজ ও ইঙ্গ-ভারতীয় মহলে তার সহজ প্রবেশ—সেই কাগজে যখন সংযত দৃঢ়ভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ সম্পাদকীয় ও সংবাদ বেরুতে লাগল তখন তা স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে দাঁড়াল। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যের প্রমাণরূপে বারে বারে ইংরাজদের কাগজ স্টেটসম্যান থেকে সংবাদ ও মন্তব্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি সম্ভবত জানতেন না যে, (অন্তত তার উল্লেখ করেন নি) স্টেটসম্যান ঐ ধরনের কাজ করেছিল নিবেদিতার প্ররোচনায় ও র‍্যাটক্লিফের চেষ্টায়। র‍্যাটক্লিফের সাহায্যের গুরুত্ব বিষয়ে নিবেদিতা ১৪ জুন ১৯০৬ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"র‍্যাটক্লিফ ভারত সম্বন্ধে একেবারে দিব্য ভূমিকায়। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সে স্টেটসম্যানের সম্পাদকরূপে প্রভূত সাহায্য করেছে।"

নিবেদিতার দ্বারা চালিত র‍্যাটক্লিফের এইপ্রকার ভারতের জাতীয় আন্দোলন সমর্থন-নীতিকে স্থায়ীভাবে সহ্য করা স্টেটসম্যান-মালিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে তার প্রতি স্টেটসম্যানের এই সহানুভূতি বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের পক্ষে অবশ্যই বিপজ্জনক। সুতরাং মালিকদের সঙ্গে র‍্যাটক্লিফের সংঘাত বাধল। র‍্যাটক্লিফ লিজেল রেমঁকে সাক্ষাৎকার-কালে (২৮-৯-১৯৩৭) বলেছেন, তিনি ১৯০৬ সালে ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডে যান—ফিরেও আসেন। নিবেদিতা তাঁকে বলেছিলেন—"আমি তোমাকে না ফিরতে বলার জন্য মনে বিশেষ তাগিদ বোধ করেছিলাম।" তার কারণও র‍্যাটক্লিফ বলেছেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের কালে স্টেটসম্যান-কর্তৃপক্ষ আর র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে একমত হবেন না।

নিবেদিতা একই কারণে চেয়েছিলেন ইংলণ্ডে প্রভাবশালী মহলে র‍্যাটক্লিফ নিজের স্থান করে

১০ *Letters of Sister Nivedita*, Vol. II, 777.

নিন। র‍্যাটক্লিফ ইংলণ্ডে যাচ্ছেন, এই সংবাদ দিয়ে ১৪ জুন, ১৯০৬, মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লেখেন : "র‍্যাটক্লিফদের জুলাই মাসে তুমি কিছুটা হস্তগত করবে, তোমার সঙ্গে তাদের পরিচিত হতে দেবে, এবং অ্যালিস্ বার্কটন, মিস ফ্র্যাঙ্কস্, ফ্রেডরিখ হ্যারিসন-দম্পতি, ও তোমার জানা পজিটিভিস্টদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে—এটা কি আমি আশা করতে পারি ?" একইজনকে কাছাকাছি সময়ে আর একটি চিঠিতে লেখেন :

"আমি বিশেষ আনন্দিত হব যদি তুমি র‍্যাটক্লিফদের সঙ্গে মিঃ গেডেস ও পজিটিভিস্টদের পরিচয় করিয়ে দাও। তুমি জানো না—এই বৎসরগুলিতে স্টেটসম্যানের সম্পাদকরূপে সে ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে কতখানি কাজ করেছে, এবং সে কতখানি বিশ্বস্ত ও সশ্রদ্ধ বন্ধু।"

এই পর্বে ভারতে ফেরার পরে র‍্যাটক্লিফকে স্টেটসম্যানের কর্তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কী পরিমাণে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, নিবেদিতা তা বুঝেছিলেন। তাই ১১ অক্টোবর ১৯০৬, তিনি এক আদর্শবাদীকে অন্য আদর্শবাদীর এই বার্তা পাঠান :

"তুমি কোথায় ফিরছ, সে সম্বন্ধে কী বলি বলো ? বলতে শঙ্কা হচ্ছে, তবু বলি, ও-বিষয়ে জানার উত্তম উপায় হুইটম্যানের 'মুক্ত পথের সঙ্গীত' খুলে বসা—ঐ শব্দগুলি—'শোনো, আমি সৎ হব তোমার সঙ্গে।' হে আমার হতভাগ্য বন্ধু ! এই হল ন্যায়-প্রেমিক সকল মানুষের ভবিষ্যৎ ! কিন্তু তবু, ঐসব মানুষের এমনই দুর্ভেদ্য প্রকৃতি যে, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সঙ্গী হয়ে সে দুঃখ পেতে চায়—তার বিপরীতকে বরণ ক'রে সুখী হতে চায় না। ঐ [দুঃখ-পথ] নির্বাচনের অসামর্থ্য কি [মানবজীবনের ক্ষেত্রে] সর্বাধিক ক্ষতি নয় ?

"আর নয়, থামছি। কেবল স্মরণ রেখো, তোমরা ফিরছ ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও সমর্থনের একটি জগতে—যদিও সে প্রাপ্তি তোমাদের প্রাপ্যের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র।"

র‍্যাটক্লিফ ফিরলেন কিন্তু বেশিদিন স্টেটসম্যানে টিকতে পারলেন না। তাঁর অবস্থা এমনই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, গোখলে প্রভৃতির কাছে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফের জন্য চাকরি সন্ধানের অনুরোধ করেছিলেন।

র‍্যাটক্লিফ নিজে কেবল অসহনীয় অবস্থায় পড়েন নি, স্টেটসম্যান-কর্তাদের কাছে নিজেকে অসহনীয় ক'রেও তোলেন। ন্যায়রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে এই সংবাদপত্রকে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামান, যা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, এবং প্রতিক্ষেত্রে জয়লাভ ক'রে স্টেটসম্যানকে তিনি মারাত্মক গৌরব ও ইংরাজ প্রশাসনকে সুনিশ্চিত অগৌরব দান করেছিলেন। দু'একটি তথ্য দেওয়া যায়।

প্রথম তথ্য আগেই উপস্থিত করেছি—কার্জন-অধ্যায়ে। কার্জনের উদ্ধত কনভোকেশন ভাষণকে কিভাবে নিবেদিতা ধূলিশায়ী করেন, এবং স্টেটসম্যানে র‍্যাটক্লিফ কিভাবে তার সমর্থন করেন—তা জেনেছি। অমৃতবাজারের পূর্বোক্ত উদ্‌ঘাটনকে স্টেটসম্যান উদ্ধৃত ক'রে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল—এটা আমলাতন্ত্রের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের সর্বোচ্চ প্রতিভূ ভাইসরয়, তাঁর প্রেসটিজ্‌কে একটি সাহেবী কাগজ ছিন্নভিন্ন করল—এই ব্যাপারটি নিশ্চয় শাসককুলের বড় অংশের কাছে দেশদ্রোহিতা ! সুতরাং স্টেটসম্যান ও তার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে শায়েস্তা করার সুযোগ আমলাতন্ত্র খুঁজছিলই।

সুযোগ এসে গেল। ৭ জানুয়ারি, ১৯০৬, স্টেটসম্যানে কার্জনের একটি 'নোট' ছাপা হয়, যার মধ্যে সম্বলপুর জেলার আদালতের ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কার্জনের মন্তব্য উদ্ধৃত ছিল।

এটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সরকার স্টেটসম্যানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—ঐ নোটটি 'গোপন চরিত্রের', এবং 'অসাধুভাবে' তা সংগ্রহ করা হয়েছে—এই অভিযোগে। অবিলম্বে স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করল। সরকারের সে কাজ এমনই গর্হিত, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে তা এমন স্থূল হস্তক্ষেপ যে, দেশী বিদেশী সকল সংবাদপত্রই সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। ৩০ জানুয়ারি, ৩১ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের স্টেটসম্যানে সংকলিত হল অন্যান্য সংবাদপত্রের মন্তব্য—যাদের মধ্যে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্দয় নিন্দা ছিল। সংকলিত হয়েছিল টাইমস অব ইণ্ডিয়া, পায়োনীয়ার, ইংলিশম্যান, বম্বে গেজেট, অ্যাডভোকেট অব ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল, মাদ্রাজ স্টাণ্ডার্ড, রেঙ্গুন গেজেট, রেঙ্গুন টাইমস, সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট, ইণ্ডিয়ান মিরার, অমৃতবাজার, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান ডেইলি টেলিগ্রাফ, ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট, ইন্দুপ্রকাশ, বেঙ্গলী, হিন্দু প্রভৃতি সংবাদপত্রের মন্তব্য। এই দীর্ঘ তালিকা দেখিয়ে দেয়, ভারতবর্ষের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয়, কোনো কাগজই এই সরকারী কাজের নিন্দায় পিছিয়ে ছিল না। অমৃতবাজার বলেছিল : "প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো সংবাদপত্র একটি নির্দোষ ডকুমেণ্ট প্রকাশ করেছে বলে সরকার এইপ্রকার দানবিকভাবে তার ক্ষতি করতে পারে? যদি পারে তাহলে বুঝতে হবে—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অদৃশ্য। সরকারের আক্রোশের রূপ কল্পনা করুন : সরকার স্টেটসম্যানের প্রতিনিধিকে প্রেস-রুম ও সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করতে দেবে না; ঐ কাগজে সরকার তার সরকারী তথ্য ও প্রকাশনগুলি পাঠাবে না; ...ঐ কাগজে সকল প্রকার সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ থাকবে। শুধু তাই নয়, সরকার তার পন্থানুসরণ করতে বলেছে—বিচার বিভাগের দপ্তরগুলিকে ও জনসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকেও।"

অত্যন্ত বিদ্রূপভরা মন্তব্য "ম্যাক্স"-এর "ক্যাপিটালে"। লেখা হয়েছিল : কার্জনের উক্ত প্রেমপত্রটি অবশ্যই গোপন—প্রেমপত্র তেমন হয়েই থাকে। তবে একথাও তো সত্য, সময় পেরিয়ে গেলে প্রেমপত্রের তাপ কমে যায়—আহা, কার্জনের প্রেমপত্রের ক্ষেত্রে বুঝি তা হয়নি। "মিঃ রিস্‌লে স্টেটসম্যানকে 'সাংবাদিক-ঔচিত্যের চূড়ান্ত লঙ্ঘনের' অভিযোগে দোষী করেছেন, কেননা সে উল্লিখিত প্রেমপত্রটি প্রকাশ করেছে। মিঃ রিস্‌লে ঐ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পাদকের কোনো কৈফিয়ত শুনতে রাজি হন নি। এবং তিনি ফরিয়াদীর ভূমিকার সঙ্গে বিচারকের ভূমিকাটা জুড়ে নিয়ে স্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বসেছেন—এমন একটি অপরাধে, যার কথা আইনের জগতে কুত্রাপি শোনা যায়নি।" এই সঙ্গে স্টেটসম্যান ও র‍্যাটক্লিফের সম্বন্ধে এই কথাগুলি লেখা হল :

"The Statesman has always been ably conducted, and its tone as a first class liberal paper has always been of a high order. Its persent editor Mr. Ratcliffe, was specially selected by the Government for a Fellowship of the Calcutta University, and there is no journalist more careful than he is, while fearless and outspoken in honest criticism, to keep within the four corners of journalistic propriety and fair play." [Quoted in the *Statesman*, Feb. 2, 1906]

সর্বদিকে প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে সরকারকে গুটিয়ে যেতে হল। অপমান হজম করে আপস করতে হল তাকে। ৩ ফেব্রুয়ারির স্টেটসম্যানে সংবাদ বেরুল সরকার 'বয়কট' প্রত্যাহার করেছে। ভারত সরকারের সেক্রেটারী এইচ এইচ রিস্‌লে স্টেটসম্যানের সম্পাদককে যে-চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি এবং সম্পাদকের ব্যাখ্যাত্মক চিঠিও বেরুল। দেখা গেল, ভদ্রতাবিনিময়ের ক্ষেত্রে যেমন মানুষ একটু মাথা ঝোঁকায়, সম্পাদক তাই করেছেন, কিন্তু মাথা নামাতে হয়েছে সরকারকেই।

র‍্যাটক্লিফ তাঁর বয়ানের শেষাংশে বলেন : "আমরা আমাদের পূর্বতন মতকে বজায় রাখছি—লর্ড কার্জনের নোটটি প্রকাশ করা সাংবাদিক ঔচিত্যের লঙ্ঘন নয়। কিন্তু ভারত সরকার এই নোটটির প্রকাশে স্বাভাবিকভাবে যে-দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন তদনুযায়ী—এর প্রকাশ বিবেচনাসম্মত হয়নি।" র‍্যাটক্লিফ তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয় রচনায় ভারতের সাহেবী কাগজগুলিকে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানালেন—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁদের দৃপ্ত মত ঘোষণার জন্য :

"ভারতের প্রায় সকল সংবাদপত্রে উক্ত বিবাদ সম্পর্কে যে-মত প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি দিক সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি।...গত সপ্তাহে ভারতের সংবাদপত্রসমূহ তাঁদের রায় দিয়ে দিয়েছেন।...ভারত সরকারের প্রশাসনিক ব্যাবস্থাটিকে টাইমস অব ইণ্ডিয়া চিহ্নিত করেছে এই বলে : 'ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে মারাত্মক দরজা খুলে গেল।' পায়োনীয়ারের মতে—সরকারী ব্যবস্থা 'আইন-মান্যকারী সংবাদপত্রের উপর হুমকি।' দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ঐ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের সঙ্গে ঐকমত প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার তাৎপর্য যে-প্রকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপলব্ধ হয়েছে, সরকারের কার্যকে যে-প্রকার প্রায় সর্বসম্মতভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, তা ভারতের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রায়শ-শ্রুত অভিযোগর চূড়ান্ত খণ্ডন—অভিযোগ ছিল, ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতা রক্ষায় ও ঐক্যরক্ষায় যে-গর্বের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে আছে, তা কিছু পরিমাণে ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। ভারতীয় সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বর্তমান ক্ষেত্রের অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেনি—যেখানে দেখা গেছে, সুখজনকভাবে সদ্যসমাপ্ত ঘটনাটির সূত্রে ইংরাজ ও ভারতীয় সহযোগীগণ সংবাদপত্রের অধিকাররক্ষায় প্রচুর সংখ্যায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন।"

সরকারের সঙ্গে স্টেটসম্যানের আপস মীমাংসার পরে টাইমস অব ইণ্ডিয়া দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখল (স্টেটসম্যানে ৬ ফেব্রুয়ারি উৎকলিত), যার শেষে এই মনোরম কথাগুলি ছিল : "ভারত সরকার নিজেকে সমর্থনের অযোগ্য যে-অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিলেন সেখান থেকে তাঁদের উঠে আসার সুযোগ দিয়ে স্টেটসম্যানের পরিচালকগণ সবিশেষ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারও সেই সুযোগকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে বিজ্ঞতা দেখিয়েছেন।"

এই ঘটনার পরে র‍্যাটক্লিফ ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডে যান। তাঁর জয় হয়েছিল—কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী এক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ধারাবাহিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা করা সত্যই সম্ভব ছিল না। সরকারের তরফে স্টেটসম্যান-কর্তৃপক্ষের উপরে চাপ ক্রমে কঠিনতর হচ্ছিল। আর মালিকরাও তাঁদের উদারনৈতিকতার অভিপ্রায়কে অবশ্যই সাম্রাজ্যস্বার্থকে ধরাশায়ী করার অভিপ্রায় করে তুলতে রাজি ছিলেন না। নিবেদিতা তা জানতেন। সেজন্য র‍্যাটক্লিফ ভারতে ফিরলে নিবেদিতা পূর্বোক্ত আদর্শরসায়নের বাক্যগুলি দান করেছিলেন।

স্টেটসম্যানের উপর সরকারী আক্রমণ আবার এল—এবার কিছু ঘুরপথে। কলকাতা পুলিশ বিভাগের ছয় ব্যক্তি যৌথভাবে স্টেটসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ, ও বেঙ্গলীর বিরুদ্ধে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে মানহানির মামলা জুড়ে দিল। বিস্ময়কর অভিযোগ। মানহানির মামলা ব্যক্তিবিশেষ করতে পারেন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিমূলক কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলে যদি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মানহানির মামলা করতে শুরু করেন তাহলে ঐ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার উপায় থাকবে না। ২২ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে মিঃ জাস্টিস চিট্টি ঐ অভিযোগ নাকচ করে দেন। ২৩

এপ্রিল স্টেটসম্যানে সংবাদ বেরোয় :

POLICE LIBEL ACTION CASE
AGAINST THE STATESMAN WITHDRAWN
JOINT SUIT DECLARED ILLEGAL.
PLAINT TO BE AMENDED.

একই তারিখে স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়তে বিচারপতি চিট্টির রায়কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরাট সমর্থন বলে অভিনন্দিত করা হয়। "যদি মিঃ জাস্টিস চিট্টি অন্যপ্রকার রায় দিতেন তাহলে কালক্রমে সংবাদপত্রের পক্ষে কর্পোরেশন, পোর্ট কমিশনার, বঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের কোনো কাজকে সমালোচনা করা অসম্ভব হয়ে উঠত। ...মিঃ জাস্টিস চিট্টির রায়, যার মধ্যে সহজ বুদ্ধি ও উত্তম আইনজ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে—যৌথভাবে মামলা দায়ের করার আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছে।"

এখানেও স্টেটসম্যান-সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের জয়। কিন্তু মালিকগণ আর জয় চাইছিলেন না। মূলে হাভাত ক'রে বাইরের জয় ধুয়ে খাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। মালিকরা র‍্যাটক্লিফকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে তাঁর কলম কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন। ফলে, র‍্যাটক্লিফকে পদত্যাগ করতে হল। অবস্থা এমন তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, র‍্যাটক্লিফ আইনের পরামর্শ নেবার ইচ্ছা পর্যন্ত করেছিলেন। তিনি ১৯ মে, ১৯০৭, ৪১ চৌরঙ্গী থেকে নিবেদিতাকে এই বিষয়ে লিখলেন :

"প্রিয় সিস্টার নিবেদিতা, এই পত্রসংলগ্ন দ্বিতীয় রচনাটি প্রকাশের জন্য আমি দুই-তিন দিন আগে পদত্যাগ করেছি। ঐ রচনাটি যাতে প্রকাশিত না হয় সে জন্য পূর্বাহ্নে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। পি-কে ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তারপরে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেইকালে তিনি তাঁদের ঐ কাজের দ্বারা কোন্ অন্যায় হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না, এমন বলেন। তিনি (ঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁরা) আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে যৎপরোনাস্তি করেছেন যে, আমি পদত্যাগের জন্য চাপ দেব না, অন্তত এক বছরের আগে ছাড়ব না। তাঁরা চুক্তিশর্তের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জোর করতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু যুক্তি দেখান—গত বৎসর ইংলণ্ডে যাতায়াতের ভাড়া এবং ছুটির সময়ে আংশিক মাহিনা নেওয়ার মানে—আরও কয়েকবছর কাজ করার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা। এখানকার ব্যবসায়িক চুক্তি-পদ্ধতির সম্বন্ধে অবহিত নই বলে ব্যাপারটি এক সলিসিটরের কাছে নিয়ে যাই। তিনি বলেন, ওঁদের বক্তব্য উদ্ভট। সুতরাং আমি একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছি, যাতে বলেছি : উক্ত কথাবার্তার বিষয় পুনর্বিবেচনা করার পরেও আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখছি, এবং শরৎকালে চলে যেতে চাই। সলিসিটর যদি এই চিঠিকে অনুচিত বা রূঢ় বিবেচনা না করেন তাহলে আগামীকাল পাঠিয়ে দেব।"

এই চিঠি থেকে সহজেই বোঝা যায়, র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতখানি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসভাজন মনে করতেন। চরমপত্র দেবার ঠিক আগে নিবেদিতাকে চিঠি লেখাও লক্ষণীয়।

র‍্যাটক্লিফের পত্র-কথিত "দ্বিতীয় প্রবন্ধটি" কী—যার প্রকাশের জন্য র‍্যাটক্লিফ পদত্যাগ করার মতো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? নিবেদিতার কাগজপত্রের মধ্যে স্টেটসম্যানের সেই "দ্বিতীয় প্রবন্ধটি" না পাওয়া গেলেও স্টেটসম্যানের ফাইল সন্ধান করে সেটি কোন্ প্রবন্ধ, তা নির্ধারণ

করতে পেরেছি। সেটি অবশ্যই র‍্যাটক্লিফের সাংবাদিক ঔচিত্যবোধের উপর চূড়ান্ত আঘাত। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পরে আত্মমর্যাদাযুক্ত মানুষ হিসাবে পদত্যাগ না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। বিনাবিচারে লাজপত রায়ের নির্বাসনের সমর্থনে প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল।

১২ মে, ১৯০৭, এই সূত্রে স্টেটসম্যানে "প্রথম" সম্পাদকীয় বেরোয়। তার মধ্যে বলা হয়, "ভারতীয় জনগণ যদি লাজপত রায়ের নির্বাসনকে অতিরিক্ত হৃদয়ঘাতী ব্যাপার বলে মনে করে তাহলে খুবই ভুল করবে।" এর পরে ছিল ভারতীয় সংবাদপত্রের কটু সমালোচনা এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের সমর্থন: "অনেক যোগ্য বিচারপতি, যাঁরা ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মোটেই শত্রুভাব পোষণ করেন না—দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের অবিরাম ক্রূরকঠিন তিক্ততায় স্তম্ভিত। অতি সাধারণ প্রশাসনিক কার্যের উপর জঘন্যতম উদ্দেশ্য আরোপের স্থায়ী অভ্যাস, কোনো প্রশাসক কোনো ক্ষেত্রে জনগণের সুলভ অনুভূতির বিপরীত কিছু করা মাত্র তাঁর মানবিকতায় সন্দেহ, তৎসহ ঐসব পত্রপত্রিকার কোনো-কোনোটির ঘোর অসাধুতা—এইসকল বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ দেশীয় পত্রিকাগুলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান চালাচ্ছে।...শিক্ষিত ভারতবাসীরা অবশ্যই মুক্তভাবে স্বীকার করবেন যে, বৃটিশ সরকার ছাড়া ইউরোপের আর কোনো সরকার এই ধরনের পত্রপত্রিকা মারফত প্রচারিত বা সভায় বক্তৃতা-মারফত উদ্‌গিরিত হিংসা-প্রচারকে এক সপ্তাহও সহ্য করবে না—কিন্তু ইংলণ্ড ধৈর্য ধরে এতগুলি বৎসর তা সহ্য করে এসেছে। চরমপন্থীদের শাস্তি প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য। দাঙ্গা ও রাজদ্রোহিতাকে কোনো সরকার সহ্য করতে পারে না, আর যে-সব ব্যক্তির কথাবার্তা বিশৃঙ্খলা ও বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে, ফলভোগ তাদের করতেই হবে।"

এই লেখা স্পষ্টতই র‍্যাটক্লিফের এইকালীন দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তবু এর মধ্যে সরকারকে সংযমের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, ন্যায়বিচার করার জন্য অনুরোধও জানানো হয়। জনগণকে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে নীরবে নতভাবে গ্রহণ করার বিজ্ঞতা দেখাবার" উপদেশও সেইসঙ্গে ছিল।

এও যথেষ্ট নয়—১৫ মে বেরুল পূর্বোক্ত "দ্বিতীয়" সম্পাদকীয়—যার প্রতিবাদে র‍্যাটক্লিফের পদত্যাগ। তাতে বলা হল, অনেকেই পঞ্জাবে 'ওল্ড রেগুলেশন' প্রয়োগে ক্ষুব্ধ, কিন্তু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা তত মন্দ নয়। 'নির্বাসন' কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও বস্তুত খারাপ নয়। আদালতে বিচারের পর শাস্তি দিয়ে সাধারণ অপরাধীর মতো জেলে পাঠানোর চেয়ে নির্বাসন তো তোফা ব্যবস্থা। নির্বাসিত ব্যক্তি ভালই থাকবেন—তারপর যখন দেশে ফিরবেন তখন তো এক ঝটকায় মহা দেশনেতা! এই ধরনের নির্বাসন রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাই বলে লাজপত রায়রা [সম্পাদকীয়টি সামনে নিয়ে বলেছিল] মোটেই রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পেতে পারেন না। সাধারণ বিচারের মধ্য দিয়ে এঁদের নিয়ে যাওয়ার কিছু অসুবিধা থাকার জন্য এই প্রকার নির্বাসন-ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের শাস্তিবিধির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়—ইংরাজরা কত নরম। রাশিয়া প্রভৃতি অসভ্য দেশের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কথা তোলার দরকার নেই, জার্মানী ইত্যাদি দেশে ইংরেজদের কোমল আচরণ সম্বন্ধে ঘৃণার অন্ত নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

[ইংরেজের নিপুণ প্রচার অনেক বিজ্ঞ অবিজ্ঞ ভারতবাসীকে বোঝাতে পেরেছিল—অন্য ইউরোপীয়দের তুলনায় সে কত ভদ্র ও সহিষ্ণু। সাহেবী কাগজগুলি ছিল এর পক্ষে প্রধান প্রচারযন্ত্র। নমুনা হিসাবে তাই স্টেটসম্যানের উক্ত ১৫ মে তারিখের সম্পাদকীয়ের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

"If they [our Indian fellow-subjects] will scan the matter a little more closely they will, we think, share our conviction that, though 'deportation' may be a word

of ominous import, yet it is not nearly so bad as it sounds at first hearing. As a matter of fact, the lot of the so-called political exile is considerably happier than thatof the criminal relegated to work out his sentence in the common jail. The first at all events can feel that he is a person of importance in that an exceptional procedure has been applied in his case, that his daysin exilewill be free from the squalid servitude and surroundings of the everyday offender ; and that he is a made man for life whenhe returns to his own country. We would not, of course, be understood to suggest that the man who have been deported from Lahore are politicalprisonersin the true sense,.as was, for instance, Arabi Pasha in Ceylon, or as in Therbaw in Ratnagiri. No act of State is involved in their arrest We regard them simply as men who have brought themselves within the reach of the ordinary municipal laws by seditious speaking and writing, but who, for reasons of convenience connected largely with the easier maintenance of internal order, are not sent before the ordinary courts for trial, but dealt with summarily, still under municipal law... The action of the authorities in India, if contrasted with that of the average European Govt., is liniency itself. A short sojourn in Berlin or Paris...will convince anyone who seeks information that the everyday action of the Police in the French and German capitals, both in respect of the rights of public meeting and of freedom of speech, is far more stringent than any measures that the Government of India has yet taken. For obvious reasons we do not travel east of Poland in search of illustrations of repressive measures. Confining ourselves to the more civilised Westernnations,it is the veriest commonplace to assert that British toleration provokes hardly more astonishment than contempt in our European neighbours, notably in the Germans. The mere fact that under British rule the deportation of even two men without a public trial according to the forms of law, can be a nine-day's wonder, is in itself sufficient proof of the essentially mild character of the administration..."]

স্টেটসম্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে র‍্যাটক্লিফের সংগ্রামের যে-রূপ কিছুটা দেখেছি—তাতে সেই একই সংবাদপত্র তাঁরই সম্পাদনাকালে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ চালাবে, আর তিনি চাকরির খাতিরে তা সহ্য করে যাবেন—সে চরিত্রের মানুষ তিনি ছিলেন না। র‍্যাটক্লিফের দুর্গতিতে সবচেয়ে পীড়িত হন নিবেদিতা। র‍্যাটক্লিফের পদত্যাগের আগেই নিবেদিতা বুঝেছিলেন—পদত্যাগ অনিবার্য। তখন থেকেই র‍্যাটক্লিফের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। র‍্যাটক্লিফের তুল্য শক্তিশালী ও সহানুভূতিশীল লেখককে তিনি ভারত থেকে চলে যেতে দিতে চাইছিলেন না। ৮ মার্চ ১৯০৭, তিনি গোখলেকে লেখেন :

"সেদিন কথাবার্তার সময়ে তোমাকে স্টেটসম্যানের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমাকে ক্লান্ত দেখে বিরত ছিলাম। তবে শুনলাম, বোম্বাইয়ে একটি নতুন কাগজ বেরুবে। তা যদি হয়, তাহলে কি আমরা যে-সুযোগের জন্য এতদিন অপেক্ষা করছি তাকে পেয়ে যাব? —এঁকে অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারব? সময় নষ্ট না করে এটা লিখছি—সম্ভাব্য অফারের আশায়।"

পরবর্তী ঘটনা র‍্যাটক্লিফের পদত্যাগ—সেই সূত্রে নিবেদিতাকে লেখা তাঁর পত্র। পত্রটির উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি। নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ কী উত্তর দিয়েছিলেন, বা কী করেছিলেন, আমরা জানি না, তবে অল্পদিন পরে, ৮-৯ জুন তারিখে র‍্যাটক্লিফকে লেখা তাঁর পত্র থেকে মনে হয়, পদত্যাগ করা সত্ত্বেও র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সঙ্গে তখনি সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেননি—এবং নিবেদিতা,

অপরপক্ষকে অসুবিধায় ফেলে কিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা যায় তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন :

"আমার মনে হয়, গোড়ায় তোমার যে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল তা আবার ঘটবে। কথা হচ্ছে, কিভাবে বন্ধন ছিন্ন করে তুমি সরে যাবে? তা করতে হবে উভয়পক্ষের অমায়িক সম্পর্কের কালে—যখন ওরা মনে করবে, ব্যাপারটা বেশ-তো স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে—সেইসময়ে সরে গিয়ে ওদের অসুবিধায় ফেলতে হবে। সুতরাং তোমাকে পি কে-র বিদায় সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে। মধ্যবর্তীকালে ইংলণ্ডে [কাজের জন্য] যোগাযোগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? ভারতীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি? আমার ইচ্ছা, তারা জোট বেঁধে [ইংলণ্ডের] একজন ভালো সংবাদদাতাকে [অর্থাৎ র‍্যাটক্লিফকে] পোষণ করুক। ওটা কি অসম্ভব?"

একই চিঠিতে দেখি, নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফের একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন : ভূমিকা বদলের ফলে স্টেটসম্যানের 'রাজনৈতিক সর্বনাশ হল।' নিবেদিতা মনে করলেন, সেইসঙ্গে 'অর্থনৈতিক সর্বনাশও' ঘটবে। সেজন্য নিবেদিতা চাননি যে, র‍্যাটক্লিফ আর পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত থাকুন। নিবেদিতার উক্তিমতো স্টেটসম্যানের অর্থনৈতিক সর্বনাশ হয়েছিল কিনা জানি না, সম্ভবত হয়নি। অতঃপর ধরে নেওয়া যায়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সে অঢেল পেয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় মহলে যে কাগজটির প্রতিপত্তি কমে গিয়েছিল তা ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১০ জানুয়ারি ১৯০৮, মন্তব্য দেখিয়ে দেয় : "স্টেটসম্যানের সঙ্গে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সম্পর্কচ্ছেদের পর থেকে, ঐ কাগজটি কলকাতায় যে-স্থান অধিকার করেছিল, সেই স্থানটি ক্রমেই দ্রুত গ্রহণ করছে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ।"

ভারতীয় কাগজে র‍্যাটক্লিফকে নিযুক্ত রাখার বিষয়ে নিবেদিতার আগ্রহের শেষ ছিল না। পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতাকে যে-চিঠি লেখেন, সেটি গোখলেকে পাঠিয়ে দিয়ে নিবেদিতা বলেন :

"সংলগ্ন পত্রটি মোটামুটি গোপন রাখবে। বেশ বুঝতে পারছি, নতুন পার্শী কাগজটির কাজে আমাদের বন্ধুকে লাগানো যাবে না। তোমার নীরবতা থেকে তা ধরে নিয়েছি। [এই কাগজে র‍্যাটক্লিফের কর্মসংস্থানের জন্য ৮ মার্চ নিবেদিতা গোখলেকে কী লেখেন, আগেই দেখেছি]। কিন্তু তুমি কি ভূপেনবাবু [ভূপেন্দ্রনাথ বসু] বা অনুরূপ কাউকে পত্র লিখবে এবং প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে যাতে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ কিনে নিয়ে সেটি ওঁকে অর্পণ করা হয়? বন্ধুর দিক দিয়ে বিচার করলে আমার পক্ষে তাঁকে ইংলণ্ডে স্বজনগণের মধ্যে অনাড়ম্বর সহজ জীবনে ফিরে যেতে লেখাই উচিত হবে। কিন্তু যখন তাঁর ঐকান্তিকতা ও সামর্থ্যের কথা, সেইসঙ্গে তাঁকে আমাদের কতখানি প্রয়োজন, সেকথা চিন্তা করি, তখন আমার পক্ষে এটা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে যে, ভারতবর্ষ নিষ্ক্রিয় থেকে তাঁকে চলে যেতে দিচ্ছে!"

গোখলে শেষ পর্যন্ত র‍্যাটক্লিফের জন্য একটি চাকরি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, যা অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে র‍্যাটক্লিফ গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তার দ্বারা ভারতের কৃতজ্ঞতা কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল বলে নিবেদিতা স্বস্তিবোধ করেন। ১৯ জুলাই গোখলেকে তিনি লেখেন :

"মিঃ র‍্যাটক্লিফ সম্বন্ধে তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আশঙ্কা হয়, এটা সম্ভব করতে তোমাকে নিরতিশয় পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফদের মনোভাব কী, এখনো জানি না। ঈশ্বরের কাছে অনন্ত কৃতজ্ঞতা—ভারতবর্ষ ঐ কাজটা করতে পেরেছে। মিঃ র‍্যাটক্লিফের মূল্য অতুলনীয়, আমি তা অবশ্যই জানি, তবে ওদের পক্ষে স্বাস্থ্যের প্রশ্নটা উঠবে। পূর্বের অপেক্ষা ইদানীং সে ঐ ব্যাপারে অনির্শ্চিত।"

র‍্যাটক্লিফ ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার মনে এই আত্মগ্লানি ছিলই—তাঁর জন্য র‍্যাটক্লিফের সুখের চাকরি গেল। তাই তিনি র‍্যাটক্লিফের আর্থিক সুরাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আমেরিকায় লেখক হিসাবে র‍্যাটক্লিফ যাতে অর্থোপার্জন করতে পারেন, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে তিনি বহু চেষ্টা করেছেন ; সেখানে কী-ধরনের লেখার সমাদর হবে, কোন্-কোন্ পত্রিকার দরজা খোলা পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে নানা চিঠিতে অনেক কিছু জানিয়েছেন। তিনি আরও ভেবেছেন, যদি র‍্যাটক্লিফ আমেরিকায় লেখক ও বক্তারূপে উপস্থিত হন তাহলে হয়ত সেখানে ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে উপযোগী কথা বলতে পারবেন। আমেরিকার সংবাদপত্র প্রধানত ইহুদী-নিয়ন্ত্রিত, এবং তারা বৃটিশ-পক্ষীয়—সেজন্য সেখানে র‍্যাটক্লিফের মতো ইংরাজ লেখক কর্তৃক ভারতীয় স্বার্থের সমর্থন ভারত সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব গঠনে সহায়তা করবে। আমেরিকা তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। সেজন্যও নিবেদিতা আমেরিকার জনমতকে অনুকূল করার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। ১ নভেম্বর ১৯০৮, চিঠিতে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে সাংবাদিক হিসাবে আমেরিকা-গমনের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত করতে চেষ্টা করেন। আমেরিকায় লেখার জন্য পয়সা ভালো পাওয়া যায় ; র‍্যাটক্লিফ ওখানে সফল হতে পারবেন ; তবে আমেরিকার আগ্রহ কোন্ বিষয়ে, তা র‍্যাটক্লিফ বিশেষ জানেন না ইত্যাদি। আমেরিকার আগ্রহের বিষয়গুলির কিছু উল্লেখ করার পরে নিবেদিতা বলেন, র‍্যাটক্লিফ চেষ্টা করলে ওখানে ধারণার ক্ষেত্রে অল্পাধিক পরিবর্তন আনতে পারবেন, কারণ তাদের উৎসুক করবার মতো কিছু বিষয় র‍্যাটক্লিফের জানা আছে। যেমন তিনি কার্জনের কথা তুলতে পারবেন, যাঁর স্ত্রী আমেরিকান ইহুদী [এবং কার্জনের সঙ্গে যাঁর জীবন ছিল দুঃসহ] ; কিংবা তিব্বত অভিযানের পিছনে একটি ইহুদী মাইনিং সিণ্ডিকেট ছিল বলে শোনা যায় ; অনেক লোক উক্ত অভিযানে মারা যায় ; কার্জন তাঁর স্ত্রীর কারণে উক্ত অভিযান সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন ;—এসব কথাও আমেরিকানদের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে। ২৭ ডিসেম্বরের চিঠিতে নিবেদিতা আরও বিস্তৃতভাবে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। আনন্দপ্রকাশ করলেন এই বলে—বহু ভাগ্য, র‍্যাটক্লিফ 'ফ্লিট-ডিচ্'-এ পড়েননি। নিবেদিতা অনেকগুলি আমেরিকান পত্রিকার নাম জানালেন যেগুলি র‍্যাটক্লিফের লেখা ছাপতে পারে—তাদের কোনো-কোনোটিতে তিনিই পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারেন, তাও বললেন ; এমন কি তিনি বই ছাপার ব্যাপারেও সহায়তা করতে পারেন। আরও বললেন :

"এখন দেখছি, আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ জন্মাচ্ছে। ভারতের বিক্ষোভ এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। [আমেরিকার] সরকারী মনোভাব অল্পই জানা গেছে, তথাপি অন্যদিকে যে, [সাধারণের মধ্যে] অবস্থা জানবার জন্য যথার্থ ইচ্ছা হয়েছে, এটা সত্যই ভালো।...এখানকার লোক বিক্ষোভের উদ্ভবে কার্জনের ভূমিকার বিষয়ে জানতে দারুণ উৎসুক। ...হাঁ, এডুকেশন বিলের উপর পূর্ণ আলোকপাত করলে তা এখানে সাদরে অভ্যর্থিত হবে। [কনভোকেশন] বক্তৃতাটি সম্বন্ধে রসালো ক্ষুদ্র কাহিনীটি এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাছাড়া টাটা-পরিকল্পনার ইতিহাস মূল্যবান। 'একটি প্রদেশ কিভাবে বিভক্ত হয়েছে'—সেটিও হবে আর একটি রত্নবিশেষ।"

এইসঙ্গে নিবেদিতার অগ্নিঝলক :

"এখন কাজে লেগে পড়ো। তারই মধ্যে নিজের অর্থভাগ্য গড়ে নাও। এবং সত্যকে প্রকাশ করো।...

"আশঙ্কা হয়, আমার কাছ থেকে যে মতামত তুমি চাইছ তা ভালো নয়, মন্দই করবে। আমার

কাছে চিত্তাকর্ষক বস্তু হল—সরকারী প্রশাসকদের দিব্য প্রতিভা। তা প্রযুক্ত হয় সেইসব লোককে পাকড়ানোর কাজে, যারা আক্রান্ত না হলে কোনো প্রকার অনিষ্টকার্যে অসমর্থ ছিল, কিন্তু এখন উদ্বুদ্ধ ও রূপান্তরিত—অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণে। কি আছে বিলাপের—ক্রন্দনের। আমরা ভয়ঙ্করের উপাসনা করি। যন্ত্রণা, ক্ষতি, কৃচ্ছ্রতা আর মৃত্যু-ভিন্ন আদর্শ নেই।"

অবিলম্বে না হলেও র‍্যাটক্লিফ আমেরিকায় গিয়েছিলেন বক্তা ও লেখকরূপে—নিবেদিতার দেহত্যাগের কয়েকবছর পরে। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। তবে তখন তিনি নিবেদিতার অভিপ্রায় পূরণ করেছিলেন কিনা বলতে পারব না।

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে স্টেটসম্যানের অশোভন সম্পাদকীয় : র‍্যাটক্লিফের কঠোর প্রতিবাদ

নিবেদিতার কাছ থেকে অবিরাম যে-সাহায্য, সহানুভূতি ও প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা স্মরণ ক'রে র‍্যাটক্লিফ লেখেন : "ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় পরামর্শদাত্রী। অতুলনীয়, কারণ তা তৎপরতায় অসাধারণ এবং সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিত।" এহেন নিবেদিতা সম্বন্ধে অন্যের অকৃতজ্ঞতা সহ্য করা র‍্যাটক্লিফের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে-স্টেটসম্যান পত্রিকা বেশ কয়েক বৎসর ধরে নিবেদিতার দ্বারা বহুভাবে উপকৃত, সেই পত্রিকাটি র‍্যাটক্লিফের বিদায়ের পরে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত প্রহরীর ভূমিকা নিয়ে, সেই ভূমিকার প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের প্রমাণ রাখতে, নিবেদিতার মৃত্যুর পরে তাঁর বিষয়ে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধায় কলঙ্কিত কিছু উক্তি করে। লেখাটি পড়লে মনে হবে, অত্যন্ত গোঁড়া বদ কোনো মিশনারির হাতে সে এক্ষেত্রে কলম ছেড়ে দিয়েছিল। নিবেদিতা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজীবনের মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন, সেই অপকর্মের মূলে তাঁর রঙ-চড়ানো কল্পনাশক্তি কী পরিমাণে দায়ী, তার হিসাব নিবেদিতার রচনাংশ উদ্ধৃত করে স্টেটসম্যানের এই লেখাটিতে দাখিল করা হয়। সেইসঙ্গে হিন্দুপল্লীতে হিন্দুরীতিতে নিবেদিতা বাস করতেন, সেই গর্হিত কাজের বিষয়েও ছিল যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। প্রশংসা কিছু করতে হয়েছিল, কারণ নিবেদিতার ব্যাপক পড়াশোনা ও প্রতিভা তো অস্বীকার করা যায় না, অন্তত তা স্টেটসম্যানের অগোচর ছিল না ; আর তাঁর 'ওয়েব্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থের শক্তি ও সৌন্দর্যও অবশ্যগ্রাহ্য। প্রশংসার কিছু মশলাগন্ধ মিশিয়ে সেসব কথা বলা হল, তারপরেই তৎপরতার সঙ্গে সেইসকল গুণকে দোষের আকর করে তোলাও হল ; এমনও বলা হল—হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজীবনের গুণগান করার কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি নিজেকে ও অন্যদের প্রতারণা করেছেন। "তাঁর এই আদর্শায়িতকরণের ক্ষমতা, সেইসঙ্গে হিন্দুনারীদের সঙ্গে যথাসম্ভব সন্নিধানে জীবনযাপনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান—[স্টেটসম্যান লিখেছিল]—এদের সাহায্যে সিস্টার নিবেদিতা একটি বই লিখতে পেরেছিলেন, যা সর্বপ্রকার অতিরঞ্জন ও কল্পনার উন্মত্ত পাখার ঝাপট সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে, যা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। 'ওয়েব্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রকার হিন্দুপদ্ধতির সমর্থন করেছেন—বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, স্বামীর কাছে পত্নীর দাসত্ব, জাতিভেদপ্রথা, ও আরও অনেক মন্দ বস্তু—ভারতীয় সমাজসংস্কারকরা যাদের ধিক্কার দিয়েছেন। এই অপূর্ব গ্রন্থটির পাঠকেরা এর রচনানৈপুণ্য ও দুঃসাহসিক কুযুক্তির তারিফ না ক'রে পারবেন না, যার দ্বারা লেখিকা অতি বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে শিল্পতুলিকার স্পর্শে কোমলাকার দিতে-দিতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে সেগুলির স্থূলতা প্রায় অর্ধেক হারিয়ে গেছে। তবে তিনি নিজের শিল্পসৃষ্টির উপাদানসমূহের মহিমায়

নিজে কতখানি বিশ্বাসী হয়েছিলেন, সেটা কিছুটা সন্দেহের বস্তু, কেন না স্পষ্টই দেখা গেছে, নিজেকে সুস্থ রাখতে কলকাতা থেকে দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকার প্রয়োজন তাঁর হত। যে-কেউ সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারবেন—তাঁর মতো তীক্ষ্ণ মনস্বিতাসম্পন্ন, বহুপঠিত এক নারী তাঁর অবস্থানের ক্ষুদ্র জগৎটির মধ্যে কিছু সময়ের মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন—যে-জগতে বসে তিনি হিন্দুধর্মকে নিয়ে খেলা করবার ইচ্ছা করেছিলেন। ওটা খেলাই ছিল। হিন্দু তিনি কদাপি হতে পারেন না—যতই সে-বিষয়ে উৎসুক হয়ে জ্ঞানার্জন করুন, যতই তার গভীর মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করুন—জাতিপ্রথার লৌহপ্রাচীর তাঁকে বাইরে সরিয়ে রেখেছিল—যে-জাতিপ্রথার সমর্থনের চেষ্টা তিনি ক'রে গিয়েছিলেন! অনিবার্য ফল যখন এমন, তখন কেবল এই দুঃখই করা চলে—ঐ প্রকার শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক এক ব্যক্তিত্ব খ্যাপামির কাছে আত্মবলি দিল! একমাত্র ক্ষতিপূরণ—ওয়েব্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ।"

স্টেটসম্যানের লেখাটি র‍্যাটক্লিফ পড়েছিলেন, ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়েছিল তাঁর মুখ, তারপর কলম তুলে নিয়েছিলেন যা তরবারির আকারে ঝলসিত হয়ে ভেদ করেছিল স্টেটসম্যানের হীন অকৃতজ্ঞতাকে—তারপরে আনত হয়ে নমস্কার করেছিল ঐ ক্ষুদ্র আক্রমণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মহীয়সী নারীকে। র‍্যাটক্লিফ লিখেছিলেন :

"যদি কেউ সেই অপূর্ব ও অদম্য চৈতন্যরূপিণীর পরিচয় পেয়ে থাকেন, তিনি কদাপি এই ধরনের এক সমালোচনার বিরুদ্ধে ভগিনী নিবেদিতার পক্ষসমর্থনকে কোনো যোগ্য কাজ বিবেচনা করবেন না—যদিও তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এর কর্কশ আবির্ভাব হয়েছে এমন একটি পত্রিকায় যেখানে তিনি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কিছু সাংবাদিক-রচনা দান করেছিলেন। তবে 'খেলা' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে যে-চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার মোকাবিলা করা যেতে পারে, কারণ শব্দটির উপর [স্টেটসম্যানের] লেখক জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা স্মরণে আনতে পারি, তাঁর ধারাবাহিক ও সুতীব্র উদ্যমের কথা ; তাঁর মুক্ত ব্যাকুল সত্যসন্ধানের কথা ; তাঁর অপ্রশমিত সাহস ও করুণাপূর্ণ মহান হৃদয়ের কথা ; চিন্তা করতে পারি, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষগুলির পাশে বসে সেবা-শুশ্রূষার কথা ; অসহায়, পরাভূতদের জন্য হৃদয় সমর্পণের কথা ; যাদের সঙ্গে নিজের জীবনকে বেঁধেছেন তাদের প্রয়োজনে নিজের ঐশ্বর্যশালী বুদ্ধিশক্তি ও কূলপ্লাবী মানবতাকে রাজকীয় গরিমায় বিতরণের কথা ;—এর পটভূমিকায় বলতে পারি—এ যদি 'খেলা' হয়, তাহলে ঈশ্বর করুন—আমরা সকলেই যেন খেলাটা খেলে নিতে পারি।"

স্টেটসম্যানের সঙ্গে নিবেদিতার পূর্ব-সম্পর্কের কথা অনেকের জানা ছিল বলে নানা মহল থেকে ঐ কুরুচি ও অর্ধসত্যে পূর্ণ লেখার প্রতিবাদ করা হয়। অমৃতবাজার ১৮ অক্টোবর, ১৯১১, এই প্রসঙ্গে "দি স্টেটসম্যানস্ গুড টেস্ট্" নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। সূচনায় বলে : "শকুন উঁচু থেকে উঁচুতে ওঠে, কোনো স্বর্গীয় সৌন্দর্যদর্শনের জন্য নয়—তলায় কোথায় পচা মড়া রয়েছে তার সন্ধানের জন্য, যাতে ভূরিভোজ করতে পারে। এমন কিছু কীট আছে যারা ফুলের সুগন্ধ থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়, পাঁকেই তাদের আনন্দ, তাকেই নিয়ে যায় গর্তে প্রাতরাশের জন্য। মিস মার্গারেট নোবল বা সিস্টার নিবেদিতা নামে সর্বত্র পরিচিত সেই অসামান্যা মহাত্মা নারীর মৃত্যুতে স্টেটসম্যান পত্রিকা আর কিছু নয়, কতকগুলি বিদ্বিষ্ট নীচ উক্তিতে তাঁর পবিত্র স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করার সুযোগ গ্রহণ করেছে, তার দ্বারা সভ্যসমাজে প্রচলিত সুরুচি ও শালীনতার সীমাকে সর্বতোভাবে লঙ্ঘন করেছে। সেইসঙ্গে সে হিন্দু রীতি-নীতির উপর গালিবর্ষণও করেছে। ঐ পত্রিকাটির মতে, নিবেদিতা তাঁর বিরাট মনস্বিতা-শক্তি ও সৌন্দর্য-আবিষ্কারের সামর্থ্য সত্ত্বেও কেবল এক

মাথা-খারাপ মহিলা। এই হল চৌরঙ্গীর সংবাদপত্রের সুনির্দিষ্ট অভিমত।"

নিন্দা কি ক'রে ফিরিয়ে দিতে হয় অমৃতবাজার তাতে সিদ্ধ, সুতরাং হিন্দু রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নিন্দার জবাবে ইউরোপীয় রীতি-নীতির কদর্য চেহারাটা সে খুলে ধরেছিল ; ব্যঙ্গ করে বলেছিল, নিবেদিতা অবশ্যই স্টেটসম্যানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেতেন যদি তিনি হিন্দুধর্মের কেচ্ছায় নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করতেন। নিবেদিতাকে যারা মাথা-খারাপ বলেছে, তারা যে কতখানি নিরেট, তা দেখিয়ে দেবার পরে অমৃতবাজার স্টেটসম্যানের কাপুরুষতা সম্বন্ধে লিখেছিল :

"স্টেটসম্যানের শিভাল্‌রি লক্ষ্য করুন। সিস্টার নিবেদিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে এইভাবে কথা বলার উদ্যম দেখায়নি। কিন্তু যেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, আত্মসমর্থনের জন্য প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নেই, স্টেটসম্যান তাঁর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—তিনি যা প্রচার করেছেন তাতে বিশ্বাস করতেন না।" এই "মনোবিকার", অমৃতবাজার লিখেছিল, ঐ কাগজটির পক্ষে অবশ্যই সম্ভব, কেননা তা "হিন্দু-বিরোধিতার জন্য কুখ্যাত, এবং সরকারের কবলিত বলে কথিত।"

অমৃতবাজার ২৬ অক্টোবর, ১৯১১, নিবেদিতা সম্বন্ধে ফ্রেজার ব্রেয়ারের অসাধারণ রচনাটির পুনর্মুদ্রণ করেছিল ; সেইসূত্রে র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্বের উল্লেখ ক'রে বলে :

"আহা যদি এখন মিঃ র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদকের আসনে থাকতেন! তাহলে চৌরঙ্গীর কাগজটির পক্ষে সেই মহীয়সী নারীর স্মৃতির অপমান ক'রে জনরুচির উপর অত্যাচার করা সম্ভব হত না—সেই নারী, যাঁর সম্বন্ধে পরিচিত সকল মানুষের অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাভক্তি।"

ঢাকার *Eastern Bengal And Assam Era* নামক সাহেবী কাগজটি অমৃতবাজারের পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়ের উপভোগ্যতার তারিফ করার সঙ্গে কিছু চতুর বক্রোক্তিও করে। তার উপর অমৃতবাজার ৯ নভেম্বর *Vulture And Worm Domination* নামে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে।

॥ ৫ ॥ ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ভারতীয় আন্দোলনের সমর্থনে র‍্যাটক্লিফের ব্যাপক চেষ্টা ও সেজন্য নিবেদিতার গভীর কৃতজ্ঞতা

১৯০৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে, র‍্যাটক্লিফ বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে লেখক-রূপে যুক্ত হন। ১৯০৭-১৯১১ পর্বে তিনি ভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে কোন্ বিরাট উপকার করেছিলেন, তার সঠিক মূল্য কোনোদিন নির্ণীত হবে কিনা সন্দেহ। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি, ভারতে বৃটিশ শাসকদের অবিচার, ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ, পুলিশী অত্যাচার—এইসব বিষয়ে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি থেকে যে দু'বছর নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যে ছিলেন, সেইসময়ে উভয়ে সহযোগিতা ক'রে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা ভারত থেকে আন্দোলন-সংক্রান্ত তথ্য পাঠিয়েছেন তাঁর ব্যবহারের জন্য। অনেকগুলি উদারনৈতিক বৃটিশ পত্রিকার সঙ্গে র‍্যাটক্লিফের যোগ ছিল, বিশেষত 'নেশন' ও 'ডেইলি নিউজ'-এর সঙ্গে তিনি লেখক হিসাবে যুক্ত। স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে গবেষকরা যদি এইকালের বৃটিশ লিবারাল প্রেসের পুরনো সংখ্যাগুলি দেখেন তাহলে অনেক মূল্যবান সংবাদ, সেইসঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে সহানুভূতিসূচক অনেক রচনা, আবিষ্কার করতে পারবেন। এই ব্যাপারে প্রধান সংগঠক নিঃসন্দেহে র‍্যাটক্লিফ।

র‍্যাটক্লিফের ভারত-বিষয়ক একটি প্রবন্ধকে অভিনন্দন জানিয়ে নিবেদিতা ২১ নভেম্বর, ১৯০৯, লিখেছিলেন :

"ডাঃ বসু তোমার অনবদ্য প্রবন্ধটি নিয়ে এলেন ; সেটি চেঁচিয়ে পড়া হল—শুনবার জন্য আমরা সবাই একত্র হয়েছিলাম। অপূর্ব। ভারতীয় শ্রমিকদের সবিশেষ অসন্তোষের মধ্যে এখানে তুমি কি এসে পড়তে পারো না—এবং রেল ধর্মঘটের বিষয়ে, কোন্-কোন্ কারণে তা ঘটেছে জানিয়ে, তার উপরে প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারো না ?"

নিবেদিতা আরও লিখলেন :

"যেভাবে এখন লিখতে শুরু করেছ কেবল সেইভাবেই তুমি ভারত সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মূল্য নিজে উপলব্ধি করতে পারবে। ...অন্য কোনো ইংরেজের ও-বস্তু নেই—কাছাকাছি যাবার মতোও কেউ নেই। ...তুমি এখন [ইংলণ্ড থেকে] যেমন খোলাখুলি লিখেছ তার দ্বারা মাৎসিনীর মহামূল্য সমরনীতিকে বাস্তবায়িত দেখতে পাচ্ছি : 'ইতালিতে থাকাকালে সতর্ক উক্তি, বাইরে মুক্ত বাক্য।' এই ধরনের কাজের দ্বারাই নতুন ভারতের ভবিষ্যৎ গঠিত হবে।"

এই সময়ে রামজে ম্যাকডোনাল্ড, কেয়ার হার্ডি ও নেভিনসনের স্বদেশী আন্দোলন-সংক্রান্ত বই বেরোয়—সেইপ্রকার কোনো বই র‍্যাটক্লিফ লেখেননি। কেন, তার কারণ নিবেদিতা ২৫ আগস্ট, ১৯১০, চিঠিতে বলেছিলেন :

"এটাই স্বাভাবিক। তুমি ব্যাপারটার মধ্যে খুব বেশি নিমজ্জিত ছিলে। ওটা তোমার কাছে বহির্গত বস্তু নয়—ওর জন্য তুমি আত্মত্যাগ করেছ। তুমি অবশ্যই বাইরের মানুষ হিসাবে লিখতে পারবে না। ...তোমার বিনয়ের প্রয়োজন নেই। [র‍্যাটক্লিফ নিশ্চয়, পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের মতো ক'রে লিখতে পারি না বলে সংকোচ প্রকাশ করেছিলেন।] তুমি ভ্রমণকারীর ভ্রমণপঞ্জীর চেয়ে অনেক অনেক বড় কাজ করেছ।"

সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে লিখিত ভ্যালেনটাইন চিরলের প্রবন্ধ ও গ্রন্থের বিরুদ্ধে লেখবার জন্যও নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে প্রণোদিত করেছেন দেখতে পাই। র‍্যাটক্লিফ সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। [প্রসঙ্গটি পরে অল্পাধিক উল্লিখিত হবে]।

নেশন, ডেইলি নিউজ, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান বা সমধর্মী পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা ওল্টাবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি, কিন্তু ইণ্ডিয়া পত্রিকায় উদ্ধৃত র‍্যাটক্লিফের ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধের পরিমাণ দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার।

এই পর্বে ইণ্ডিয়া পত্রিকায় উৎকলিত র‍্যাটক্লিফের প্রবন্ধ ও বক্তৃতার রিপোর্টের তালিকা এই :

1908 *January 10*, 'Ratcliffe on the Release of Lajpat Rai.' *February 14*, 'What is happening in India', (Mr S. K. Ratcliffe at Manchester). *April 3*, 'The Story of Bengal Partition', (S. K. Ratcliffe, from 'The New Age'). *July 24*, 'The Future of Indian Nationalism', (Ratcliffe in the 'Daily Chronicle'). *September 11*, '*The Dual Policy in India. A Criticism from Mr S. K. Ratcliffe*' (from the 'Nation'). *[Sept. 25*, Virendranath Chattopadhyaya's letter in the 'Nation' on the said article of Mr Ratcliffe]. *October 30*, 'The Social Movement in India', (Ratcliffe's article in the 'Sociological Review'). *December 18*, 'The Deportations' (Ratcliffe's letter to the 'Manchester Guardian', 'Daily News', 'Pall Mall Gazette', India').

1909. *September 24*, 'False News from India'. [Reuter sent a false news about an alleged bomb outrage on the Eastern Bengal State Railway.

Ratcliffe wrote the above mentioned letter on the Reuter news. The letter got wide publicity in the Liberal Press.]

1910. *April 29*, 'The Rise of Nationalism in India by S. K. Ratcliffe' (from the 'Christian Commonwealth'). *May 6*, 'Perils and Possibilities in India. Mr Ratcliffe and Mr Lajpat Rai at Liverpool.' *December 30*, 'Mr Chirol's Conclusions by S. K. Ratcliffe' (From the 'Morning Leader').

1911. *January 20*, 'The Problem of Indian Nationalism'. (Ratcliffe on Valentine Chirol's 'Indian Unrest.' From the 'Daily News'). *August 25*, 'The Tragic Farce of Midnapore.' (Ratcliffe on Midnapore Trial, in the 'Nation').

এই তালিকা র‍্যাটক্লিফের রচনার তুলনায় অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। নেশন ও ডেইলি নিউজে নামহীন সম্পাদকীয় রচনায় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উপরে বহু-কিছু লিখেছেন। যেমন ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১৩ জানুয়ারি, ১৯১১, নেশন পত্রিকা থেকে ভ্যালেনটাইন চিরলের লেখার উপরে যে-মন্তব্য উদ্ধৃত হয় তা খুব সম্ভব র‍্যাটক্লিফেরই রচনা। নিবেদিতা তাঁর পত্রে নেশন পত্রিকায় লেখার জন্য র‍্যাটক্লিফকে বারবার ধন্যবাদ দিয়েছেন।

ইংলণ্ডে অবস্থান ক'রে র‍্যাটক্লিফ ভারতের পক্ষে কয়েক বৎসর ধরে যে-কাজ করেছেন, তার জন্য নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, র‍্যাটক্লিফ আবার ভারতে এসে এখানকার শোচনীয় উৎপীড়নের চেহারা দেখে যান। ১২ জুন, ১৯১১, চিঠিতে নিবেদিতা সরকারী উৎপীড়নের বিবরণ দিলেন, বিশেষভাবে শিক্ষাকে রুদ্ধ করার নিষ্ঠুর ব্যবস্থার কথা বললেন, এ-ব্যাপারে ইংলণ্ডের নীচতার কথাও তুললেন :

"আমার কাছে যে-একটি সমস্যাই আছে তা হল—শিক্ষা। ভারতীয়রা কি মনুষ্য নয়? তারা যদি মনুষ্যপদবাচ্য হয় তাহলে সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের অধিকার নিঃসন্দেহে তাদের আছে। আর হাঁ, সকল বিকাশই স্বাধীনতায় উপনীত, মনোবুদ্ধিগত স্বাধীনতায়। যদি ভারতবাসী মনুষ্য বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে তাদের সর্বাত্মক বিকাশের সপক্ষে আছে মানবতার দাবি।"

এই তত্ত্ব মুখে স্বীকার করেও [অহো তাঁদের উদারতা] যাঁরা কার্যকালে তাদের অগ্রাহ্য করেন—সেই ব্যক্তিদের দুমুখো চেহারা নিবেদিতা সব্যঙ্গে খুলে দেখালেন :

"[হাঁ, ভারতবাসী মনুষ্য অবশ্যই, শিক্ষার অধিকারও তাদের আছে, কিন্তু—] রাজনৈতিক সুবিধাবুদ্ধি বলে যে, ঐ অধিকার ব্যাহত করতে ও সংবৃত রাখতে হবে। কেননা ভারতবাসী ইনটেলেকচুয়াল স্বাধীনতা লাভ করলে অবিলম্বে বা বিলম্বে জাতীয় [রাজনৈতিক] স্বাধীনতারও দাবি করবে—তারা চাইবে অশৃঙ্খলিত ও অব্যাহতভাবে নিজ ভাগ্যকে দর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার। না—না, ওসব জিনিস চিন্তাও করা যায় না—অন্তত ইংরাজ জাতি ওসব জিনিস চিন্তাও করতে পারে না।"

শাসক ইংরাজের এই নৈতিক ভণ্ডামীর ছবি দেবার পরে নিবেদিতা ভাবতে চাইলেন, আহা, তাঁর বন্ধু র‍্যাটক্লিফ পার্লামেন্টে গিয়ে যদি ভারত-বিষয়ে আণ্ডার সেক্রেটারি হয়ে বসেন, তাহলে কত-না শুভফল ঘটতে পারবে। তা যখন হবার নয়, তখন র‍্যাটক্লিফ ভারতে আবার এসে যদি পরিস্থিতি

পর্যবেক্ষণ করে ফিরে যান, তাতেই যথেষ্ট উপকার হবার সম্ভাবনা। নিবেদিতা খুবই চাইছিলেন—র‍্যাটক্লিফ একবার ভারতে আসুন, থাকবার জন্য নয়, কেবল ঘুরে যাবার জন্য। "আমার মনে বিচিত্র বোধ জেগেছে—সবই যেন শেষ, ভবিষ্যৎ নেই কিছু।" একথা তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন ২০ জুলাই, ১৯১১ চিঠিতে। পরের সপ্তাহেই (২৮ জুলাই) ক্লান্ত কল্পনার জাল বুনলেন—যদি র‍্যাটক্লিফকে ভারতে এনে একটি কাগজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়, কি যে ভালো হয়! কিন্তু তারই পাশে মনের ভিতরে জেগে উঠতে লাগল 'না না' শব্দ : "বিজ্ঞানের মানুষটি [ডঃ বসু] বলছেন, আমাদের পক্ষে অপূর্ব হলেও তোমার পক্ষে ব্যাপারটা খুবই মন্দ দাঁড়াবে—যদি আমরা এখানে টাকা তুলে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ কিনে নিয়ে সেটি তোমার হাতে তুলে দিই। ওটা তোমার পক্ষে এত মন্দ হবে যে, ও-বিষয়ে চিন্তাও করছি না। তুমি এখন সুস্থ-স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছ। কিন্তু আহা, কি সুখেরই সেই দিনগুলি ছিল যখন তোমাকে আমরা এখানে পেয়েছিলাম! আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটি এখন নিঃসঙ্গ নির্জন। তখন ছিল জীবন—এখন সে সকলই অতীত! আমার মা ও সেণ্ট সারার মৃত্যুর পরে এরকম কথা না-ভেবে পারি না। সুতরাং এসব কথায় বেশি গুরুত্ব দিও না।"

নিবেদিতার মনে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছে। শেষবারের মতো তিনি বন্ধুদের কথা ভেবে নিতে চাইছেন। ডঃ বসু বলেছিলেন, "র‍্যাটক্লিফের মতো বন্ধু তুমি পাবে না।" (২৮-৭-১৯১০)। অনস্বীকার্য তা। মৃত্যু সেই মিত্রতায় আপাতত ছেদ আনবে, কিন্তু মৃত্যুতে নিবেদিতা কদাপি অসুখী নন। "মৃত্যুর ছায়া সম্বন্ধে আমার বিপুল ভালবাসার কথা তুমি জানো," নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে ২৮-৭-১৯১১ লিখলেন, "দূর থেকে সে ভয়ঙ্কর, কিন্তু তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখলে সে কত সুন্দর—এই জীবন-নামক বিরক্তিকর ব্যাপারটির চেয়ে কত বেশি বাস্তব।"

সে মৃত্যুপ্রীতি আবদ্ধ থাক নিবেদিতারই মধ্যে—তাঁর পরম বন্ধুর জন্য ছিল জীবনের প্রসারিত আলোকের প্রার্থনা :

"হে প্রিয় বন্ধু, মৃত্যুর মধ্যে তুমি নও! এঞ্জেল ইজরায়েলের বসনপ্রান্ত স্পর্শ করা থেকে তোমাকে যেন সরিয়ে রাখা যায়—যতদিন সম্ভব।"

সপ্তম অধ্যায়

ম্যাককারনেস, এবং ভারত-বিষয়ে তাঁর বাজেয়াপ্ত প্যামফ্লেট

॥ ১ ॥ অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকানোয় র‍্যাটক্লিফ ও ম্যাককারনেসের চেষ্টা

নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে একাধিকবার লিখেছেন, র‍্যাটক্লিফ ও ম্যাককারনেসই অরবিন্দর গ্রেপ্তার ঠেকিয়েছেন। ওঁরা এক্ষেত্রে কী করেছিলেন?

ওঁরা কী করেছিলেন, অন্তরালে কোন্ কলকাঠি নেড়েছিলেন, সে ইতিহাস উদ্ধার করা হয়নি, এখন সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাবে কি না জানি না। এমন-কি ওঁরা সংবাদপত্রে উন্মুক্ত আন্দোলনের দ্বারা কোন্ কাজ করেছিলেন, সে ইতিহাসও অলিখিত। নিবেদিতার চিঠি থেকে ইঙ্গিত নিয়ে, কেবল দুটি-একটি পত্রিকা সন্ধান ক'রে, যেসব বিস্ময়কর সংবাদ পেয়েছি, তাদের অল্পমাত্রায় উপস্থিত করব।

আমরা দেখেছি, অরবিন্দ কর্মযোগিনে ৩১ জুলাই, ১৯০৯, যে-'ওপন্ লেটার' প্রকাশ করেন, তাকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে ছড়াবার জন্য নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে অনুরোধ করেছিলেন; র‍্যাটক্লিফ ও ম্যাককারনেস সে-কাজ করেন, সম্ভবত আরও কিছু করেন, যার দ্বারা নিবেদিতা মনে করেছিলেন, ঐকালে অরবিন্দের গ্রেপ্তার নিবারিত হয়েছে। অরবিন্দর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আবার দেখা দেয়। অরবিন্দ পুনশ্চ ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯, আর এক 'খোলা চিঠি' ছাপেন। নিবেদিতা সেটিকেও ইংলণ্ডে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি র‍্যাটক্লিফকে লেখেন, ওটি যাতে রাজদ্রোহকর বলে সরকার ধরে না নেয় সেইভাবে পুনঃপ্রকাশ করো ইংলণ্ডে। (২৮-৪-১৯১০)। এইকালে অরবিন্দ বেপাত্তা হয়ে গেছেন। নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল, যদি রাজদ্রোহকর লেখার অভিযোগ অরবিন্দর বিরুদ্ধে না টেঁকে তাহলে তিনি সুযোগমতো আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন।

নিবেদিতা যা চেয়েছিলেন, র‍্যাটক্লিফ ঠিক তারই ব্যবস্থা করেন। ইণ্ডিয়া কাগজ ৮ এপ্রিল, ১৯১০ তারিখে ডেইলি মেল থেকে সংবাদ দেয়—"অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে সক্রিয় রাজদ্রোহের অভিযোগে, কিন্তু গত ৬ সপ্তাহ তাঁর কোনো সংবাদ নেই। এইসঙ্গে এই কাগজটি 'টাইমস' পত্রিকা থেকে সংবাদ উদ্ধৃত ক'রে বলে, অরবিন্দর ২৫ ডিসেম্বরের প্রবন্ধের জন্যই সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ইচ্ছুক। টাইমস পত্রিকা অরবিন্দর রচনার যে-সারসংক্ষেপ করেছিল, তাকে উদ্ধৃত করার পরে ইণ্ডিয়া মন্তব্য করে: "আমাদের বলা হয়েছে যে, এইপ্রকার মতবাদ কর্মযোগিনে প্রায়শ প্রচারিত হয়। এক্ষেত্রে আমরা কেবল এইটুকুই বলব, সংকলিত অংশকে যদি সিডিশাস্ বলে গণ্য করা হয়, তাহলে কোথায় তার সীমারেখা টানা হয়েছে তা শুনতে পাওয়া চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হবে।"

ডেইলি নিউজ পত্রিকায় র‍্যাটক্লিফ আরও কিছু কৌশল করেছিলেন। সেখানে অরবিন্দর ৩১ জুলাইয়ের অধিক নরম 'খোলা চিঠি'র অংশ তুলে বলা হয়—কি বিচিত্র, এই ধরনের লেখার জন্য অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের আয়োজন চলছে। (বস্তুতপক্ষে পরবর্তী ২৫ ডিসেম্বরের লেখাটির জন্যই তা করা হচ্ছিল)। ডেইলি নিউজ এই লেখায় বলেছিল, "[অরবিন্দর] রচনাটি জাতীয়তাবাদীদের মতাদর্শ সম্বন্ধে এতাবৎ ভারতবর্ষে যা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে সর্বাধিক স্পষ্ট ও উৎকৃষ্ট। সমগ্র ম্যানিফেস্টোটিতে যে-ভাব প্রকাশিত তার সূচক দৃষ্টান্তরূপে আমরা কিছু অংশ উৎকলন করছি, যাতে ইংরাজ পাঠকগণ ভারতীয় জাতীয়তার চেহারা আঁচ করতে পারেন, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন, কী ধরনের বক্তৃতা ও রচনা ভারতের আদালতে সিডিশাস্ বলে শাস্তি পাচ্ছে।"[১]

নিবেদিতার ইঙ্গিত অনুযায়ী ইণ্ডিয়া আর একটি কাজ করেছিল। নিবেদিতা জানতেন, অরবিন্দকে গ্রেপ্তারে উৎসাহী ইংরাজ প্রশাসকগণ তাঁর প্রকাশিত মতকে বিকৃত করে ইংলণ্ডে পাঠাবে। আর ঠিক তাই করা হচ্ছিল। অরবিন্দর মতাদর্শ যাতে বিদ্রোহসূচক বলে প্রতীয়মান হয়, তেমন ভাবেই টাইমস পত্রিকা তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করেছিল। অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট বার করা হয়েছে কেন, সে সম্বন্ধে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৪ এপ্রিল ১৯১০ বৃটিশ প্পার্লামেন্টে প্রশ্ন করেন। তার উত্তর সরবরাহের জন্য রয়টারের সিমলা-সংবাদদাতা অরবিন্দর ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯ তারিখের রচনার 'নিজস্ব সামারি' টেলিগ্রাফ-যোগে প্রেরণ করেন। সেটি এই:

"The article [of Aurobindo] began by declaring that the Nationalist party must now abandon its attitude of reserve and expectancy, and must again assume its legitimate place in the struggle for Indian liberties. Nothing, it said, could be expected from persistence in moderate politics except retrogression, disappointment, and humiliation. The article then went on to accuse the Moderates, naming Mr Gokhale and Sir Pherozeshah Mehta, of misleading the Indian public, and to bid those stand aside who thought that by flattering Anglo-Indian or coquetting with English Liberalism they could dispense with the need of effort, and avert the certainty of peril. It called on Nationalists to come forward and assume their burden, and suggested that the 'ukases' of the authorities were illegal, and the evidence they used suborned and perjured. Finally it invited the people not to shrink from 'all we have to pay on the march to freedom.'"[২]

নিবেদিতা চেয়েছিলেন, অরবিন্দর গোটা প্রবন্ধটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হোক। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সেক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাধারায় অভ্যস্ত ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মহল অন্তত সেটিকে মারাত্মক মনে করবে না। তদনুযায়ী ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল, ১৯১০, *What is Sedition? The Offending Article of Mr Aurobindo Ghose* শিরোনামায় কর্মযোগিনের ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯ তারিখের প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয় (অন্য পত্রিকাতেও তা হতে পারে)—সেইসঙ্গে মন্তব্য করা হয়:

১ ইণ্ডিয়া, ১৫ এপ্রিল, ১৯১০।

২ *India*, April 22, 1910.

"আমাদের ইংরেজ পাঠকেরা যাতে বর্তমানে ভারতবর্ষে সিডিশন-তত্ত্ব কোন্ আকারে উপস্থাপিত হচ্ছে তা অনুধাবন করতে পারেন, সেজন্য আমরা গোটা প্রবন্ধটি নিম্নে হাজির করছি। প্রবন্ধটির আপাদমস্তকে কোথাও সক্রিয় সিডিশন বলতে যা বোঝায় তার চিহ্নমাত্র নেই, কিংবা যৎসামান্যই আছে—প্রবন্ধটির সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও একথা বলতে পারি।"

॥ ২ ॥ ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ম্যাককারনেসের পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে আপসহীন সংগ্রাম

এই সকল ব্যাপারে র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন ফ্রেডরিক ম্যাককারনেস। ম্যাককারনেস আরও কিছু করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে পুলিশী অত্যাচার সম্বন্ধে ইংলণ্ডে সবচেয়ে হৈ-চৈ তিনিই বাধান। এর মূল্যও তাঁকে দিতে হয়। তিনি লিবারাল এম-পি—পরবর্তী নির্বাচনে দেখা যায়—তিনি দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন—সে অনিচ্ছার মূলে দলীয় কর্তৃত্বের অনিচ্ছার তাগিদ সক্রিয় ছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। নিবেদিতার পত্রে উল্লেখ না থাকলে আমরা এইকালে ম্যাককারনেসের কর্মকাণ্ডের কথা জানতে আগ্রহ বোধ করতাম না, আর সেটা অসজ্ঞান অকৃতজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াত।

ম্যাককারনেস ছিলেন পুরনো রীতির র‍্যাডিকাল লিবারাল, তদনুযায়ী ব্যক্তিস্বার্থের উপরে ন্যায়নীতিকে স্থান দিতে সমর্থ। লিবারাল পার্টির এম-পি হয়েও তিনি লিবারাল দলের শিরোমণি ভারতসচিব মর্লে-র আমলেই ভারতে ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ; এবং ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, পুলিশী উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য ইংলণ্ডে যে "ইণ্ডিয়া সিভিল রাইটস্ কমিটি" গঠিত হয়—তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এই কমিটি গঠনের সূচনাকালে নিবেদিতা ইংলণ্ডে ছিলেন। ধরে নেওয়া যায়, এর পিছনে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল। নিবেদিতার বন্ধু ও সহযোগী র‍্যাটক্লিফ ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সেক্রেটারি।[৩] ভারতে প্রশাসনিক দমনকার্য ও উৎপীড়নের প্রশ্নে সরকারকে আক্রমণের সৈনাপত্য ম্যাককারনেস গ্রহণ করেন। তাঁর ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্রীশ্চান কমনওয়েলথ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের পক্ষে গত পার্লামেণ্টে নিউবেরীর সদস্য ফ্রেডরিক কোলরিজ ম্যাককারনেসের অপেক্ষা আর কোনো কণ্ঠ সমুচ্চে নিনাদিত হয়নি। নিজ দলের হুইপ ও নেতাদের অসন্তোষভাজন হবার ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন। যেখানে স্পষ্ট অন্যায় দেখা গেছে...সেখানে তিনি নির্ভয়ে প্রতিবাদ করেছেন। ভারতে বর্তমান প্রশাসনের স্বৈরাচারী কার্যবলী বিশেষভাবে তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ জাগিয়েছে ; গত দুই বৎসরে ভারতে বৃটিশ প্রজাদের বিনা বিচারে নির্বাসিত করার কুখ্যাত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তিনি জনসাধারণকে অবহিত করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেছেন—দেখাতে চেয়েছেন, ভারতীয় সংস্কারপন্থীদের বিষয়ে সরকারের আচরণের চরিত্র কী ?"[৪] ম্যাককারনেসের প্রশংসায় একই ধরনের কথা টাইমস পত্রিকায় এক পত্রে লিখেছিলেন ডবলিউ পি বায়লস্, এম-পি।[৫]

৩ ইণ্ডিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯।
৪ ইণ্ডিয়া পত্রিকায়, ১০ জুন, ১৯১০, উদ্ধৃত।
৫ "All who knew him in the last Parliament recognised his fairness and moderation, both of language and temper. The patience, knowledge and courage with which he was always ready to champion the weak and to track the oppressor were qualities which endeared him to many of his colleagues."
[W. P. Byles, M. P., on F. C. Mackarness, in the *Times*. Quoted in *India*, Aug. 5, 1910]

দু' বছরের উপর ভারত-প্রশ্ন নিয়ে ম্যাককারনেস ইংলণ্ডে ধারাবাহিক কঠিন সংগ্রাম করেছেন। সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি। এর সূচনা মর্নিং লীডার পত্রিকায় ম্যাককারনেসের একটি পত্র থেকে, যাতে তিনি ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য নিয়োজিত ১৯০৫ সালের কার্জন-কমিশনের (স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার যার চেয়ারম্যান ছিলেন) রিপোর্ট থেকে অংশ উদ্ধৃত ক'রে পুলিশী উৎপীড়নের চিত্র তুলে ধরেন। ঐ পত্রের সূচনা হয়েছিল এই বলে : "গত দুই বৎসরে ভারত সরকার অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং ক্রুদ্ধভাবে নিপীড়নমূলক আইন পাস করাচ্ছেন। 'বিস্ফোরক পদার্থ আইনের' কথা যদি নাও তুলি, দেখা যাবে, জনসভা, সংবাদপত্র এবং সরকারের দৃষ্টিতে 'বেআইনি সংস্থা'র বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করা হয়েছে ; তা ব্যবহৃত হয়েছে জুরির সাহায্যে বিচারের বিরুদ্ধে, অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে গোপন তদন্তের পক্ষে এবং কোনোপ্রকার অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই কারারুদ্ধ করা বা নির্বাসিত করার সমর্থনে।" র‍্যাটক্লিফ ডেইলি নিউজে এই পত্রের সমর্থনে লিখেছিলেন : "ভারতের বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীতে তা একমাত্র দেশ যেখানে পুলিশ সরকারীভাবে অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং উৎপীড়নকারী বলে ধিকৃত হলেও তাদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় ভূষিত করা হয়েছে। ...সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্ত করা যায়, ভারতবর্ষ...পুলিশের রাজ্য।"[৬]

ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ম্যাককারনেস হাউস অব কমনস্-এ প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু উক্ত 'গুরুতর প্রশ্নের' কোনো উত্তর না পেয়ে ডেইলি নিউজে পুনশ্চ ২৩ জানুয়ারি, ১৯০৯, এক পত্র লিখলেন।[৭]

অল্পদিন আগে, ৮ ডিসেম্বর ১৯০৮, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে নির্বাসিত হয়েছেন। এই ঘোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব ক'রে ম্যাককারনেস ২৯ জানুয়ারি, ১৯০৯, টাইমস পত্রিকায় দীর্ঘ পত্র লিখলেন, যার মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্তের 'উচ্চ চরিত্র, এবং শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের জন্য তাঁর দীর্ঘ সেবার' বিশেষ উল্লেখ ছিল। 'আইন ও বিচারের' ভক্ত ইংরাজদের শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল—'ম্যাগনাকার্টা', 'পিটিশন অব রাইট', 'হেবিয়াস কর্পাস্ অ্যাক্ট', এবং ভারতের জন্য রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের কোন্ শোচনীয় অবহেলা ঘটছে ভারতবর্ষে।[৮] স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন ম্যাককারনেসকে সমর্থন ক'রে ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটে ২ ফেব্রুয়ারি চিঠি লিখেছিলেন। অপরদিকে, "এটা আশা করা যায় না যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সরকারী মহল নির্বাসন সম্বন্ধে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ম্যাককারনেস, এম-পি'র, কঠিন শীতল তথ্যবাহী পত্রটিকে উপেক্ষা করতে পারবে।"[৯] সুতরাং জনৈক আই-সি-এস, টাইমস-এ ম্যাককারনেসের পত্রের উত্তর দিলেন ; তার যোগ্য প্রত্যুত্তর ম্যাককারনেস দিলেন একই কাগজে ১০ ফেব্রুয়ারি। ম্যাককারনেস সেখানেই থামলেন না। কয়েকমাসের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে ১৪৬ জন এম-পি (৮৪ লিবারাল, ৬২ লেবার ও আইরিশ) প্রধানমন্ত্রী এইচ এস অ্যাসকুইথের কাছে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখের বিনাবিচারে নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। অ্যাসকুইথ তার যা উত্তর দিলেন তার সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৪ মে তারিখের সম্পাদকীয়ের নাম ছিল : *A Polite Evasion*.[১০]

৬ ইণ্ডিয়া, ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯।
৭ ইণ্ডিয়া, ২৯ জানুয়ারি, ১৯০৯।
৮ ইণ্ডিয়া—৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯।
৯ ঐ—১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯।
১০ ইণ্ডিয়া ১৪ মে, ১৯০৯।
অ্যাসকুইথের উত্তরের উপরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জুন ১৯০৯, একটি সম্পাদকীয় নোট বেরোয়, সেটি রচনাভঙ্গিতে

সরকার পক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। বাংলার সি-আই-ডি বিভাগের প্রধান ব্যক্তি মিঃ প্রৌডনকে ইংলণ্ডে ডেকে পাঠানো হয় "ধৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে ক্ষীণ-জ্ঞান মিঃ মর্লে-র জ্ঞান-বলাধানের জন্য।"[১১] বেসরকারী পক্ষে শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত এই সময়ে ভারত সরকারের কার্যাবলীর প্রশংসায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন। "মিসেস বেশান্ত ভাইসরয়কে তাঁর 'অনন্যসাধারণ সাহসের জন্য' ধন্যধ্বনি শুনিয়েছেন। ভাইসরয়ের বিষয়ে উনি বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়। ...চরমপন্থীদের বিষয়ে সামান্যই সহানুভূতি [জনগণের মধ্যে] আছে ; তবে জনগণের মধ্যে বেশকিছু মূক অসন্তোষ আছে, তাকেই চরমপন্থীরা ভাঙিয়ে চলতে পারে।"[১২] অরবিন্দ প্রসঙ্গে এইসূত্রে বেশান্ত যা বলেছিলেন, তা যে অরবিন্দর কোমরে আবার দড়ি পরাবার পাকা ব্যবস্থা করছিল, সেকথা আগেই বলেছি। অধিকন্তু, যেসব লিবারাল সদস্য ভারতীয় প্রশাসনের সমালোচনা করছিলেন বৃটিশ-সরকারপক্ষ তাঁদের মুখ বন্ধের চেষ্টাও করেন। পার্টিশন-বিরোধী লর্ড ম্যাকডোনেলকে মর্লে কিভাবে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তার বিবরণ ছিল আউটলুক পত্রিকায় : "একই প্রকারে লিবারাল দলকে ভারতীয়দের নির্বাসন-প্রশ্নে 'নীরবতার কোলে আত্মসমর্পণ' করাবার জন্য প্রয়াস চলেছে।"[১৩]

কিন্তু ম্যাককারনেস ও তাঁর সমর্থকরা অদম্য। তিনি হাউস অব কমনস্-এ পুনরায় নির্বাসিতদের বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন ; সেইসূত্রে ডেইলি নিউজে এক পত্রে বললেন : "ঐ সকল ব্যক্তিকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সংগ্রহ না করেই বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং কোনোভাবে সতর্ক না করেই বহুশত মাইল দূরে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। ...আজ পর্যন্ত তাঁদের বলা হয়নি—কী তাঁদের অপরাধ। হাউস অব কমনস্-কেও একইভাবে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আমরা সর্বমোট এই জেনেছি যে, তাঁরা এমন কোনো অপরাধ করেননি যা নির্দিষ্টভাবে ঘোষিত হতে পারে ; তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ নেই যা আদালতে দাখিল করা সম্ভব ; এবং তাঁদের অপরাধ সম্বন্ধে সংবাদদাতাগণ এমন সব ব্যক্তি যাদের নাম অ-কথ্য।"[১৪]

শেষপর্যন্ত লর্ড মর্লে-কে উত্তর দিতে হল। মর্লে বললেন : "তিনি কেবল ভারতবর্ষে আইন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে ধারণা পোষণ করছেন, তাই নয়, যেসব ভদ্রলোকদের নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে ঐ ষড়যন্ত্রের সংযোগও আছে। তিনি স্বীকার করলেন,

নিবেদিতার বলেই মনে হয়। অ্যাসকুইথ যেসব 'অস্পষ্ট অভিযোগ' উপস্থিত করেন, তাদের বিষয়ে ঐ নোট-এ বলা হয় : "এই ধরনের দায়িত্বহীন এবং অপমানজনক বিবৃতির সম্বন্ধে মানহানির আইন প্রযুক্ত হোক, সে ইচ্ছা আমরা অবশ্যই করতে পারি। তাহলে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা নিজ বক্তব্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক সাবধান হবেন।" ঘৃণাপূর্ণ ব্যঙ্গে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্বিবেক অসাড়তাকে। অ্যাসকুইথ বলেছিলেন, "৯ জন বাঙালী নেতার নির্বাসন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয় ; তা কেবল নিবারক ব্যবস্থা।" মডার্ন রিভিউ-এর নোট-এ লেখা হল : "হাঁ, অবশ্যই শাস্তি নয়! আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া, স্বাভাবিক আহার্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, স্বাভাবিক কাজকর্মের অধিকার অপহৃত হওয়া—সত্যই কত না সুখের ব্যাপার! যুক্তপ্রদেশের [বর্তমানে উত্তর প্রদেশ] ভয়ানক গুমট রাত্রেও বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থাহীন, প্রায় আলোকশূন্য, নীচু-ছাত, ক্ষুদ্র একটি কক্ষে তালাচাবি বন্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করা অবশ্যই শাস্তি নয় ; মাঝে-মধ্যে দু'একটি চিঠি লেখার সুযোগ ছাড়া কাগজ কালি কলম না দেওয়াও শাস্তি নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।" ব্যঙ্গের ছুরি আরও মর্মভেদী হয়েছে : "আরব্যরজনীর দিন এখন নয়। নচেৎ আশা করতে পারতাম, আহা, সেখানকার কোনো জিন যদি আগ্রা জেলের নির্জন কক্ষে কেবল এক রাত্রের জন্য মিঃ অ্যাসকুইথকে স্থাপন করার ব্যবস্থা করে দিত!"

১১ ইণ্ডিয়া, ১৪ মে, ১৯০৯।
১২ ঐ, ১৪ মে, ১৯০৯।
১৩ ঐ, ১৪ মে, ১৯০৯।
১৪ ইণ্ডিয়া, ২৮ মে, ১৯০৯।

সঠিকভাবে অবশ্য এসব বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই ; তথাপি দাবি করলেন, 'প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করেই তিনি কাজ করেছেন, যদিও সেই সংবাদের প্রকৃতি বা তার উৎস পার্লামেণ্টে জানানো সম্ভব নয়—হতভাগ্য অভিযুক্তদের কাছেও নয়।"[১৫]

১৯ জুন টাইমস্-এ মর্লে-র বক্তব্যের উত্তর দিলেন ম্যাককারনেস। নেশন পত্রিকা—অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির উচ্চ চরিত্র ও জনসেবার উল্লেখসহ মর্লে-র রাজনৈতিক ছলনার বিরুদ্ধে তির্যক ব্যঙ্গ করল : "আমরা যখন দেখি, এই ধরনের [উচ্চ] চরিত্রের মানুষকে বিনা অভিযোগে, বিনা বিচারে পাকড়াও ক'রে ঝটিতি নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে...তখন ভাবতেই হয়, জনসাধারণ ও ভারত সরকারের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। যেভাবেই হোক, এটা না ভেবে পারা যাচ্ছে না যে, 'রাষ্ট্রীয় কারণ' নামক ব্যাপারটাকে ন্যায়বিচার ও ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধীয় পুরাতন উদারনৈতিক ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানো হচ্ছে।"[১৬] উদারনৈতিকদের মধ্যমণি লর্ড মর্লে তাঁর অক্সফোর্ড বক্তৃতায় যখন "সরকারের স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী [ইংরাজ] উদারনৈতিকদের বিষয়ে বললেন, ওঁরা ভারতীয়দের চেয়েও ভারতীয়, এবং তিনি নিজপক্ষে এক্ষেত্রে গোখলের দৃষ্টান্ত দিলেন," তখন ম্যাককারনেস ১৫ জুলাই-এর ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন।[১৭] এই বছরের শেষে হাউস অব কমনস্-এর কার্যকাল শেষ হয় এবং ম্যাককারনেস স্থির করেন, আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না (অর্থাৎ তিনি তাঁর দলের সমর্থন হারান—ভারতের দাবিকে সমর্থন করতে গিয়ে !!) —ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৩ ডিসেম্বর, ১৯০৯, এইসূত্রে লেখা হয় : "পার্লামেণ্ট থেকে মিঃ ম্যাককারনেসের অবসরগ্রহণ আসন্ন। এর দ্বারা যে-আদর্শ ও নীতির সপক্ষে তিনি মুক্তকণ্ঠ এবং আপসহীন সংগ্রামের প্রতিভূতার উপর দারুণতম আঘাত পড়ল। তবে ভারতীয়রা জেনে আনন্দ বোধ করবেন যে, তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটিতে যোগদান করেছেন—সেজন্য তাঁর শক্তিশালী লেখনী ও ব্যক্তিত্বের সহায়তা থেকে ভারত সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে না।"

॥ ৩ ॥ ভারতে পুলিশী অত্যাচারের উদ্ঘাটন : ম্যাককারনেসের সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত : ম্যাককারনেস-মণ্টেগু'র বিতর্ক

ইণ্ডিয়া পত্রিকার উপরি-উক্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্তি অবিলম্বে দেখা গেল—ম্যাককারনেসের নতুন আক্রমণ থেকে। নেশন পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে "ভারতীয় পুলিশের চরিত্র" নামে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, যাদের মধ্যে প্রথমত ১৯০৫ সালের কার্জন-কমিশনের দ্বারা উদ্ঘাটিত পুলিশী অত্যাচারের বর্ণনা ছিল, দ্বিতীয়ত ছিল পূর্বের দুই বৎসরের বাংলা, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারত, অর্থাৎ ভারতের সকল স্থানের বিনাবিচারে নির্বাসন, বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার ও অন্যান্য পুলিশী অত্যাচারের দৃষ্টান্ত। পঞ্জাবে ঘটিত একটি উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত দেবার পরে, তাঁর প্রথম প্রবন্ধের শেষে ম্যাককারনেস মন্তব্য করেছিলেন : "এই ভয়ানক সংবাদটির বিষয়ে এখনো কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি যে, বৃটিশ প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত পুলিশ পঞ্জাবে নির্দোষ মানুষের উপর এমন অত্যাচার করতে পারে যাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, একটি নারীকে তারা খুন ক'রে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল, যে-নারী ঐকালে বহাল তবিয়তে বর্তমান ছিল।"[১৮]

১৫ ঐ, ২৫ জুন, ১৯০৯।
১৬ ইণ্ডিয়া, ২৫ জুন, ১৯০৯।
১৭ ঐ, ২৩ জুলাই, ১৯০৯।
১৮ ঐ—৩ ডিসেম্বর, ১৯০৯।

ম্যাক্কারনেসের লেখাগুলি স্বভাবতই চাঞ্চল্যসৃষ্টি করেছিল। তাঁর সমর্থনে নেশন কাগজে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হল। ম্যাক্কারনেসের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন সংবাদ বেরুল : 'স্বরাজ্য' নামক উর্দু সংবাদপত্রের সম্পাদক নন্দগোপালকে এলাহাবাদের সেসনস্ জজ তিনটি 'সিডিশাস্' প্রবন্ধ লেখার জন্য "প্রতিটি প্রবন্ধের শাস্তি হিসাবে ১০ বৎসর ক'রে নির্বাসনের আদেশ দিয়েছেন ; শাস্তি একসঙ্গে চলবে ; সেইসঙ্গে কোনো এক লাহোর মামলায় অপরাধী প্রমাণ হওয়ায় আরও পাঁচ বছরের নির্বাসন। অ্যাসেসরগণ সর্বসম্মতভাবে নির্দোষ বললেও বিচারপতি উক্ত শাস্তি দেন।"[১৯]

"ভারতবর্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিনাবিচারে ধৃত বন্দীদের উপর উৎপীড়নের বলবৎ রীতি সম্বন্ধে" কেয়ার হার্ডি ও রামজে ম্যাকডোনাল্ড পুনশ্চ যখন হাউস অব কমনস্-এ দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রশ্ন তুললেন তখন সরকারপক্ষ থেকে উত্তর না দিয়ে উপায় রইল না। আণ্ডার-সেক্রেটারি মন্টেগু সে উত্তর দিলেন—এবং তাকে তছনচ্ ক'রে দিলেন ম্যাক্কারনেস ডেইলি নিউজ ও মর্নিং লীডারে পত্র লিখে।[২০]

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে ম্যাক্কারনেস আর একটি কাণ্ড করেছিলেন। নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলন ক'রে *The Methods of Indian Police in the Twentieth Century* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেটি প্রথমে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে, পরে ক্রমান্বয়ে পঞ্জাব, বাংলা-সহ ভারতের সর্বত্র বাজেয়াপ্ত হয়। ক্যালকাটা গেজেটের জুন সংখ্যায় এ-সম্পর্কে বলা হয় : "এই পুস্তিকায়...এমন ধরনের কথা আছে...যা বৃটিশ ভারতে আইন-ভিত্তিক সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অপমানসূচক মনোভাব সৃষ্টির প্রবণতাসম্পন্ন।"

ম্যাক্কারনেসের পূর্ববর্তী প্রচার, প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় যে-ফল হয়নি তা ঘটল পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত হতে। "বাজেয়াপ্ত হবার আগে যেখানে একজন আগ্রহী ছিলেন, এখন সেখানে দশ হাজার জন আগ্রহী—মিঃ ম্যাক্কারনেস প্রতিদিন যে-সংখ্যায় চিঠি পাচ্ছেন তার দ্বারা তা বোঝা যাচ্ছে। ঐ সকল মানুষের কৌতূহল জাগরিত হয়েছে ; সকলেই জিজ্ঞাসা করছেন, পুস্তিকাটিতে আছে কি ? ওর মধ্যে কোন্ মারাত্মক পদার্থ মিলবে ?"[২১]

প্রেস আইনের ভয়ে এই বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে ভারতের দেশীয় কাগজগুলি নম্র-প্রতিবাদের

১৯ ঐ—২২ এপ্রিল, ১৯১০।

২০ ঐ—৬ মে, ১৯১০।

লর্ড মর্লে-র পুরাতন সহকর্মী উইলিয়ম স্টেড 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর মে ১৯১০ সংখ্যায় ম্যাক্কারনেসকে তাঁর পুস্তিকার জন্য অভিনন্দন জানালেন, সেইসঙ্গে মর্লে-র চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রবেশ করাবার চেষ্টাও করলেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ইউরোপ কাঁপিয়েছিলেন ভলটেয়ার—সেই ভলটেয়ারের প্রশস্তিকারক মর্লে—তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর শাসনাধীন ভারতীয় পুলিশী ব্যবস্থাকে সংস্কার করবার, যেখানে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার হল সাধারণ রীতি। (চোখে লোক্তাপাতো ঘষা যে-পদ্ধতিতে মৃদু ব্যাপার)। কিন্তু লর্ড মর্লে সে-প্রকার সংস্কার-চেষ্টা করেননি। স্টেড লিখলেন, ম্যাক্কারনেসের পুস্তিকায় যেসব অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে সেগুলি অতীতের বস্তু নয়, বর্তমানেও তা বলবৎ—তা চালিয়ে যাচ্ছে মর্লে-র সাক্ষাৎ শাসনাধীন ভারতীয় পুলিশগণ। "যদি লর্ড মর্লে তাঁর পুলিশগণকে নিছক সন্দেহের অজুহাতে ধৃত ব্যক্তিদের উপর উৎপীড়ন করা থেকে নিবৃত্ত করতে না পারেন তাহলে ভাবীকাল তাঁর বিষয়ে কী ভাববে ? ভলটেয়ারের উপরে তাঁর রচিত প্রশস্তি-সাহিত্যের দ্বারা অবশ্যই তাঁর বিচার হবে না—সে বিচার হবে, তিনি কী পরিমাণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভলটেয়ারী আদর্শকে ভারতের পুলিশী-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তার দ্বারা।"

মর্লে-র মৃত বিবেককে এইপ্রকারে প্ল্যানচেটে আহ্বানের চেষ্টা থিয়জফিস্ট উইলিয়ম স্টেড বারবার করেছেন—কিন্তু বৃথা ! আধিভৌতিকে আস্থাহীন মর্লেকে ভৌতিকে কবলিত করা যায়নি।

২১ ঐ—১২ এপ্রিল, ১৯১০।

বেশি-কিছু করতে না পারলেও কলকাতার 'ক্যাপিটাল' বা 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' ইত্যাদি সাহেবী কাগজগুলি তীক্ষ্ণ আপত্তি জানিয়েছিল।[২২] বিস্ময়কর হল, গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক সংবাদপত্রগুলি সরকারের কাজের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি, পুস্তিকাটি হাতে না থাকার জন্যই হয়ত, যদিচ এমন সন্দেহ করা হয় যে, মর্লে-র অসন্তুষ্টির ভয়েই লিবারাল প্রেসের এই নীরবতা।[২৩] অপরদিকে ছিল 'স্ট্যাণ্ডার্ড', 'গ্লোব', 'ডেইলি এক্সপ্রেস' প্রভৃতি 'ইয়েলো' কাগজের সমবেত উল্লাস।[২৪]

ভারত সরকারের কৃতকর্মের সমর্থনে এগিয়ে এলেন ভারতসচিবের আণ্ডার-সেক্রেটারি মিঃ মণ্টেগু। তিনি ঢালাও মন্তব্য করলেন : "এই পুস্তিকার প্রতি পৃষ্ঠায় বিপুলসংখ্যক ভুল আছে।" আরও বললেন, "পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাককারনেসের আক্রমণের পক্ষে কোনোই সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।" ম্যাককারনেস তার উত্তরে টাইমস, ডেইলি নিউজ ও অন্যান্য কাগজে চিঠির পর চিঠি লিখে মণ্টেগু'র দায়িত্বহীন উক্তিকে খণ্ড-খণ্ড করলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মণ্টেগু'র পক্ষে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া সম্ভবই হল না। তাঁকে ধিক্কার দিয়ে ইণ্ডিয়া লিখল : "ইংলণ্ডে ভারত সম্বন্ধে লজ্জাজনক অজ্ঞতা বলবৎ—সেই সুপরিচিত ব্যাপারটি ভাঙিয়ে ভক্ষণ করা লিবারাল দলের আণ্ডার সেক্রেটারির পক্ষে অবশ্যই উপযোগী কাজ হতে পারে। ...মিঃ ম্যাককারনেস কর্তৃক এই নির্মম উদ্‌ঘাটনের কোনো [নির্দিষ্ট] উত্তর মিঃ মণ্টেগু দেননি, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ। এই বিতর্কের মধ্য থেকে মিঃ ম্যাককারনেস অক্ষত, অমলিনভাবে বেরিয়ে এসেছেন।"[২৫]

এইবার লিবারাল কাগজগুলি এগিয়ে এল ম্যাককারনেসের সমর্থনে, কারণ তারা মণ্টেগুর কাছ

২২ ঐ—২১ জুন, ১৯১০।

২৩ "The Government Press has preserved a significant silence on the subject both of the interdict and of the official defence. Not one line has been published in the editorial columns of the *Manchester Guardian* or of the London Liberal newspapers...*As Lord Morley is understood nowadays to look upon criticism of his Indian policy as a personal attack upon himself, they are no doubt wise in their forbearance.* But their reticence is thrown into stately relief by the braying trumpets of the Yellow Press, which has once more overwhemled the Secretary of State with praise." [*India*, July 1, 1910.]

২৪ স্ট্যাণ্ডার্ড লেখে :

"Mr Keir Hardie might be trusted to protest, as he did in the House of Commons, against the steps taken by Lord Minto's Government to stop the circulation in India, of a mischievous pamphlet written by the late member for Newbury.... When, to preserve public tranquility, natives of India are placed in confinement without trial; when, with the same object their liberty of speech and action is sternly restricted, it is neither just nor expedient that wrongheaded or malignant persons in England should be permitted to aid and abet them in maligning British rule."

গ্লোব লেখে :

"We do not think that, outside of an extremely small and singularly foolish set of politicians, Mr Keir Hardie will succeed in arousing much indignation at the sadly cold reception extended to his friend's pamphlet in India. We really do not care two straws whether Mr Mackarness can or cannot verify every charge brought against the Indian police in this precious document. If it were all as true as gospel—which, by the way, we take leave to doubt—the various local Indian Governments which have prohibited its circulation would be abundantly justified in the action." [Quoted in *India*, July, 1910]

উদারনৈতিক সংবাদপত্রগুলির নীরবতার শূন্যতা ভরাট করে দিয়েছিল ইয়োলো প্রেসের কর্কশ ড্রামের আওয়াজ—উদ্ধৃত অংশে তার নমুনা আছে।

২৫ ঐ—৫ অগস্ট, ১৯১০।

থেকে 'ঢালাও অভিযোগের' বেশি কিছু পায়নি। মর্নিং লীডার ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বলল : "ভারতীয় পুলিশী ব্যবস্থা কেলেঙ্কারীর জয়ঢাক ও দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ড—তা হবার পক্ষে না-হয় সাফাই আছে, কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে পুলিশী ব্যবস্থার চরিত্র ঐ প্রকার নয় বলে ভঙ্গি করার কোনো সাফাই নেই।" ডবলিউ পি বায়লস্, এম-পি, বললেন : "মহামান্য রাজার একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে জনসমাজে সুপরিচিত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগ আনা গুরুতর ব্যাপার—অধিকতর গুরুতর ব্যাপার তার পক্ষে প্রমাণ না দেখিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা।"[২৬] নিরতিশয় কঠিন হল নেশন পত্রিকার আঘাত : "ভারতীয় পুলিশ সম্বন্ধে রচিত একটি পুস্তিকাকে দমনের সমর্থনে মিঃ মণ্টেগু এমন উগ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন যা এই ধরনের কাজে আনাড়ি আনকোরা এক তরুণ মন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত অযোগ্য কাণ্ড। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছেন—উদারনৈতিকতার পক্ষে যাঁর নির্ভয় সেবাকে অনুসরণ করার সাধ্য মিঃ মণ্টেগুর হবে না।" ম্যাককারনেসের পুস্তিকা নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রচিত, একথা বলার পরে, নেশন আরও লিখল : "ব্যক্তিগত জীবনে সর্বোচ্চ নৈতিকতা এবং জনজীবনে অতি মর্যাদাময় কীর্তির অধিকারী কোনো ইংরাজ রাজনৈতিকের লেখনী-নির্গত একটি ডকুমেণ্ট যদি 'সিডিশাস্' বিবেচিত হয় তাহলে ভারতীয় সাংবাদিকরা আর কোন্ সুবিবেচনা পেতে পারেন যখন তাঁরা অন্যায়ের উদ্ঘাটনে এমন ভাষা প্রয়োগ ক'রে ফেলেন যা নাকি সরকারকে 'ঘৃণা ও অপমানের' সম্মুখীন ক'রে দেয়?" সরকারের সমর্থক প্রধান পত্রিকা তখন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান—তার পক্ষেও চুপ ক'রে থাকা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটি লিখল : মণ্টেগু সম্ভাবনাময় তরুণ রাজনীতিক ; তিনি যদি ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে চলেন, নিজ মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান না হন, তাহলে জনগণের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলবেন। এই কথাগুলিই তীক্ষ্ণতর ভাষায় নেশন বলল : "মিঃ মণ্টেগু তরুণ—আর তরুণরা যখন গুরুতর ভুল ক'রে বসে, যা তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে ফেলে, তখনও সেই ভুল তারা স্বীকার করে না। মিঃ মণ্টেগু সেই ভুল ক'রে বসেছেন যখন তিনি তাঁর স্বদল লিবারাল পার্টির এমন এক ব্যক্তিকে ঘাঁটিয়েছেন যিনি উচ্চ চারিত্রশক্তিসম্পন্ন এবং বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সামর্থ্যযুক্ত। মিঃ মণ্টেগু যদি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে মূল্যবান মনে করেন তাহলে ঐ ভুল দূর করতে বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না, বিশেষত যখন তা না-করার তাৎপর্য তাঁর নিজের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে।"[২৭]

মণ্টেগু বলাবাহুল্য 'তাৎপর্য' বুঝেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক—নৈতিক নন। রাজনৈতিক জীবন অব্যাহত থাকা পর্যন্ত অবুঝ থাকার স্বাধীনতা তিনি গ্রহণ করতে পারেন—কিন্তু তার বেশি নয়। সুতরাং মণ্টেগু তাঁর নির্বাচন-স্থান নিউটনে উপস্থিত হয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ম্যাককারনেসের বক্তব্য খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন, এবং যেহেতু খণ্ডন করা সম্ভব ছিল না তাই উত্তপ্ত অর্ধসত্য ও অসত্যের ফোয়ারা ছোটালেন। ম্যাককারনেস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে মণ্টেগুকে স্বরূপে দেখিয়ে দিলেন। "মিঃ মণ্টেগুর প্রচণ্ডতা বাড়ছে হুহু ক'রে [ম্যাককারনেস লিখলেন] ; আমার 'পুস্তিকার প্রতি পৃষ্ঠায় বিপুল পরিমাণ ভুল রয়েছে'—এই অপেক্ষাকৃত মৃদু অভিযোগ থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি উগ্র বর্ণরঞ্জিত এই চিত্রটি হাজির করেছেন—'পুস্তিকাটি জঘন্য এবং দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত', তা 'দেশপ্রেমিক প্রতিটি ভারতীয় ও ইংরেজের কঠিনতম নিন্দার যোগ্য'।"[২৮]

২৬ ঐ—৫ অগস্ট, ১৯১০।
২৭ ঐ—১২ অগস্ট, ১৯১০।
২৮ ঐ—১৯ অগস্ট, ১৯১০।

এরপরে সমস্ত লিবারাল সংবাদপত্র মণ্টেগুকে নাজেহাল ছাড়া আর কিছু করেনি। "মিঃ মণ্টেগুর বক্তৃতা [ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল] মিঃ ম্যাককারনেসের বিরুদ্ধে নিজ আচরণের সমর্থনে প্রধানাংশে বাক্যের ফুলঝুরি—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পৃষ্ঠপোষণে নিয়োজিত এক মহাবীরকর্ম। এই প্রকার তলোয়ার ঘোরানোর কাজটা ছোটখাট থিয়েটারের জন্য রেখে দেওয়াই উচিত ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পক্ষ সমর্থনের জন্য ইংলণ্ডের রাজনীতিকরা ভদ্রতাবোধ কিংবা তথ্যদানের প্রয়োজনবোধ হারাবেন—না, সে বস্তুতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজন নেই।"[২৯]

ম্যাককারনেস ভারতের জন্য কী করেছিলেন, তার রূপ সেকালের ভারতীয়দের পক্ষে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব ছিল না—প্রেস-আইনের বজ্রবন্ধন এমনই তখন।[৩০] কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতীয় সমাজ তা জেনেছিলেন। ম্যাককারনেসের 'ভারতীয় বন্ধু ও অনুরাগীরা' লণ্ডনে তাঁকে এক 'ধন্যবাদ-ভোজ' দেন, যাতে বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—স্যার এম ভবনগিরি, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, জি এস খাপার্দে, এম কে তায়েবজি। ভারতবন্ধু ইংরাজদের মধ্যে ছিলেন—এইচ ডবলিউ নেভিনসন, জি পি গুচ, এল ডবলিউ রিচ। সভাপতি জে এম পারিক বলেছিলেন: "মিঃ ম্যাককারনেস পুরনো ধারার লিবারাল, বলদর্পীর বিরুদ্ধে দুর্বলের সমর্থনে অগ্রবর্তী, বিশেষত সেইসব দুর্বলের পক্ষে তিনি দণ্ডায়মান, যাদের বিষয়ে ভ্রান্ত প্রচারের, বিভ্রান্তি সৃষ্টির সীমা নেই, যেমন হয়েছে ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে। 'ইণ্ডিয়ান সিভিল রাইটস্ কমিটি'—ভারতে স্বাধীনতা সংরক্ষণে অদ্ভুত কাজ করেছে—তার সংগঠনে এঁর প্রভাবশালী ভূমিকা।"[৩১]

অল্পাধিক উপস্থাপিত এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়—নিবেদিতা কেন নির্বাসিতদের মুক্তি-ব্যবস্থায়, বা অরবিন্দর গ্রেপ্তার বিলম্বিত করার ব্যাপারে, ম্যাককারনেসের প্রবল চেষ্টার কথা বলেছেন। এর থেকে আরও বুঝতে পারি—নিবেদিতা কেন ইংলণ্ডে ভারতপক্ষে জনমত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উত্থাপন করেছেন। পরের অধ্যায়ে এই বিষয়টির উপর তথ্যযোজনা করব।

নিবেদিতার পত্রে ম্যাককারনেস সম্বন্ধে আরও দু'একটি উল্লেখের মধ্যে মণ্টেগুর 'পুনরাক্রমণে'র কথা আছে। তিনি বলেছেন, "মণ্টেগু মনে হচ্ছে অতীব তরুণ এবং অতীব ইহুদী।" (১-৯-১৯১০)। নিবেদিতার চিঠি থেকে বোঝা যায়, ভারতের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ম্যাককারনেসকে কতখানি বিপাকে পড়তে হয়েছিল। নিবেদিতা ১ ডিসেম্বর, ১৯০৯ র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন:

"ম্যাককারনেস সম্বন্ধে অবশ্যই যথাসাধ্য করব।...আশা করা যায়, তাঁকে বেশিদিন অবসরে থাকতে হবে না। অত্যন্ত মূল্যবান কাজ তিনি করেছেন—তাঁকে ছাড়ান দেওয়া যায় না।"

২৯ ঐ—১৯ অগস্ট, ১৯১০।
রিভিউ অব রিভিউজ অগস্ট ১৯১০ সংখ্যায় বলেছিল, ভারত সরকার ম্যাককারনেসের পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করার পরে

ম্যাককারনেস সম্বন্ধে নিবেদিতার কী করবার ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি কী করেছিলেন, তা জানি না, তবে দেখি, তিনি ৭ এপ্রিল, ১৯১০ তারিখে র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন :

"আশা করি, ম্যাককারনেস যে-কাজ চেয়েছিলেন, তাই পাচ্ছেন।"

মণ্টেগুর পক্ষে তা সমর্থন না ক'রে, এবং সেই কার্যকালে ম্যাককারনেসকে গালমন্দ না ক'রে, উপায় ছিল না। মণ্টেগু এই কাজ করবার সময়ে মাত্রা ছাড়িয়েছিলেন। এই পত্রিকা সেই প্রসঙ্গে লিখেছিল : "কিন্তু মিঃ ম্যাককারনেসের পুস্তিকা যদি রাশিয়ার কারাগারে উৎপীড়নের বিষয়ে রচিত হত তাহলে তার দমনকার্যে মিঃ মণ্টেগু কদাপি এগিয়ে আসতেন না। মিঃ ম্যাককারনেসের পুস্তিকার বিষয়বস্তু দুঃখের বিষয় বাস্তব সত্য : ভারতবর্ষে উৎপীড়ন সর্বদাই ছিল, থাকবেও ; সরকারের সমর্থনে না হলেও সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেই, সরকারীভাবে সেটা পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হয়েছে। মিঃ ম্যাককারনেস কেবল সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি একত্রে গেঁথেছেন এবং সরকারকে তার ন্যায়শাসনের মধ্যে বলবৎ এইসকল অমানবিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনে অধিক দৃঢ় ও তৎপর হতে বলেছেন। মিঃ ম্যাককারনেস তাই মিঃ মণ্টেগুর বিদ্রূপের পাত্র না হয়ে সরকারের পুরস্কারের পাত্র হতে পারতেন।"

৩০ ম্যাককারনেসের কার্যবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাসা-ভাসা কিছু সংবাদ দেশী কাগজে বেরিয়েছে। মডার্ন রিভিউ-এ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সংখ্যায় বেরিয়েছিল 'ম্যাককারনেস প্যামফ্লেট' নামে একটি নোট। এর আগে, ঐ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায়, 'দি ক্যারেক্টার অব দি পুলিশ' নামক নোট-এর মধ্যে মর্নিং লীডারে প্রকাশিত ভারতের পুলিশী চরিত্র বিষয়ে ম্যাককারনেসের পত্রের দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছিল। সেখানে ডেইলি নিউজে প্রকাশিত র‍্যাটক্লিফের চিঠির উদ্ধৃতিও ছিল। তারপর মডার্ন রিভিউ মন্তব্য করে : "ভারতে ইংরাজ প্রশাসকরা যে-কোনো সংখ্যার খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে, তারা যে-কোনো সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু ঘটনাগতি নিয়ন্ত্রণের শক্তি তাদের নেই।" প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই নোট-এর শেষাংশে নিবেদিতার প্রিয় মাৎসিনী থেকে উদ্ধৃতি ছিল।

৩১ ইণ্ডিয়া, ১২ আগস্ট, ১৯১০।

অষ্টম অধ্যায়

ভারত-সমর্থক ইংরাজ সাংবাদিক ও রাজনীতিক

॥ ১ ॥ ভারত-সমর্থক ইংরাজদের বিষয়ে নিবেদিতার প্রবন্ধ

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরাজদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ১৯০৯ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন—*Our Friends in Parliament and Outside.* লেখাটিতে লেখকের নাম ছিল না, তবে এটি নিবেদিতারই—আত্মপ্রাণাও নিবেদিতা-জীবনীতে তাই বলেছেন।[১]

এই লেখাতে নিবেদিতা কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জোরালো সমর্থন জানান। এই বৃটিশ কমিটিই ইণ্ডিয়া পত্রিকা চালাতেন।

ন্যাশন্যালিস্টদের মধ্যে এই কমিটির প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রে নানাপ্রকার মন্তব্য করা হচ্ছিল। নিবেদিতা সুস্পষ্টভাবে এইসকল সমালোচনার বিরোধিতা করেছেন। পৃথিবীর কোনো মানুষের চেয়ে আত্মশক্তির নীতিতে নিবেদিতা কম বিশ্বাসী ছিলেন না; এই প্রবন্ধেও পরিষ্কার বলেছেন :

"কোনো স্বাধীনতাই যোগ্যপ্রাপ্তি নয় যদি না তা স্বাধীনতাকামীদের সক্রিয় আত্মঘোষণার দ্বারা অর্জিত হয়।...আমাদের ভাগ্য আমাদেরই হাতে সে ভাগ্য আমরা নির্মাণ করব ভারতবর্ষেই।"

কিন্তু নিবেদিতার রাজনৈতিক বুদ্ধি বৈদেশিক প্রচারের গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি—বিশেষত তার দ্বারা যখন ভারতবর্ষ উপকৃত হচ্ছিল। [কী উপকার, তা কিছুটা ইতিমধ্যে দেখে এসেছি]। নিবেদিতা দেখেছেন—ইণ্ডিয়া পত্রিকা নানা সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, তাদের সুশৃঙ্খল ও সংহতভাবে প্রকাশও করে; বৃটিশ কমিটির অফিসে ভারত-বিষয়ে মূল্যবান নথিপত্র রাখা হয়, যাকে আগ্রহীরা ব্যবহার করেন; পার্লামেন্টে ভারত-পক্ষে প্রশ্ন তোলার সময়ে ঐসব তথ্য অত্যন্ত কাজে লাগে। জাপান ও অন্য অনেক দেশ বৈদেশিক প্রচারের জন্য কতখানি অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করে—তার উল্লেখের পরে নিবেদিতা ইণ্ডিয়া পত্রিকা বন্ধ করার প্রস্তাবকে অত্যন্ত অসমীচীন বলে বর্ণনা করেন। পরবর্তী কালে আমরা দেখি, আপসহীন স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিভূ সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি একই প্রকার ছিল। গান্ধীজী, বৃটিশ কমিটি ও ইণ্ডিয়া পত্রিকা বন্ধ ক'রে দিলে সুভাষচন্দ্র তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।[২]

১ আত্মপ্রাণা, ২১২।

২ "There was one resolution [passed by the Nagpur Congress in December 1920] which must be regarded as a great blunder. That was the decision to wind up the British Branch of

নিবেদিতা উক্ত প্রবন্ধে তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়ে দেন : ইণ্ডিয়া পত্রিকায় যদি 'ভিক্ষানীতি' দেখা যায়, তার দায়িত্ব বৃটিশ কমিটির নয়—দায়িত্ব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-নীতির, যা উক্ত পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়। উল্টোদিকে বলা যায়, বৃটিশ কমিটির সদস্যরা অনেক সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অপেক্ষা অধিক সাহসিক মনোভাব দেখান, যাকে ভারতীয় নেতারা আবার অপছন্দ করেন। ইংলণ্ডে যাঁরা ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক তাঁরা "ভারতে ইংরেজ অধিকার বলবৎ রাখায় আগ্রহী"—এই ধারণার প্রতিবাদ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন—"কোনো জাতিরই অপর জাতিকে শাসনাধীনে রাখার অধিকার নেই—একথা বোধ করার ও বলার মতো মানসিক উদারতা এঁদের আছে। এঁরা সাম্রাজ্যের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন। সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ যে, স্বদেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করার ঝুঁকি নেয়—সেকথা বলবার মতো দেশপ্রেমের এঁরা অধিকারী।" ইংলণ্ডের ভারত-সমর্থকেরা যেসব ত্যাগস্বীকার করছেন, তাদের মূল্য স্বীকার না করে ভারতবাসী নিজেদের অকৃতজ্ঞ প্রতীয়মান করছে—এটাই নিবেদিতার কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছিল। যাঁরা কমনস্-সভায় ভারতের স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন, তাঁরা সেকাজ করেন, "মানবতা ও নৈতিকতাসম্পন্ন রাজনীতির জন্যই।" নিবেদিতা যোগ করেছেন, "ঐসব কাজ ক'রে তাঁরা মস্ত ঝুঁকি নেন, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের আসন হারাবার সম্ভাবনার সম্মুখীন পর্যন্ত হন।" [ম্যাককারনেসের বরাতে কী ঘটেছিল, দেখে এসেছি]। স্বাধীনচিত্ততা দেখিয়ে দল-প্রভুদের চটিয়ে দেবার ফল—নির্বাচনে মনোনয়ন না-পাওয়া থেকে শুরু ক'রে বৃটিশ মন্ত্রীসভায় স্থান না-পাওয়া, বা ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদ হারানো পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—নিবেদিতা জানিয়েছিলেন।

কমনস্-সভায় ভারত-পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা কয়েকজনের নাম করেছেন, যথা স্যার হেনরি কটন, মিঃ ফ্রেডরিক ম্যাককারনেস, ডাঃ ভি এইচ রাদারফোর্ড, মিঃ কেয়ারহার্ডি, মিঃ জে হার্ট-ডেভিস, মিঃ জেমস ও'গার্ডি, মিঃ সি জে ও'ডনেল, মিঃ সুইফট ম্যাকনীল এবং মিঃ উইলিয়ম রেডমণ্ড। বন্ধু সাংবাদিকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন : এইচ ডবলিউ নেভিনসন, এস কে র‍্যাটক্লিফ, হাইণ্ডম্যান। এই সঙ্গে মর্নিং লীডার, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ডেইলি নিউজ, স্টার, নিউ এজ, লেবার লীডার, জাস্টিস প্রভৃতি কাগজের সম্পাদকদের কথাও বলেছিলেন।

ন্যাশন্যালিস্ট-মহলের ঠিক কাদের সমালোচনার উত্তরে নিবেদিতা আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না। লক্ষ্য করা যায়, জেল থেকে বেরুবার পরে বিপিন পাল নিজের পূর্ব মত বদলে ফেলে ইংলণ্ডে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে প্রচারে নেমে পড়েন (এ-বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি), সেইসঙ্গে তিনি ভারতীয় অবস্থা বিষয়ে ইংলণ্ডে উপযুক্ত প্রচারের প্রয়োজনের কথাও জোরের সঙ্গে বলতে থাকেন। পালের চিন্তা ও বাগ্মিতাশক্তি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ এবং বন্দেমাতরম্—মামলায় পালের কারাবরণ-কার্যের জন্য কৃতজ্ঞ অরবিন্দের পক্ষেও কিন্তু পালের পরিবর্তনকে পরিপাক করা সম্ভব হয়নি। তিনি পাল-প্রস্তাবিত ইংলণ্ডে প্রচারকাজের ঔচিত্যকে অগ্রাহ্য করে 'ধর্ম' পত্রিকায় ১৮ আশ্বিন ১৩১৬, লিখলেন, "আমরা সেইরূপ চেষ্টায় আস্থাবান নই। আমরা বর্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্র বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সেইহেতু আত্মশক্তি অবলম্বন ও

the Indian National Congress and stop publication of its organ the paper *India*. With the carrying into effect of this resolution, the only centre of propaganda which the Congress had outside India was shut down." [Subhas Ch. Bose, *Indian Struggle*, 1948 edition, 69]

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে সর্বদাই বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনের কথা বলেছেন, এবং সে-ব্যাপারে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের গণ্ডীবদ্ধ আত্মতুষ্ট মনোভাবের সমালোচনা করেছেন।

বৈধ প্রতিরোধ সমর্থন করি।" [গিরিজাশঙ্কর, ৮০২]। পালের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচলিত অরবিন্দ ২৫ আশ্বিন তারিখে পুনশ্চ লিখলেন, "দেখিতেছি, বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে বিপিনবাবুর মত কতক পরিবর্তিত হইয়াছে।" পালের বক্তব্য ছিল : ইংরেজ দেবতা নয় সত্য, তবে তারা পশুও নয়, তাদের গুণ আছে, বিবেকবুদ্ধি আছে, তারা অন্যায়ের পক্ষপাতীও নয় ; ইংরেজের বিবেককে জাগিয়ে তুলে ভারতে তার নিগ্রহনীতি বন্ধ করতে হবে ; ভারতীয় শাসকরা বিলাতে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার নিরাকরণে বিলাতে সত্য প্রচার দরকার ইত্যাদি। অরবিন্দ বললেন, ইংরেজ অবশ্যই পশু নয়, তারা অবশ্যই মানুষ, এবং "মানুষ নিজ স্বার্থেই অনলস যুক্তি করিয়া নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত।" [অরবিন্দ রচনাবলী, ৩-২০৪]। একই তারিখে অরবিন্দ লিখেছিলেন, রামজে ম্যাকডোনালড় "বিলাতের একজন প্রধান প্রজাতন্ত্র সমর্থক, বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রবাদীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন"—কিন্তু তিনিও মর্লে-র শাসনসংস্কারের উদারনীতির প্রশংসাকারী, সেক্ষেত্রে "দেশবাসী বুঝুন, বিলাতের আন্দোলন করায় আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ফললাভের সম্ভাবনা কত সুদূরপরাহত।" কর্মযোগিন্ পত্রিকার ৯ অক্টোবর ১৯০৯ সংখ্যায় অরবিন্দ বিপিন পালের প্রচারের বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ('ন্যাশন্যালিস্ট ওয়ার্ক ইন ইংলণ্ড')। পাল ইংলণ্ডে ন্যাশন্যালিস্ট ব্যুরো বা এজেন্সি স্থাপনের সুপারিশ করেন। অরবিন্দ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন : পাল মত বদল করে ন্যাশন্যালিস্ট দলের স্বীকৃত মতের বিরোধিতা করছেন (তাহলে দেখা গেল, অরবিন্দ-দলভুক্ত বিপ্লবীরা এবং নিবেদিতা ঠিকভাবেই পালের চরিত্র বিচার করেছিলেন, অথচ পালকে সরিয়ে দেবার জন্য অরবিন্দ আগে স্বদলীয় কর্মীদের তিরস্কার করেছেন) ; দলের অধিকাংশ মানুষ মনে করে, দেশে সংগঠনই আসল কাজ, ইংলণ্ডে প্রচারকাজ কর্মশক্তি ও টাকার অপব্যয়। পাল বলেছিলেন, রয়টারের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে ঠিক তথ্য প্রচার করলে বিলেতী ইংরেজরা ভারতের খাঁটি অবস্থা বুঝতে পারবেন। অরবিন্দের বক্তব্য, ওরা খাঁটি খবর জানলেও কোনো ফলোদয় হবে না, কারণ ওরা ভারতীয়দের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলে মনে করে। অরবিন্দ স্বীকার করলেন, ম্যাককারনেস ও তাঁর বন্ধুরা পার্লামেন্টে নির্বাসিতদের মুক্তির জন্য যে প্রবল প্রচার চালাচ্ছেন, তা দেখে তাঁর দলের মত পুনর্বিবেচনার কথা মনে ওঠে, এবং কে জানে হয়ত কার্জন উইলির হত্যাকাণ্ড ঘটে না গেলে নির্বাসিতদের মুক্তি ঘটে যেতই। কিন্তু শেষপর্যন্ত, অরবিন্দ প্রস্তাবটিতে সায় দিতে পারলেন না যেহেতু দেখেছেন যে, এ-ব্যাপারে হেনরি কটন প্রভৃতির আশাবাদ কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজ-চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রেও পালের সঙ্গে অরবিন্দের মতপার্থক্য ঘটেছে। পাল ইংরেজের 'সুসভ্য বিবেকের' উপর আস্থা রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই সুসভ্য বিবেকের প্রকৃতি এবং পরিমাণ এমনই বিচিত্র ও হিসাব-বহির্ভূত যে, অরবিন্দ তার উপর নির্ভর করতে রাজি হন নি। তিনি দেখেছেন, ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ইংরেজ একগুঁয়ে, বাস্তববাদী, কর্মপটু ; তারা পাথরে মাথা ঠুকে শিক্ষা নেয় ; বুদ্ধিমত্তা ও সহানুভূতির ব্যাপারে তারা গোলমেলে অনিশ্চিত। (নিবেদিতা সাধারণ ইংরেজ-চরিত্রের আরও কড়া সমালোচনা করেছেন, গোখলে-প্রসঙ্গে আগেই দেখেছি)।

বিপিন পালের মতের বিরুদ্ধেই কেবল নয়, সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও অরবিন্দ কলম ধরেছিলেন। এর কয়েক মাস আগে সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গিয়ে বক্তৃতাদি করে প্রচুর সংবর্ধনা পান। তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি (এবং মডারেটরা) লণ্ডনে কংগ্রেস অধিবেশন বসাবার প্রস্তাব করেন। ২১ অগস্ট ১৯০৯, কর্মযোগিন-এ অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লেখেন : নিজের বাগ্মিতায় মোহিত সুরেন্দ্রনাথ তার তুচ্ছতা সম্বন্ধে অন্ধ, সেজন্য লণ্ডনে কংগ্রেস অধিবেশনের পুরনো কথাটা পাড়ছেন, যাতে অযথা বিপুল অর্থব্যয় হবে। ওটা ঘটলে নির্ঘাত বিপুল মজার কাণ্ড দাঁড়াবে। ভারতীয় আন্দোলনের লড়াইতো বিলেতী গণতন্ত্রের সঙ্গে নয়, ও-বস্তু ইংরেজের জন্য ইংলণ্ডে আবদ্ধ। ভারতের লড়াই লণ্ডনের ভারত-বিষয়ক দপ্তরের সঙ্গে এবং ভারতের ইংরাজ প্রশাসক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে। অরবিন্দ স্মরণ করালেন, স্যার হেনরি কটন অথবা মিঃ ম্যাককারনেস পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষের কথাই বলেন। পরের সপ্তাহে ২৮ অগস্ট ১৯০৯ কর্মযোগিন্-এ একই প্রসঙ্গে লিখবার সময়ে অরবিন্দ নিজ মত কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, ইংলণ্ডে প্রচারে ফলোদয় হতে পারে যদি বহু বৎসর ধরে ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়। তিনি

স্মরণ করালেন, ভারতীয় স্বার্থ-সমর্থক ইংরেজরা সর্বদাই স্বদেশে সংখ্যালঘু থাকবেন, কেননা মনে করা হবে তাঁরা বৃটিশ-স্বার্থের শত্রুতা করছেন। নিবেদিতার বক্তব্যমতো অরবিন্দ স্বীকার না করে পারলেন না, ম্যাককারনেস প্রমুখরা ভারত-সমর্থনের জন্য সত্যই নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বলি দিয়েছেন :

"Those who are on the side of Indian interests must always be in the minority and will always be denounced by the majority as allies of the enemies of English intersts. Even now that is increasingly the attitude of the public towards Mr. Mackerness and his supporters and we do not think Sj. Surendranath's eloquence has changed matters. Already the most prominent critics of Lord Morley and his policy of repression have received intimation from their constituents of their serious displeasure and are in danger of losing their seats at the next election." [*Karmayogin*, Aug., 28, 1909 ; Sri Aurobindo Works, Vol. II, p.p. 170-71]

সুতরাং অরবিন্দের মতে ('ধর্ম', ৭ ভাদ্র ১৩১৬), "এই ভূতশ্রাদ্ধে অজস্র টাকা" ঢালার হেতু নেই।

লক্ষণীয়, অরবিন্দর মতের অনেকখানি অংশের মধ্যে নিবেদিতার মতৈক্য ছিল—যেমন, সাধারণ ইংরাজের স্থূল স্বার্থপর অর্থলোভী চরিত্র সম্বন্ধে কিংবা পরিবর্তিত বিপিন পালের বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের পক্ষসমর্থন সম্বন্ধে। বরং বলা যায়, এই দুটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার মনোভাব কঠিনতর। কিন্তু তাই বলে নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বৈদেশিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কদাপি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। এবং তিনি উদারনৈতিক ইংরাজদের প্রয়াসের মূল্যকে লঘু করে দেখা বা দেখানোর চেষ্টা দেখে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। উদারনৈতিকদের প্রয়াসের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তিনি নিজে ব্যাপারটির সংগঠনের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন। কোন্ ঝুঁকি নিয়ে উদারনৈতিক ইংরাজরা ঐ কাজ করছিলেন তা জানতেন বলে আগেই বলেছি, তার উপযুক্ত স্বীকৃতি না দেওয়া তাঁর কাছে অকৃতজ্ঞতা বলেই প্রতীয়মান। নিবেদিতা রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রয়াসের পক্ষপাতী, গোপন ও প্রকাশ্য সর্ববিধ রাজনৈতিক প্রয়াসের তিনি সমর্থক।

স্মর্তব্য, সুরেন্দ্রনাথের 'লণ্ডনে কংগ্রেস' প্রস্তাব বা বিপিন পালের ইংলণ্ডে কংগ্রেসী প্রচার-প্রস্তাবের উপর অরবিন্দর আলোচনার (যে গুলির উল্লেখ আমি করেছি) বেশ কয়েক মাস আগেই ১৯০৯-এর এপ্রিল মাসে নিবেদিতার প্রবন্ধ বেরিয়ে যায়। কিন্তু 'ইণ্ডিয়া' কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে অরবিন্দ কিছু লিখেছিলেন কিনা এখনো জানি না।

॥ ২ ॥ শ্রমিক-নেতা কেয়ার হার্ডি প্রসঙ্গ

ইতিমধ্যে নানা প্রসঙ্গে কেয়ার হার্ডির উল্লেখ করেছি। বৃটিশ লেবার পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা এই ব্যক্তি—১৯০৭ সালে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও রচনা—ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে উদ্দীপনা এবং সরকারী মহলে বিরক্তির কারণ হয়। তিনি সেপ্টেম্বর ১৯০৭, কলকাতায় পৌঁছলে দেশীয় কাগজগুলির কাছ থেকে উদ্দীপ্ত সংবর্ধনা লাভ করেন।[৩] কেয়ার হার্ডির ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার প্রভূত বিবরণ সংবাদপত্রগুলিতে বেরিয়েছিল। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৭ তারিখে 'লেবার লীডার' কাগজে লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি ভারতে পুলিশী নির্যাতনের সমালোচনা ক'রে বলেন, তা রাশিয়ার অত্যাচারের সমতুল—আর এই অত্যাচারই চরমপন্থীদের তৈরী করে দিচ্ছে। বাংলায় অত্যাচার-উৎপীড়নের দীর্ঘ বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন।[৪] ভারতে অশান্তির কারণ ও চরিত্র,

৩ ইণ্ডিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭।

৪ *Labour Leader*, Dec. 27, 1907. *How Extremists Are Made. Mr Keir Hardie At Mymensingh And Barisal.* Quoted in *India*, January 3, 1908.

৫ *Labour Leader*, January 3, 1908. *Among The People In Eastern Bengal. Mr Keir Hardie's Story Of What He saw.* Quoted in *India*, January 10, 1908.

৬ *India*, April 17, 1908. *The Situation In India. Mr Keir Hardie, M. P., And Mr Nevinson On Their Visit And Its Impressions.*

এবং তার দমনে সরকারের অযৌক্তিক প্রয়াসের বহু বিবরণও তিনি দিয়েছেন।[৫] লণ্ডনে বক্তৃতা সভাতেও নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন।[৬] গোটা বক্তব্য গ্রন্থাকারে তিনি প্রকাশ করেন।[৭] একই কাজ করেছিলেন রামজে ম্যাকডোনাল্ড—ভারতভ্রমণের অন্তে।[৮]

কেয়ার হার্ডি ও রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে ও বাইরে হৈ-চৈ বাধিয়েছিলেন। নিবেদিতা, অরবিন্দের শেষ প্রবন্ধটি ইংলণ্ডে কিভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, তা আগেই দেখেছি। তার উল্লেখ ক'রে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ২৮ এপ্রিল, ১৯১০, যে-চিঠি লেখেন ; তার মধ্যে অরবিন্দের গ্রেপ্তার ঠেকানোয় রামজে ম্যাকডোনাল্ড ও কেয়ার হার্ডির প্রচণ্ড প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। [অংশটি আগেই উদ্ধৃত]

ঐকালে একটা কথা বাজারে চলিত হয়েছিল—বিনা বিচারে নির্বাসিত বাংলার ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি ঘটেছে উদারনৈতিক লর্ড মর্লে-র অনুতপ্ত বিবেকের প্ররোচনায়। নিবেদিতা তা অগ্রাহ্য ক'রে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০, তারিখে র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখলেন : "একথা শোনা যাচ্ছে—নির্বাসিতদের মুক্তি ঘটেছে মর্লে-র বিবেকের জন্য নয়—কেয়ার হার্ডি ও রামজে ম্যাকডোনাল্ডের চেষ্টার জন্যই।" এর পরেই নিবেদিতা তিক্তভাবে যোগ করেছিলেন : "আর সেই তরুণ গর্দভ বর্ধমানের মহারাজা কিনা কেয়ার হার্ডি সম্বন্ধে বলেছে—'সাদা কুলিদের সর্দার।'" বর্ধমানের এই তরুণ মহারাজার কাপুরুষতার জন্য নিবেদিতার তীব্র ঘৃণার কথা আগেই বলেছি। ইংরাজ প্রশাসকদের বাহবার লোভে মহারাজা কেয়ার হার্ডি সম্বন্ধে ঐ নোংরা মন্তব্যটি করেছিলেন। সে কথার বিরুদ্ধে মডার্ন রিভিউ-এ জুলাই, ১৯১০, "দি হোয়াইট সর্দার কুলি" নামে একটি লেখা বেরোয়, লেখকের নাম 'ইজ্জত', (শান্তাদেবীর মতে তিনি লাজপত রায়)—লেখাটির পিছনে নিবেদিতার হাত থাকা বিচিত্র নয়। নিষ্ঠুর আক্রমণে প্রচণ্ড সেই রচনা। মহারাজার স্পর্ধার পিছনে কাদের মদত, সে সম্বন্ধে বলা হয় : "ভারতের ক্রমোত্থিত শিক্ষিত গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাসি ও ভূমিনির্ভর আভিজাত্য কিভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে—[মহারাজার] ঐ মন্তব্য তার পক্ষে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ।" অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাসি আগে বাঙালী জমিদারদের সর্বপ্রকার পাপের আকর মনে করত—কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ধাক্কায় তারা ধারণা বদল করে ফেলেছে—এখন জমিদারদের সাহায্য যে তার চাই! আমলাতন্ত্রের ডাকে সোৎসাহে সাড়া দিয়ে যেসব জমিদার এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদেরই একজন উক্ত বর্ধমানের মহারাজাকে 'ইজ্জত' নামক লেখক ইংলণ্ডের রাজনীতিতে কেয়ার হার্ডি-র স্থান কী—তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। "লেবার পার্টির এই সর্দারের...আয়ত্তে রয়েছে কমনস্-সভার ৪০টি বাঁধা ভোট। আইরিশ ন্যাশন্যালিস্টদের সঙ্গে জোটবদ্ধ মিঃ কেয়ার হার্ডির পার্টির...হাতে আছে মন্ত্রীদের ভাগ্য—যেসব মন্ত্রীরা ভারতের রাজা-মহারাজাদের ভাগ্যনির্ধারণ করে থাকেন,—এবং ভাইসরয় ও গভর্নরদের নিযুক্ত করেন বা বরখাস্ত করেন।" এই লেখায় কেয়ার হার্ডির জীবনকথাও ছিল। একটি কুলি-বালক দীর্ঘ সংগ্রামের ফল-রূপে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিকদের সংগঠিত ক'রে যথেষ্ট

India, May 15, 1908, *Mr Keir Hardie, M. P., At New castle. The Indian Police As 'Agents Provocateurs'.*

Labour Leader, quoted in *India*, May 28, 1909, *The Regime of Repression*, By J. Keir Hardie, M. P.

৭ ২১ জুন, ১৯০৯, ডেইলি নিউজে কেয়ার হার্ডি-র বইয়ের উপর আলোচনা করেন আর এ ব্রে। তার বড় অংশ উদ্ধৃত হয় ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২৫ জুন, ১৯০৯, শিরোনামা ছিল, "আয়ারল্যাণ্ড ইন দি ইস্ট।"

৮ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের "দি অ্যাওকেনিং অব ইণ্ডিয়া" বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা করেন এইচ ই এ কটন—ইণ্ডিয়া পত্রিকায়, ১৪ অক্টোবর, ১৯১০।

সংখ্যক শ্রমিক সদস্য পার্লামেণ্টে পাঠাতে পেরেছেন ; লিবারাল দলের আওতা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে লেবার পার্টির স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টারি দল গঠন সম্ভব করেছেন। এই কাহিনী বলার পরে বর্ধমানের মহারাজাকে, যিনি 'লর্ড কর্নওয়ালিসের ভ্রান্তির ফসল ছাড়া কিছু নন'—লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : "কেয়ার হার্ডি গ্রেট বৃটেনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োগ-অংশের ক্ষেত্রে পিতামহস্বরূপ।" "ইতিহাস যদি আমাদের সম্পূর্ণ প্রতারণা না করে তাহলে বলব ভারতের ভবিষ্যৎকে মুঠিতে ধরে রাখবে ভারতের ভাবী কেয়ার হার্ডি-রা—অর্থাৎ সর্দার-কুলিরা।"

॥ ৩ ॥ ভারতে মানবতাবাদী লেখক নেভিনসন

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস-গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা ডবলিউ নেভিনসনের নামের সঙ্গেও পরিচিত। তাঁর লেখা "নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া" (১৯০৮) গ্রন্থটির নানা অংশ এই পর্বের ইতিহাসে উদ্ধৃত হয়েছে—বিশেষতঃ সুরাট কংগ্রেস প্রসঙ্গে।

নেভিনসন ১৯০৭ অক্টোবর মাসে ভারতে এসেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ডেইলি ক্রনিকল, এবং গ্লাসগো হেরাল্ড-এর প্রতিনিধিরূপে। "তাঁর উদ্দেশ্য—বর্তমান অসন্তোষের কারণ যথাসম্ভব আবিষ্কার করা, এবং 'গোঁড়ামি না রেখে' প্রধান ভারতীয়গণ ও সরকারী কর্মচারীদের মতামতের বিবরণ দেওয়া। অসন্তোষের সকল প্রধান কেন্দ্র পরিদর্শন করাও তাঁর অভিপ্রায়।"[১]

হেনরি উড নেভিনসন (১৮৫৬-১৯৪১) ভারতে আসছেন, এটা যথেষ্টই চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্যের কারণ হয়েছিল—কেননা তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবতাবাদী, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, জীবনীকার। যৌবনে জার্মানীতে গিয়ে শিক্ষা নেবার সময়ে সামরিকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে আগ্রহ জাগলেও পরে যুদ্ধ সম্বন্ধে ঘৃণা আসে, কিন্তু সমর-ইতিহাস বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যায়নি। দীর্ঘকাল তিনি সামরিক-সংবাদদাতার কাজ করেছেন ; নিজ প্রজন্মের অধিকাংশ যুদ্ধ ও ব্যাপক বিক্ষোভের প্রত্যক্ষদর্শী লেখক তিনি। নেভিনসনের সমর-সংবাদদাতা পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছিল মানবতাবাদী সংগ্রামী লেখক-পরিচয়। এইচ এন ব্রেলস্‌ফোর্ড "ডিক্সনারি অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফি" (১৯৪১-৫০) গ্রন্থে নেভিনসনের বিষয়ে যে-বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে জেনেছি—উনি প্রথম বয়সে ক্রীশ্চান সায়েনটিস্টদের প্রভাবে পড়েন ; ১৮৮৯ সালে এইচ এম হাইণ্ডম্যানের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনে যোগদান করেন, কিন্তু মার্কসবাদ তাঁর কাছে গ্রাহ্য ছিল না, কেননা অজ্ঞেয়বাদীরূপে তিনি সকলপ্রকার অনড় মতবাদের বিরোধী ; প্রিন্স ক্রপটকিন ও এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতের কিছু প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল ; শ্রমিকদের মধ্যে বাস করতেন, তাদের ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন ; সমর-সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করার সময়ে সর্বদা লেখার দ্বারা স্বাধীনতাকামীদের সাহায্য করেছেন ; বিভিন্ন যুদ্ধের সময়ে শুশ্রূষা-সংগঠন করেছেন : "তাঁর সকল ধর্মযুদ্ধের মধ্যে একক কঠিনতম যুদ্ধ ১৯০৪-০৫ সালে পর্তুগীজ-অ্যাঙ্গোলায়—যেখানে নাম ছাড়াই ক্রীতদাস প্রথা বলবৎ ছিল ;" তিনি নারী-ভোটাধিকারের মস্ত সমর্থক ; "ইংলণ্ডে নারীর ভোটাধিকার প্রবর্তনে তাঁর তুল্য ভূমিকা খুব কম মানুষেরই।"

ভারতে আসার আগেই নেভিনসন অনেকগুলি বই লিখে ফেলেছেন :

Neighbours Of Ours (1895). ***In The Valley Of Trophet*** (1896). ***The Thirty Days' War*** (1898). ***Life Of Schiller*** (1899). ***Ladysmith*** (1900). ***Books***

১ ইণ্ডিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭।

And Personalities (1905). *A Modern Slavery* (1906). *The Dawn In Russia* (1906).

নিবেদিতার জীবনকালের মধ্যে আরও বেরিয়ে যাবে :

The New Spirit In India (1908). *Essays In Freedom* (1909). *Peace And War In The Balance* (1911).

নেভিনসন ভারতবর্ষের অনেকগুলি গুরুত্বযুক্ত স্থান ভ্রমণ ক'রে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ চিঠির আকারে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে পাঠাতে থাকেন ; সুবিখ্যাত এক সাংবাদিক-লেখকের রচনা হিসাবে সেগুলি অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নেভিনসন ভারত সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়া পত্রিকার কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে তার কিছু সংবাদ আছে :

"কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর। আজ সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে এক বৃহৎ জনসভায় মিঃ এইচ ডবলিউ নেভিনসন বলেন : ভারতবর্ষে রাজদ্রোহ নেই, কেবল আছে সরকারের সমালোচনা। তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করতে তিনি ইচ্ছুক নন, তথাপি তাঁর অভিযোগ, গোয়েন্দারা তাঁকে অনুসরণ করছে, তাঁর টেলিগ্রাম আটকে রাখা হচ্ছে, চিঠি ছেঁড়া হচ্ছে, এবং ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের কপি তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না।"

"...মিঃ নেভিনসন বিশ্বাস করেন, ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়াররা রাজদ্রোহী নয়। তিনি বলেন, সমালোচকরা একদিকে বাঙালীদের কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেবে, অন্যদিকে যদি বাঙালীরা শরীরচর্চা করে তাহলে তাদের রাজদ্রোহী বলবে—দুটো জিনিস একসঙ্গে চলে না।"

ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৭, বলা হয়েছিল : অসম্মানিত মিঃ নেভিনসনকে আমরা সহানুভূতি জানাই, কিন্তু ও-ব্যাপারে সম্পূর্ণ দুঃখিত নই, কারণ ওর থেকে ব্যুরোক্র্যাসির চেহারাটা খুলে গেছে।

ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে নেভিনসন প্রকাশ্য জনসভায় খোলাখুলি ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবির প্রতি সহানভূতি জানিয়েছিলেন।[১০]

নিবেদিতা নেভিনসনের ভারত-বিষয়ক রচনায় অত্যন্ত উল্লসিত ছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৭ লিখেছেন :

"নেভিনসন অনবদ্য সব প্রবন্ধ লিখছেন। তিনি তাঁর চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন।"

নেভিনসনের প্রবন্ধগুলি একত্র ক'রে পূর্বোক্ত 'নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া' বইটি বেরুলে নিবেদিতা একাধিকবার সানন্দে তার উল্লেখ করেছেন। ৪ নভেম্বর ১৯০৮, আমেরিকা থেকে র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লিখেছেন : "মিসেস বুল নেভিনসনের বইটিকে [এখানে] পরিচিত করাবার জন্য যথাসাধ্য করবেন। আমরা অবশ্যই অবিলম্বে কিনব। হার্পার বইটির প্রকাশক বলে [বইয়ের] নাম সম্বন্ধে অজ্ঞতায় কোনো ঝঞ্ঝাট হবে না।" এর পরে নিবেদিতা যোগ করেছিলেন, "গ্রাহাম বেল-এর জামাতা অধ্যাপক উইনস্লো এখানে আছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তাঁর সঙ্গে

১০ *India*, April 17, 1908, *The Situation in India. Mr Keir Hardie, M. P., And Mr Nevinson On Their Visit And Its Impressions.*

'সংযোগ' করতেই হবে।" ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯, চিঠিতে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-সম্পতিকে বলেছেন, উল্লাসকর দত্তের ভাইকে সাহায্য করা প্রয়োজন, নেভিনসন সে-ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন। এই সঙ্গে বলেছেন, নেভিনসনের বই তখনো তাঁর হাতে পৌঁছয়নি।

নেভিনসনের লেখার একটি গুণের বিশেষ তারিফ নিবেদিতা করেছেন—নাটকীয়তা। র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার সেরা বন্ধু ; র‍্যাটক্লিফের সুষ্ঠু সুদৃঢ় এবং সুতীক্ষ্ণ রচনার তিনি অত্যন্ত অনুরাগী। তবু জীবনের সংগ্রামের মুহূর্তগুলিকে ফোটাতে যে-নাট্যপ্রতিভার প্রয়োজন হয়, তা নেভিনসনের মধ্যে অধিকতর ছিল, সেকথা বলতে নিবেদিতা দ্বিধা করেন নি। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী লিখবেন, তার জন্য তথ্য সংগ্রহও করেছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বুঝেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে ও-কাজ করা সম্ভব নয়, কারণ নিজ জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে গেছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১০, মিসেস বুলকে লিখেছিলেন :

"আশঙ্কা হয় [ডাঃ বসুর] জীবনী লিখবার জন্য বেঁচে থাকব না। তবে জানি তুমি বিশেষভাবে ঐ কাজের জন্য ১০০ পাউণ্ড উইলে রেখে যাবে—র‍্যাটক্লিফ বা নেভিনসনের উদ্দেশ্যে—ওঁদের লেখার মূল্য হিসাবে নয়, সময়ের মূল্য হিসাবে। ভারত থেকে ভারতের খরচে জীবনীটি সহজেই বেরুতে পারবে। আমার কাগজপত্র ওঁদেরই ব্যবহারের জন্য থাকবে। অবশ্য আমি যেভাবে তাকে [বসুকে] দেখেছি, আর কেউ সেভাবে তাকে দেখতে পাবে না। নেভিনসন বোধহয় বদমাশদের সঙ্গে তার [বসুর] কঠিন সংগ্রামের প্রহরগুলিকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে ফোটাতে সমর্থ—কোন্ বীরত্বের সঙ্গে সে [ডাঃ বসু] প্রতিটি তরঙ্গকে লঙ্ঘন করেছে—তার কাহিনীকে।"

নিবেদিতা জানতেন—নেভিনসন ভারতের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াবেনই, কারণ বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অধিকারের পক্ষে তাঁর শক্তিশালী লেখনী সর্বদাই যুদ্ধরত। একই কাজ নিবেদিতাও করেছেন, নিজ জীবনে ও রচনায়। সেজন্য নেভিনসন নিবেদিতা-নাম্নী "মুক্তিযুদ্ধের জ্বলন্ত তলোয়ারের" প্রতি কোন্ অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাপ্রকাশ করেছিলেন, তা গ্রন্থসূচনায় উদ্ধৃত করেছি। অপরপক্ষে নিবেদিতাও পূর্বোক্ত 'ইংলণ্ডে ভারতবন্ধু' বিষয়ক রচনায় নেভিনসন সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"[ভারতের অধিকার-সমর্থক] এই সকল সাংবাদিকদের সর্বাগ্রণী সেই মানুষটি—সকল দেশের সর্বশ্রেণীর নরনারীর স্বাধীনতার পক্ষে সেই উত্তপ্তহৃদয় বন্ধু—ডবলিউ এইচ নেভিনসন।"

নবম অধ্যায়

মর্লে : মিন্টো : হার্ডিঞ্জ—নিবেদিতার দৃষ্টিতে

॥ ১ ॥ মর্লে ও মিন্টোর পূর্ব পরিচয় : ভারতের শাসন-সংস্কারে মর্লে-স্কীম ও তার ক্রমপরিবর্তন : সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি : মর্লে সম্বন্ধে নিবেদিতার আদি ধারণা

কার্জন ছাড়া আরও দু'জন গভর্নর-জেনারেলকে নিবেদিতা ভারতে পেয়েছেন—আর্ল অব মিন্টো এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ। শেষোক্ত দু'জনের কার্যকালে ভারতসচিব ছিলেন ভাইকাউন্ট মর্লে (১৯০৫-১০)। এঁদের অল্পবিস্তর উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিতে আছে। নিবেদিতার সঙ্গে অধিকন্তু লেডি মিন্টোর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল, যা পরস্পরের সম্ভ্রমপূর্ণ প্রীতিসম্পর্কে পরিণতি পায়।

স্বদেশী আন্দোলন নামক প্রথম ব্যাপক ভারতীয় বিক্ষোভ-আন্দোলনের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মিন্টো ভারতের ভাইসরয় হয়েছিলেন। কার্জনের পার্টিশন-কর্মই উক্ত আন্দোলন-উৎপাতের জনক—ওটাকে মিন্টো কার্জনী অপকর্ম বলেই মনে করেছিলেন। অনুভূতিহীন, লোভী, রুষ্ট এবং আতঙ্কিত ইংরাজ প্রশাসকদের ভারত-বিদ্বেষের চাপও মিন্টোর উপর পড়েছিল। স্বদেশীয় রক্ষণশীলদের আক্রোশপূর্ণ উৎপীড়ন-দাবির পেষণ তো ছিলই। তথাপি প্রথমদিকে মিন্টোর ভারসাম্যযুক্ত ভূমিকা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাঁরা মনে করেছেন—কার্জনের গর্ব ও গোঁড়ামির স্থান গ্রহণ করেছিল মিন্টোর বোধ ও বিচার।

ভারতে আসার আগেই আর্ল অব মিন্টো (১৮৪৫-১৯১৪) 'বৃটিশ সৈনিক ও প্রশাসক'—এই পরিচয় অর্জন করে ফেলেছিলেন। "১৮৭৭ সালে তুরস্ক সেনাবাহিনীতে, ১৮৭৯ সালে আফগান-যুদ্ধে, ১৮৮২ সালে মিশর অভিযানে, ১৮৮৫ সালে উত্তর-পশ্চিম কানাডার বিদ্রোহ দমনে ('চীফ অব দি স্টাফ'-রূপে) অংশ নিয়েছিলেন।" ১৮৯৮-১৯০৪ সময়ে—কানাডার গভর্নর-জেনারেল।[১] ১৯০৫ অগস্ট মাসে ভারতের গভর্নর-জেনারেল, সেই পদে থাকেন ১৯১০ সাল পর্যন্ত। তাঁকে ইংলন্ডের লিবারাল গভর্নমেন্টের অধীনস্থ হয়ে কাজ করতে হয়েছিল।

এইকালের ভারতসচিব জন মর্লে ('ফার্স্ট ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ন; ১৮৩৮-১৯২৩')—নানা প্রশংসনীয় পরিচয়ে পূর্ব থেকেই অলঙ্কৃত —রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, সমালোচক, জীবনীকার। তাঁর প্রথম জীবনের 'চরমপন্থী উদারনৈতিকতা' যথেষ্টই চাঞ্চল্যকর। ১৮৮৩-১৯০৮ সময়ে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য, গ্লাডস্টোনের আইরিশ-নীতি ও অন্য উদারনীতির সমর্থক, ১৮৮৬ সালে আয়ারল্যান্ড-বিষয়ক চীফ সেক্রেটারি, ১৮৯২ সালে সেই পদে

১ *New Century Cyclopedia of Names*, Vol. I

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ১৯০৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯১০ পর্যন্ত ভারতসচিব। তাঁর রচিত বিখ্যাত জীবনীগুলির মধ্যে পড়ে—এডমন্ড বার্ক (১৮৬৭), ভলটেয়ার (১৮৭২), রুশো (১৮৭৩), দিদেরো (১৮৭৮), রিচার্ড কপডেন (১৮৮১), ওয়ালপোল (১৮৮৯), ক্রমওয়েল (১৯০০), গ্লাডস্টোন (১৯০৩)।

কিন্তু আমরা দেখি, আয়ারল্যান্ড সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে, এবং জীবনীগুলিতে প্রভূত পরিমাণে পরিবেশিত মর্লে-র উদারনৈতিকতা ভারত প্রসঙ্গে নিঃশেষিত—কার্যকালে তিনি পিছু হটে আমলাতন্ত্রের রক্ষণশীলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। নিবেদিতার ধারণা সেটা পরাজয় নয়—স্বেচ্ছাপরাজয়। অমলেশ ত্রিপাঠী, যিনি মর্লে-র ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে তাঁর সাধু ইচ্ছার রূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে যত্নবান, তিনিও এই তির্যক মন্তব্য না করে পারেননি : বার্কের সম্বন্ধে 'ভক্তি' সত্ত্বেও মর্লে-র মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ক্রমওয়েলীয় 'ভাব' ছিল।[২]

ভাইসরয়-রূপে মিন্টো কার্যভার গ্রহণ করার পরেই সিভিলিয়ানদের তরফে তাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সমর্থনের বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়। মিন্টো সাড়া দেন অবিলম্বে। কংগ্রেসের শক্তিকে তুচ্ছ করার মতো কার্জনী ভ্রান্তিও তিনি দেখাননি। তাই তাঁর "ভেদ আনো, শাসন করো" নীতির দ্বিবিধ রূপ দেখা গিয়েছিল—এক, কংগ্রেসের মডারেট ও একসট্রিমিস্টদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি, দুই, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধানো। একটা ভুল অবশ্য তিনি করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, মডারেটরা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। এই ধারণা অনুযায়ী তিনি গোখলেকে বশীভূত ক'রে, তাঁর মারফত কংগ্রেসকে বয়কটের বিরোধিতায় রাজি করাতে চেয়েছেন। তাঁরই অদৃশ্য হাতের টানে মডারেটরা সুরাটে একসট্রিমিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। তারপরে গোখলে যখন শেষপর্যন্ত উপযুক্ত ফলদান করতে পারলেন না, এমন কি মর্লে-স্কীমের আদি রূপের পরবর্তী অত্যন্ত পরিবর্তিত সংকীর্ণ চেহারার বিরুদ্ধে সমালোচনার 'ঔদ্ধত্য' পর্যন্ত দেখালেন, (যদিচ, গোখলে ১৯১০ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উক্ত পরিবর্তিত স্কীমের সমর্থন করেছিলেন)[৩]—তখন মিন্টোর কাছে গোখলে অনির্ভরযোগ্য মানুষ, এমন কি বিশ্বাসঘাতক বলে প্রতীয়মান।[৪]

মর্লে তার উদারনৈতিকতার তলানি পান ক'রে, হঠাৎ উন্মাদনায়, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে ফেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ভারতীয়দের কিছু শাসনাধিকার দিলে তাদের দাবি বেশি বাড়তে পারবে না। গোখলের সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি আলোচনাও করেন। ভাইসরয়ের কাউন্সিলকে প্রসারিত ক'রে তাতে ভারতীয় সদস্য গ্রহণের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে, তবে বিভিন্ন সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে আসন পাবে—এই সকলও তিনি চেয়েছিলেন। মর্লে-র এই শুভবাসনার কথা জেনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাসি রাগে ফেটে পড়ে। শাসন সংস্কার সম্বন্ধে ভারত থেকে যে-রিপোর্ট তিনি চেয়ে পাঠান, তা পাঠাতে ভারত সরকার যথেষ্ট গড়িমসি করে। তাতে মর্লে ক্ষুব্ধ হন।

মর্লে-র উদারনৈতিক ভূমিকা এই পর্যন্ত দৌড় দিয়ে দম হারিয়ে ফেলেছিল। ক্লান্ত আত্মসমর্পণকে অতঃপর তিনি মেনে নেন। ত্রিপাঠী মর্লে-মিন্টোর 'কাগজপত্র' থেকে যেসব সংবাদ

২ ত্রিপাঠী, ১৭১।
৩ রমেশ মজুমদার, ২য়, ২৬৩।
৪ ঐ, ২য়, ১৫৯-৬০।

সংগ্রহ করেছেন তার থেকে দেখি—মর্লে অবিরাম মিন্টোর দমননীতির বিরোধিতা করে গেছেন কিন্তু নিষ্ফল হয়েছে সেই বিরোধিতা। মর্লে পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী লেফটন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে অপসারিত করতে চেয়েছেন, তাতে মিন্টো ও ইবাটসন আপত্তি করায় তখনি তা সম্পন্ন করতে পারেননি ; মিন্টোর দমননীতির বিরোধিতা তিনি করেছেন, কিন্তু তিলকের কঠোর শাস্তি নিবারণ করতে পারেননি : অশ্বিনীকুমার প্রমুখের নির্বাসন নিয়ে মিন্টোর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ চালালেও যতক্ষণ না মিন্টো নতুন কাউন্সিলের নির্বাচন সমাধা করেছেন, 'প্রেস-অ্যাক্ট' (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) এবং 'একস্‌টেনডেড্ সিডিশাস্ মিটিংস্ অ্যাক্ট' পাস করিয়েছেন, ততক্ষণ ওঁদের মুক্ত করাতে পারেননি। অপরদিকে তিনি ভারতস্থ মিন্টো ও ব্যুরোক্র্যাটগণের এবং ইংলন্ডস্থ কনজারভেটিদের চাপে পড়ে কেবল তাঁর প্রস্তাবিত রিফর্ম-স্কীমকে ছাঁটাই করেননি, তাকে রীতিমতো প্রতিক্রিয়াশীল ক'রে তুলেছিলেন। উস্কানিপ্রাপ্ত মুসলমান নেতাদের অযৌক্তিক দাবির কাছে নতিস্বীকার তার চরম দৃষ্টান্ত।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচনাদানের ব্যাপারে কার্জন ও ফুলারের চেষ্টার উল্লেখ আমরা আগে করেছি। কার্জন-পরবর্তী মিন্টো, এবং ফুলার-পরবর্তী হেয়ার, একই নীতি নিয়েছিলেন। মর্লে-র যৌথ নির্বাচন বাসনার কথা জেনে মিন্টোর কাছে মুসলমানদের ডেপুটেশন যায় (১ অক্টোবর, ১৯০৬)—তা ব্যুরোক্র্যাটদের প্ররোচনাতেই হয়েছিল।

হেয়ার বলেছিলেন, 'বস্তুতপক্ষে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনই প্ররোচিত'[৫] মিন্টো মুসলিম প্রতিনিধিদের উদার প্রতিশ্রুতি দেন ; বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের সহযোগে তিনি যৌথ নির্বাচন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ; সেকাজে সহায়তা পান ইংলন্ডের কনজারভেটিভ বন্ধুদের কাছ থেকে ; তাঁদেরই উস্কানিতে দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী আমীর আলির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ইংলন্ডে মর্লে-র কাছে হাজির হয়।

এইবার দেখা গেল—মর্লে-র পুরাতন চেহারা আর বজায় নেই। আমীর আলির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধই তিনি আনলেন না। ক্রমে তিনি সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাটদের সকল দাবিই মেনে নিলেন। মুসলমানদের দাবি বাড়তে-বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছল যা দেখে উস্কানিদাতা রক্ষণশীল মিন্টো পর্যন্ত অস্বস্তিতে পড়লেন, কিন্তু উদারনৈতিক মর্লে-র করুণাধারা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচনযোগ্য আসনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানেরা যেখানে শতকরা ১৪ ভাগ আসন পেতে পারে, সেখানে তাদের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি আসন না দিয়ে নিরুদ্ধ হল না। এছাড়াও নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাদের আরও নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল।

নিবেদিতার চিঠিতে এবং অস্বাক্ষরিত রচনাসমূহে মর্লে-র যেসব উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে এখনকার ঐতিহাসিকরা মর্লে-কে শুভবুদ্ধির যে-ছাড়পত্র দিয়েছেন, তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। নিবেদিতার কাছে দমননীতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী মিন্টো বোধগম্য চরিত্র—যিনি কঠোর কিন্তু ক্রূর নন ; অপরপক্ষে মর্লে ভঙ্গিপ্রধান রাজনীতিক, যাঁর উদানৈতিকতার আচ্ছাদনে আবৃত ছিল ভারত-বিরোধী কঠিন চোয়াল।

মর্লে সম্বন্ধে নিবেদিতা প্রথমাবধি সন্দিগ্ধ। মর্লে তখনো ভারতসচিব হননি, তবে হবেন, স্থির হয়ে গেছে, এই অবস্থায় মিস ম্যাকলাউড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এই সংবাদে উল্লসিত হবার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ নিবেদিতা ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪ তাঁকে লেখেন :

৫ ত্রিপাঠী, ১৬১।

অরবিন্দ-কার্টুন । হিন্দী পাঞ্চ, ২০ জুন ১৯০৯ । অরবিন্দকে উপদেশ : বন্ধু শোনো, বৃথা কল্পনায় শক্তিক্ষয় করো না । আমিও তোমারই মতো স্বদেশীর অনুরাগী—তবে তা খাঁটি স্বদেশী—মারকুটে স্বদেশী নয় ।

প্রসঙ্গ : কলকাতায় বীডন স্কোয়ারে জুন মাসে এক স্বদেশী সমাবেশে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন । প্রধান বক্তা অরবিন্দ বলেন, যখন স্বদেশী আন্দোলনে ঢিলে পড়ে, উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে, তখন তাকে চাঙ্গা করতে সরকারী উৎপীড়নের প্রয়োজন হয় । দেখা গেছে, ৯ জন স্বদেশসেবককে বিনা দোষে নির্বাসনে পাঠানো হলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল ।

COLLAPSE!

Mr. Extremist—What! All my hopes and expectations gone to pieces? Ah me!

অরবিন্দ-কার্টুন । হিন্দী পাঞ্চ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৯ । হুড়মুড় বিপর্যয় ! 'এ কি মিঃ একস্‌ট্রিমিস্ট, আপনার সব আশা চুরমার ! আর তা যে হবে, সে তো জানাই ছিল ! যা পুঁতবে তাই তো ফলবে !' প্রসঙ্গ : কংগ্রেসের পুনর্মিলনের জন্য অক্টোবর মাসে হুগলী কনফারেন্সে একটা মিটমাট কমিটি হয় । তার সামনে সুরেন্দ্রনাথের আপসসূত্রের মূল কথা ছিল—কংগ্রেসের পূর্বের ক্রীডকে পুরো মানতে হবে, এবং সেকথা সদস্যদের লিখিতভাবে জানাতে হবে । অরবিন্দ ও তাঁর দল জানিয়েছেন—ঐ শর্ত মানতে তাঁরা অপারগ । ফলে তাঁর সকল আশার সমাধি ।
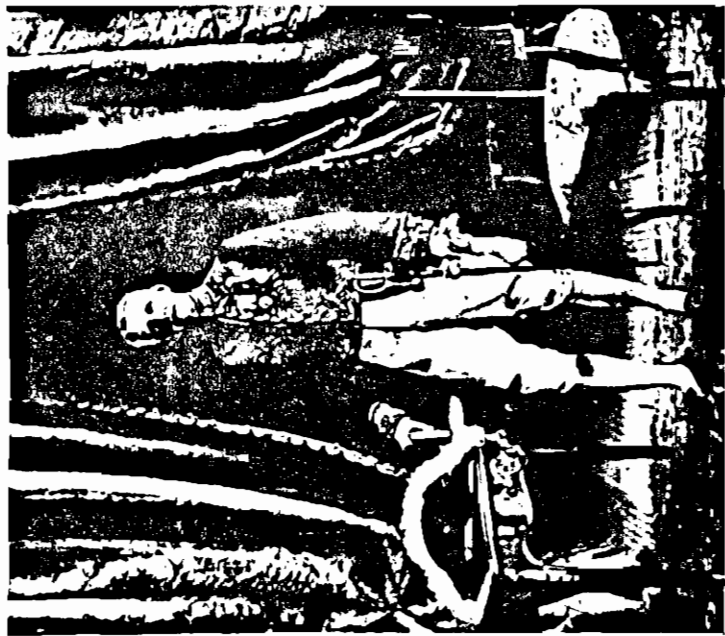
(বামে) ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসামের লেফট্ন্যান্ট-গভর্নর স্যার জোসেফ বামফিল্ড ফুলার, কে. সি. আই. ই. ।।

(ডাহিনে) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লেফট্ন্যান্ট-গভর্নর স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার এবং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ । গভর্নর বাহাদুরের বর্ধমান পরিদর্শনের সময়ে গৃহীত চিত্র ।

মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ৭ এপ্রিল ১৯১০। চিঠির সংবাদ : 'কর্মযোগিন্' আক্রান্ত, 'ধর্ম' ও তাই। অরবিন্দের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা কিন্তু তিনি বেপাত্তা। কর্মযোগিনের অভিযুক্ত সংবাদটি নিবেদিতা ইংলণ্ডে পাঠাচ্ছেন। সরকার ভারতের মানুষকে হত্যার প্রচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। একমাত্র উপায় গোপন সংবাদপত্র। [একই পত্র পর পৃষ্ঠায়]

"জন মর্লে-র সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার নিয়ে গোড়ায় বেশ উন্মাদনা বোধ করেছিলুম। পরে মনে পড়ল, কে যেন আমাকে বলেছিল—ভারতের ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ; লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের মতোই তিনি মন্দ ভারতসচিব হবেন কিংবা মন্দতর। আমি কখনো শুনিনি যে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের মানুষ। তবু আমি মহান এনসাইক্লোপিডিস্টদের উপরে তাঁর কাজের জন্য তাঁকে ভালবাসতে পারতাম—এবং যে-মহাপ্রাণ মানুষটি লোকান্তরিত হয়েছেন [গ্লাডস্টোন ?] তাঁর শিষ্যত্ব করার জন্য। তিনি নিশ্চয় তরুণ বয়সে অন্তত অনাড়ম্বর সত্যান্বেষী ছিলেন।"

ভারতসচিবরূপে মর্লে কর্মভার নেবার আগেই নিবেদিতা জেনেছিলেন—তরুণ মর্লে প্রবীণ হয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মতো সমস্ত গুণই হারিয়ে ফেলেছেন।

॥ ২ ॥ মর্লে সম্বন্ধে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার নানা রচনা : নিবেদিতার পত্রে মর্লে-শাসন প্রসঙ্গ

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মর্লে-সূত্রে লিখিত বেশ কয়েকটি অস্বাক্ষরিত কিংবা ছদ্মনামের প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণে আমরা নিবেদিতার রচনা বলে বিবেচনা করেছি, যদিও সেগুলির উপরে সম্পাদকের সতর্ক সংশোধনী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও মেনে নিচ্ছি। সেগুলি আপাতত এই :

1. *Lala Lajpat Rai Simply Becomes non est.* (June 1907. Ed. note).
2. *Repression and Liberalism.* (June 1907. Ed. note)
3. *The Present Situation.* (June 1908. Unsigned article).
4. *Lord Morley's Reform Speech.* (January 1909. Unsigned article).
5. *Mussalman Representation.* (March 1909. Ed. note).
6. *The Indian Debate in the House of Lords* (April 1908. 'By an English Sojourner in England').
7. *Morley Scheme and the Situation.* (April 1909. Ed. note).
8. *Personal or One-Man Rule.* (May 1909. Ed. note).
9. *Lord Morley's Mixture.* (May 1909. Ed. note).
10. *Macaulay Versus Sinha* (May 1909. Unsigned article).
11. *The Swadeshi and Boycott Movement.* (Aug 1909. Unsigned article).
12. *A Justification of Excessive MoslemRepresentation.* (July 1910. Ed. note).
13. *S.P. Sinha's Resignation.* (Sept. 1910. Ed. note).

এই লেখাগুলি নিবেদিতার ধরে নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হব।

৯ মে, ১৯০৭, লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই সূত্রে ১নং ও ২নং নোট-এ নিবেদিতা মর্লে-সহ ভারত সরকারকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। রাওয়ালপিণ্ডি রায়টের জন্য নাকি লাজপতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকাশ্য অভিযোগ করা হয়নি, মামলাও দায়ের করা হয়নি। "সরকারের সপক্ষে কোনো-কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, সরকার তাঁকে শহীদ বানাতে চাননি, বা প্রকাশ্য বিচারের খ্যাতিও দিতে চাননি, তাই নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।" [এই কাগজটি যে স্টেটসম্যান, তা র‍্যাটক্লিফ প্রসঙ্গে আগেই

দেখেছি]। নিবেদিতা ব্যঙ্গ করে লিখলেন, "বাহবা যুক্তি!...স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, সরকার পৃষ্টদংশকদের কিংবা গুপ্তচরদের ঈর্ষাপূর্ণ কাপুরুষোচিত কুৎসা দ্বারা চালিত হয়েছেন, তাঁরা আতঙ্কে অস্থির। এটা কিন্তু তাঁদের শক্তির আস্ফালনের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়।" সরকারের বিচিত্র নীতি—যেখানে প্রমাণের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে লাজপত রায় গ্রেপ্তার, আর যেখানে কুমিল্লা ও অন্যান্য দাঙ্গার সঙ্গে ঢাকার নবাবের পরিষ্কার সম্পর্ক আছে, সেখানে "নবাব পুরস্কৃত", কেননা "দাঙ্গাগুলি হিন্দুদের বিরুদ্ধে বাধানো হয়েছে।" পূর্ববঙ্গের ঐসব দাঙ্গায় "লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত, বাড়িঘর ভস্মীভূত, পুরুষ প্রহৃত, নিহত, সমস্ত গ্রাম জনশূন্য, এবং সর্বাপেক্ষা বর্বর কাণ্ড—ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রশাসকদের প্রায় নাকের ডগায় নারী অত্যাচারিত।...ঐ সকল সরকারী কর্তারা জনগণকে রক্ষা করা বা সাহায্য করার জন্য কোনো কিছু তো করেইনি, ক্ষেত্রবিশেষে গুণ্ডাদের নারকীয় কাজের সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছে...এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হিন্দুদেরই গ্রেপ্তার করেছে। ...আর এই পুরো সময়ে, ঘটনার জন্য দায়ী পাষণ্ডগুলি মুক্ত ছিল (এখনো আছে), যদিও তাদের বে-আইনি কথাবার্তা ও প্রকাশ্য কার্যাবলী অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণরূপে বর্তমান।"

[বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের দ্বারা অত্যাচারিত অসহায় জনগণের ছবি তুলে ধরেছিলেন মিস রাথবোনকে লেখা খোলা চিঠিতে—এবং ধিক্কার দিয়েছিলেন সাহেবী নীচতাকে, যা অস্ত্র কেনার অধিকার-বঞ্চিত জনসাধারণের কাপুরুষতাকে নিন্দা করার বর্বরতা দেখায়।]

সলিমুল্লারা ছাড়া থাকবে—নির্বাসনে যাবে লাজপত রায়রা। কেন—তার উত্তর নিবেদিতা দিয়েছেন। "পঞ্জাব-সরকার 'ক্যানাল কলোনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' আন্দোলনকারীদের হাতে পরাজয়ের অপমান কোনোমতে হজম করতে পারেনি। আন্দোলনকারীরা বর্ধিত জলকর দিতে অস্বীকার করেছিল। তার শোধ তুলতে কোনো একটা ঘটে-যাওয়া উৎপাতের ধুয়ো তুলে লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ পঞ্জাবে তিনিই প্রধান ব্যক্তি।"

এর পরে ক্রমান্বয়ে মর্লে-র মুখোশের পর মুখোশ ধরে টান।

"বিচিত্র ব্যাপার, মর্লে-র মাপের বৃটিশ রাজনীতিকও বুঝতে অসমর্থ যে, দমননীতি অশান্তির নিরাময় ঘটায় না—তার নিরাময় ঘটে অশান্তির কারণ দূরীকরণে। ইণ্ডিয়া অফিস মর্লে-র উদারনৈতিক খ্যাতির সুনিশ্চিত সমাধিভবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অনেক দিনই এই আশা ছেড়ে দিয়েছি যে, ভারতের জন্য তিনি যোগ্য কিছু করবেন। অবশ্যই তিনি তা করবেন না—যদি না আমরা তাঁকে বাধ্য করতে পারি, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা একথা কদাপি ভাবিনি যে, তিনি ভারতীয় প্রশাসনকে রুশ জার-তন্ত্রী ক'রে তুলবেন।"

নিবেদিতা অগ্ন্যুদ্গার করেই চললেন :

"কমনস্-সভায় লালা লাজপত রায়ের নির্বাসন-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মর্লে স্বৈরাচারী শাসকের পুরাতন ছুতোর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ ক'রে বলেছেন—পার্লামেন্টে এই বিষয়ে কোনো আলোচনা বা এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ প্রশাসন-কর্তৃত্বকে দুর্বল করে ফেলবে। অহো উদারনৈতিকতা! তোমার কি পরিণতি!...কিন্তু প্রশাসন-কর্তৃত্ব কি অভ্রান্ত?...১৮১৮ সালের রেগুলেশন, যার বলে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে—অবিলম্বে তা বাতিল করার জন্য কিছু সদস্য দাবি করলে মিঃ মর্লে বলেছেন—ভারত সরকারকে সে-দেশীয় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো আইনের অস্ত্র থেকে বঞ্চিত না-করতে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেননা 'সেখানে বজ্জাতির পরিমাণ সুবিপুল।' এখন আমরা উদারনৈতিকতার অর্থ বুঝলাম।

লিবারাল মানে বড় মাপের টোরি।...লর্ড মিন্টো একটি অর্ডিনান্স জারি করেছেন, যার সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগুলি নির্ধারিত স্থানে সভাসমিতি করার অধিকার জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে। ভালই। মুখোশ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা বৃটিশ শাসনকে তার নিজস্ব রঙে ও আকারে দেখতে পেলাম।"

নিবেদিতার দৃঢ়, ধ্বনিত কণ্ঠস্বর অতঃপর :

"কিন্তু আমাদের মন্দ অবস্থার মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠকে আহরণ করতে হবে। আঘাত বিশেষভাবে এসেছে স্বদেশী ও বয়কটের উপরে—এবং সাধারণভাবে এসেছে জাতীয়তার ক্রমোত্থিত চেতনার উপরে। যদি আমাদের মধ্যে প্রাণের চিহ্ন থাকে তাহলে উৎপীড়নেই আমাদের পরিত্রাণ।"

মর্লে-স্কীমের প্রথম চেহারা যখন প্রকাশ পেল তখন নিবেদিতা চেয়েছিলেন—ভারতীয়রা ঐ পরিকল্পনাকে সমর্থন করুক। নিবেদিতার সহযোগী চরমপন্থী ভারতীয়রা কিন্তু মর্লে-স্কীমের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। নিবেদিতা যে, রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেই মর্লে-স্কীমের আপাতত সমর্থন করতে চাইছিলেন, তা র‍্যাটক্লিফকে লেখা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ চিঠি থেকে স্পষ্ট। তিনি বলেন :

"যদি তুমি এই সপ্তাহে মডার্ন রিভিউ-এ লেখো, এবং আমিও লিখি—তাহলে তা যেন একটা ঘোষণার দিকে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি থাকলে আমরা সেই 'ঘোষণা' প্রস্তুত ক'রে ফেলতে পারতাম। এই সকলই আমার নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধিচাতুর্য সম্বন্ধে আমার নিজ ধারণার পোষকতা করছে। ভারতীয় দল 'নিউ স্কীম' সম্বন্ধে উত্তপ্ত সমাদর ঘোষণা করুক—তাই আমি চাই। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের [ভারতের ইংরাজ প্রশাসকদের] তীব্র বিরোধিতার সামনে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি সর্বদাই সন্দিহান। আমি আগেও ভেবেছি এখনও ভাবছি—নিউ স্কীমের পক্ষে সমাদর ও গ্রহণেচ্ছার মনোভাব দেখানোই আমাদের পক্ষে প্রাজ্ঞতম ও সুন্দরতম ভঙ্গি হবে। তা করলে উক্ত স্কীমের বিরোধীদের খাঁটি চেহারাটা দেখিয়ে দেওয়া যাবে, এবং মর্লে-কে কিছু বাস্তব সমর্থন জানানো হবে। অন্যক্ষেত্রে যেমন, রাজনীতিতেও তেমনি—খুঁতখুঁতে মনোভাব উত্তম নয়।"

নিবেদিতা যা ভেবেছিলেন কেবল তাই ঘটল না—আরও কিছু ঘটল। মর্লে-স্কীমের বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লাগল ভারতের ইংরাজ আমলাতন্ত্র—এবং মর্লে পিছোলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল—অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের চাপের সামনে ভেঙে পড়বার জন্য মর্লে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন—নাড়া দিতেই ঢলে পড়েছেন।

জুন ১৯০৮ তারিখের ৩নং প্রবন্ধে ('দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন') বাঙালী বোমারুদের প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল—কাপুরুষ বলে ধিকৃত বাঙালীরা অকস্মাৎ ঐ ধরনের বেপরোয়া কাজে কেন লিপ্ত হল? এই প্রসঙ্গে বাঙালী ও আইরিশ মানসিকতার তুলনাও করা হল। তারপরে ভারত-প্রশ্নে মর্লে-র অনড় মনোভাব সম্পর্কে বলা হল—ও-বস্তু বিসমার্কের মনোভাবের তুল্য। "ওঁরা জার্মানীর লৌহ-রাজকুমার বিসমার্কের মতোই বিশ্বাস করেন, 'রাজনীতির সঙ্গে অনুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই।' ওঁরা বিশ্বাস করেন, ভারতের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক নিছক রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক শোষণের জন্য তা স্থাপিত, কিংবা সেমুর কী যা বলতে পারেন—'ভারতের লুণ্ঠনের জন্য' কৃত।"

ব্যঙ্গভাষণ প্রখরতর অতঃপর :

"অবশ্য আমাদের বর্তমান ভারতসচিব—দি অনারেবল ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ন—যিনি

একদা 'সাধু জন' নামে পরিচিত ছিলেন—তিনি অবশ্যই ভারতে ইংলণ্ডের রাজশাসনের ব্যর্থতার কারণ সন্ধানে প্রয়াসী হবেন না, কিংবা তার প্রতিকারের যথার্থ চেষ্টাও করবেন না। তাঁর কাছে যদি ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যর্থকাণ্ড হয় তবু তা 'সেটলড্ ফ্যাক্ট'।"

মর্লে-র ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের লেখা থেকে নিবেদিতা দেখালেন—মর্লে "শিক্ষিত ভারতবাসীকে ইংলন্ডের শত্রু বলে" বিবেচনা করেন। মর্লে-র মত হল, "পার্লামেন্ট বা পার্লামেন্টারি কমিটি ভারতের মঙ্গল করার ব্যাপারে অকেজো ও অর্থহীন।" এই যখন পরিস্থিতি, "রাজহস্তে ভারত শাসন হস্তান্তরের...পর থেকে প্রতি বৎসর ভারতের অবস্থা যখন মন্দ থেকে মন্দতর", এবং "ইংলণ্ডে ভারতীয় সমস্যা কোনোই আগ্রহ সৃষ্টি করে না," তখন নিবেদিতা উপায় জানালেন, "ভারতের এই অপশাসনের একমাত্র প্রতিকার...স্বরাজ বা হোমরুল।"

এহেন মর্লে-কেও ভারতের উপকার করবার সুযোগ দিতে মডার্ন রিভিউ-এর জানুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় 'লর্ড মর্লে-র রিফর্ম-বক্তৃতা' প্রবন্ধে (৪নং) নিবেদিতা উক্ত স্কীম থেকে কী পাওয়া যাবে আর কী পাওয়া যাবে না, তার হিসাব দিলেন। শেষপর্যন্ত 'কী পাওয়া যাবে না', তার দিকেই পাল্লা ঝুঁকেছিল। সমর্থক কথাগুলি এই :

"প্রাদেশিক এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে ভাইকাউন্ট মর্লে-র প্রস্তাব যদি উদার মনোভাব নিয়ে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়, তাহলে তা ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ হবে। আমরা খোলাখুলি তা স্বীকার করছি। সেইসঙ্গে কিন্তু আমরা প্রশ্নসূচক যদি-কে যোগ ক'রে দিচ্ছি।"

গোটা রচনাটির বৃহৎ অংশ এই 'যদি'-র আশঙ্কাতে পূর্ণ ছিল—সেইসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন দমনে সরকারের উৎপীড়ন-সংবাদে এবং প্যার্টিশন নামক বৃহৎ অন্যায়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখে। পার্টিশন "সেই সর্বোচ্চ ভ্রান্তি," যা বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক প্রভাব" খর্ব করার জন্য কৃত। তারপর কার্জনের অনুচিত শিক্ষানীতি, বিনাবিচারে নির্বাসন, সমিতিগুলির বিরুদ্ধে নতুন ফৌজদারী আইন, আপদজনক খানাতল্লাস, রাজদ্রোহের মামলা—এইসব অন্যায়ের উল্লেখের পরে, প্রস্তাবিত স্কীমের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার আলোচনা করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য হবার কথা স্কীমে ছিল, কিন্তু যেভাবে সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির হয়েছিল তাতে, নিবেদিতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখান—জনগণের যথার্থ নেতারা কাউন্সিলে প্রায় যেতে পারবেন না। দুটি কারণে তা সম্ভব হবে না : এক, সরকার শিক্ষার প্রসার করতে অনিচ্ছুক, অথচ "কাউন্সিলের যথার্থ সদস্য নির্বাচন শেষপর্যন্ত জনগণের বুদ্ধিশক্তি ও রাজনৈতিক [চেতনা-] সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল ; আর সে অবস্থা কখনই লাভ করা যাবে না যতক্ষণ না প্রাথমিক শিক্ষার (তা যদি অবৈতনিক ও সর্বজনীন এখন নাও হয়) বিপুল বিস্তারের ফললাভ জনগণ করতে পারছে।" দ্বিতীয়ত, সরকারের পরিকল্পনা হল— "কাউন্সিলে শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব।" তার পক্ষে সরকারের যুক্তি—ঐ পদ্ধতিতে অনগ্রসর শ্রেণীরা প্রতিনিধিত্ব পাবে। নিবেদিতার মতে—"এই ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে চিরদিনের ভেদ-প্রাচীরের ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। সকল শ্রেণীকে সম্মিলিত ক'রে ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের প্রতিবন্ধকতা করবে এই ব্যবস্থা। না, তা আরও বেশি ক্ষতি করবে—যে-ভেদ এবং মতসংঘাত এখন নেই, তার সৃষ্টি করবে।" তবে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষণের উপযোগিতার বিষয়ে নিবেদিতা সচেতন ছিলেন। "বর্তমানে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের প্রশ্নটি অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত মানুষেরই মনোযোগের বিষয়। কিন্তু যখন এই অনুন্নত শ্রেণী এক ধরনের ভোটাধিকার পাবে, এবং তাদের কাছে ভোট চাইতে যেতে হবে, তখন তাদের অনুভূতি ও স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনার

মনোভাব রাখতেই হবে। আর ছুৎমার্গ চলবে না। কাউন্সিল-কক্ষে ব্রাহ্মণ ও পারিয়া, ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র, খ্রীস্টান ও মুসলমান—সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবেন।"

প্রস্তাবিত স্কীমে কত সামান্য ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভারতীয়দের দেওয়ার কথা আছে, নিবেদিতা তার শূন্যগর্ভতার নিপুণ বিশ্লেষণও করেছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল : "আমাদের মুক্তি আছে আমাদেরই হাতে, সরকার আমাদের জন্য কী করতে পারে তার মধ্যে নয়—একথা যেন আমরা কদাপি ভুলে না যাই।"তবু তিনি, মর্লে-স্কীমের প্রথম-উপস্থাপিত রূপকে শুভবুদ্ধির সঙ্গে কার্যকর করা হলে তার দ্বারা কোন্ মঙ্গলজনক প্রাপ্তি ঘটতে পারে, সে কল্পনা করার ইচ্ছাও করেছিলেন : "যদি আলস্য ও স্বার্থপরতা ঝেড়ে ফেলে সম্ভাব্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করি, যাতে তা জাতীয় ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সজাগ ও সক্রিয় আগ্রহের উদ্বোধক-যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে—তবেই সর্বাধিক ফললাভ ঘটবে।"

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল—যৌথ নির্বাচনের পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করতে আমলাতন্ত্রের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের দাবি সীমা ছাড়াল। মার্চ মাসের "মুসলমান রিপ্রেজেনটেশন" নামক সম্পাদকীয় নোট-এ (৫ নং) নিবেদিতা সেই অহেতুক দাবিকে তথ্য ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করলেন।, "কোনো-কোনো মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুগামীরা পৃথক মুসলমান প্রতিনিধিত্ব চান।...তার অর্থ, তাঁরা মুসলমান ভারত ও অমুসলমান ভারত—এই দুই ভারত চান—যা আওরঙ্গজীব পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেননি।"

ইংরেজ আমলাতন্ত্র ক্রমেই উদ্ভট অসংলগ্ন উক্তি বিস্তার করে যেতে লাগল। একদিকে বলল, মুসলমানদের "উচ্চতর রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য" তাদের চাই সংখ্যানুপাতের চেয়ে অনেক বেশি আসন, অন্যদিকে একইসঙ্গে বলা হল, যেহেতু মুসলমানেরা পশ্চাদ্‌পদ, তাই তাদের জন্য চাই অধিক আসনের রক্ষাকবচ। নিবেদিতা সব্যঙ্গ বিস্ময়ে লিখলেন : "'ব্যাকওয়ার্ড' অথচ হিন্দুদের অপেক্ষা 'সুপিরিয়র পোলিটিকাল ইম্পর্টান্স'-যুক্ত ? নিশ্চয় ইংরেজি শব্দ তাদের অর্থ বদলে ফেলেনি ?" তারপর তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "আমরা কদাপি মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী নই, এবং জ্ঞানত কখনো তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করিনি।" তাঁর আপত্তির হেতু—"যে-সকল মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুচরগণ এই প্রকার দাবি করছেন তাঁরা কখনো তাঁদের হিন্দু ও অপরাপর দেশবাসীদের সঙ্গে নাগরিক অধিকারলাভের প্রয়াসে হাত মেলাননি। লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-সমূহ বিস্তৃত করার ইচ্ছা যখন থেকে সরকার ঘোষণা করেছেন তখন থেকে এইসকল মুসলমানেরা আসনসংখ্যার সিংহভাগ পেতে চাইছেন, যেন তাঁরা গত কয়েক দশকের নাগরিক অধিকারপ্রাপ্তির সংগ্রাম এবং অন্যান্য আন্দোলনে সিংহ-অংশ গ্রহণ করেছেন।"

এই সকল মুসলমান নেতার ভূমিকা বিষয়ে আরও খোলা কথা বললেন :

"ওঁরা 'ভেদ ঘটাও—শাসন করো' নীতির প্রয়োগকর্তাদের হাতের যন্ত্র হতে সদাপ্রস্তুত।"

লর্ডস সভায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯, 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল'-এর উপর বিতর্ক শুনতে নিবেদিতা গিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন—লিবারাল মর্লে ও কনজারভেটিভ কার্জন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। র‍্যাটক্লিফকে লেখা ৫ মার্চের চিঠিতে তিনি মর্লে ও কার্জনের "অভিনন্দন বিনিময়ের" কথা বললেন। তারপর এই বিতর্কের কথা বিস্তারিতভাবে লিখলেন মডার্ন রিভিউ-এ এপ্রিল সংখ্যায়—'দি ইন্ডিয়ান ডিবেট ইন দি হাউস অব লর্ডস্' (৬ নং) নিবন্ধে। ভয়ঙ্কর একটি লেখা—এমন খোলাখুলি আক্রমণ এই কাগজে অল্পই বেরিয়েছে। নিবেদিতা গোড়ায় ভারত-প্রশ্নে লর্ডস সভার সদস্যদের ঔদাসীন্যের কথা বলার পরে জানালেন—কার্জন বা মর্লে, কারো বক্তৃতাই উচ্চাঙ্গের হয়নি। তথাকথিত আইরিশ ন্যাশন্যালিস্ট লর্ড ম্যাকডোনেল কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের

সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফেলেছেন, ঘৃণাভরে তার উল্লেখ করলেন, এবং দুঃখ জানালেন উদারনৈতিক মর্লে-র অধঃপতনে। বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, "লর্ড মর্লে এবং লর্ড কার্জনের বক্তৃতার সর্বাধিক দীপ্ত অংশ সেইগুলি যেখানে তাঁরা পরস্পরকে উচ্চ ও বিস্তারিত প্রশস্তিবাক্য শুনিয়েছেন।" সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের কাছে মর্লে-র আত্মসমর্পণকে আঘাত করলেন কঠোরতর ভাষায় : "মুসলমানদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেগুলি তাদের অজ্ঞতা, অন্ধ গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের হাতের পুতুল হওয়ার পুরস্কার।...লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে-কোনো সংখ্যায় মুসলমান নেওয়া হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের তাতে কোনোই আপত্তি নেই, কিন্তু বঙ্গজাতির মূল রয়ে গেছে একটি ক্ষেত্রে—মুসলমানেরা তাঁদের দেশের শত্রুর হাতে খেলেছেন—সেই শত্রুরা মুসলমানদের দাবির সমর্থনের দ্বারা তাঁদের কৃতজ্ঞতার উপরও নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।...ভারতসচিব মুসলমানদের আন্দোলনের কাছে সত্যই নতিস্বীকার করেছেন একথা ঠিক নয়—তিনি নতিস্বীকার করেছেন টোরী প্রেস ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছে, যারা প্রতিনিধিত্ব প্রশ্নটিকে ব্যবহার করেছে...মুসলমান ও হিন্দুদের সামাজিক শত্রুতাকে বাড়িয়ে তুলতে।"

কার্জনের কথা উঠলেই নিবেদিতার কলম জ্বলে উঠত। কার্জন তাঁর চোখে সর্বনিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী। "ইংরাজগণের পৃথিবীশাসনের সামর্থ্য বিষয়ে এক দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তির নাম লর্ড কার্জন—যিনি ঈশ্বরের জগতে শ্বেত মনুষ্যগণের বিরাট জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বিশ্বাসী। হাড়ে-হাড়ে টোরী তিনি, এক নম্বর স্বৈরাচারী। গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস নেই এবং মনুষ্য বা জাতির স্বায়ত্তশাসনের নিজস্ব অধিকার নামক 'জাহান্নমের' ধারণার প্রতি কোনো সম্ভ্রমও নেই।" এহেন কার্জন বাগ্মিতার ঝোঁকে, ভারতের অজ্ঞ অগণিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কাতর হয়ে বলে ফেলেছিলেন, "জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে ভারতের অগণিত মানুষের কোনোই প্রয়োজন নেই, তাদের প্রয়োজন উত্তম সরকার, এবং...উত্তম সরকার বলতে তারা ইংরাজ সরকারকেই বোঝে। তাদের প্রাণের ধন সেই সরকার যা তাদের লুব্ধ মহাজন ও জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা করবে, রক্ষা করবে স্থানীয় উকিল ও অন্যান্য মানবদেহী হাঙরদের মুখ থেকে। এই সুখহীন মানুষগুলি মহাজন-জমিদার-উকিলদের হাতে অসহায় শিকার।"

শেষের কথাগুলি নিবেদিতার হাতে অস্ত্র তুলে দিল এবং তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অতি তিক্ত আক্রমণের সুযোগ পেলেন। "মানবদেহী হাঙর" সত্যই কারা—সে প্রসঙ্গে বললেন : "শেষ বাক্যটিকে পুরো সত্য করবার জন্য ওঁর [কার্জনের] তালিকায় যোগ করা উচিত ছিল—'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ট্যাক্স-কালেক্টার, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চা-মালিক, এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভাগ্যান্বেষী'—যাদের হাত থেকে ভারতীয় জনগণকে রক্ষা করা অবশ্যই দরকার।" নিবেদিতা বলে চললেন : "এইসকল [অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান] লোকগুলির তুলনায় 'লুব্ধ মহাজন বা জমিদার এবং স্থানীয় উকিল' কিছুই নয়। কেননা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা চাতুর্যকৌশলে বহুগুণে অধিক সমৃদ্ধ ; তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সাম্রাজ্য ও বিরাট এক সভ্যতা ; তাদের আয়ত্তে রয়েছে এমন হননের অস্ত্র যা সামান্য সংখ্যাতেও লর্ড বাহাদুরের বক্তৃতায় উল্লিখিত ভারতীয় শ্রেণীগুলির হাতে নেই। হতভাগ্য কুলিদের, বিশেষত চা-বাগানের কুলিদের, হৃদয়বিদারক অবস্থা, রায়তদের অসম্ভব নিষ্পেষক দারিদ্র্য, সরকার কর্তৃক রেলপথে, পূর্তবিভাগে, কলকারখানায় ও অফিসে নিযুক্ত শ্রমিকগণের যৎসামান্য বেতন ও নিদারুণ ঘর্মাক্ত পরিশ্রম যে-কাহিনী রচনা করছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে—'নরদেহী হাঙরদের' কবল থেকে ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশকে 'আমরাই কেবল রক্ষা করছি বা করতে পারি'—ভারতের ইংরাজ প্রশাসকদের এই বড়াই কতখানি

সমর্থনযোগ্য ?"

এর পরে নিবেদিতা উক্ত 'হাঙর' শব্দটি মনোরম কৌশলে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দিলেন লর্ড কার্জন ও তজ্জাতীয়দের উপরে : "আমার মনে হয়, 'নরদেহী হাঙরে'র সংজ্ঞা ও বর্ণনা যদি আমরা লণ্ডনের বেকারদের কাছ থেকে এবং তাদের পক্ষসমর্থক পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্যদের কাছ থেকে লাভ করতে পারি, সেটা বড়োই মনোহারী দাঁড়ায় ।...দুর্ভাগ্যবশত আমরা ভারতীয় হাঙরদের সঙ্গে তাদের ইংরেজ প্রতিরূপদের দেহ-মনোগত মস্তকিছু পার্থক্য দর্শন করতে সমর্থ নই ।...অনেক ইংরাজ লর্ড-মহাশয় ও জমিদার এই ধারণা ক'রে বসে আছেন—এই পৃথিবীর হতভাগ্য মৎস্যকুল কেবল হাঙরদের জন্যই দেহধারণ করবে—তাই তো স্বাভাবিক ও বিধিসঙ্গত !!"

এই মাসেই নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে একটি সম্পাদকীয় নোট লিখে পাঠালেন, "মর্লে-স্কীম অ্যাণ্ড দি সিচুয়েশন" (৭ নং), যাতে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার দায়িত্বহীন রচনার কঠোর সমালোচনা ছিল, এবং মর্লে যে, কনজারভেটিভ পত্রিকা টাইমস-এর সমালোচনার 'ভয়ে থরহরি', সেই সংবাদও ছিল। [শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রসঙ্গে এটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে]।

মর্লে-স্কীমের সূত্রে এইকালে বিচিত্র সব মতামত প্রকাশিত হচ্ছিল। কার্জন ও ম্যাকডোনেল—'এক-ব্যক্তির শাসন' বা 'স্বৈরতন্ত্রের' পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। মর্লে-র উপকারার্থ মে মাসের মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতা "পার্সোনাল অর ওয়ান-ম্যান রুল" (৮ নং) শীর্ষক সম্পাদকীয় নোট-এ জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাংশ উদ্ধৃত ক'রে উক্ত বক্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করার পরে বললেন :

"উত্তম সরকার কদাপি স্বাধীন সরকারের বিকল্প হতে পারে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে—যে-সরকার স্বাধীন নয় সে কখনো উত্তম সরকার হতে পারে না।"

এই প্রসঙ্গটি নিবেদিতা তাঁর ৩ নভেম্বর ১৯০৯ চিঠিতে উত্থাপন করেছিলেন। র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন : "বুঝতে পারছ, [মর্লে-স্কীমের ফলে] দুই কি তিনজন ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ সাম্রাজ্য শাসন করবে ?" এই চিঠিতেই উক্ত স্কীম অনুযায়ী ভারতীয়দের বিচিত্র ভোটাধিকার-প্রাপ্তির বিষয়ে লিখেছিলেন :

"ওঁরা বলছেন, গতকাল থেকে ভারতীয়গণ ভোটাধিকার পেতে আরম্ভ করেছে, তার মানে ভোটার-লিস্ট তৈরী হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না, ভোটের অধিকার কে পাবে—কোন ভিত্তিতে পাবে ? এইটি কেবল জানা গেছে—ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে যে সম্পত্তি-পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে, তার একের চার ভাগ থাকলেই মুসলমানেরা ভোটাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে এমন হয়েছে, হিন্দু মালিকের যেখানে ভোটাধিকার নেই সেখানে তার কেরানীর ভোটাধিকার আছে। এমনকি এটাও জানা যায়নি—গোপন ব্যালটে ভোট হবে কিনা !!!! তবে বহু মাস আগেই অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এমন একটি শাসনসংস্কারের জন্য—যা কেবল তাদেরই স্পর্শ করছে যাদের সম্পত্তি আছে—হিন্দু হলে ২০,০০০ টাকার এবং মুসলমান হলে ৫০০০ টাকার !"

নিবেদিতা, মে ১৯০৯ সংখ্যায় আর একটি নোট-এ (লর্ড মর্লেজ্ মিকস্চার'; ৯ নং) লিখলেন—মর্লে ভারতের জন্য একটি মিকস্চার প্রস্তুত করেছেন যার মধ্যে তোষণ ও পীড়নের ঢালাঢালি। তোষণ-অংশ মুসলমানদের দান করে নিঃশেষিত, উদ্বৃত্ত রয়েছে পীড়ন-অংশ।" নিবেদিতা অতঃপর আইন বাঁচিয়ে পীড়নের যে-বিবরণ দিয়েছেন, সেইসঙ্গে গোয়েন্দাদের ভূমিকার সংবাদ—সেইসব কথাই খোলাখুলি লিখেছেন বিভিন্ন চিঠিতে, যার রূপ আগেই দেখেছি।

অগস্ট ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত "দি স্বদেশী অ্যান্ড বয়কট মুভমেন্ট" (১১ নং) রচনাটির দুটি ভাগ : প্রথম অংশে বলা হয়েছে—নীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই ; ব্যক্তিগত জীবনে নীতিবাদী মানুষ রাজনীতির জগতে চূড়ান্ত দুর্নীতিকেও অনুচিত বিবেচনা করেন না। লর্ড মর্লে তার দৃষ্টান্ত। এহেন মর্লে তার রাজনৈতিক কুনীতির দ্বারা ভারতবর্ষের একটি বড় উপকার করেছেন—বয়কট আন্দোলনকে জোরদার করেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আছে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের চরিত্র-চিত্রণ ও তার পক্ষে সতেজ সমর্থন।

এই দ্বিতীয় অংশে নিবেদিতা স্বদেশী ও বয়কট বিষয়ে তাঁর পুরাতন বক্তব্যকে পুনশ্চ জোরালোভাবে উপস্থিত করেছেন। ভারতকে কোন্ হীন স্বার্থে ইংরাজ শোষণ করেছে,তার একটা সংক্ষিপ্ত তথ্যভিত্তিক কাহিনী এখানে পাই। নিবেদিতার চাতুর্যও লক্ষণীয়। তিনি শোষণের সমর্থক প্রমাণ তুলেছেন পাশ্চাত্ত্য লেখকদের রচনা থেকেই।

এই প্রবন্ধের গোড়ায় আছে কয়েক বাক্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত ভারতের রেখাচিত্র। ভারতবর্ষ কোমা-র অবস্থায় ছিল—তার থেকে তার পুনর্জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে পার্টিশন-নামক বিষৌষধি থেকে। পার্টিশনের ফল—স্বদেশী, অর্থাৎ স্বদেশীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের আন্দোলন। এখন এই স্বদেশী ব্যাপারটি মোটেই অভিনব নয়—স্বদেশী আন্দোলনের আগেই তার বীজ ও অল্প-স্বল্প অঙ্কুরোদ্‌গম ভারতে দেখা গেছে। 'স্বদেশী' শব্দটি অস্বস্তিকর হলেও উৎপীড়ক নয়। কিন্তু মারী-গুটিকার মতো শব্দ 'বয়কট'। এক্ষেত্রে নিবেদিতাকে পরিষ্কার বলতে হল : "স্বদেশী ও বয়কট একই জিনিসের দুই প্রয়োজনীয় দিক। একটির সাহায্য ছাড়া অন্যটি বাঁচতে বা বাড়তে পারে না। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্বের কোনো একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে মিলবে না। যখনি কোনো স্বাধীন জাতি তার স্বদেশীয় শিল্পের, অর্থাৎ 'স্বদেশীর' উদ্ভব ও বিকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছে তখন সেইকাজে সে বিদেশী দ্রব্য বয়কট-ভিন্ন সফল হতে পারেনি। বয়কট শব্দটির বয়স হয়ত তিরিশ বছরও নয়, কিন্তু তার ভাবটি মানবজাতির মতোই পুরাতন। যে-ইংলন্ড বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী জাতি, সে যখন তার শিল্প সংগঠনের জন্য সংগ্রাম করছিল তখন সে-কাজ করতে পেরেছিল বিদেশী দ্রব্যের অর্থনৈতিক বয়কটের দ্বারা।"

নিবেদিতা অতঃপর আইরিশ ঐতিহাসিক লীকি-র লেখার দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে ইংলন্ডের শিল্পবাণিজ্যের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী হাজির করেছেন। ইংলন্ড, এমন-কি আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের উৎপন্ন দ্রব্য পর্যন্ত স্বদেশে ঢুকতে দেয়নি, সেজন্য স্কটল্যান্ডও প্রচণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। লীকি-র ইতিহাস থেকে নিবেদিতা আরও দেখিয়েছেন—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বস্ত্রে ইংলন্ড ছেয়ে গিয়েছিল, তাদের হঠাবার জন্য ১৭০০ এবং ১৭২১ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টে আইন পাস হয়—নাগরিকদের পক্ষে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে। এইসকল ব্যবস্থা যখন ইংলন্ড করে তখন ভারত স্বাধীন। ইংলন্ডের নিষ্ঠুরতা ও নীচতা উলঙ্গ আকারে দেখা গেল পরাধীন ভারতের সঙ্গে ব্যবহারে। হোরেস হেম্যান উইলসনের 'হিস্টরি অব বৃটিশ ইন্ডিয়া' বই থেকে এইসূত্রে নিবেদিতা যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার একাংশে পাই :

"প্রদত্ত সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, এই পর্ব [১৮১৩] পর্যন্ত ভারতের সুতি ও রেশমী দ্রব্য বৃটিশ-বাজারে ইংলন্ডে জাত দ্রব্য অপেক্ষা পঞ্চাশ কি ষাট শতাংশ লাভে বিক্রয় করা যেত। তা ঠেকাতে ইংলন্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপরে সত্তর কি আশি শতাংশ কর বসল, কিংবা তাদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। এরকম না করা হলে...পাইস্‌লি বা ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলিকে গোড়াতেই বন্ধ করে দিতে হত, এমন কি বাষ্পশক্তির পরবর্তী প্রয়োগেও তাদের সচল করা যেত না। ইংলণ্ডের মিলগুলি ভারতীয় উৎপাদকদের বলিদানের দ্বারা তৈরী। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে এর

টমাস বাবিংটন মেকলে। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারিতে রক্ষিত স্যার ফ্রান্সিস গ্রাণ্ট কৃত প্রতিকৃতি।
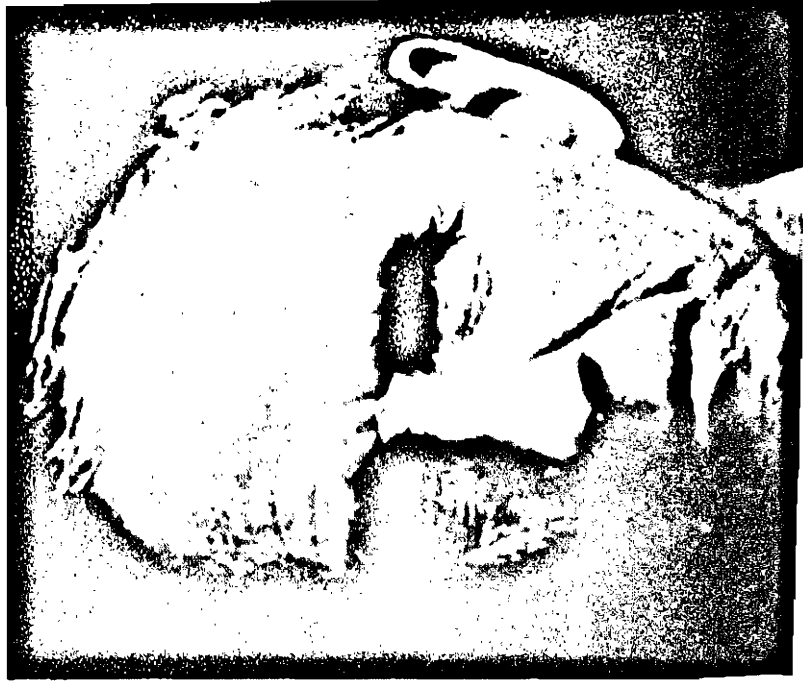
(বামে) ভারতের গভর্নর-জেনারেল হার্ডিঞ্জ অব পেনস্‌হার্স্ট্‌। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট গ্যালারিতে রক্ষিত স্যার উইলিয়ম অরপেন-কৃত তৈলচিত্র।
(ডাহিনে) ভারতসচিব ফার্স্ট ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্লাকবার্ন।

স্যার লরেন্স এচ জেনকিনস্, কে. সি. আই. ই. । বাংলার প্রধান বিচারপতি ।

আর্ল অব মি টা। ভারতের গভর্নর নারেল।

কাউন্টেস অব মিণ্টো।

কার্টুন হিন্দী পাঞ্চ, ১৫ অগস্ট ১৯০৯। (বামদিকে) গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ। গোখলের পায়ের তলায় লেখা—'চরমপন্থীদের কুৎসা।' সুরেন্দ্রনাথের পায়ের তলায়—'মানপত্র, অভিনন্দন, সংবর্ধনা।' সুরেন্দ্রনাথ গোখলেকে বলছেন : যে-মাসগুলিতে আমি বিদেশে ছিলাম তখন সর্বক্ষণ সংবর্ধনা পেয়েছি। তা তুমি এখানে কি-রকম ছিলে ? গোখলে : আমি ছিলাম দায়িত্বহীন চরমপন্থীদের নিন্দা-কুৎসার উপরে। বলাবাহুল্য, হিন্দী পাঞ্চ রাজভক্ত নরমপন্থী পত্রিকা।

(ডানদিকে) উপরে সাজানো খাদ্যবস্তু। তাতে লেখা—শিল্পায়ন, শিল্পোদ্যোগ, স্বদেশী শিল্পে মদত ইত্যাদি ইত্যাদি। কুকুরবেশী বিপিন পালের মুখে-ধরা মাংস-হাড়ে লেখা—'বয়কট'। 'বিচিত্র বাঙালী কুকুরটি' সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যেখানে ভালো ভালো মিঠাই প্রচুর সাজানো, সেখানে ওর কামড়াকামড়ির হাড় চাইই।

বেশান্ত-কার্টুন । হিন্দী পাঞ্চ, ৮ নভেম্বর ১৯০৮ । স্কুল-দিদিমণির ভূমিকায় অ্যানী বেশান্ত বেতের পতাকাদণ্ড নিয়ে এক মরাঠিকে শাসন করছেন—যে-ব্যক্তির মাথার টুপিতে লেখা—'দায়িত্বহীন চরমপন্থা ।' প্রসঙ্গ : বেশান্ত 'সনস্ অব ইণ্ডিয়া' নামে এক সংস্থা তৈরী ক'রে ঐ নামেই এক পত্রিকার প্রবর্তন করেন । উদ্দেশ্য—তরুণ সম্প্রদায়কে দায়িত্বহীন অপরাধজনক চরমপন্থা থেকে টেনে এনে শুভকর্মপথে ঠেলে দেওয়া ।

.. IONS.

has been
It was
...st (May

afternoon
House of
ervative—
he reason
s subjects
ough not
gainst the

eyond dis-
d men of
ninent for
n, philan-
d in their
state,. and
y warning
anything
l what are
pt equally
have com-
at there is
submitted
ainst them

de against
inable ex-
ave affixed
en marked
e offence.
l proceed-
ent, either
's to book.
treatment
ich means,
nished for
prevented
t they may
in find out
have been
at in India
sh subjects
ative, what
popular in

..EASE.
.. observes

.. 25) in the
f State for
. We wish
Hobhouse
arly a cen-
e ignorant,
e not even
t them. It
ed men are
eir previous
ar disorder,

THE REGIME OF REPRESSION.

BY J. KEIR HARDIE, M.P.

[FROM THE "LABOUR LEADER"]

Writing on "the Eastern Question" in the "Labour Leader," Mr. Keir Hardie, M.P., passes Turkey, Persia, Egypt, and India under review in turn. Touching Egypt, he observes:—

What, then, is now the position after a quarter of a century of British occupation? The Constitutional movement which has won such signal victories elsewhere is being treated as seditious. Editors of Nationalist newspapers and other reformers are being cast into prison, and our resident British agent is indulging in stale platitudes about reforms which are to be granted some day when the people become fit. It is the old game of hypocrisy and bluff once more being worked off on the British nation in the interest of the moneylenders, who, for close on half a century, have been "spoiling the Egyptians" without mercy.

Upon the subject of India, Mr. Keir Hardie says:

Then, in the Far East, there is India. For over a hundred years we have made ourselves responsible for the government and welfare of that great Empire.

There can be no question here concerning our responsibility for the condition of its people. Nor can it be alleged that they are unfit for self-government. The many Native States which are ruling themselves is a proof to the contrary which cannot be gainsaid. A great educated class exists in India which manages universities and higher-grade schools, supplies the country with lawyers, professors, newspaper editors, and the heads of great business concerns. Wherever these men have an opportunity they prove that, whether as administrators or as legislators, they have capacity of a very high order. For a quarter of a century they have been conducting a great reform movement; not for separation from the British Empire, but for self-government within its borders. But in India, as in Egypt, this claim has of late been treated as seditious. Everything possible has been done to render life well-nigh intolerable for all who are known to be, or who are even suspected of being, in active sympathy with the Reform movement. Their footsteps are dogged by corrupt secret police agents, their homes broken into and ransacked, and, when no evidence is found upon which a prosecution will lie, they are apprehended, and, without being told of what they are accused, without trial of any kind, are deported as exiles. There have been eleven such cases in two years, each victim being a man of education and good social position. A return was laid before Parliament the other day which shows the prosecutions of newspaper editors and others since January 1, 1907. Here is a summary of its contents:—

Number of persons prosecuted for seditious writing and speeches, 63.

Total number of years' imprisonment following convictions, 132.

Fines in addition to imprisonment, Rs 15,300.

One of the "crim-inals" got seven years for sending a "seditious" telegram; another five years for "exhibiting seditious photographs"; a third, a Mahomedan, two years for a "seditious" article, the said article being a commentary upon the methods of education in Egypt. In many cases the printing plant has, in addition to fine and imprisonment of the editors, been confiscated. Mr. Justice Beaman, of the Bombay High Court, in an [illegible]icle in the "Empire Review," shows how the legal mind c[illegible]s sedition. He therein states with brutal frankness tha[illegible]t is "patriotism" from the Indian standpoint becomes "rebellion" when seen from a British view point. And so the dreary tale proceeds; suppression of newspapers, imprisonment of editors, deportation of men of influence, and the practical prohibition of public meetings.

It is a terrible commentary on Britain's claim to be the [illegible] of constitutional government and the special patron of

'লেবার লীডার' পত্রিকায় বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা জে কেয়ার হার্ডি-র রচনা—ভারতে বৃটিশ শাসনের উৎপীড়ক আকার বিষয়ে। ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (২৮ মে, ১৯০৯) উৎকলিত।

ফ্রেডরিক ম্যাককারনেস, এম-পি ; বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে এবং পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে গেছেন। ভারতের উৎপীড়ক পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ করেছিল ইণ্ডিয়া পত্রিকা, ৩ ডিসেম্বর ১৯০৯। (পর পৃষ্ঠায়)

THE CHARACTER OF THE INDIAN POLICE.

By Frederic Mackarness, M.P.

[From "The Nation."]

YOUR contemporary, the "Spectator," published in its issue of November 13 the following grave statement by a correspondent about the Indian police :--

The Indian Courts know (italics not mine) that torture is occasionally used to extort false confessions. They, therefore, suspect every confession to be false, and, in practice, decline to convict on a confession unless it is strongly corroborated.

In 1902 Lord Curzon, then Viceroy of India, found it necessary to appoint a commission of leading Indians and Anglo-Indians to investigate the growing scandals in connection with the administration of the police in India. It was presided over by Sir Andrew Fraser, late Lieutenant-Governor of Bengal. It visited every province in India and examined upwards of 600 witnesses. Its report was presented to Parliament in 1905, and contained the following sentences :--

Everywhere we went we heard the most bitter complaints of the corruption of the police. . . . The forms of this corruption are very numerous. . . . The police officer may levy a fee or receive a present for every duty he performs. . . . Suspects and innocent persons are bullied and threatened into giving information they are supposed to possess. . . . If, in the police-officer's opinion, enough evidence is not thus obtained to secure a conviction, he will not hesitate to bolster up his case with false evidence. . . . *Deliberate association with criminals in their gains, deliberately false charges against innocent persons, on the ground of private spite or village faction, deliberate torture of suspected persons, and other most flagrant abuses occur occasionally. What wonder is it that the people are said to dread the police?* (Italics mine.)

This terrible indictment—not surpassed by Mr. Gladstone's denunciation of the Neapolitan police in 1851—has been in the hands of the Government of India since 1903. What has been done to remove this blot upon our civilisation? Why, hardly a mail comes from India without bringing fresh evidence of this intolerable oppression of our fellow-subjects; evidence, not from agitators, but from British judicial officers of the highest standing, nay, even from the police themselves.

new-comers are few, the rooms will be available, it is anticipated, for men from Oxford or Cambridge, or other academic centres, brought to London for the Civil Service, the Bar, or other examinations. Many young Indians live in the western suburbs, and the house is nearer their homes than Westminster, or than the eastern end of Piccadilly, where the Northbrook rooms have hitherto been situated.--"Times."

THE PROSCRIBED PAMPHLET ON THE POLICE.

AN INTERVIEW WITH MR. MACKARNESS

Upon receipt of a telegram on Friday evening last (May 27) from the Calcutta correspondent of the "Morning Leader" stating that Mr. Mackarness's pamphlet on the methods of the Indian police had been declared forfeit by the Government of Eastern Bengal, a representative of that journal called upon the late member for the Newbury division. Mr. Mackarness explained, in answer to enquiries, that the pamphlet consisted of extracts from the report of the Commission appointed by Lord Curzon in 1903 to enquire into the conduct of the police, and of extracts from the judgments of various judges—all Anglo-Indian officials—during the last 18 months or two years, pointing to the fact that torture for extracting evidence, and especially of confessions of suspected guilt from untried prisoners, was still largely prevalent.

"The pamphlet," continued Mr. Mackarness, "contains hardly any matter original to myself. It was published about six weeks ago, and has only just got out to India, I should say. The meaning of its suppression is that the Government of Eastern Bengal shrink from public attention being called to the fact that large bodies of police have been found to be both corrupt and cruel, and that the Executive in India has been unable to put down this practice of tor- I presume this has been done under the

ভারতের পুলিশী অত্যাচারের উদ্‌ঘাটন ক'রে ম্যাককারনেস যে-পুস্তিকা প্রকাশ করেন, ভারতে তা বাজেয়াপ্ত হয়। সে সম্বন্ধে ম্যাককারনেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিবরণ—ইন্ডিয়া পত্রিকায়, ৩ জুন ১৯১০।

said that the trouble is quite over."

Mrs. Besant's estimate of Mr. Arabindo Ghose is interesting, in view of his recent acquittal. She says: "The extremist party are small in number, though they have two or three men of very great power and influence among them. Arabindo Ghose, who has just been acquitted, is a man of the type of Mazzini, with the difference that he is fanatical, which Mazzini was not. He has been the h[illegible]t of the anti-English movement. He is a man of [illegible]tely pure motive and entirely unselfish. He has no personal axe to grind. But he is dangerous, because he would use any methods, which would upset British rule."

MR. ASQUITH AND THE DEPORTATIONS.

A LETTER OF PROTEST FROM MEMBERS OF PARLIAMENT.

The following correspondence has taken place between the Prime Minister and various members of Parliament with reference to the deported prisoners in India:—

House of Commons, May 3, 1909.

Dear Mr. Asquith,—We, the undersigned members of Parliament, beg respectfully to call your attention to the fact that ever since December 8 last nine British subjects in India have been deported from their homes and detained in prison without having been charged with any offence, or informed even of the grounds of suspicion entertained against them by the Government of India.

Some of them are admitted to be men of high character. None are alleged to have been previously convicted of any crime.

Under these circumstances, we venture to make an urgent appeal to you that they may be either brought to trial or set at liberty.

Signed by 84 Liberal and 62 Labour and Irish members.

THE PRIME MINISTER'S REPLY.

The Prime Minister's reply was addressed to Mr. Mackarness, M.P., who had been deputed to present the memorial, and was in the following terms:—

10, Downing Street, S.W., May 7, 1909.

My dear Mackarness,—I have to thank you for the memorial signed by many members of Parliament, praying that the nine British subjects in India who have been deported during the last few months should either be brought to trial or set at liberty. Such an appeal is perfectly natural, and I am not surprised to find that it is widely and influentially supported.

Deportation without trial as a method of dealing with political agitation must necessarily be repugnant to Englishmen, and to no one has the necessity of resorting to such a measure been more repugnant than to Lord Morley.

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথের কাছে, বাংলার ৯ জন স্বদেশী নেতাকে বিনাবিচারে নির্বাসন দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্টের ৮৪ জন লিবারাল এবং ৬২ জন লেবার ও আইরিশ সদস্য পত্র পাঠান—ম্যাককারনেসের নেতৃত্বে।

(ইণ্ডিয়া, ১৪ মে ১৯০৯)।

এই সংবাদের উপরে কর্তিত অংশে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অ্যানী বেশান্তের প্রচারের কিছু নমুনা আছে।

Westminster Gazette.]

Lord Morley von Moltke.

A happy cartoon by F.C.G. *apropos* of a dispatch by Lord Morley to be found in the Indian Frontier Blue-Book.

রিভিউ অব রিভিউজ্ পত্রিকার অগস্ট ১৯০৮ সংখ্যায় ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট থেকে মর্লে-কার্টুনের পুনর্মুদ্রণ। শান্তিকামী মানবতাবাদীরূপে পরিচিত মর্লে-র যুদ্ধোৎসাহ এই কার্টুনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

THE TIMES TUESDA

Obituary

MR. S. K. RATCLIFFE

JOURNALIST AND PUBLICIST

Mr. Samuel Kerkham Ratcliffe, who died in a London hospital yesterday, at the age of 90, was one of the last, as he was one of the ablest, of the old type of Radical journalist, a former acting editor of the daily Calcutta *Statesman*, and a much respected writer and lecturer on Indian and American affairs.

For many years he devoted himself to expounding (though always of his own Liberal and independent judgment) the British view of world affairs to the American public, and the American view to the British public. His strong interest— typical of the school to which he belonged in moral problems and religious freedom, made him an ideal author for the history, published in 1955, of the South Place Ethical Society of whose panel of lecturers he had been a member for more than 40 years.

Short and thickset in figure, he had a strikingly handsome head, with smooth silver-grey hair, and a clear-cut profile. In Liberal journalistic circles he was one of the most familiar personalities enthusiastic, kindly, and full of encouragement to young writers.

He was born of East Anglian stock in

ভারতের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রাক্তন স্টেটসম্যান-সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুসংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনকথা—লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায়, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। (স্বামী যোগেশানন্দের সৌজন্যে)। (পর পৃষ্ঠায় এই সংবাদই চলেছে)।

SEPTEMBER 2 1958

in 1923, of Sir William Wedderburn, one of the I.C.S. adherents to the Indian National Congress in its early years.

Books were few in Ratcliffe's vast output of print, but besides the two already mentioned he wrote *The Roots of Violence*, in 1934. His outstanding merit on the platform and as a broadcaster was that of clear, animated and sincere exposition. In his eightieth year he joined the staff of the *Glasgow Herald* as leader writer and remained there for two and a half years. He

had warm friends in many lands and, as hosts of fellow members of the National Liberal Club knew well, he was a most likeable and far-ranging conversationalist with the happiest gift of anecdote. In the last year or two he had borne failing eyesight with philosophy and cheerfulness.

He married Miss K. M. Reeves, and leaves

15 Chowringhee
26 Aug.

My dear Sister Nivedita,

You are what I knew you to be — & I am glad & grateful. I am doing night duty this week, & I don't think it will be possible to come over in the morning. If I'm not too tired I will start off about 7: then perhaps I can have about an hour with you. It is just as uncertain about the evening, so I send the article for you to read. Perhaps, Thing!

নিবেদিতাকে লেখা র‍্যাটক্লিফের ২৬ অগাস্ট ১৯০৫ তারিখের পত্র। এতে তিনি স্টেটসম্যানের রচনার বিষয়ে নিবেদিতার পরামর্শ প্রার্থনা করেছেন। এরকম প্রায়শই করতেন। (পর পৃষ্ঠায় একই পত্র)

প্রতিশোধ নিতে পারত—সেও বৃটিশ দ্রব্যের উপর কর বসিয়ে নিজের শিল্পকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত। আত্মরক্ষার অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি, বিদেশীর দয়ায় নির্ভরশীল তার জীবন। বৃটিশ মালকে কোনো কর না নিয়েই, জোর করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। বিদেশী উৎপাদকরা রাজনৈতিক অবিচারের হাত বাড়িয়ে ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে প্রথমত দমালো, তারপর মারল গলা টিপে—কারণ তার সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ভারতীয়দের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

ইংরাজলেখকদের আরও অন্য রচনা থেকে নিবেদিতা তাঁর বক্তব্যকে তথ্যযুক্ত করেছেন। একটি দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : ইংলণ্ড ভারতের বস্ত্রব্যবসায়কে ধ্বংস করেছে, যে-বস্ত্রব্যবসায়ের উপরে ইংলন্ডের সমৃদ্ধির ভিত্তি। ভারতের পক্ষে এই অভিযোগটি জোরালো রকম উঠেছিল বলে ইংরাজপক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল—কেবল বস্ত্রব্যবসায়ে নয়, ইস্পাত ও অন্য ব্যবসায়েও ইংলন্ডের দৌলত বেড়েছে। নিবেদিতা জোর দিয়ে বললেন—না, ইংলন্ডের সমৃদ্ধির বড় অংশ বস্ত্রব্যবসায়ের দান। জন ডিকিন্‌সনের 'দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আন্ডার এ ব্যুরোক্র্যাসি' (১৮৫৩) গ্রন্থ থেকে নিবেদিতা এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন : "আমাদের সুতি-দ্রব্য এখন ইউনাইটেড কিংডমের এক-অষ্টমাংশ লোকের কর্মসংস্থান করে এবং গোটা জাতির আয়ের এক-চতুর্থাংশ দান করে, যা বছরে ১২০ কোটি পাউন্ডেরও বেশি।" প্রধানাংশে এই অর্থ ভারতকে নিংড়েই মিলেছে।

নিবেদিতা অতঃপর বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে দেখালেন—স্বদেশী ও বয়কট পৃথিবীতে কিভাবে জাতীয়তা সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা, ইতালি, জার্মানীতে তা ঘটেছে। সুতরাং ভারতে ঘটবে না কেন? "স্বদেশীর অপর পিঠ বয়কট—আমেরিকা ও ইতালির ক্ষেত্রে তা যা ঘটিয়েছে, ভারতের জাতীয়তার ক্ষেত্রেও অবশ্যই তা ঘটাবে।" ভারতকে লুণ্ঠিত করতে ইংলন্ডের ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকরা উৎসাহী, কিন্তু ভারতের প্রয়োজনের বিষয়ে ইংলন্ডের মানুষ একই সঙ্গে উদাসীন থাকতে পারে। "ভারত-বিষয়ে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের জাগ্রত করতে হলে তাদের টাকার থলিতে হাত দেওয়ার অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত উপায় আর নেই। বয়কট আন্দোলনের মূল্য এখানেই, এবং তা যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ, একটা সময় ল্যাঙ্কাশায়ারের ৫০০-র বেশি কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।" বয়কট সম্বন্ধে রুষ্ট ইংরাজ ও তাদের অনুগত কিছু ভারতবাসীকে একই ব্যঙ্গশরে বিদ্ধ করে নিবেদিতা লিখলেন : "তোবামোদের সবচেয়ে আন্তরিক চেহারা হল—অনুকরণ। যাঁরা ভাবেন, যা-কিছু ইংরেজি তাই ভালো, তাঁরা ইংরাজদের রাজনৈতিক-অর্থনীতিক দর্শনের থেকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন—জেনে নিতে পারেন, ইংরেজরা স্বদেশীয় শিল্পের উৎসাহবিধানে কী ক'রে থাকে।" তারা কী ক'রে থাকে তা নিবেদিতা যথেষ্টই দেখিয়েছেন। প্রবন্ধ শেষে নিবেদিতার সুপরিচিত আহ্বানের ভাষা :

"Let the prayer go out of the heart of every patriotic Indian that success be to the cause of Swadeshi in India, that the Motherland again rise in prosperity and win the esteem and respect of other nations by the skill of her manufacturing sons and daughters. May Swadeshi and Boycott take such a firm root in the land of the holy rishis and sages, whose productions both material and spiritual will excite the admiration of all peoples of the world, that nothing may be able to uproot them. God of all nations, give strength to the people of India to carry on with vigour the campaign of Swadeshi and Boycott till all their efforts be crowned with success and the formation of a United Indian Nation."

এই স্বদেশী ও বয়কট ভারতবর্ষকে যাঁরা উপহার দিয়েছেন তাঁদের একজন লর্ড মর্লে। প্রবন্ধের

গোড়ায় তাঁর চরিতগাথা নিবেদিতা রচনা করেছিলেন। "বর্তমান ভারতসচিব—'স্থির ব্যবস্থার ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ন, যিনি সম্প্রতি পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এই বাণী নিবেদন করেছেন যে, তাঁর পক্ষে পার্টিশন বরবাদের কাজের সামিল হওয়া সম্ভব নয়—সেই তিনি, পার্টিশন যখন ৬ মাসের শিশু নয় তখন ঘোষণা করেছিলেন—ও-বস্তুর দ্বারা বিচলিত মনুষ্যগণের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ও-বস্তুকে কার্যকর করা হয়েছে। হিজ লর্ডশিপ সেইকালে ছিলেন নিছক মিঃ মর্লে, পৃথিবীর লোক যাঁর বিষয়ে ভাবত—ওঁর ক্ষেত্রে অন্তত 'হিস্টরি অব ইউরোপীয়ান মর‍্যালস্' গ্রন্থের লেখক রাজনৈতিকদের বিষয়ে যা লিখেছেন তা প্রযুক্ত হবে না।" নিবেদিতা ঐ বইটি থেকে খানিক অংশ উদ্ধার করেন—তাতে দেখা যায়—ব্যক্তিগত জীবনে যিনি ন্যায়বোধের মডেল, সেই তিনি "রাজনৈতিক অসাধুতা ও হিংসার জঘন্যতম কাজেরও সাফাই-গায়ক হয়ে পড়েন। এই প্রকার বিচিত্র নৈতিক বৈপরীত্য মোটেই বিরল নয়। দেখা যায় যে, জাতীয় জীবনের গুণাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক অপরাধ।" উদ্ধৃতির বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে একদা উৎসাহিত "মিঃ মর্লে" কালগতে "লর্ড মর্লে" হয়েছেন। তা হয়েই তিনি শিখে নিয়েছেন, "রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য—সুবিধাবাদ।...অপরদিকে দার্শনিকদের উদ্দেশ্য সত্য।...রাজনীতির ক্ষেত্রে দার্শনিকতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে আত্মঘাতী ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।...উগ্র রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে স্বার্থশূন্য সত্যপ্রীতি একত্রবাস করতেই পারে না। যে-সকল দেশে চিন্তাপ্রকৃতি প্রধানত রাজনৈতিক জীবনের আশ্রয়ে গঠিত, সেই সকল স্থানে সুবিধাবাদের দ্বারা সত্যকে যাচাই ক'রে নেওয়ার প্রবণতা আমরা আবিষ্কার করতে পারি।" এহেন দর্শনের দ্বারা নবতেজপ্রাপ্ত মর্লে-র পূর্বাপর চরিত্রের নিবেদিতাকৃত এই মনোরম মূল্যায়ন :

"মহদাশয় ভাইকাউন্টের রচনা ও বক্তৃতাসমূহ যেহেতু উপরের বিবৃতির অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থক নয়, তাই তাঁকে তাঁর স্বদেশবাসী—যাদের চিন্তাপ্রকৃতি প্রধানত রাজনৈতিক জীবনের আশ্রয়ে গঠিত, তদনুযায়ী সুবিধাবাদের দ্বারা সত্যকে যাচাই করবার প্রবণতাযুক্ত—'সাধু জন' আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষেই তো পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। 'সাধু জন' একদা ম্যাকিয়াভেলির মত-পথকে অপরিমিত নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু ভাবী ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ইতিহাসের মর্লে-অধ্যায়ের ইতিহাস লেখার সময়ে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—হিজ্ লর্ডশিপের ভারত সম্বন্ধীয় পলিসির সঙ্গে ম্যাকিয়াভেলী-নীতির সুস্পষ্ট কোনো বিরোধ ছিল না।"

মডার্ন রিভিউ-এর ১৯১০ জুলাই সংখ্যায় "এ জাস্টিফিকেশন ফর একসেসিভ্ মোসলেম রিপ্রেজেনটেশন" (১২ নং) সম্পাদকীয় নোট-এ নিবেদিতা স্যার হ্যারি জনস্টনের নির্লজ্জ মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করেছেন তথ্যযোগে। স্যার হ্যারি জনস্টন বলেছিলেন, মুসলমানেরা জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি আসন পেতে পারে কারণ তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত। এরকম ডাহা বাজে কথার খণ্ডন করতে বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি।

॥ ৩ ॥ প্রথম ভারতীয় আইন-সদস্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ : সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও মেকলে

নবগঠিত ভাইসরয়-কাউন্সিলের প্রথমভারতীয় সদস্য (আইন-সদস্য) নিযুক্ত হন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর বিষয়ে দুটি লেখা—"মেকলে ভারসাস্ সিন্‌হা" (১০ নং), এবং "এস পি সিন্‌হাজ রেজিগনেশন্" (১৩ নং)। প্রথম লেখায় ভারত সরকারের একেবারে প্রথম আইন-সদস্য মেকলের সঙ্গে প্রথম ভারতীয় আইন-সদস্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের গুণাবলীর তুলনা করা হয়।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর নিয়োগে বাধা দেবার জন্য ভারতের ইংরাজ আমলাতন্ত্র এবং ইংলন্ডের রক্ষণশীল মহল উঠে-পড়ে লেগেছিল। ভারত সরকারের শাসন-পরিষদে একজন ভারতীয়ের প্রবেশ তাঁদের কাছে চিন্তাতেও অসহ্য। সেই মর্মজ্বালার উপরে নুন ছড়াবার উদ্দেশ্যে নিবেদিতার এই লেখাটিতে তথ্যসহযোগে দেখানো হয়—প্রথম ইংরাজ আইন-সদস্যটি কত অপদার্থ ও নীচ, অপরপক্ষে প্রথম ভারতীয় সদস্য পূর্ববর্তীদের তুলনায় কতখানি উচ্চগুণসম্পন্ন। মেকলের মুখের উপরে নিবেদিতা ক্রমান্বয়ে ঝামা ঘষে গিয়েছিলেন। "ভারত সরকারের প্রথম ল' মেম্বার মেকলে ছিলেন এক দুঃস্থ ভাগ্যান্বেষী—উনি এই দেশে এসেছিলেন 'প্যাগোডা-গাছ' নাড়া দিয়ে, এদেশের সন্তানদের খরচে বড়লোক হতে, অথচ দেশীয় মানুষদের প্রাণভরে গালাগালি দিতে ওঁর বিবেকে বাধেনি।"

বোনকে লেখা মেকলের একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, পেট চলছে না বলেই মেকলে সরকারী কাজে ঢুকেছেন। "লিখে কখনো বছরে দুশো পাউন্ডের বেশি রোজগার করতে পারিনি [মেকলে বলেছিলেন], অথচ পাঁচশো পাউন্ডের কমে স্বচ্ছন্দে আমার দিন চলবে না।" সুতরাং মেকলে ভারতে এলেন—আইন-সদস্যের পদ নিয়ে। এখানে তিনি পাবেন "বছরে দশ হাজার পাউন্ড।" কলকাতার হালচাল জানেন এমন লোক তাঁকে যা বলেছেন, সানন্দে সে সংবাদ তিনি বোনকে দেন : "বছরে পাঁচশো পাউন্ড খরচ ক'রে রাজার হালে [ভারতে] থাকতে পারব ; বাকি মাইনে সুদসুদ্ধ জমাতে পারব। ফলে যখন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইংলন্ডে ফিরব তখন দেহে-মনে পুরো শক্তি, তৎসহ ৩০ হাজার পাউন্ডের ঐশ্বর্য।" এহেন অর্থলোভী বাগাড়ম্বরপ্রিয় এক ব্যক্তির নিয়োগের অনৌচিত্য কতখানি, নিবেদিতা তা খুলে দেখিয়ে দেন : উনি সেই ব্যক্তি যিনি আইন-সদস্য হবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ভারতের রীতি-নীতি, জীবনযাত্রার বিষয়ে কেবল সম্পূর্ণ অনবহিত নন—অবহিত হবার প্রয়োজনকে ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করেছিলেন, অথচ সরকারী নথিপত্রে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান আইন-সদস্যের পক্ষে আবশ্যক বলে লিখিত।

মেকলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর তুলনা অতঃপর। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর নিয়োগে অসন্তুষ্ট লন্ডন টাইমস আইন-সদস্যের মধ্যে প্রত্যাশিত গুণাবলীর দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত ক'রে বক্রভাবে বলেছিল, "মিঃ সিন্‌হা ঐ সকল গুণের অধিকারী হলেও হতে প্যারেন, তবে সেগুলি যে-কোনো জাতির মানুষের মধ্যে বিরল, আর প্রাচ্যদেশীয়দের মধ্যে তো জঘন্যভাবে অনুপস্থিত।" এর উত্তরে ইন্ডিয়া পত্রিকা বলেছিল—ঐ সকল গুণ মিঃ সিনহার পূর্ববর্তী ইংরাজ আইন-সদস্যদের মধ্যে কদাপি ছিল না। সেইসব ব্যক্তির তুলনায় আইন-জীবনে সিন্‌হার সাফল্য সমুচ্চ, এবং আশা করা যায়, ইংরাজ আইন-সদস্যরা আইন-বিভাগকে যে-গহ্বরে গেড়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে তাকে সিন্‌হা উদ্ধার করতে পারবেন। নিবেদিতা তৃপ্তির সঙ্গে 'ইন্ডিয়া'র মন্তব্য উৎকলন করেন। তারপর পুনশ্চ মেকলের চরিতনামা শোনান। মেকলে সারাজীবনে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করেননি। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের গৌরব তাঁকে দেওয়া হয়। সে-কাজ তিনি কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্যে করেন নি ; ইংলন্ডের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি ও খ্রীস্টধর্মের বিস্তারের জন্যই করেছিলেন। তাঁর ধারণায়—অসভ্য লোককে শাসনের চেয়ে সভ্য লোকের সঙ্গে ব্যবসা ইংলন্ডের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে ; "এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, [মেকলে বলেছিলেন] যদি আমাদের শিক্ষানীতি বলবৎ করা হয় তাহলে আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার সভ্যশ্রেণীর মধ্যে একটিও পৌত্তলিক থাকবে না।" এই প্রথম-নিযুক্ত ইংরাজ আইন-সদস্যের পাশে প্রথম ভারতীয় আইন-সদস্যকে স্থাপন ক'রে নিবেদিতা বলেন, মেকলে যেখানে গাছ নাড়িয়ে টাকা কুড়োবার জন্য ঐ কাজ নিয়েছিলেন, সেখানে এস পি সিংহ "বৎসরে তিন লক্ষ টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে ঐ পদ নিয়েছেন, যে-অর্থপরিমাণ ভাইসরয়ের মাহিনার চেয়েও বেশি।" তারপর, মেকলে

যেখানে কোনো বড় আইনজ্ঞ নন, সেখানে সিন্‌হা একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের আইনজীবী। মেকলে এদেশের কোন্ ক্ষতি করেছেন, তার কথা পুনশ্চ নিবেদিতা লিখলেন : "এদেশের বর্তমান বিক্ষোভের উৎপত্তিতে মেকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান প্রচুর। যে-কোনো ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে চূড়ান্ত ঘৃণা তিনি পোষণ করেছেন। তাঁর শিক্ষা-প্রস্তাব এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যা ভারতীয়দের অনুভূতির উপর প্রচণ্ড অত্যাচার। এই সুবৃহৎ উপমহাদেশের কোনো ভাষার বিষয়েই যাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না, যিনি প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের বিষয়ে জানবার কোনো ইচ্ছাই বোধ করেননি—সেই তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাবার মতো ঔদ্ধত্য দেখালেন!! যেভাবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের সুখে বাঙালীদের কুৎসা করেছেন—বাংলার মানুষ তা কদাপি ভুলতে পারেনি। যদি মেকলের ঐসব গালাগালির কথাগুলি প্রতিটি বাঙালীর বুকে বিঁধে গিয়ে মেকলের শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে বাঙালীদের হতশ্রদ্ধ ক'রে ফেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।" এর উল্টোদিকে ছিলেন প্রতিভাবান সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, যাঁর কাছে তাঁর দেশবাসী "অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হবে," যদি তিনি মেকলে ও তাঁর অনুবর্তীদের দ্বারা চাপানো অন্যায়ের প্রতিকার করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর করণীয়ের মধ্যে ছিল "জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি-নির্ণয়, ন্যায়সঙ্গত ভূমি-আইন, আইনের সরলীকরণ, অপরাধীদের শাস্তি-বিষয়ে মানবিকতাবোধ এবং অস্ত্র-আইনের প্রত্যাহার।" এসব কাজে যদি তিনি অসমর্থও হন, তার ছাড়ানও নিবেদিতা তাঁকে দেন—ভাইসরয়-কাউন্সিলে তিনি তো সর্বদাই সংখ্যালঘু দলের হবেন।

এই প্রবন্ধে তথ্যযোগে অধিকন্তু দেখানো হয়—শাসন-পরিষদে আইন সদস্যকে কখনই পূর্ণ সদস্যের অধিকার দেওয়া হয়নি—না, ইংরাজ সদস্যদেরও নয়। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সদস্যের কী দশা হবে, সহজেই অনুমেয়। [আইন-সদস্যের পদটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত না বলেই প্রথম ভারতীয় সদস্যকে ঐ পদ দেওয়া হয়]। নিবেদিতা লিখলেন : "এখন যেহেতু একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আইন-সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন, এক্ষেত্রে তাঁকে শাসন পরিষদের অধিবেশন ও আলোচনা থেকে কৌশলে বাদ দিতে পারা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক কাজ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাটদের কাছে আর কিছু থাকতে পারে না।"

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর পক্ষে বেশিদিন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়নি। নিবেদিতা আগেই ওঁর পদত্যাগের অভিপ্রায়ের কথা জেনেছিলেন। ৬ জুলাই, ১৯১০, র‍্যাটক্লিফকে লেখেন :

"এস পি সিন্‌হা পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। এটা অবশ্য অত্যন্ত গোপন সংবাদ। তিনি দেখেছেন যে, তাঁকে মোটেই ভিতরকার ব্যাপারে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে না জানিয়ে, তাঁকে এড়িয়ে, কাজ সমাধা করা হচ্ছে, এবং তিনি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন। সিমলায় আছেন বলে নিজের মানুষের সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন, আর ওঁকে এদের কোনো প্রয়োজনই নেই।"

এই চিঠিতেই নিবেদিতা জানালেন : ভারতীয়দের মধ্যে একটা স্ফূর্তি জেগেছিল, একজন ভারতীয় যখন শাসন-পরিষদের সদস্য হয়েছেন, তখন সরকারের ভিতরের খবর আর গোপন থাকবে না—সেই আহ্লাদে কিন্তু সায় দেওয়া যায় না। কমিটিগুলিকে এমন কায়দা ক'রে তৈরী করা যায় যে, অবাঞ্ছিতকে তাদের থেকে দূরে রাখা সহজেই সম্ভব। নিবেদিতা এইসঙ্গে র‍্যাটক্লিফকে সতর্ক ক'রে দিলেন—"এস পি সিন্‌হাকে সম্ভবত কোনো চমৎকার নতুন চাকরি দিয়ে কিনে নেওয়া হবে, সুতরাং এই সংবাদটি ব্যাবহার করো না।"

নিবেদিতা একই প্রসঙ্গে ১০ অগস্ট র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

"সরকার তার রিফর্ম স্কীমের দ্বারা কিভাবে দুরস্ত হয়েছে, তার কথা তুমি বলেছ। আমার মতে, বলা উচিত ছিল কিভাবে সরকার আপাতত দুরস্ত হয়েছে মনে হচ্ছে। বস্তুত কেবল কাগজে-কলমে সে দুরস্ত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না সরকার এতটুকু বদলেছে। সৌভাগ্যবশত আমি তোমাকে সময়ে-সময়ে যেসব সংবাদ পেয়েছি তা জানিয়ে গেছি। তুমি জেনেছ যে, এস পি সিন্‌হা দেখেছেন—কিভাবে তাঁকে আসল জায়গা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যে-কোনো শক্ত কমিটি সহজেই এ-জিনিস করতে পারে—সামাজিক সম্পর্কের বৈষম্যকে নীতিহীনভাবে ব্যবহার ক'রে কোনো একজন সদস্যকে তা একেবারে অকেজো করে দিতে পারে।"

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর পদত্যাগের পরে সেপ্টেম্বর ১৯১০ সংখ্যার মডার্ন রিভিউ-এ সম্পাদকীয় নোট-এ (১৩ নং) নিবেদিতা অনেক সাবধানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঐ কথাগুলি লিখেছিলেন। তার গোড়ার দিকে, পদত্যাগ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নর বিরুদ্ধে কিছু সংবাদপত্রের অনুচিত সমালোচনার উত্তর ছিল। ঐসব সমালোচনায় বক্রভাবে বলা হয়েছিল, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বোধহয় আর্থিক ক্ষতির কারণে পদত্যাগ করছেন। তাঁকে অ্যাসকুইথ, হ্যালডেন, লয়েড জর্জের আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়—যেসব ব্যক্তি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও মন্ত্রীত্বাদি করেছেন। নিবেদিতা উত্তরে লিখলেন :

"এইসকল উচ্চভাবসম্পন্ন সাংবাদিকের মাথায় কি এটা আসেনি যে, পূর্বোক্ত [ইংরাজ] ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক-দশমাংশের অধিকারীও মিঃ এস পি সিন্‌হা ছিলেন না ? আমাদের তো মনে হয়, কোনো ব্যক্তি তামাশার জন্য রাজকীয় আয় ত্যাগ করতে বাধ্য নন, কেননা তা করার মধ্যে কোনো গুণের পরিচয় নেই।"

এই ধরনের আরও কিছু কথা লেখার পরে, শেষের দিকে নিবেদিতা আসল কথাগুলি বলেছিলেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁর চিঠির বক্তব্যকে এখানে তিনি অনবদ্য সাংবাদিক কৌশলে প্রকাশ করেছেন :

"In spite of an 'authoritative' contradiction, most people seem still inclined to think that there may be something in the allegation of the correspondent of the *Manchester Guardian* that Mr. Sinha has been obliged to recognise that he cannot expect to enter the inner circle of the Executive Councile of the Government of India.

"Our own guess is that Mr. S.P. Sinha has been obliged to recognise that his usefulness to this country in his present position has not been and cannot under present circumstances be at all commensurate with to the sacrifice he has made. It may also be that for some reason or other he feels like a fish out of water. We are not thought-readers, nor are we in the confidence of Mr. Sinha; but when a guessing competition is on, why should we have not our chance !"

নানাভাবে মর্লে-র কঠোর সমালোচনা করলেও নিবেদিতা কিন্তু ১৯১০ সালের ইংলন্ডের নির্বাচনে মর্লে-র দলের জয়কামনা করেছিলেন, কারণ মর্লে আপাতত অন্তত লিবারাল দলের অন্তর্ভুক্ত (যে-লিবারাল শাসনেই ভারতে ওহেন উৎপীড়ন !)—কিন্তু কনজারভেটিভরা এলে তো সর্বনাশ। ২০ জানুয়ারি ১৯১০, তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন :

"লিবারালদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি, কারণ মর্লের পতন মানে পাইকারী নির্বাসন।"

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার চিঠিতে মিন্টো-প্রসঙ্গ

স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে উত্তাল পর্বে লর্ড মিন্টো ভারতের গভর্নর-জেনারেল। "বয়স্ক লর্ড মিন্টো একেবারে ক্ষিপ্ত"—নিবেদিতা ২৩-৪-১৯০৬, মিসেস বুলকে লিখেছিলেন। সিভিলিয়ানদের কাছে মিন্টোর অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ, নিবেদিতার কাছে, এমনকি সিভিলিয়ানদের কাছেও, বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। ৮/৯ জুন, ১৯০৭, র্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন:

"কি ভয়ঙ্কর অবস্থা এসে গেছে। মিন্টোর দুর্বলতা দেখে স্তম্ভিত। মানসিক ও নৈতিক জাতি-যুদ্ধ! দুই পক্ষ সহযোগিতায় নয়, যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি। সিভিলিয়ানরা ভাইসরয়ের উপর নিজেদের আধিপত্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক—সে-কথা মনে না করে পারছি না।"

তথাপি মিন্টো, তাঁর আমলের সর্ববিধ উৎপীড়ন সত্ত্বেও (যার বিরুদ্ধে নিবেদিতা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন) যতখানি 'শয়তান' হতে পারতেন ততখানি হননি। অমলেশ ত্রিপাঠী মর্লে-মিন্টোর চিঠিপত্র থেকে দেখাতে চেয়েছেন—উৎপীড়নের বিধিব্যবস্থায় মর্লে যেখানে অনিচ্ছুক, সেখানে মিন্টো তার পক্ষে চাপ সৃষ্টি করেছেন। নিবেদিতা কিন্তু ঐকালে নানা গোপন সূত্র থেকে যেসব সংবাদ পেয়েছেন তাতে মিন্টোকে ব্যক্তিগত ক্রূরতার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তাঁর মতে, মিন্টোর দুর্ভাগ্য—ক্রূর, নীচ, অবিবেচক কার্জনের কৃতকর্মের বোঝা তাঁকে টেনে যেতে হয়েছে। আমেদাবাদে মিন্টোর উপরে ১৯০৯ নভেম্বরে বোমা ছোঁড়া হয় (কোনোক্রমে তিনি বেঁচে যান)—এই কাজকে নিবেদিতা "জাতীয় বুদ্ধিশক্তির স্খলন" মনে করেছেন। র্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখা ৩১ মার্চ ১৯১০ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা স্বীকার করেছেন, "ওঁর [মিন্টোর] আমলে অবশ্যই আতঙ্কজনক সংখ্যায় দমনমূলক আইন হয়েছে", কিন্তু নিবেদিতা যোগ করেছেন:

"মিন্টো পরিস্থিতির কাঠিন্যকে হ্রাস করার চেষ্টা যৎপরোনাস্তি করেছেন।...ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বে ভাইসরয় ছিলেন বলে [নিপীড়নমূলক আইনের] প্রয়োগের গতি বৃদ্ধি পায়নি, বরং বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মিন্টো তাঁর চরিত্রগত সৌজন্য ও মৃদুতার জন্য অসম্ভব এক অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব সুরাহার চেষ্টা করেছেন।...কাউন্সিলগুলি তামাশা ছাড়া কিছু নয়, নির্বাসিতরা কারাগারে আবদ্ধ—কিন্তু তুমি এবং আমি জানি, কার দোষে এসব ঘটছে। জে-র চিঠি যেকথা লিখেছে তাতে আর একজন চার ঘোড়ার গাড়ি-চড়া ভাইসরয় আসার সম্ভাবনা দেখে আমি আতঙ্কিত। তার মানে আর একটি কার্জনী-ধরনের রাজত্ব, প্রতিদিন নতুন খুনের সংবাদ! যদি পারো তার থেকে আমাদের বাঁচাও। কার্জন এখন এখানে থাকলে তাঁকে আর বেঁচে ফিরতে হত না—সে-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।"

আমেদাবাদে আক্রমণের পর থেকে, নিবেদিতা লিখেছেন: "শোনা যাচ্ছে, মিন্টো ভয়ে মরমর। বেচারা তা হতেই পারে। ভাইসরয়ের দায়িত্ব বেকারের উপর ছেড়ে দিয়ে উনি শীঘ্রই ফিরে যাবেন।" [১৭-২-১৯১০ চিঠি]।

আগের সপ্তাহে একই প্রসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন:

"আশঙ্কা হয় মিন্টো ফিরে যাচ্ছেন। আমার ধারণা, বেচারাকে যেসব অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার ফলে উনি একেবারে নার্ভ হারিয়ে ফেলেছেন। আর সেখানে কিনা ঐ আহাম্মক কার্জনটা ক্রমাগত বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছে! কি বিচিত্র, লোকটা লজ্জায় মাথা ঢাকছে না। ও কি ভেবেছে, এই নতুন পরিস্থিতির জন্য ছোট্টখাট্ট বেচারা মিন্টো দায়ী?" [১০-২-১৯১০]

॥ ৫ ॥ নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লেডি মিন্টোর আগমন : নিবেদিতার পত্রে এই ঘটনার পূর্বাপর রূপ : লেডি মিন্টোর জার্নালে উভয়ের সাক্ষাৎ-বিবরণ

এইকালে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। স্বয়ং লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন—২ মার্চ ১৯১০ তারিখে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক আমেরিকান মহিলা, এবং এ-ডি-কং কর্নেল ব্রুক। বাগবাজারের গলিতে স্বয়ং ভাইসরয়-পত্নী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসেছেন—বিপ্লবীদের উস্কানিদাতা বলে সন্দেহভাজন এক ইংরাজ-নারীর সঙ্গে দেখা করতে—ব্যাপারটার আশ্চর্যজনকতা সম্বন্ধে স্বয়ং লেডি মিন্টোই নিবেদিতাকে সচেতন করতে চেয়েছেন। "তিনি [লেডি মিন্টো] আমাদের বললেন [নিবেদিতা লিখেছেন]—আমরা যেন অতি অবশ্যই স্বীকার করি যে, এই বিশেষ কাজটি ইতিপূর্বে কোনো ভাইসরয়-পত্নী করেননি। সেকথা ঠিক। আমরাও সে-বিষয়ে সন্দেহ করি না।"

লেডি মিন্টো এর আগেও নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলন যখন চরমপন্থার প্রচারে বেপরোয়া, সরকারী মহলে এ-ব্যাপারে নিবেদিতার হাত আছে বলে সন্দেহবিদ্ধ—তখন লেডি মিন্টো ১৯০৭ মার্চ মাসে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য "ঘুরপথে চেষ্টা" করেন। নিবেদিতা পরিষ্কার "না" বলে দেন।

ঘটনাটির সূত্রপাত এইভাবে :

স্বামীজীর এক শিষ্যা মেরী হলবয়িস্টার (বিবাহের পরে হন মেরী হ্যামিলটন কোটস্‌) লর্ড মিন্টোর এক সম্পর্কের ভাইয়ের বাড়িতে গভর্নেস ছিলেন। সেই ভাই, মিন্টো গভর্নর-জেনারেল হবার পরে তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি হন। এই ভাইয়ের সূত্রে মিন্টো-পরিবারের সঙ্গে মেরীর বিশেষ পরিচয় ঘটে। লেডি মিন্টো ভারতীয় নারীদের সাহায্য করতে উৎসুক, এই কথা জেনে, এবং স্বামীজীর ঋণ শোধ করার ইচ্ছায়, মেরী চান নারীশিক্ষার ব্যাপারে নিবেদিতার সঙ্গে লেডি মিন্টো সহযোগিতা করুন। সেই উদ্দেশ্যে উভয়ের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে উৎসুক মেরী, নিবেদিতাকে এক চিঠি লেখেন। নিবেদিতা সেই চিঠি মিস ম্যাকলাউডকে পাঠিয়ে দিয়ে, এবং এ-ব্যাপারে নিজের মনোভাব জানিয়ে, ১৪ মার্চ ১৯০৭ তারিখে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল—লেডি মিন্টোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটাবার চেষ্টার পিছনে কিছু অতিরিক্ত কারণ থাকা সম্ভবপর। তিনি লেখেন :

"লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোনোই ইচ্ছা নেই। কদাপি ভেবো না, তিনি কিছু করতে পারবেন। যদি আমি সত্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তাহলে সেটা একমাত্র এই কারণে ঘটবে—এই সাক্ষাৎকারকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলে স্থির করেছিলেন, এবং আমাকে খোলাখুলি মতামত দেবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। নারীশিক্ষার ব্যাপারকে নিঃসন্দেহে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে—এবং আন্দোলনের সপক্ষে উচ্চমহলের বন্ধুও দরকার এই দুটি কথা উঠতে পারে। কিন্তু [আমার মতে] ওদের দ্বারা বড়-কিছু ফললাভ হবে না। আর আমি মনে করি না—লেডি মিন্টো

এক্ষেত্রে উপযুক্ত সাহস সংগ্রহ করতে পারেন। গত সপ্তাহে তিনি আমার সঙ্গে ঘুরপথে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন—এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে। আমি অবশ্যই এড়িয়ে গেছি। এসব কথা তোমাকে সাবধান করবার জন্য বলছি—তুমি যেন কদাপি এই ব্যাপারটিকে এগিয়ে দেবার জন্য এখানকার বা অন্য জায়গার কারো সঙ্গে যোগাযোগ করো না। মনে হয় না এমন ইচ্ছা তোমার আছে, কিন্তু যদি ঘটনাচক্রে তার উদয় হয় তাই তোমাকে এ-ব্যাপারে আমার দৃঢ় মনোভাব জানিয়ে দিলাম।...লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে বলাটাই আমার কাছে বিভ্রান্তিকর ও বিপর্যয়কর বলে প্রতীয়মান। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা তো আপদজনক। জনগণ নিজের জন্য যা করে তাই শ্রেয়।...আমার সকল আবেদনের লক্ষ্য—জনগণ। নৈতিকভাবে আমি তাদের সঙ্গে এক। শাসকদের সঙ্গে এমনকি সুদূর সম্পর্কও জনগণের সেবার ক্ষেত্রে লাভ নয়—ক্ষতি।"

ঠিক তিন বছর পরে, লেডি মিন্টো কোনো 'ঘুরপথে' না এসে, সরাসরি নিবেদিতার কাছে হাজির হন। নিশ্চয় নিছক কৌতূহলবশে নয়; খুবই সম্ভব, আমেদাবাদে বোমার হাত থেকে তাঁর স্বামী বাঁচবার পরে, সন্দেহলক্ষ্য নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষে যাচাই করবার জন্য। লেডি মিন্টো যে খুব ঝুঁকি নিয়ে এসেছিলেন—নিবেদিতাই সেকথা বলেছেন। বেশ কয়েকটি চিঠিতে তিনি বাগবাজারে তাঁর কাছে লেডি মিন্টোর আগমন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁদের ভ্রমণ, 'হার লেডিশিপের' আমন্ত্রণরক্ষা করতে তাঁর আবাসে গমন, তাঁরই অনুরোধে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ডাঃ বসু ও লেডি বসুর সঙ্গে 'লেডিশিপের' পরিচয়সাধন, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন :

"গতকাল সকালে ছোট-খাট এক আমেরিকান মহিলা এনে হাজির করলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য—কাকে?—লেডি মিন্টো। সমস্তটাই গোপন ব্যাপার—একজন এড্-ডি-কং কেবল সঙ্গে। লেডি মিন্টো চার্মিং—বোমার বিষয়ে নিজের মনোভাব শান্ত সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। পরের মঙ্গলবার তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে হবে। তার আগে পর্যন্ত এই সাক্ষাৎকার গোপন ব্যাপার।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ; ৩-৩-১৯১০]।

"গতকাল একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে, যা পরবর্তী কয়েক মাসের জন্য আমাদের অবিরাম পুলিশের হয়রানি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। লেডি মিন্টো সকালে গোপনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা হয়েছে। আমরা তাঁকে স্কুল দেখিয়েছি। পরের মঙ্গলবার তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা। তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত থাকবে। এই চিঠি স্থগিত রাখাই বোধহয় মঙ্গল, কেননা পোস্ট অফিসের এজেন্সির মারফত পরিকল্পনা পূর্বাহ্ণে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাঁদের উপরে বোমা ছোঁড়ার পর থেকে তিনি চলাফেরা কাজকর্ম বিষয়ে সাবধান হয়ে উঠেছেন। আর বুঝতেই পারছ আমি কোনো বিপর্যয়কর ঘটনার পরোক্ষ কারণ হতে পারি না। একটি ছোট-খাট আমেরিকান মহিলা কয়েক সপ্তাহ আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—তিনি এখানকার গোটা ব্যাপারটির ভালবাসায় পড়ে যান—তিনিই ওঁকে আনেন। বসু বললেন, বেপরোয়া আমেরিকান ছাড়া একাজ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।" [মিসেস উইলসনকে ; ৩-৩-১৯১০]।

"তোমাকে আজ যে-সংবাদটি দেব, সেটি কদাপি কল্পনায় আনতে পারবে না। লেডি মিন্টো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আর এইচ ফিপসন্ নামে ছোট-খাট এক আমেরিকান মহিলা তাঁকে এনেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর যৌবন কেটেছে বস্টনে। মিষ্টি ছোট্ট মহিলা, বিয়ে

হয়েছে এক ইংরেজের সঙ্গে; স্পষ্টতই খুব ধনী; তাঁর কাজকর্ম দৃষ্টিআকর্ষক; তৎসহ আমেরিকান-সুলভ মৌলিকতার পুরো বরাদ্দ। যাই হোক, এই অসাধারণ ব্যাপারটি ঘটেছে, যা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। বসু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। পুলিশ উত্তরোত্তর ভয়ানক বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল।...লেডি মিন্টোর মহলে এটি প্রচারিত হবে না। তবে তাঁর স্বামী জানেন। কয়েকদিন পরে এর কথা পাড়ায় জানাবো, এবং বুঝতেই পরছ সেটা সর্বাধিক মূল্যবান ব্যাপার হবে। [মিসেস বুলকে; ৩-৩-১৯১০]।

"গত মঙ্গলবার ভাইসরয়পত্নীকে যথারীতি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর ছোট একটি নৌকা ক'রে নদীপথে নদী-ঘাটে প্রত্যাবর্তন। তার মধ্যে স্বদেশী কাপে চা-পান, অন্তে তারকার আলোকের নীচে বাক্যালাপ।...উনি ছোট্ট মিষ্টি মাতৃজাতীয় মহিলা, নিজ স্বামীর জন্য তাঁর ভাবাকুলতা নিখুঁত সুন্দর।" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে; ১০-৩-১৯১০]

"লেডি মিন্টোর আগমন-ব্যাপার পুরো সফল। আমরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গিয়েছিলাম; তারপর সূর্যাস্তে নদীপথে প্রত্যাবর্তন। তিনি এখানে খড়ো-নৌকার উপর দিয়ে ঘাটে নামলেন, নানা মন্দির-যুক্ত সরু পথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে মোটরে পৌঁছলেন। মনে হল, এই ভ্রমণ তিনি পুরো উপভোগ করেছেন। ঠিক জনগণের মতো করেই সমস্ত কিছুর মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করার এই কাজকে তিনি নিজের অবিমিশ্র দীপ্ত বুদ্ধির ফল বলেই মনে করেছেন। তাঁর এড্-ডি-কং কর্নেল ব্রুক নদীর সৌন্দর্যে মোহিত; সে-বিষয়ে তাঁর অনুভূতি মর্মস্পর্শী। এই ঘটনা আমাদের কাছে যেমন, তাঁদের কাছেও তেমনি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরের দিন তিনি তোমার বন্ধু কর্নেলিয়া সোরাবজি-র সঙ্গে [বেলুড়-] মঠ দর্শন করেন।" [মিস ম্যাকলাউডকে; ১০-৩-১৯১০]।

"মিসেস হেরিংহ্যাম সোমবার সহসা বসুদের বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর অজন্তা-স্কেচগুলি মঙ্গলবার প্রদর্শিত হল। ঐদিন লেডি মিন্টোকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাবার কথা। তিনি ৯৩ নম্বরে [আপার সার্কুলার রোডে, বসুর বাড়িতে] আমাকে তুলে নেবার জন্য এলেন, আনন্দের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন, এবং বউ [অবলা বসু] ও ডাঃ বসুকে তাঁর সামনে হাজির করা হল। চমৎকার নয়? লেডি মিন্টোর ব্যবহার কি সুন্দর। অত্যন্ত স্বস্তিকর তা, কারণ বউ-কে রেখে-ঢেকে তাঁর কাছে হাজির করতে হয়নি, উনিই গৃহকর্ত্রীকে চিনে নিয়েছিলেন। পরদিন উনি সোরাবজি-র সঙ্গে আকস্মিকভাবে মঠে উপস্থিত হন।" [মিসেস বুলকে; ১০-৩-১৯১০]।

"তোমাকে বলতে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম, আগামীকাল দুপুরে বিশেষ আমন্ত্রণে লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাতে যাচ্ছি। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ এখন দারুণ অবস্থা। মনে হয় ছোট নৌকা ক'রে ভ্রমণকে তিনি উপভোগ করেছেন। তার কারণ তুমি বুঝবে। আমাদের তিনি কিছু স্বদেশী বিস্কুট নিয়ে যেতে বলেছেন। সেইসঙ্গে নতুন শিল্পরীতির এক বুদ্ধিমান তরুণ শিল্পীর আঁকা একটি অজন্তা-স্কেচ তাঁকে অগত্যা দিতে হচ্ছে, খোকার [ডঃ বসুর] অনুরোধে। খোকার অনুরোধ ছাড়া কোনোমতে সেটি হাতছাড়া করতাম না।" [মিঃ ম্যাকলাউডকে; ১৭-৩-১৯১০]।

"প্রচুর সংবাদ আছে, কিন্তু চিঠিতে আলোচনা করা অসম্ভব। মিষ্টি মহিলা লেডি মিন্টো, আমি যাতে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সেজন্য তিনি এমনই ব্যাকুল যে, সেকাজ ঐ সপ্তাহে

আমাকে করতে হয়েছিল। কমিশনার খুবই বিবেচনাবুদ্ধি দেখিয়ে অফিসে নয়, তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। বারান্দায় বসে এক কাপ চা-পান করা হয়। অতীব চার্মিং তাঁর ব্যবহার। অবশ্য জানা সম্ভব নয় তিনি কতখানি আন্তরিক ছিলেন। তবে কথাবার্তা ভালভাবেই চলেছে। তিনি বলতে পারতেন, [যে-রকম তেনারা বলতে অভ্যস্ত], 'নেটিভ-পল্লীতে বাস করা আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক'—তার তুলনায় কথাবার্তা ভালোই ছিল। অবশ্য 'হার এক্সলেনসির বন্ধু' ব্যাপারটা তো অগ্রাহ্য করার বস্তু নয়।" [মিসেস বুলকে ; ৬-৪-১৯১০]।

"আমাদের নতুন ও মহিমান্বিত বন্ধুকে [লেডি মিন্টোকে] বাধিত করবার জন্য আমরা হ্যালিডে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম—একসঙ্গে চা-পানও হয়েছে। তিনি বললেন, তিনি জানেন যে, 'পুলিশ শয়তান এবং নজরদারি যাচ্ছেতাই ব্যাপার।' কিন্তু উপরওয়ালারা তাঁকে বাধ্য করছেন। বিস্ময়কর কথা! কিন্তু একটা প্রশ্ন কথাবার্তার সময়ে আমি মন থেকে বিতাড়িত ক'রে রেখেছিলাম—যা কথাবার্তার আগে ও পরে মনে উঠে এসেছিল—'এস-বি হত্যাকাণ্ডে [?] তোমার হাত কতখানি ছিল ?' ঐটির উত্তর পেতে চাই। তুমিও কি চাও না ?" [র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে ; ৭-৪-১৯১০]

উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লেডি মিন্টোর আগমনের চমৎকারিত্বে নিবেদিতা প্রথম দিকে অভিভূত হলেও শেষপর্যন্ত সে মনোভাব বজায় থাকেনি, বিশেষত উপরোধে পড়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করাটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেননি, অথচ ভাইসরয়-পত্নীর অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে পুলিশী উৎপাতকে আরও অসহনীয় হতে দেওয়াও সম্ভব ছিল না, বিশেষত ডঃ বসুর স্বার্থে। পরবর্তী ঘটনাক্রমে দেখি, নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হ্যালিডে ভদ্রতা বজায় রাখলেও সন্দেহত্যাগ করেননি, এবং নিবেদিতাকে ছদ্মবেশ ধারণ করেই ভারতত্যাগ ও ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। লেডি মিন্টোর মধ্যে বৃদ্ধ স্বামীর শুভাশুভের ভাবনায় কাতর এক প্রেমময়ী নারীকে দেখে নিবেদিতার ভালো লেগেছিল, আর তিনি মনে করেছিলেন—দক্ষিণেশ্বর-ভ্রমণ ওঁর স্মৃতিতে বর্তমান থাকবে। নিবেদিতার সেই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। লেডি মিন্টো নিবেদিতার ব্যক্তিত্বেও আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর জার্নালে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরবর্তী ঘটনার মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে দেখতে পাই, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনস্থল পঞ্চবটী, তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর জার্নালে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ কিয়দংশে এই :

"সম্প্রতি জনৈকা মিস নোবলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কলকাতার দরিদ্রতম পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করতে বিশেষ আগ্রহবোধ করেছিলাম। উক্ত মিস নোবল ভারতীয় জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছেন : সিস্টার নিবেদিতা নামে তিনি আত্মপরিচয় দেন। আদর্শবাদী তিনি, হিন্দুধর্মের মধ্যে অপূর্ব সব তাৎপর্য দেখেন, যদিও তাঁর যুক্তিধারা অনুসরণ করা কঠিন। মিসেস ফিলিপসন্ নামক একজন আমেরিকান মহিলা এবং ভিক্টর ব্রুকের সঙ্গে তাঁর স্কুল দেখতে আমি অজ্ঞাতপরিচয়ে গিয়েছিলাম। সিস্টার নিবেদিতা এক বিশেষ শ্রেণীর বালিকাদের সেখানে পড়িয়ে থাকেন। তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শাসন-সংস্কারের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন, সেই সঙ্গে মিন্টোর শাসনকালে ভারতীয়রা যে, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছে, তার কথাও। তিনি বললেন, যাঁদের মধ্যে তিনি বাস করেন তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিরতিশয় দরিদ্র কিন্তু অতীব গর্বিত। আমার মনে হল, তিনি তাদের গুণাবলীকে আদর্শের বর্ণরঞ্জিত ক'রে দেখে থাকেন।...পৃথিবীর ধর্মচিন্তার বহু সহস্র বৎসরের বিবর্তনের ইতিহাস তিনি অনুশীলন করেছেন, এবং মনে করেন—ভারতবর্ষ জ্ঞান ও দর্শনের উৎসভূমি।

"শহরের দেশীয় অংশের কেন্দ্রস্থলে এক সংকীর্ণ অন্ধকার গলিতে, ক্ষুদ্র বাড়িতে, সিস্টার নিবেদিতা বাস করেন—বর্তমান গোলযোগের অবস্থায় যদি সকলের জ্ঞাতসারে সেখানে যেতে হত তাহলে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা ছাড়া আমাকে সেখানে কদাপি যেতে দেওয়া হত না, সেকথা আমি জানি। সেখান থেকে চলে আসার আগে আমি তাঁকে বললাম—আমি ভাইসরয়-পত্নী। তিনি শুনে খুবই বিস্মিত হলেন। [নিবেদিতার চিঠিতে কিন্তু কোনো ইঙ্গিতই নেই যে, স্থানত্যাগের আগেই মাত্র লেডি মিন্টো আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন]। মনোহারী তাঁর মুখ, বুদ্ধিতে প্রভাময়। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যখন তাঁকে বললাম, আমি [কালীঘাটের] কালীমন্দির অত্যন্ত অপছন্দ করেছি তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন আমি যেন নদীতটে [দক্ষিণেশ্বর] কালীমন্দির দর্শন করি, যেখানে তাঁর গুরু বিবেকানন্দ [লেডি মিন্টো এখানে এবং পরে ভুল ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের বদলে বিবেকানন্দ লিখেছেন] ১২ বৎসর ধ্যান ও সাধনা ক'রে গেছেন—যে-পর্যন্ত না তিনি 'সত্য' দর্শন করেছেন বলে পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেছিলেন। কয়েকদিন পরে সেই ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

"আমি ভিক্টর ব্রুকের সঙ্গে একটা ভাড়া-করা গাড়িতে যাত্রা করলাম, পথিমধ্যে সিস্টার নিবেদিতাকে পেলাম। মন্দির পর্যন্ত গাড়িতে গেলাম। মন্দিরের ফটকে মোটর ছেড়ে দিয়ে, একটি নিমগাছ পেরিয়ে এগোলাম। গাছটি পবিত্র বলে গৃহীত, দরিদ্র রমণীরা সেখানে পূজা করতে আসে, ছোট-ছোট অদ্ভুত বাজে চেহারার ঘোড়া গাছের তলায় রেখে দেয়, দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গরূপে। অগ্রসর হয়ে আমরা পাথর-বাঁধানো বেদীর সামনে পৌঁছলাম—সামনেই হুগলী নদী। ঐ বেদীর উপর গাছের তলায় বিবেকানন্দ বসতেন। [মনে হয় নিবেদিতা বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ এই বেদীতে বসে বিবেকানন্দও ধ্যান করতেন, যা তিনি করতেনই]। ধ্যানের পক্ষে সুনির্বাচিত স্থানটি, অস্তসূর্যের আলোয় শান্ত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানে একজন সন্ন্যাসী এলেন—তিনি আমাদের মন্দির-প্রাঙ্গণের বহির্বেষ্টনীর পথ দিয়ে নিয়ে চললেন। আমাদের আর ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না—খিলানের মধ্য দিয়ে যে-মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি আছে তা দেখলাম। পুরোহিতরা ইতস্তত যাতায়াত করছিলেন, সিঁড়িতে ক্ষুদ্র নগ্ন শিশুরা খেলা করছিল। এই অপূর্ব মন্দিরটি যেন শান্তি ও সন্তোষ বিকীর্ণ করছিল। সযত্নে পরিচ্ছন্ন এই মন্দিরের সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তীর্থযাত্রীরা পুষ্প নিয়ে আসেন, বিবেকানন্দের [শ্রীরামকৃষ্ণের] তপস্যাপূত বৃক্ষমূলে অর্পণ করার জন্য।...তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেটি এতই পবিত্র বলে বিবেচিত যে, প্রবেশের পূর্বে আমাদের পাদুকা উন্মোচন করতে হল। এখানে দৈন্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচিত্র মিশ্রণ। মশারিসহ বিছানা স্বাচ্ছন্দ্যের সূচক। দেওয়ালে দেবদেবীর ছবির অদ্ভুত মিশ্র সংস্থান। নিমজ্জমান পিটারকে আমাদের প্রভু উদ্ধার করছেন—তার একটা ছবি রয়েছে। ক্ষুদ্র ঘরটি সিস্টার নিবেদিতার মনকে পবিত্রভাবে পূর্ণ ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু আমার কাছে সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এটি খাপছাড়া জিনিস।

"নৌকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে ঘাটে নামলাম—যেখানে নির্ধারিত সময়ে দলে-দলে মানুষ স্নান করতে আসে। তিন-মাঝির একটি ক্ষুদ্র দেশী নৌকাতে উঠলাম। নদী দিয়ে যাবার সময়ে সিঁড়িতে-বসা লোকদের ছবির মতো দেখাচ্ছিল। ব্যারাকপুর থেকে লঞ্চে যাতায়াতের সময়ে আমি তাদের অনেক সময়ে দেখেছি কিন্তু কখনো ভাবিনি যে, ছোট দেশী নৌকায় আমি চড়ব। সিস্টার নিবেদিতার বন্ধু সিস্টার ক্রিস্টিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বসবার জন্য গদীর আসন আমাকে দেওয়া হয়েছিল। নৌকা চলাকালে চা-পান করানোও হয়। টাইফয়েডের চিন্তা মনে ঘোরাফেরা করছিল বলে আমি দুধ ছাড়াই চা দিতে বললাম। চায়ের সৌগন্ধ্যে ভাবলাম অবশ্যই সেরা 'অরেঞ্জ পিকো' চা। কিন্তু ওঁরা বললেন, সবই 'স্বদেশী' : চা, চিনি,

কাপ ও ডিস। নৌকা থেকে নেমে অপেক্ষারত মোটরে পৌঁছানো পর্যন্ত পথে ধীরে-ধীরে হেঁটে যাওয়া বেশ চমৎকার লেগেছিল। সেই অপরাহ্নে কেউই আমাদের চিনতে পারেনি। নৌকার মাঝি এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি টাকা বকশিশ হিসাবে পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত।

"অতীব মনোহারী সেই অপরাহ্নটি। সিস্টার নিবেদিতা পারিপার্শ্বিকের সবকিছুতে সৌন্দর্য দেখছিলেন। আলোচনার বিষয় অনুযায়ী পুরাতন পারসিক কবিতা আবৃত্তি করার অদ্ভুত সুন্দর ঝোঁক তাঁর আছে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির তারে বাঁধা বিচিত্র উচ্চসুরে সেগুলি তিনি আবৃত্তি করছিলেন। আমি যে অপরাহ্নটি যথার্থ উপভোগ করেছি, তা দেখে তিনি আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন।"[৬]

নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা লেডি মিন্টো পরেও করেছেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে দুঃখ জানিয়ে সিস্টার ক্রিস্টিনকে তিনি যা লেখেন, তার মধ্যে ছিল :

"ভগিনী নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব অপরূপ। তাঁর সঙ্গে যে অল্প কয়েকবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের বিষয়ে আমার স্মৃতি সুমধুর। অপরকে সাহায্য করার জন্য তাঁর উদ্দীপ্ত একাগ্র প্রয়াস আমার গভীর শ্রদ্ধার বস্তু।"[৭]

লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি খুবই ভুল করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি, তাঁর কাছে নিবেদিতা রিফর্ম এবং মিন্টোর শাসনকালের প্রশংসা করেছিলেন রাজনৈতিক কৌশলের কারণেই। মিন্টোর স্বভাবগত ভব্যতার তারিফ করলেও তাঁর শাসনকালে প্রচণ্ড উৎপীড়ন, সেইসঙ্গে রিফর্ম-স্কীমের অন্তঃসারশূন্যতা তিনি কিভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন—বিস্তারিতভাবে তা আমরা ইতিমধ্যেই উপস্থিত করেছি। নিবেদিতা ১০-৮-১৯১০, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন :

"লেডি মিন্টো ভাবেন, ভারতবর্ষকে পার্লামেন্ট দিয়েছেন বলে তাঁর স্বামী ইতিহাসে স্থান করে নেবেন। কিন্তু হায়, ও-যে খেলনার পার্লামেন্ট!"

॥ ৬ ॥ হার্ডিঞ্জ ও তাঁর শাসন সম্বন্ধে নিবেদিতা

মিন্টোর পরে ভাইসরয় হয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল লর্ড কিচ্‌নারের। কিচ্‌নারের মতো নিরেট লড়াকু আদমী আসছেন ভারতবর্ষের মুখ্য শাসনকর্তা হিসাবে—নিবেদিতা শিউরে উঠেছিলেন। সে সম্ভাবনা তিরোহিত হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মিসেস উইলসনকে ৬-৭-১৯১০ লেখেন : "কিচ্‌নার পরবর্তী ভাইসরয় হচ্ছেন না, এতে খুবই আনন্দিত। ক্রিস্টিন বলছে, কিচ্‌নার এলে তাকে সে বড় জোর দিন-পনের আয়ু দিতে পারে।"

কিচ্‌নার সম্বন্ধে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা ১৯/২০ জুলাই ১৯১০, লেখেন :

"কিচ্‌নারের পতন হয়েছে? একটি ঐতিহাসিক পতনের তুল্য ব্যাপার—অ্যাকিলিস্ নিজের শিবিরে বসে গুমরাচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, যদি ইংলণ্ড সত্যই, যেভাবেই হোক, কসাইদের ও কসাইবৃত্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়!"

৬ আত্মপ্রাণা (২২৪-২৭) কর্তৃক মূল রচনা উদ্ধৃত। লেখক-কৃত অনুবাদ।

৭ ঐ, ২২৬-২৭।

ভাইসরয় হয়ে এলেন চার্লস হার্ডিঞ্জ (১৮৫৮-১৯৪৪)। 'ফার্স্ট ব্যারন হার্ডিঞ্জ অব পেনস্‌হ্যার্স্ট।' ভারতে ভাইসরয়-জীবনের আগে তিনি সেন্ট পিটারস্‌বার্গে (রাশিয়া) বৃটিশ রাজদূত (১৯০৪-০৬), তারপর ইংলণ্ডে পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী আণ্ডার-সেক্রেটারি (১৯০৬-১০)। জবরদস্ত কনজারভেটিভ হার্ডিঞ্জ ভারতে পেষণের যন্ত্র সবেগে চালিয়ে দেবেন—এমন আশঙ্কা নিবেদিতা বোধ করেছিলেন। সংবাদপত্রে হার্ডিঞ্জের ছবি দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া :

"কাগজে হার্ডিঞ্জের মুখের ছবি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি এইসকল [দমন ও উৎপীড়ন] বাড়িয়ে চলবেন। চার-ঘোড়ার গাড়ি-চড়া নিরেট লৌহকঠিন ওহেন চেহারা !! ঐ চেহারা অবশ্যই সক্রিয় হবে—সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নয়, জনগণের বিরুদ্ধেই।" [র‍্যাটক্লিফকে, ১৯/২০ জুলাই, ১৯১০]।

একই কথা পরেও লিখেছেন :

"তোমাকে বলি, যখন হার্ডিঞ্জের শাসন শুরু হবে তখন আমাদের সকলের বিরুদ্ধে ঐ সকল [গোয়েন্দাগিরির] ব্যবস্থা আরও কঠোর হবে। ঐ ইস্পাতের জাঁতিকল মুখ, এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় !!!" [একই জনকে, ২৮ জুলাই ১৯১০]।

পুনশ্চ :

"সম্প্রতি ম্যাক্স-লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়লাম—হার্ডিঞ্জের আমলে কী ঘটবে তার থেকে দেখতে পাচ্ছি। সিভিল সার্ভিসের তখন হবে বেপরোয়া বাড়বাড়ন্ত। মিন্টোর আমলে যত দুর্দৈবই ঘটুক, তুলনায় তিনি এঞ্জেল।" [মিসেস র‍্যাটক্লিফকে, ১৪ অক্টোবর, ১৯১০]

লেডি মিন্টোর সঙ্গে পরিচয়ের সুফল দেখে নিবেদিতা সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধে হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আলাপের কথাও ভেবেছিলেন।

নিবেদিতাকে ধারণা বদল করতে হয়েছিল। সানন্দে দেখলেন—তাঁর আশঙ্কাগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দেখলেন যে, হার্ডিঞ্জ সেই শক্ত মানুষ যিনি কঠোরহস্তে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদেরও শায়েস্তা করেন। তাঁর দ্বারা শাসিত প্রশাসকদের মধ্যে লেফট্‌ন্যান্ট গভর্নর থেকে পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত অনেকেই ছিলেন। বেকার, স্ল্যাক, হ্যালিডে সম্পর্কে তাঁর কঠোর ব্যবস্থার কথা "উচ্চ পর্যায়ের ইংরাজ-শাসকদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ" অধ্যায়ে আগেই জানিয়েছি।

আনন্দের সঙ্গে দুঃখের হাসিও নিবেদিতাকে হাসতে হয়েছিল :

"বেচারা হার্ডিঞ্জ! প্রথমে এসে অজিয়াসের আস্তাবল সাফ করার চেষ্টা অতি উত্তম ব্যাপার, যদিও এইপ্রকার উৎসাহ একটানা ৫ বছর হারকিউলিসের পক্ষেও বজায় রাখা সম্ভব নয়। আর, তিনি ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিচ্ছেন। ...আমার আশঙ্কা, দুর্নীতি সর্বদাই রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।" [র‍্যাটক্লিফকে, ৬-৭-১৯১১]।

হার্ডিঞ্জ সত্যই স্থির সিদ্ধান্তের ও নির্দিষ্ট কর্মের মানুষ ছিলেন। যখন তিনি ভারতসচিব লর্ড ক্রিউই-এর মতো ক'রে উপলব্ধি করলেন যে, পার্টিশনই ভারতের গোলযোগের মুখ্য কারণ, তখন পার্টিশনের বরবাদে সমস্ত কাউন্সিলকে প্রণোদিত করতে মনস্থ করেছিলেন।[৮]

পার্টিশন রদ হবার আগেই নিবেদিতার দেহান্ত হয়। জীবিত থাকলে তিনি নিশ্চয় হার্ডিঞ্জের এই বিষয়ক স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করতেন।

৮ রমেশ মজুমদার, ২য়, ২৬৩।

কাহিনীধারাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখি, পার্টিশন-রদের প্রধান কর্মকর্তা হার্ডিঞ্জের উপর কিছুদিনের মধ্যে বোমা পড়েছিল। "আক্ষরিকভাবে আমি নৈরাশ্যে কেঁদেছিলাম [হার্ডিঞ্জ লিখেছেন] যখন দেখলাম, কতকগুলি দুর্বৃত্তের দ্বারা সাধারণ পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি অদৃশ্য হয়ে গেল।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সূত্রে প্রগাঢ় মন্তব্য করেছেন :

"হার্ডিঞ্জ একথা বুঝতে পারেননি—তাঁকে মোকাবিলা করতে হবে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দুর্বৃত্তের সঙ্গে নয়—তা করতে হবে বিরাট এক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে।...নতুন ভারতের অভ্যুদয় ঘোষিত হয়েছিল প্রকাশ্যে স্বরাজ দাবির দ্বারা—আর গোপনে বৃহৎ আকারে সশস্ত্র সংগ্রামের মন্ত্রণার দ্বারা। যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতে ছিলেন তখনো ঐ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আন্দোলন পুরোদমে চলছিল—কিন্তু তিনি নির্বোধের স্বর্গাসীন।"[১]

১ মজুমদার, ২য়, ২৬৪।

দশম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র পরাধীনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে নিবেদিতা

॥ ১ ॥ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে নিবেদিতার সচেতনতা

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টির পিছনে নিবেদিতার মূলচারী গভীরশায়ী চিন্তা ও চেষ্টার যথাসাধ্য বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। নিবেদিতা সমস্ত কিছুকে বৃহত্তর ইতিহাসের উপর স্থাপন ক'রে দেখতে চাইতেন বলে ভারতীয় সংগ্রামকে বিশ্বের শোষিত মানুষের সংগ্রাম বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তদনুযায়ী ব্যাপকতর চেতনার স্পর্শ এই আন্দোলনে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রসঙ্গ এসে গেছে। সে সকলের ইতস্তত উল্লেখও করেছি। তথাপি এই শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার অল্পবিস্তর উল্লেখ পুনশ্চ করা উচিত। তাঁর মতো মনস্বিনী, যিনি পাশ্চাত্যদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, তিনি কখনই বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না, কারণ ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন পৃথিবীর বড় অংশকে শিকারের ফাঁদে ধরে ফেলেছিল ; যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকেও জড়াবার উদ্যোগ করছিল ; উল্টোদিকে ঐ সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর নানাস্থানে সংগ্রামও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

নিবেদিতা নিজের জীবনকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বলে ভারতের প্রভু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হত। তাছাড়া পূর্ব থেকেই ইংলণ্ডের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মের যোগ ছিল। সেজন্য তাঁর চিঠিপত্রে ইংলণ্ডের নির্বাচন, তাতে কাদের জয় সম্ভব, কোন্ দল জয়ী হলে ভারত ও অন্যান্য স্থানের নিপীড়িত মানুষের কিছু সুবিধা হতে পারে—এসব প্রসঙ্গ আছে।

এছাড়া রাশিয়া, জাপান, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মন্তব্য পাই ; নরওয়ে, সুইডেন, পর্তুগাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশের রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও। রাজশক্তি ও চার্চের মধ্যে ক্ষমতার টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনাও করেছেন। [র‍্যাটক্লিফকে পত্র, ১৪-১০-১৯১০]। কটাক্ষ করেছেন তুরস্কের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের মিতালি পাতানোর চেষ্টার বিষয়ে। [ঐ ; ১৫-১০-১৯০৮]।

বারবার বলেছেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা নিতে হবে ক্ষুদ্রতর দেশগুলির স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে।

বুয়োর যুদ্ধ সম্বন্ধে নিবেদিতার মন্তব্য স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিচায়ক। মানবতাবাদী হিসাবে তিনি ইংরাজ কনজারভেটিভদের যুদ্ধলালসার সমালোচনা করেছেন, চেম্বারলেন এবং কেনী-ই যে

বুয়োর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য দায়ী, ইংরাজ জনগণের অসৎ যুদ্ধোন্মাদনাকে ব্যবহার ক'রে কনজারভেটিভরা যে, স্বদেশে নির্বাচন জিততে চাইছে—এসব কথা বলেছেন। [২৫-৯-১৯০০, ২৯-৯-১৯০০, চিঠি]। কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি যে, "ওলন্দাজরা আমাদেরই [ইংরাজদের] মতো ভয়াবহ শোষণকার্যে ব্যাপৃত, এবং একথা বিশ্বাস করবার মতো কারণ পর্যন্ত আছে—তারা আরও পাশবিক।" [১৪-৪-১৯০৪, চিঠি]।

॥ ২ ॥ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে নিবেদিতার কিছু চিন্তা

নিবেদিতার রচনাদির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধঘোষণা। ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর মনে কী পরিমাণে ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল তার যথেষ্ট পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়েছি। সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও ক্রমপ্রসারের বিষয়ে তাঁকে চিঠিপত্রে একাধিকবার আলোচনা করতে দেখা গেছে। খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম, যা পৃথিবীকে "বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, এই দুইভাগে বিভক্ত ক'রে থাকে"—তারাই পৃথিবীতে এনেছে সামরিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ। উদার মানবিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না বলে রোমকরা সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী না-হয়ে পারেনি। "রোমকরা সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জাতি। তাদের সামনে গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে সেই গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা ছিল না যার দ্বারা একই ধারায় প্রগতিমুখী নূতন পথ উন্মোচন করার প্রেরণা তারা বোধ করতে পারে।" অতি বিতৃষ্ণাকর এই স্থূল সামরিকতা। মানবসমাজকে খণ্ড দৃষ্টিতে দেখার জন্য সংকীর্ণ জাতীয়তা ও অধিকারলালসাযুক্ত যুদ্ধস্পৃহা এসেছে। তার বিরুদ্ধে অদ্বৈতবোধে উদ্দীপ্ত নিবেদিতার এই মহান উক্তি :

"সকল যুদ্ধই গৃহযুদ্ধ, কারণ অভেদ এই মানবসমাজ।" "All war is Civil War, for all Humanity is one." [মিস ম্যাকলাউডকে, ৩০-৫-১৯০০]।

ইসলাম গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদী থাকলেও পরে তার চরিত্র বদলেছে ; "এখন তারা বিজ্ঞানের জন্য ঐক্যবদ্ধ। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে জাগরণের সূচনা হয়েছে।" ফ্রান্স মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সম্ভাবনাকে রুখেছিল বলে তার প্রতি নিবেদিতা কৃতজ্ঞ। তাঁর ধারণা হয়েছিল, "সাম্রাজ্যবাদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অপসারিত করে—সর্বনিম্ন শ্রেণীকে নয়।" "যখন ভারতবর্ষ জাভা বা মিশরের মতো কয়েকটি ইউরোপীয়ের দ্বারা পরিচালিত ধান্য-উৎপাদক, মসলা-উৎপাদক জনসমষ্টিতে রূপান্তরিত হবে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা পরিতৃপ্ত হয়ে, হয়ত সহৃদয়ও হয়ে উঠবে, কারণ ক্রীতদাসদের প্রভুরা বাহ্যত নিষ্ঠুর উৎপীড়ক নয়।" [৫-৮-১৯০৯]। এই স্বস্তির দাসত্বের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন ; জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

"সাম্রাজ্য সত্যই অধোগতিকর। এই সকল নিষ্ঠুর শিকার ও অপরের মুখের আহার্য গ্রাস করা কেন ?—না, তার দ্বারা কিছু লোক মোটর চড়তে পারবে ; সকাল হতে না হতে কারুকার্যকরা পোশাক চড়িয়ে, গায়ে হীরা জহরত ঝুলিয়ে, ঘুরে বেড়ানো বজায় রাখতে পারবে। নির্বোধ ধনীরা নিরানন্দ অপব্যয়ী নিরর্থক জীবনের গভীরে ডুববে—ডুববে। এর থেকে আমি দরিদ্রতম হিন্দু হব ; ইন্দ্রিয়জগতকে ধূলিতলে পদদলিত ক'রে তার পরপারে প্রসারিত হবে দৃষ্টি।" [১৪-৯-১৯১১]।

কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন :

"[ইংরাজ শাসকদের] এই ধরনের উৎপীড়নের কাজ থেকেই বিদ্রোহ আকারিত এবং সুসংবদ্ধ

হবে—যা দুঃখের হলেও প্রয়োজনীয়। ইংরাজরা সেটা দ্রুত ঘটানো সম্ভবপর করে তুলছে। তাদের কাজকর্মের গতিক দেখলে মনে হয় তারা ভাবছে—এশিয়া তাদের ভালবাসে। ...তারা কি ভাবে যে, চীনকে তারা মাপসই করে ফেলতে পারবে? এশিয়া সর্বদাই দুর্বল থাকবে? একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে-গোষ্ঠী শাসন করছে তারা দ্রুত শোষণের ব্যবসায়ী প্রবৃত্তিতে চালিত, খাঁটি সাম্রাজ্য বিস্তারের আদর্শে চালিত নয়। খাঁটি সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রাণশক্তিপূর্ণ, পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত জাতির সৃষ্টি হয়—বর্তমানে যেমন আমেরিকায় হচ্ছে।" [১০-৮-১৯১০]।

॥ ৩ ॥ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে প্রচারিত 'পশ্চাদ্‌পদ জাতি-তত্ত্বের' প্রতিবাদে নিবেদিতা

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ নানামুখী—কামানের মতোই কলমের আক্রমণ। পরাধীন দেশসমূহের উপর শক্তির অধিকার জারি করতে সাম্রাজ্যবাদীরা কামানের গোলা ছুঁড়েছে, আর নৈতিক অধিকার ঘোষণা করতে কলমের কালি ছিটিয়েছে। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের কুণ্ঠিত বিবেকের জন্য বলবর্ধক সুরা—"পশ্চাদ্‌পদ জাতি-তত্ত্ব।" *(Backward Race Theory)*। এরই পার্শ্বচর—'সারভাইভ্যাল্ অব দি ফিটেস্ট' এবং 'হেরিডিটারি ট্রানস্‌মিশন' থিয়োরি—স্বামী বিবেকানন্দ যাঁদের সম্পর্কে বলেছেন—'দানবিক ও পাশবিক।' নিবেদিতা স্বামীজীর ঐ ধারণার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায়, দক্ষিণ ভারতে রক্ষণশীল বিদ্যাচর্চার দুর্গ কুম্ভকোনমের জনসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন :

"আমি এও দেখতে পাচ্ছি, 'বংশানুক্রমিক সংক্রমণ' ('হেরিডিটারি ট্রানস্‌মিশন্') ও অনুরূপ নানাপ্রকার দানবিক পাশবিক মতবাদকে পাশ্চাত্যজগত থেকে এনে হাজির করা হচ্ছে—দরিদ্র মানুষদের উপর অধিকতর বর্বর উৎপীড়ন চালাবার জন্য।" [বিবেকানন্দের ইংরাজি রচনাবলী, ৩য় ১৯২]।

স্বামীজী প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অন্যত্রও বলেছেন :

"যোগ্যজনের উদ্বর্তন ('সারভাইভ্যাল্ অব দি ফিটেস্ট') মতবাদের দ্বারা প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা থেকে অব্যাহতি পাবার যুক্তি খুঁজে পায়। এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা দার্শনিক বলে নিজেদের পরিচয় দেবার পরে, সকল দুষ্ট বা অনুপযুক্ত মানুষকে খুন ক'রে মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করার অভিপ্রায় বোধ করেন—তবে কারা বাঁচবার যোগ্য তা নির্ধারণ করার একমাত্র বিচারকর্তা এই সকল দার্শনিকই, তাও ধরে নিতে হবে।" [ঐ, ১ম, ২৯২]।

"প্রায়ই শুনি যে, ক্রমবিকাশবাদের ('থিওরি অব ইভলিউশন্') একটি বিশেষত্ব—তা সংসার থেকে দোষভাগ বাদ দিয়ে দেয়। ফলে ক্রমাগত দোষের অংশ বাদ পড়তে-পড়তে শেষ পর্যন্ত কেবল উত্তমই বলবৎ থাকবে। কথাটা শুনতে চমৎকার। এ সংসারে যাদের প্রাচুর্য আছে, যাদের প্রত্যহ কঠিন সংগ্রাম করতে হয় না, যারা এই তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে চূর্ণ হয় না—তাদের দম্ভের পিঠচুলকানি এতে হতে পারে। এইসব ভাগ্যবানের কাছে ঐ মতবাদ অবশ্যই অতি উত্তম, অতীব সুখদায়ক। সাধারণ লোক কষ্ট পাক, মরে মরুক, তাতে ওদের কি!" [ঐ, ২য়, ৯৫]

"আজকাল লোকে 'যোগ্যজনের উদ্বর্তন' নামক নয়া মতবাদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে

থাকে। তারা মনে করে, যার পেশীর শক্তি বেশি সেই জগতে টিকে থাকবে। [স্বামীজী পেশী-গরবীদের স্মরণ করিয়ে দেন—] ঐ মত যদি সত্য হত, তাহলে প্রাচীনকালে যেসব জাতি কেবল যুদ্ধ করে কাটিয়েছে তারাই আজ জীবিত থাকত।" [ঐ, ৩য়, ১৮১]

না, তারা জীবিত থাকেনি, পরন্তু দুর্বল হিন্দুজাতিই জীবিত আছে—স্বামীজী যোগ করেছিলেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সর্বাত্মক সংগ্রামে নেমে নিবেদিতা এই শোষণের সাফাই-গায়ক থিয়োরিগুলির মোকাবিলা করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রে এসব বিষয়ে অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। এইকালের মডার্ন রিভিউ-এ একাধিক অস্বাক্ষরিত রচনায় প্রসঙ্গটি আলোচিত, যাদের কয়েকটিকে নিবেদিতার লেখা বলে মনে করি। সেগুলির ভাবাভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতিতে নিবেদিতার সুস্পষ্ট মুদ্রণ লক্ষণীয়। তরুণ শিক্ষার্থীদের তিনি যেসব বিশেষজ্ঞের বই পড়তে অনুরোধ করতেন, তাঁদের অনেকের মন্তব্য এইসব রচনায় উদ্ধৃত আছে দেখা যায়। সমকালের মডার্ন রিভিউ-এর লেখকদের মধ্যে এইপ্রকার লেখার মতো শক্তিসম্পন্ন অন্য কারো কথা আমরা জানি না। এদের একটিকে অন্তত প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা নিবেদিতা রচনাবলীর (৫ম) অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ছদ্মবিজ্ঞানের ঘেরাটোপ পরে 'পশ্চাদ্‌পদ জাতিতত্ত্ব' কোন্ জঘন্য চেহারা ধরতে পারে, নিবেদিতা তা নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন মডার্ন রিভিউ-এর জুন ১৯১০ সংখ্যায় 'নেটিভের উত্থান' *(Rise of the Native)* নামক সম্পাদকীয় নোটে। জনৈক স্যার হ্যারী জনস্টন কোয়ার্টারলি রিভিউ পত্রিকায় একটি আড়ম্বরপূর্ণ রচনায় আলোচ্য বিষয়ে যা বলেছিলেন, সে-বস্তু "অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য ও বালকোচিত অহঙ্কারের প্রকাশে এতাবৎজ্ঞাত সকল সাম্রাজ্যবাদী বক্তব্যকে ছাড়িয়ে" গিয়েছিল। উক্ত ব্যক্তি সদম্ভে লিখেছিলেন : "আমরা ইস্ট ইণ্ডিজ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও দূরপ্রাচ্যের বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করেছি ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্ব থেকে, দেশী বিদেশী মহাজনদের কবল থেকে, রক্তপিপাসু উৎপীড়ক ও ভ্রান্ত ধর্মপ্রভুদের হাত থেকে। তাদের কাউকে-কাউকে তিরস্কার করেছি নরমাংসভোজন ও বহুগামিতা সম্বন্ধে, তারিফ করেছি তাদের উন্মুক্ত আনুগত্যের, ...কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করেছি তাদের দেশের রাজাদের ও অভিজাতবর্গের শিকার-আয়োজনের।" কিন্তু হায়! 'হায় হায়' করে উঠলেন জনস্টন-সাহেব। 'শ্বেত মনুষ্যের দায়ভার বহনের' জন্য অত পরিশ্রম করেও কি ফল লভিনু হায়! অকৃতজ্ঞ প্রাচ্যবাসীরা কিনা বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করল! "অ্যাঁ, ওরা ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পাবার জন্য আন্দোলন করছে!!"

"ঐ লোকগুলো [থুতু ফেলে জনস্টন সাহেব বললেন], মিশনারিদের কাছ থেকে লেখাপড়া-শেখা ঐ ক্রীতদাসদের সন্তানগুলো, পার্শী-মুদির কোল থেকে নেমে-পড়া ঐসব সাংবাদিকগুলো, জনপ্রিয় গর্দভ-চালকের ব্যাটারা—ওরা হয়ত এখন ছোটখাট খ্যাতি জোগাড় করে ফেলেছে, কিংবা হয়েছে বড়জোর প্রাচ্য দোভাষী বা হাতুড়ে ডাক্তার—ওরা করছে আন্দোলন!!" ঐ প্রকার উচ্চাভিলাষী নেটিভ আন্দোলনকদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা জনস্টন ও তাঁর স্বশ্রেণীর মানুষের যথেষ্টই জানা ছিল। তিনি সমঝে দিয়েছেন : "চেঁচামেচি ক'রে গাল পাড়লে, বা অনর্থক হিংসার কাজ করলে" কিচ্ছুটি হবে না! কি করলে ইংরেজের দয়া মিলতে পারে তাও সদয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে ইনি জানিয়েছিলেন : "ইংরেজের পূর্ণ প্রাণের সমাদর পাবার দুটি উপায় আছে। এক হল, যুদ্ধক্ষেত্রে তার সঙ্গে বীরের মতো লড়ে যাওয়া।" এই কথা বলেই, 'না না' ক'রে উঠলেন জনস্টন : ওপথে যেও না বাপু, একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। অন্য পথ ধরো। "দ্বিতীয় উপায় হল,

আর সেটা সবচেয়ে নিশ্চিত পথ—খুব ক'রে খাটো আর অনেক ক'রে টাকা করো। টাকাই উত্তম আচরণের গ্যারান্টি। প্রায় নিশ্চিতভাবে তা রাজনৈতিক সামর্থ্যবৃদ্ধি করে এবং বিবেচনাসম্মত ভোটাধিকার প্রয়োগের পথে এগিয়ে দেয়।"

এই ধরনের রচনা পাঠের পরে ধৈর্যধারণ করা সত্যই কঠিন, অন্তত নিবেদিতার পক্ষে কঠিন ছিল। স্বর্ণ-লালসার এই উলঙ্গ প্রদর্শনীতে "যে-বর্বরের আত্ম-উদ্‌ঘাটন" ঘটেছে—তাকে ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন : "নিজেকে নিয়ে তোমার স্ফূর্তি, দাগড়া-দাগড়া পেশী আর এতাবৎ-অপরাজিত তোমার ঐ ঔদ্ধত্যের উল্লাস—এসব দেখে মনে বুঝি একটু ঈর্ষার ভাব এসেছিল, কিন্তু তখনি দেখলাম—ঐ গুণগুলি আছে তবে খাটো আকারে—কুকুরছানায় কিংবা স্কুলবালকে। ওটা দৈহিক স্বাস্থ্য ও জান্তব উদ্দীপনার ফল।" নিবেদিতা আরও অগ্রসর হয়েছেন : "শ্বেতমনুষ্যরা দেবতা বা দেবোপম ব্যাপার হতে পারে, যা হে লেখক, তুমি সরলপ্রাণে ভেবে বসেছ, নিশ্চয় তারা তাই, তবে তা নিজেদের কাছে এবং নিজের পত্নীগণের কাছে।" অর্থসম্পদের স্তূপের উপরে উপবিষ্ট কয়েকটি লোকের হিংস্র অট্টহাসির সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা স্থির কণ্ঠে বলেছিলেন : "নিয়তির কণ্ঠ যখন নিনাদিত হয় তখন পার্থিব সম্পদে কি ফল ? জমানো জমাট সোনা মানুষকে ঈশ্বরের বিচার থেকে রক্ষা করতে পারে নাকি ?" আধ্যাত্মিক শাস্তিতে যদি কেউ অবিশ্বাস করে তাদের নিবেদিতা স্মরণ করিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের স্ব-ঘরে উত্থিত বঞ্চিতের আর্তনাদ ও ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের কথা : "দেখতে পাচ্ছ না—[বঞ্চিত] শ্রেণীসমূহের মুক্তির ফলে কোন্ যন্ত্রণাময় ভাবরাশি সকলের উপর আপতিত হচ্ছে ? তাদের তীব্র চিৎকার শুনছ না ? আমরা তোমাদের দ্বীপদেশের নেটিভদের দিকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

সাম্রাজ্যবাদীরা কেবল পরাভূতদের অর্থসম্পদ ও ভূমি লুণ্ঠন করেনি—তাদের প্রাণ-মনের উপর আধিপত্য করতে চেয়েছে। কতকগুলি কৌশলী চতুর লোক ছদ্ম-বিজ্ঞানযোগে বলতে চেয়েছে—সভ্যতা ও সংস্কৃতির একচেটিয়া অধিকার গত কয়েক শতাব্দী ধরে কেবল শ্বেত ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত। এঁদেরই অন্যতম উক্ত জনস্টন অসুবিধায় পড়েছিলেন এশিয়ার শক্তিশালী দেশ জাপানের বিরোধী দৃষ্টান্তে। এক্ষেত্রে ওঁর সরল সমাধান অতি চমৎকার। "রাশিয়ার উপর জাপানের জয়ের সূত্রে আমাদের গম্ভীরভাবে জানানো হয়েছে [নিবেদিতা লিখেছিলেন]—জাপানীরা প্রধানত শ্বেতজাতি !!" জনস্টনের "আমোদজনক ধারণা"—"শ্বেতজাতি অসীম অনন্তকাল ধরে মানবজাতির মধ্যে প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী অংশ।" উত্তরে নিবেদিতা ধারালোভাবে বলেছেন : "অপেক্ষাকৃত পিঙ্গল রোমক ও গ্রীকদের পাশে 'বারবেরিয়্যান্'-রা [প্রাচীন গ্রীক ও রোমক প্রয়োগে—বিদেশীরা] ছিল শ্বেতজাতি। সেই বারবেরিয়্যানরা হাজার বছর চেষ্টা ক'রে তবে পিঙ্গল জাতির সংস্কৃতি ও সংগঠনীশক্তি আয়ত্ত করতে পেরেছিল। আমাদের বিবেচনায় চীন মানবসভ্যতার এক পর্বে এমন উন্নতি দেখিয়েছে যা বর্তমানের পাশ্চাত্যসভ্যতার কোনো অংশের তুলনায় ন্যূন নয়।" জনস্টনের ছদ্ম নৃবিজ্ঞানের মতে, নিওলিথিক মানুষ পলিওলিথিক মানুষের উপর সাম্রাজ্যবন্ধন বিস্তার করেছিল—তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাভূত করেছিল। এবং খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তিত হবার আগে এই সাম্রাজ্যবিস্তারকরণের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয়নি। নিবেদিতা উত্তরে বলেছেন : "এশিয়া ন্যায় ও করুণা খ্রীস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে কদাপি শেখেনি—শেখেনি—শেখেনি।" "যেসব শিক্ষিত ভারতবাসী ইতিহাস পড়েছেন, যাঁরা পেরু ও মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের বিজয়ের কাহিনী কিছুটা জানেন, নিউজিল্যাণ্ড ও টাসমানিয়াতে কলোনি-স্থাপন, সাউথ আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তারের ও সেখানকার যুদ্ধকথার সঙ্গে পরিচিত আছেন, সেইসঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গেও—তাঁরা ঐকথা [মিশনারি ন্যায় ও করুণার কথা] শুনে দুঃখের

হাসি হাসবেন।" নিবেদিতা পূর্বোক্ত নিওলিথিক ও পলিওলিথিকদের সংঘর্ষ-সম্পর্কের তত্ত্বকেও অগ্রাহ্য ক'রে বলেছেন, "আমাদের মতে, নিওলিথিকরা পলিওলিথিকদের মাংসাহার ক'রে বা তাদের নিকেশ ক'রে বেঁচেবর্তে ছিল না।...উল্টোপক্ষে আদিম মানুষদের মধ্যে বিশেষপ্রকার ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা ছিল।"

জনস্টনগণের মতবাদগুলিকে "সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের লেজুড়" নামে চিহ্নিত ক'রে নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্যতা তার নৈতিক ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। নৈতিক সভ্যতা—সহজ পারিবারিক জীবনের উপর নির্ভরশীল। আর সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্যতা সর্বদাই আত্মবিস্তারের রণক্ষেত্রে ধাবিত। "উদ্যত রণবাহিনীর পক্ষে পরিচ্ছন্ন দাম্পত্যজীবন সম্ভব নয়।" অনেক গভীর চরিত্রের এবং স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যকর—প্রাচীনপন্থী এশিয়ার জীবননীতি। "কালগতে জাতি ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয় ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপক আকারে, সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বেঁচে থাকে নৈতিকতার কতকগুলি পুরাতন ধারা, সেইসঙ্গে সেই মানুষগুলি—মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও ঔদার্যময়।"

সাম্রাজ্যবাদীদের মর্মচ্ছেদী আরও কয়েক লাইন রচনা :

"প্রাতঃকালীন কফি, দৈনিক সংবাদপত্র এবং মোটরগাড়ির সভ্যতার মধ্যে জাত মনুষ্যগণ বিশ্বাসই করতে পারে না—ওটা স্বর্গরাজ্য নয় বা অনন্ত ব্যাপার নয়।...আত্মতোষণে ভরপুর লোকগুলি! তারা যে, পৃথিবীর পিষ্টকের মস্ত বড় অংশ কেড়ে কামড় বসাতে পেরেছে, নিজেদের সেই চালাকির কীর্তি দেখে সরল গ্রাম্য বিস্ময়ে মোহিত। তারা ভেবেই বসেছে, পেশীশক্তি ও ঔদ্ধত্যের প্রদর্শনীতে তারা যখন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পেরেছে, তখন অবশ্যই তা তাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে, মানসিক শ্রেষ্ঠত্বও, এবং—হা ভগবান্!—ধর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বও!! বর্তমানের এই সাম্রাজ্যবাদী যুগের পটভূমিতেই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ছদ্ম-নৃতত্ত্ব, ছদ্ম-ইতিহাস, ছদ্ম-সমালোচনা।"

এইচ এইচ জনস্টনের মতো ভাল্‌গার ভঙ্গিতে নয়, সূক্ষ্মতরভাবে অনেক সাম্রাজ্যবাদীই 'পশ্চাদ্‌পদ জাতিতত্ত্ব' উত্থাপন করেছিলেন। নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এ অক্টোবর ১৯১১ সংখ্যায় "পশ্চাদ্‌পদ জাতি বলতে কী বোঝায়" *(What is a Backward Race)* নামক লেখায় ঐ ধরনের চিন্তার অসারত্ব খুলে ধরেন। ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত "ইউনিভার্সাল রেসেস্ কংগ্রেস"-এ অধ্যাপক দুবই বাগ্মী হিসাবে বিরাট সম্মান অর্জন করেন। তিনি আমেরিক নিগ্রো—স্বজাতীয় মানুষদের মধ্যে এক প্রধান নেতা। "যাঁরাই তাঁর কথা শুনেছেন [নিবেদিতা লিখেছেন] তাঁরাই অনুভব করেছিলেন—তাঁর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত, অকাট্য ও শক্তিসম্পন্ন। তাঁর কথা শোনার পরে নিগ্রোদের জাতিগত নিম্নতায় বিশ্বাস করা সম্ভবই নয়।" অথচ পাশ্চাত্যজগতে নিগ্রোদের জাতিগত হীনশক্তির কথা স্বচ্ছন্দ-স্বীকৃত। নিবেদিতা উল্টোপক্ষে নিগ্রোদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথাই তুলেছিলেন। পূর্বে আলোচিত "রাইজ্ অব দি নেটিভ" রচনায় তিনি নিগ্রোগণকে "পৃথিবীর ভাবী সাম্রাজ্য সংগঠক" বলে কল্পনা করতে চেয়েছিলেন। এই রচনায় হাইতির বিদ্রোহের নায়ক নিগ্রোনেতা তুসিয়াস্ত এল ঔভারচার্ প্রসঙ্গে বলেছেন, "উনি এমন-কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, যা বিরাট নেপোলিয়ানের সর্বোত্তম কিছু আইনের পূর্বসূচনা করে গেছে। ....ইনি নিজ জাতির স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।" "নিগ্রোরা আবেগের উৎসারণে [নিবেদিতা আরও বলেছেন] শ্বেত মনুষ্যগণের অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চশক্তিসম্পন্ন, যার জন্য তারা পৃথিবীর মধুরতম গায়কদের শ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছে।"

পুনশ্চ স্মরণ করাতে পারি—এই সকল মন্তব্য করার সময়ও নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কথার প্রতিধ্বনিই করেছেন। স্বামীজীর এই বিষয়ক মনোভাব প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন :

"তাঁর সামনে কোনো শ্বেতকায় ব্যক্তি নিজেদের সামাজিক উচ্চতা সম্বন্ধে ইতর উল্লাস দেখাতে পারত না—তা হলেই অবধারিত ধমক। তখন তিনি কী-যে কঠোর হয়ে উঠতেন। কী তীব্র হত তাঁর তিরস্কার! এই অবনমিত [নিগ্রো] মানবসন্তানরা ভবিষ্যতে অপর সকল জাতিকে অতিক্রম করে মানবসমাজের নেতৃত্ব অধিকার করবে—সর্বোপরি তার কত-না উজ্জ্বল চিত্র তিনি অঙ্কিত করতেন। বিশেষ অধিকারভোগী জাতিসমূহ নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছদ্ম-জাতিতত্ত্ব উপস্থিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলে নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে তাকে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বলতেন, 'যদি আমি আমার শ্বেতকায় আর্য পূর্বপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি তাহলে আমার পীতকায় মঙ্গোলীয় পূর্বপুরুষদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, আর সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতির কাছে।" ['স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি', ২২৭-২৯]

১৮৯৭ ফেব্রুয়ারিতে কুম্ভকোনমে বক্তৃতাকালে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভার একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সেখানে আফ্রিকার এক তরুণ নিগ্রো চমৎকার বক্তৃতা করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। ইনি এক নরখাদক গোষ্ঠীপতির পুত্র। অন্য একটি অনুরূপ গোষ্ঠীর হাতে এঁদের গোষ্ঠীর পরাজয় ঘটে। পরাভূতদের সংহার করে যখন আহারের আয়োজন করা হচ্ছিল তখন ছেলেটি কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রতীরে হাজির হয়—সেখান থেকে তাকে সৌভাগ্যবশত একটি আমেরিকান জাহাজ উদ্ধার করে। আমেরিকায় সে এমন শিক্ষা পায় যাতে তার পক্ষে ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে চমকপ্রদ বক্তৃতা করা সম্ভব হয়েছিল। স্বামীজী ঘটনাটি দক্ষিণ ভারতের হেরিডিটি-গর্বিত ব্রাহ্মণগণের কাছে হাজির করে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন—"এর পরে বলো, তোমাদের হেরিডিটি-তত্ত্বের বিষয়ে কী ভাবব?"

নিবেদিতা তাঁর আলোচ্য রচনায় আরও বললেন, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে আসে সাম্রাজ্যবাদ। ইউরোপীয়রা মনে করে, "স্থান ও গৃহ প্রধান ঐক্যবিধায়ক শক্তি।" মানুষটি কে, তা নিয়ে ইউরোপীয়রা ব্যস্ত নয়—তাদের ব্যস্ততা কোথায় তার বাসস্থান, তাই নিয়ে।" অপরপক্ষে ভারতীয়রা 'জাতি'কেই মূল ঐক্যশক্তি মনে করে। নিবেদিতা এক্ষেত্রে নিজ অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন : সাধারণ ব্যাপারে বুদ্ধিসুদ্ধি নেই এমন ভারতীয়রাও আতঙ্কে শিউরে ওঠে যদি তাদের কেউ বলে যে, মানবসমাজের উৎপত্তির বিভিন্ন উৎস সম্ভবপর কিংবা বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে মানবের বিভিন্নপ্রকার কর্তব্যনীতি রয়েছে।

"I have never met any Indian man, however wrong-headed he might be about things in general, who would not shrink in horror from the suggestion that humanity was diverse in origin, or that we owed different degrees of duty to one race and another."

নিবেদিতা 'পশ্চাদ্‌পদ জাতি' কথাটিকে কোনোমতেই চূড়ান্ত অর্থে গ্রহণ করতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, "আমরা যেন 'সাফল্য' আর 'শ্রেষ্ঠত্ব'—এই দুটি শব্দকে গুলিয়ে এক করে না ফেলি। ছোটখাট ব্যবসায়ীদের কোনো একটি বা একাধিক জাতি নিজক্ষেত্রে যত সফলই হোক না কেন তারা ছোট ব্যবসায়ীর জাতিই থেকে যায়। তারা অপেক্ষাকৃত অধিক ধনী হতে পারে কিন্তু মনস্বী মনুষ্যগণের জাতির (যত দরিদ্রই হোক) সমতুল হতে পারে না—শ্রেষ্ঠতর হবার কথা ওঠেই না।"

ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থের জন্য যারা অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে হরণ করে—নিবেদিতা তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেছেন : "মানবজাতির অগ্রগতির পথ কেউ চেষ্টা করে আটকে দেবে?—যেহেতু তার পরবর্তী পদক্ষেপ এই বৎসরে কিছু কিছু খনি থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ কমিয়ে দেবে !!!" "সবচেয়ে অলৌকিক ব্যাপারের নাম—মনুষ্য।" সেই মনুষ্য "নরম গদীতে শয়ন ও উত্তম খাদ্য ভোজনের" মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ? যারা ঐ প্রকার সুখ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে "অপর শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির শক্তি ও বিকাশের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ বলে নিজস্ব ঘোষণাপত্র হাজির করে"—সেই লোভী স্বার্থপর মানুষগুলিকেই নিবেদিতা "পশ্চাদ্‌পদ জাতির" মনুষ্য বলে নির্ধারণ করেছেন ; তার উল্টোদিকে আছে তথাকথিত পশ্চাদ্‌পদ জাতিতে অধ্যুষিত ভারতবর্ষ—"যে-দেশ বিশ্বাস করে, জ্ঞানেই জ্ঞানের শেষ, প্রেমেই প্রেমের শেষ, ত্যাগেই ত্যাগের শেষ।"

নিবেদিতা পশ্চাদ্‌পদ জাতি-তত্ত্বকে আপাদমস্তক নাড়াচাড়া করার ইচ্ছাবোধ করেছিলেন। এই বিষয়টি যেহেতু ভারতের স্বাধীনতার অধিকার-প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বেই এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন। আমরা দেখি মডার্ন রিভিউ-এ পশ্চাদ্‌পদ জাতি প্রসঙ্গে বেশ কিছু লেখা এইকালে প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি রচনা—'দি সো-কলড্ ইনফিরিয়রিটি অব কালার্ড রেসেস্।' এটি জুন ১৯০৮ ও ফেব্রুয়ারি ১৯০৯—এই দুই সংখ্যায় বেরিয়েছিল। সুদীর্ঘ রচনা এটি—নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত বহু তথ্যযুক্তিতে পূর্ণ। এর মধ্যে নিবেদিতার প্রিয় গ্রন্থকারদের রচনাংশ উদ্ধৃত আছে। লেখাটি প্রধানাংশে সম্পাদকের বলেই মনে হয়, কিন্তু এর পিছনে নিবেদিতার প্ররোচনা, বা এর উপরে তাঁর সংযোজনী হস্তক্ষেপ থাকা বিচিত্র নয়। দলে-দলে ইউরোপীয় লেখক বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে অশ্বেতকায় জাতিসমূহের উপর ঘৃণার থুতু ছিটিয়েছেন—তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর পাশ্চাত্যদেশেই উঠেছে। তেমন একজন সত্যনিষ্ঠ উদার লেখক ডাঃ স্কোলস্। এঁর 'গ্লিমসেস্ অব দি এজেস্' বইটিকে সূত্র করে এই প্রবন্ধে বিরোধী পাশ্চাত্য বক্তব্যের মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছে এই বলে :

"So much for Buckle and his theories. He is one of a class of historians which, according to Dr. Scholes, 'pursues truth, in order that, securing from it a badge, or symbol, it may with the same decorate some conventional prejudice, or political crime.' European historians have taught us much for which we are sincerely grateful, but let us abjure with all our might theirdetestable habit of 'cooking' facts to feed their national vanity. Dr. Scholes has adopted 'Fiat Justitia, ruat caelum' as the motto of his book, and he has rendered a real service to the cause of truth and humanity by exposing in all its ugly nakedness, the infamous attempt of some English and American historians and pseudo-scientists to set up the false theory of white superiority as an immutable law—a theory which was propounded with the sole object of justifying political crime."

নিবেদিতার কণ্ঠধ্বনি অথবা প্রতিধ্বনি এই লাইনগুলিতে সুস্পষ্ট।

পশ্চাদ্‌পদ জাতি-তত্ত্বের মোকাবিলায় নিবেদিতা জীবনের শেষ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত "হোয়াট ইজ্ এ ব্যাকওয়ার্ড রেস্" প্রবন্ধটি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অক্টোবর ১৯১১ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তার কয়েক মাস আগে, ১৬ অগস্ট ১৯১১, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখা চিঠিতে এ-বিষয়ে অনেকখানি আলোচনা করেছিলেন :

"অ্যানথ্রপলজি বনাম আইডিয়ালিজম—সর্বদাই নাকি তারা অ্যান্টিথিসিস্। ব্যাপারটায় আমি বিমূঢ়—কেন অ্যান্টিথিসিস্? নৃতত্ত্বের দুর্বলতা তার অপরিণত প্রারম্ভিক চরিত্রে। আর তার সবল দিক হল—তথ্য মানে তথ্য, যত অল্পসংখ্যকই হোক তারা, এবং নীতির দৃষ্টিতে যত গুরুত্বহীনই হোক। অপরদিকে আদর্শবাদের শক্তি আছে তার ভিত্তিমূলে। আদর্শবাদ নৈতিকতার পরিজ্ঞাত সুস্পষ্ট তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো মানুষের 'সম্পত্তি' যখন চুরি করছি না, তখন কেন তার 'অধিকার' চুরি করব? সর্বোচ্চ মঙ্গল শেষ পর্যন্ত সকলের মঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আদর্শবাদের দুর্বল অংশ তার লক্ষ্য-অংশে নেই, তা আছে তার যুক্তির অংশে। কেন ভাবব না—কতকগুলি জাতি পশ্চাদ্‌পদ নয়? পুনশ্চ, কোনো একটি দিকে পশ্চাদ্‌পদ মানে নয় সকল বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ। পুনশ্চ, পশ্চাদ্‌পদ জাতির মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিভার উদ্ভব হবে না এমন নয়। কি-যে জগাখিচুড়ি ব্যাপার গোটা জিনিসটি!

"আমরা অবশ্যই অধিকতর শিক্ষাপ্রদ, মিত্রতাসূচক সামাজিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আকাঙ্ক্ষা করি। সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে স্বার্থের পক্ষে স্থূল নোংরা ঘোর চিৎকার—লাভের হিসাবের বিতৃষ্ণাকর গণনায় তারা পূর্ণ। এই পৃথিবী, তার মনুষ্যগণ, তাদের ভবিষ্যৎ—সবকিছুর বঞ্চনা সেখানে। একটা প্রজন্ম বা শতাব্দীতে মাথাপিছু গড়ে দশ হাজার পাউণ্ড হাতাবার গৌরবচ্ছটা!—পরবর্তী সহস্র বৎসরে দারিদ্র্য ও অধঃপতন। এসব কিসের জন্য? শহরতলীর কোনো ড্রইংরুমে কয়েক ঘণ্টা আলাপচারির সুখ, এবং স্ট্র্যাণ্ডে নানা ধরনের থিয়েটার-দর্শনের স্ফূর্তি। শেষ পর্যন্ত আমাদের সভ্যতার এই হল অভীষ্ট!

"আমি চাই—পশ্চাদ্‌পদ জাতি কাকে বলে সেই প্রশ্নের পুরো আলোচনা। কোন্ জাতিগুলি পশ্চাদ্‌পদ—এবং কেন? এদের বিষয়ে অগ্রসর জাতিগুলির ঠিক মনোভাব কি?

"মডার্ন রিভিউ-এ এই বিষয়ের নাড়াচাড়া করতে চাই। তুমি সোসিওলজিক্যাল রিভিউ-এ একই কাজ করো না কেন? সেক্ষেত্রে এফ-এন-আর-সি [?] কিছু ফলোৎপাদন করবে। আমার প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে অত্যন্ত গর্বিত। উত্তর হিসাবে আমি কি পরে কখনো আরও কিছু লিখব? ব্রানফোর্ডের ভাব খুবই নৈর্ব্যক্তিক, এই বিতর্কে তাঁর যেন কোনো দায় নেই, কেবল দেখে যেতেই যা আগ্রহ। হবসন্ বস্তুতপক্ষে সমালোচনারই বলাধান করেছেন। আমার অভিযোগ—অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি আগ্রহ অনাগ্রহ কিছুই দেখাচ্ছে না। তা কেবল সদস্যদের মনোরম সন্ধ্যার আয়োজন করে যাচ্ছে, এবং চিত্তাকর্ষক রচনাদি উদ্‌গিরণের সুযোগ ক'রে দিচ্ছে—কিন্তু যা তার অনুশীলনের বিষয়, সেইসব সমস্যার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ক'রে সমগ্র জগতে 'সত্য' দানের আসল কাজটি করছে না। ও-কাজটি কি কেবল গির্জার করণীয়? তাহলে সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি আত্মহত্যার পক্ষে অর্ডিনান্স পাস ক'রে পজিটিভিজম্-এর মধ্যে মিশে যাক। দুঃখের বিষয়, পজিটিভিজম্ পর্যন্ত এমন সব মিথ্-এ ভর্তি হয়ে আছে যাদের আমরা গ্রহণ করতে পারি না।"

নিবেদিতা স্বস্তি পেয়েছিলেন এই দেখে যে, সকল ইউরোপীয় এক চরিত্রের নন। ছোটনাগপুরের প্রাক্তন কমিশনার, আই এফ হেউইট, শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত—দুই খণ্ডে "প্রিমিটিভ অ্যাণ্ড ট্রাডিশন্যাল হিস্টরি" নামে একটি বই লেখেন—নিবেদিতা তার আলোচনা করেন মডার্ন রিভিউ-এর জুলাই ১৯১১ সংখ্যায়। "অরণ্যচারী জাতিসমূহের পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের অনন্য সুযোগ হেউইট পেয়েছিলেন, এবং আদিবাসীদের ভাষাশিক্ষার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল।" এই সকল ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি যে-বই লেখেন সেটি "ইতিহাসের উৎস-উপাদানের উপর গবেষণা।"

বইটি নিবেদিতাকে অত্যন্ত খুশি করেছিল। "এখানে আমরা সর্বোচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন এক পাশ্চাত্য-মনের সাক্ষাৎ পাচ্ছি [নিবেদিতা লিখেছিলেন], ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যাঁর শ্রদ্ধা সুগভীর—তিনি এমন এক ইতিহাসের ভিত্তি-পরিকল্পনার উপর কাজ করেছেন যার সূচনা সন্ধান করতে হলে ২৫,০০০ বছরের মতো পেছিয়ে যেতে হয়।" মানব-ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নিবেদিতার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি কিভাবে হঠাৎ-উঠে-পড়া জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব-দাবিকে নস্যাৎ করেছেন, তা আগেই দেখেছি। মানবসভ্যতার বিরাট ইতিহাস মনে রেখে নিবেদিতা বলেছেন, "ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের সীমা নেই, কিন্তু সেই অতীত ইতিহাসের সীমারেখা কোথায় সন্ধান করব সে সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন।" নিবেদিতার মতো লোকসংস্কৃতিতে আগ্রহী সমাজবিজ্ঞানীর কাছে তাই হেউইট কর্তৃক ভারতের আদিম মানুষদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যে ইতিহাসের মূল সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা এত তৃপ্তিদায়ক মনে হয়েছিল। নিবেদিতা নিজে বহুবার এদেশের উৎসবাদিকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন। হেউইটের রচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লাসের সঙ্গে বলেছেন : "এই লেখকের মতে, কোনো জনগোষ্ঠীর উৎসবাদি হচ্ছে তাদের ইতিহাস ও ধ্যান-ধারণার চিত্র বা মানচিত্রবিশেষ।" "নৃতত্ত্ব, মানবজাতি-তত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব যেন অবশ্য ক'রে জাতীয় সরকারের রাজনৈতিক বোধ ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বস্তু হয়। হেউইট দেখিয়ে দিয়েছেন, যে-সকল জাতি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে ক্রমান্বয়ে মানবপ্রগতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছে—তাদের ঐতিহ্য, ধর্মাচার এবং জীবনচর্যার রীতি-নীতির মধ্যে আবদ্ধ অতীত ইতিহাসের জ্ঞান না থাকলে ঐ সকল বস্তুকে [নৃতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব ইত্যাদি] কদাপি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না।"

সুপ্রচুর আনন্দের সঙ্গে নিবেদিতা হেউইটের নিম্নের কথাগুলি উপস্থিত করেছিলেন :

"যাঁরা এইভাবে সভ্যতার আদিম প্রবর্তকদের নিন্দা ক'রে বলেন—ওরা ছিল অজ্ঞ বন্য বর্বর, ওরা ইতিহাসের পরিবর্তে রেখে গেছে অলৌকিক গালগল্প, অলৌকিক ক্ষমতাধারী পুরুষের কাহিনী—তাঁরা ভুলে যান যে, এইসব মানুষদের কাছেই আমরা আমাদের সমাজ ও সংগঠনের জন্য ঋণী, এরাই প্রথম বন কেটেছে, জমি চষেছে, বন্যপশুকে করেছে গৃহপালিত, গ্রাম, প্রদেশ ও দেশের সরকার তৈরী করেছে, উপজাতিদের সরকারও, স্থানীয় ও সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং উৎপাদনী শিল্পের প্রবর্তন করেছে, এবং শিশুদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যা পরবর্তী প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে বলবৎ থেকে পূর্বপুরুষাগত জ্ঞানকে নব-নব উন্নতির পথবর্তী ক'রে তোলা সম্ভবপর করেছে।"

হেউইট ভারতীয় ইতিহাসের অসাধারণ উৎসরূপে বেদকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিবেদিতাকে কৃতজ্ঞ করেছিল। "দেশপ্রেমিকের অতি মাতোয়ারা স্বপ্নও ভারতের যে-গুরুত্বের কল্পনা করতে পারেনি [নিবেদিতা লিখেছেন]—ভারতকে তাই দান করেছেন এই ইংরাজ পণ্ডিত।" বেদের মধ্যে নানা উপজাতির সমন্বিত সভ্যতার রূপরেখা কি আকারে অঙ্কিত, সে বিষয়ে হেউইট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৈদিক সভ্যতার উত্তরাধিকারীরাই যে, পৃথিবীর নানা স্থানে উদার গ্রহণশীল রীতি-নীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সে কথাও ইনি বলেন। বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট নয়, উন্মত্ত কল্পনাবিলাসে সেখানে সত্যের বিদায় ঘটেছে—এমন কথা যেসব আধুনিক ঐতিহাসিক বলে থাকেন, তাঁদের সমঝে দিয়ে, প্রাচীন হিন্দুদের বিরাট ইতিহাসচেতনার স্বীকৃতিতে হেউইট লিখেছেন :

"প্রাচীন ইতিহাসের পরবর্তী লেখকসকল যদি বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতো ক'রে অতীতের তথ্য সংরক্ষণে সতর্ক হতেন তাহলে আমাদের একালের ধারণাসমূহকে এত বেশি পরিমাণে সংশোধনের

অবিরাম প্রয়োজন হত না।"

হেউইটের তথ্যবাহী নৃতাত্ত্বিক রচনা নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করেছিল।

॥ ৪ ॥ ভারতীয় রাজনীতিতে ব্রাহ্মণাধিপত্য সম্বন্ধে ভ্যালেন্টাইন চিরলের উদ্দেশ্যমূলক রচনা : তার মোকাবিলায় নিবেদিতা ও র‍্যাটক্লিফ

সাম্রাজ্যবাদীদের বিচিত্র কলাকৌশল। একদিকে তারা প্রচার করছিল—ভারতবর্ষ পশ্চাদ্‌পদ জাতির দেশ, সুতরাং স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়, অন্যদিকে বলছিল—ভারতবর্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে আপসহীন অভিজাত সম্প্রদায় আছে—ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়—তারাই জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সচেষ্ট। জাতীয় আন্দোলনে তিলক প্রভৃতি মরাঠি ব্রাহ্মণের চরমপন্থী নেতৃত্ব এই ধরনের রচনার হেতু। উদ্দেশ্য—জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়ে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলা। ভ্যালেন্টাইন চিরল এই মতের এক প্রধান প্রবক্তা।

চিরলের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপন করেছি। আমরা জেনেছি যে, এই সাম্রাজ্যবাদী লেখক টাইমস কাগজে ভারতীয় সংকট সম্বন্ধে ধারাবাহিক পত্র-প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখায় যত্নকৃত তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা ছিল, এবং যে-সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেছিলেন তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে ইচ্ছুকও ছিলেন। রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকা সেপ্টেম্বর ১৯১০ সংখ্যায় বলেছিল :

"মিঃ চিরল অবশ্যই বর্তমান ব্যবস্থা সংরক্ষণের পক্ষে প্রচারক। কিন্তু তিনি পরিশ্রমী গবেষক, সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের জন্য ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম করেছেন, অনেক সময় ব্যয়ও করেছেন। তাঁর পত্রগুলি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে বেরুবে। যাঁরা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থিয়োরী জানতে ইচ্ছুক তাঁরা এই বই পড়লে ভালো করবেন।"[১]

চিরলের শীতল বুদ্ধিতীক্ষ্ণ রচনানীতির প্রশংসা র‍্যাটক্লিফও করেছিলেন। চিরলের বই বেরুবার পরে 'মর্নিং লীডার' পত্রিকায় তার আলোচনার মধ্যে র‍্যাটক্লিফ বলেন : "ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে একটা ব্যাপক সাধারণ ধারণা চিরলের আছে। তাঁর এই বই দীর্ঘ সন্ধান ও অধ্যয়ন, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ, সেইসঙ্গে সরকারী নথিপত্র ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগ গ্রহণের ফলদায়ী সৃষ্টি।" এইসব কারণে চিরলকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে মিঃ চিরলের বৈরিতা সর্বত্র পরিস্ফুট। বিচার-বিবেচনার সুর আছে। যেভাবে তিনি অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন তা সম্ভ্রম-আকর্ষক ; কিন্তু তাঁর মত অসম্পূর্ণ এবং প্রত্যয়দ্যোতক নয়।"[২]

কেন অসম্পূর্ণ ও প্রত্যয়দ্যোতক নয়, তা র‍্যাটক্লিফ ব্যাখ্যা করে বলেছেন। চিরলের প্রধান বক্তব্যের একটি ছিল—ভারতীয় আন্দোলন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শিক্ষার ফলজাত গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন নয়—এর মূলে আছে ইংলণ্ড ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দেশের ভাবধারার বিরুদ্ধে গভীর-প্রোথিত শত্রুতার মনোভাব—যা প্রধানত ভারতের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দেখা যায়। এই ধারণাটির উদ্ভাবক কিন্তু চিরল নন—এটি ইংরাজ শাসকদের পুরাতন ধারণা, চিরল যাকে সুষ্ঠু

১ *Review of Reviews*, Sep. 1910, *The Cause of Indian Unrest.*

২ *Mr. Chirol's Conclusions.* By S. K. Ratcliffe. (From *The Morning Leader*). *India*, Dec. 30. 1910.

রচনায় প্রকাশ করেছিলেন। র‍্যাটক্লিফ এই থিয়োরীকে 'ননসেন্স' বলে বাতিল করেছেন।*

চিরলের লেখা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তাঁর আপাত শীতল রচনার ভিতরে রয়েছে আশঙ্কার শিহরণ। আলোচ্য গ্রন্থটির রচনার তিরিশ বছর আগে তিনি ভারত ভ্রমণ করতে এসে দেখেছিলেন—ভারতীয় যুবকগণ ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চিন্তায় নিমগ্ন, অনেক উচ্চবর্ণের যুবক খ্রীস্টান হয়ে পড়েছে, ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হলেও তা আবেদন-নিবেদন-কর্মের মধ্যে ইংরাজ শাসনের গুণমহিমার সুর উচ্চতানেই বেঁধে রেখেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কারকরা নিজেদের 'বর্বর অবস্থার' নিন্দার মধ্যে ইংরাজকে পরিত্রাতার প্রণামী দিয়ে যাচ্ছে। সেই ভারতবর্ষ কিন্তু তারপর দ্রুত বদলে গেছে। পরবর্তী ভারত ভ্রমণে চিরল দেখলেন : দেশে প্রচণ্ড ধর্মান্দোলন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। চিরল, শয়তানকে তার পাওনা দেবার ক্ষত্রধর্ম অনুসরণে বললেন, ভারতের বিরাট প্রাচীন সভ্যতা, যা বহিরাগত বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে, তার উপনিষদ ও গীতা অসাধারণ রচনা, ভারতে বহু মানুষের মধ্যে সমুচ্চ মনীষা ও সংস্কৃতি বর্তমান, ইত্যাদি। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে—বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম তার আক্রমণের হস্তপ্রসার পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে করতে পেরেছে। কিন্তু ভারতীয় উত্থানের যে-অংশ চরমপন্থী রাজনীতির দিকে অগ্রসর, তার ভিত্তিমূলের ধর্মীয় প্রেরণা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল, এবং তিনি চরমপন্থাকে তাত্ত্বিক ভূমিতে প্রতিঘাত করবার জন্য অবিরাম বলে গেছেন : ব্রাহ্মণরা তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। একইসঙ্গে চিরল প্রশংসা ঢেলে দিয়েছেন মডারেটদের সম্বন্ধে, যারা বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে অতীব সহিষ্ণু। চরমপন্থীরা—"ইংরাজদের রক্তপানেচ্ছু"—তাদের সেই অপরাধ চিরলের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হয়নি। তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন—রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনা যুক্ত হলে যে-প্রচণ্ড শক্তিস্রোত বইবে, তা শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে পারে। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—ঐ শক্তিস্রোতের মধ্যে ভিন্ন চিন্তার ধারা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বিমিশ্র ও শিথিল ক'রে তোলা ; সেইসঙ্গে তিলকের প্রভাব খর্ব করাও, একমাত্র যিনি ভারতীয় চরমপন্থাকে ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত করতে সমর্থ। তিলক প্রসঙ্গে চিরলের উদ্দেশ্যমূলক বিবরণ আমরা আগেই দেখেছি।

ভারতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে চিরল বলেছেন, ব্রাহ্মণদের অসাধারণ প্রতিভা, তা যেমন গভীরচারী, তেমনি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নমনীয়। বৌদ্ধ প্রাধান্য, এবং পরবর্তী মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারও ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্যকে দূর করতে পারেনি। ইংরাজ শাসনের সর্বস্তরে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণরা তাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে। ইংরাজ আমলে কিছু ব্রাহ্মণ উদারনৈতিক হলেও বেশ বড় অংশ গোঁড়া, তীব্রভাবে ইংরাজদ্বেষী (বিশেষভাবে মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ব্রাহ্মণরা), তারাই ভারতীয় জাতীয়তার প্রবর্তক ও পরিচালক।

চিরলের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই যুক্তিসিদ্ধ ছিল না। ঐ পর্বে জাতীয় আন্দোলন প্রধানত বাংলাদেশের সৃষ্টি। এই আন্দোলনের ভাবপিতা বিবেকানন্দ থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী সক্রিয় নেতৃগণের অধিকাংশই অব্রাহ্মণ। নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে ৬ জুলাই, ১৯১০, লেখেন :

* "But he [Chirol] is clearly demonstrably wrong in trying to rehabilitate the old Anglo-Indian theory that the Brahmins are behind it, and that at bottom it is a subtle and complex conspiracy for the restoration of a vanishing priestly ascendency. The theory is nonsense. It can be riddled by any instructed person who cares to examine the evidence. And, indeed, the denial of Sir Bampfylde Fuller is in this connection of far greater value than Mr Chirol's superficially imposing argument." [Ibid].

"ভ্যালেনটাইন চিরলের বিষয়ে কিছুই জানি না। কি বিদ্‌ঘুটে নাম!" একইজনকে কিছুদিনের মধ্যে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ২৫ অগস্ট, ১৯১০, তারিখের সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমি চিরলের কিছু-কিছু প্রবন্ধ পড়ছি। তুমি যা বলেছ তা ঠিক—ওগুলি চতুর, কিন্তু [আন্দোলনকারীদের] ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করার অক্ষমতায় কলুষিত। ঐ কারণে লেখাগুলিতে মহিমা নেই। তুমিও কি তাই মনে করো না?"

চিরল যে-রকম কৌশলের সঙ্গে নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছিলেন, এবং ভারতীয় আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ইংলণ্ডের মানুষ সেগুলি যেভাবে গিলছিল, তাতে র‍্যাটক্লিফ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, এবং নিবেদিতাকে তিনি নিশ্চয় ব্রাহ্মণাধিপত্য ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন। নিবেদিতা সেই সূত্রে ১৮ অগস্ট ১৯১০, লেখেন:

"[জাতীয় আন্দোলন] ব্রাহ্মণাধিপত্য পুনঃ প্রবর্তনের জন্য একটি সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রের অংশ—তুমি [চিরলের] এই থিয়োরীর উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারছ না? বুঝতে পারছি না, ওর মোকাবিলা করার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। ঐ ধরনের একটা অর্থহীন থিয়োরী শাসকদের মনকে কেড়ে নিয়ে থাকে থাক—হয়ত তা ভারতের পক্ষে ভালই হবে। কিন্তু ঐ ধারণাটা এমন উদ্ভট যে, আঁতকে উঠতে হয়। ন্যাশনাল মুভমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে ন্যাশনাল—মোটেই পৌরোহিত্যপন্থী নয়।...তা হল সেই প্লাবন যা জাতিপ্রথার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না ক'রেও তাকে বাতিল ক'রে দেবে—এবং সকল ভগ্নাবশেষকে নূতন খাতে প্রবাহিত করবে, যার দ্বারা নূতন ভিত্তি নির্মিত হবে। জাতীয় আন্দোলন নতুন আদর্শকে [জাতীয়] ভাব-প্রত্যয়ের মধ্যে আনয়নের প্রয়াস, যার মধ্যে অতীত থেকে কিছু মৌল উপাদান মাত্র গৃহীত। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সামান্যই, এবং ভবিষ্যতে আরও সামান্য হবে। অরবিন্দ ঘোষ বলতে গেলে একমাত্র ভারতীয় মনীষা যা জাতীয়তাকে সৃষ্টিশীল অর্থে যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছে। (পেজ্ হপস্‌-কে বিবেকানন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করো—আমি তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে একেবারে একমত—বিবেকানন্দের প্রাণই গোটা জিনিসটিকে সৃষ্টি করেছে)। ডাঃ বসু অবশ্য ও-জিনিসের ধারণা করতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় চরিত্র—জনপ্রিয় নেতা নন। মরাঠা [গোখলে?] একে প্রায় বুঝতে পারেনি। অরবিন্দ কায়স্থ। তোমাকেই কেবল বলছি, বরোদা [গায়কোয়াড়] ব্রহ্মণ্যবিরোধী, তিনি জনপ্রিয় দেশীয় রাজা।...ব্রহ্মণ্য-মনীষা অবশ্যই ব্রহ্মণ্য-বিদ্যার স্রষ্টা—আতঙ্কজনক অপূর্ব কাণ্ড তা। (ওর ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি এখনো লেখার আশা রাখি)। কিন্তু নিছক ব্রহ্মণ্য-বস্তু হিসাবে ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সর্বদাই তা শিক্ষিত মানুষের জন্ম দেবে; কিন্তু তা অতিমাত্রায় প্রণালীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাই বেশ কয়েক শতাব্দী লাগবে তার বন্ধনের পেষণকষ্ট সামলে উঠতে। বিবেকানন্দ কায়স্থ। কায়স্থরা নিজেদের মৌর্যপূর্ব ক্ষত্রিয় বলে মনে করে—তারা সর্বদাই নেতৃজাতি। জাতিপ্রথা ঘনীভূত হয়েছে এমন যুগগুলিতে (গুপ্তদের শিল্পসাহিত্যের সুবর্ণযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত) যখন কায়স্থ-মনীষা সর্বাধিক মুক্ত—আইন-আদালতে, হিসাবরক্ষায়, গণিতে—তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, ইত্যাদি। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এই জাতিই প্রাধান্য করবে, ইতিমধ্যেই তা করতে আরম্ভ করেছে। বিবেকানন্দ—জে সি বোস—অরবিন্দ ঘোষ। ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিরাও আছেন—গিরিশবাবু, ভূপেন বোস, রমেশ দত্ত—কায়স্থ। যদি এঁরা ক্ষত্রিয় হন তাহলে বুদ্ধ এঁদেরই একজন। এবং বস্তুতপক্ষে এঁরা সূচনায় ব্রাহ্মণদের উপরেই ছিলেন। নবভাবনাকে গ্রহণের প্রবণতা এই জাতির মধ্যে সর্বাধিক।

"আর, জাতীয়তা ও জাতি-সৃষ্টির রণধ্বনির মধ্যে হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও আছে। অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এ নয় (যদিচ মরাঠি ও পঞ্জাবীদের মতো অনমনীয় জাতিদের

পক্ষে এ-বস্তু উপলব্ধি করা সর্বদাই কঠিন) ; অতীতের সৃষ্ট রীতি-নীতি নয় ; এ হল অতীত আদর্শের ভিতর থেকে নূতন ভবিষ্যৎ গঠনের আন্দোলন। এমন-কি চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রেও ব্রহ্মণ্য-আদর্শ বলবৎ থাকবে না। তার মানে, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে যা সর্বদাই ঘটে থাকে—পূর্বযুগের পুরোহিতদের কাজকে সংহত ক'রে নারীদের হাতে তা অর্পিত হবে—ভবিষ্যতে শিশুদের প্রাথমিক জীবনগঠনের জন্য। পূর্ব আদর্শের প্রত্যাখ্যান নয়—ঘনত্ববিধান। নূতন যুগে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষত্রিয়ই আদর্শ। জাতিগঠন, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের ষড়যন্ত্র মোটেই নয়। মহামাতার বিশাল সমুদ্রে দিব্য আত্মদান তা। আমাদের জন্য আছে বিশ্বাস—আমাদের জন্য আছে পর্বতশিখর থেকে ঝাঁপ দেবার দুঃসাহস। মাতা আমাদের যেখানে ইচ্ছা ভাসিয়ে নিয়ে চলুন। সুতরাং স্বামীজী যেমন বলতেন—সকল পরিকল্পনাকারীকে অঙ্গুলিনির্দেশে বিদায় দাও। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতায় পার্থক্যের কী-না মুখর দৃষ্টান্ত মিলল ! যতক্ষণ না কোনো বস্তু ষড়যন্ত্রের পোশাকে অঙ্গ ঢাকছে ততক্ষণ তার বাস্তবতায় পাশ্চাত্যবাসীরা বিশ্বাস করে না !! ধরা যাক, আন্দোলনের সাফল্য ঘটেছে—সময় ১৯—খ্রীস্টাব্দ—ভারতের জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। ...আমার ধারণা, সে ঘটনা ভারতীয় জনগণের মধ্যে সুগভীর গণতান্ত্রিক প্রবণতা উন্মোচন ক'রে দেবে। দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের জাতিপ্রথা (যে-দুটি জায়গায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বলবৎ, যা আপদ, যা সামাজিক ইতরতা ; মনে রেখো, এখানে আমি ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতির কথা বলছি না) বন্যায় ভেসে যাবে, হতমান হয়ে যাবে—কেননা কেন্দ্রে তখন সকলের জন্য কর্মক্ষেত্র খুলে গেছে। এইভাবে বিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃষ্ট সামাজিক সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য বিপুল কাজ করা সম্ভবপর যার দ্বারা জাতিভেদের ইতর দিকটি (জাতিভেদের একাংশে আছে নিছক প্রাদেশিকতা এবং কুশিক্ষা) অবলুপ্ত হওয়া উচিত। জাতি, ভাষা, উদ্যম ইত্যাদি কতকগুলি ইতিবাচক আদর্শের বন্ধন-কাঠামো হিসাবে জাতিপ্রথার উপযোগিতা আছে। আর ব্যক্তিগত গর্বের স্ফীতি এবং সামাজিক উদ্যমের সংকোচনের ক্ষেত্রে তার দুষ্ট প্রকৃতি। জনগণের সম্বন্ধে প্রবল অনুরাগই মাত্র ঐ বস্তুকে দ্রবীভূত করতে সমর্থ। এক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্য-আধিপত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে জাতীয়তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বলে যে-মন নির্ধারণ করে, সে-মন কতখানি-না নীচ ও সংকীর্ণ।"

চিত্তাকর্ষক রচনা, মনস্বিতায় সমুজ্জ্বল, অংশত বিতর্কযোগ্য, অবশ্যই মনোযোগ-যোগ্য। যাই হোক, নিবেদিতার কাছ থেকে তথ্য ও তত্ত্বলাভ করার পরে র‍্যাটক্লিফ কী পরিমাণে সেসব নিজ লেখায় ব্যবহার করেছিলেন তা বলতে পারব না। 'ইণ্ডিয়া' কাগজে আমরা তাঁর এই বিষয়ক কয়েকটি লেখার সারসংক্ষেপ মাত্র পেয়েছি। আরও অনেক কিছু তিনি লিখেছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। মর্নিং লীডার পত্রিকায় চিরলের 'ইণ্ডিয়ান আনরেস্ট' গ্রন্থের আলোচনাকালে তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্য থিয়োরীকে কিভাবে তুচ্ছ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা আগেই দেখেছি। 'নেশন' কাগজে একই গ্রন্থের আলোচনাও র‍্যাটক্লিফই করেন বলে ধরে নিতে হবে। ভারতীয় সংকট সমাধানের চিরল-দাওয়াই ছিল—ব্যুরোক্র্যাসির ক্ষমতাবৃদ্ধি। তিনি এমনও বলেন, ভাইসরয় যেন ভারতসচিব এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের খবরদারি থেকে মুক্ত থাকেন, তাঁর কাউন্সিল যেন বৃটিশ ক্যাবিনেটের রূপ নেয়। চিরলের প্রস্তাব গৃহীত হলে যে-সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন আমলা-জাতির সৃষ্টি হবে, তার ভয়াবহ আকার সম্বন্ধে নেশন বলেছিল—ওর তুলনায় পুরোহিততন্ত্রও ভারতের পক্ষে অধিক স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক ব্যাপার।[৪]

৪ "It [Chirol's 'ideal'] proclaims a policy not of India for the Indians, nor even of India for England; but rather of India for a professional bureaucratic caste. Even a Brahmin Theocracy would be a more natural and not a more undemocratic solution." [*India*, January 13, 1911, *The Nation* on Indian Nationalism].

র‍্যাটক্লিফ 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকাতেও চিরলের গ্রন্থ সমালোচনা করেন। তার মধ্যেও তিনি "আক্রমণশীল ব্রহ্মণ্যবাদের অশুভ রূপের সঙ্গে সংগ্রামের" জন্য চিরলের আহ্বানবাণীর উল্লেখ ক'রে বলেন—ওটি "মিঃ চিরলের একটি অসামান্য চিত্তকুহক।"[৫]

রাজনীতিতে ব্রাহ্মণাধিপত্য দূর করতে সরকারকে 'অস্ত্রোপচার নীতি' গ্রহণের জন্য চিরলের মারাত্মক অনুরোধের রূপ র‍্যাটক্লিফ বারবার খুলে ধরেছেন। চিরলের শ্রমপুষ্ট গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ভারতবাসীর হিতসাধন নয়—ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলন দমনে সরকারী উৎপীড়নের সাফাই গাওয়া। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মহলে ভারতে নিপীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে প্রচুর কলরব উঠেছিল (সে কাহিনী আমরা কিছুটা উপস্থিত করেছি), শাসকদের পক্ষে সেটা অবশ্যই অস্বস্তিদায়ক ছিল। সুতরাং তাঁরা বিবেক সাফ রাখবার মতো কিছু রচনা-সম্মার্জনী চাইছিলেন—চিরল সে বস্তু তাঁদের সরবরাহ করেছিলেন। চিরল গবেষণাযোগে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন—ভারতের আন্দোলনকে তুচ্ছ করো না; ওটা সাময়িক বিক্ষোভের ব্যাপার নয়; ওর মূল গভীরে প্রবিষ্ট; ওকে বাড়তে দিলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে; সুতরাং এখনি চরমপন্থীদের বিষয়ে চরম ব্যবস্থা নাও; অস্ত্রোপচার ক'রে দুষ্ট অঙ্গ ছেঁটে ফেলো; নচেৎ বিপত্তি ঠেকানো যাবে না। "চিরলের বক্তব্য", র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, "ব্রহ্মণ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে অস্বাভাবিক মৈত্রীকে আমাদের ভাঙতেই হবে; এবং নিপীড়নের 'অস্ত্রোপচার চিকিৎসাকে' চালিয়ে যেতেই হবে।"[৬] এই উদ্ধত উগ্র বিধানের নষ্টামীকে র‍্যাটক্লিফ কঠিনভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে যেভাবে নিপীড়ন-নীতির পক্ষ সমর্থন করা হচ্ছে, তা ভারতবর্ষের সর্ববিধ স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের পথকে একেবারে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলবে।[৭]

নিবেদিতা ও র‍্যাটক্লিফের যৌথ ভূমিকার আর একটি দিক চিরলের গ্রন্থের মোকাবিলায় দেখা গেল।

॥ ৫ ॥ নিবেদিতার সংগ্রামী আহ্বানের কিছু নমুনা

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করবার কালেই নিবেদিতা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য সংগ্রামী পৌরুষকে আহ্বান করেছিলেন। ১৯০৫ সালে রচিত তাঁর 'অ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজম্' রচনার মধ্যে এই রণধ্বনি পাই :

"কল্কির তুরীধ্বনি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে নিনাদিত। আমাদের মধ্যে যা-কিছু মহান ও সুন্দর, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও বীরোচিত, তাকেই সেই রণক্ষেত্রের মধ্যে আহ্বান করছে যেখানে পশ্চাদ্‌অপসরণের বাদ্য কখনো শোনা যাবে না।"

৫ *India*, January 20, 1911, *The Problem of Indian Nationalism. The Folly of 'Surgical Treatment'.*

৬ ইণ্ডিয়া, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯১০।

৭ "Repression in India, he [Chirol] says, 'means nothing more cruel and oppressive than the application of surgery to diseased growths,' and therefore we must continue the repress. These, we submit, are in effect counsels of despair. The term 'surgical treatment' is dangerously inaccurate. It can not in anywise be made to apply to a system which, so far from being restricted to the excision of poisonous growths, has chocked up all the natural and open means of expression. Terrorism, of course, must be stamped out; there are no two opinions on that point. For the rest, however, not repression, but a frank recognition of the new forces and a determination to mould and develop them is the only sound policy."
[Ratcliffe in *Daily News*, January 13, 1911. Quoted in *India*, January 20, 1911].

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভারতমাতার সৈনিকগণ! লঙ্ঘন করো দুর্গপ্রাকার, অধিকার করো দুর্গশহর! কেল্লায় রাখো সৈন্যদল, কষ্টার্জিত বুরুজে রাখো সতর্ক প্রহরীদের! আর যদি যুদ্ধে তোমার পতন হয়—তা এমনভাবে হোক যাতে তোমার মৃতদেহের উপর উঠে অন্যেরা ঊর্ধ্বভূমি জয়ের চেষ্টা ক'রে যেতে পারে।"[৮]

নিবেদিতার "দি কল্ টু ন্যাশন্যালিটি" রচনার অংশ:

"আজ আমাদের মাতৃভূমি জাতীয়তার জন্য আত্মোৎসর্গের কামনায় বিদীর্ণকণ্ঠে ডাক দিচ্ছেন। আজ তিনি শক্তিধর পুরুষের জনয়িত্রী ও পালয়িত্রীরূপে চাইছেন—আমরা যেন তাঁকে মধুরতা ও মৃদুতার পরিবর্তে পুরুষোচিত তেজ ও দুর্ভেদ্য শক্তি প্রদর্শন করি। আজ তিনি চান—আমরা খড়্গ নিয়ে তাঁর সামনে খেলা করি, যাতে তিনি বীরজাতির জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। আজ তিনি আবার চিৎকার ক'রে বলছেন, তিনি ক্ষুধার্ত—মানব-রাজগণের জীবন ও রক্ত ভিন্ন তাঁর দুর্গরক্ষা করা সম্ভব হবে না।...শবাধারের আচ্ছাদনীর নিম্নে বহুপূর্বে শায়িত মৃতগণের মধ্যে এখন শিহরণ ও উত্থানের সংগ্রাম। কম্পমান প্রহর! প্রতীক্ষমাণ আতঙ্করুদ্ধ সন্ধ্যা! দীর্ঘ অতীতে অবলুপ্ত জাতিসমূহ তাদের সুপ্রাচীন নিদ্রার মধ্যে আর্তকণ্ঠ। আমাদের চতুর্দিকে অতীতের কণ্ঠস্বর—জাগো! জাগো!...জনগণই হবে শাসক, তারাই থাকবে বিদ্যমান—জাতীয়তা তারই আহ্বান এনেছে।"[৯]

॥ ৬ ॥ মাৎসিনী প্রসঙ্গে নিবেদিতা

নিবেদিতার উপরে ইতালির স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপ্লবী নায়ক মাৎসিনীর প্রভাবের উল্লেখ বহুবার করেছি। তরুণ বিপ্লবীদের নিবেদিতা সানন্দে মাৎসিনীর আত্মজীবনী উপহার দিয়েছিলেন; সে গ্রন্থের বিশেষ প্রভাব তরুণদের উপর পড়েছিল—এসব বিষয়ে তথ্যও আগে দিয়েছি। নিবেদিতার চিঠিপত্রে মাঝে-মাঝেই মাৎসিনীর আগ্নেয় চরিত্রের ও চিন্তার উল্লেখ আছে। আমরা আরও দেখি, নিবেদিতা প্রেস-আইনের ফাঁক দিয়ে যতখানি পারেন মাৎসিনী-নীতি পত্রিকা-মারফত ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে মডার্ন রিভিউ তাঁর প্রধান বাহন।

মাৎসিনীর জীবন ও কার্যাবলী থেকে দুটি জিনিস নিবেদিতা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন, বা গ্রহণ করাতে চেয়েছিলেন—পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ এবং সর্বাত্মক সংগ্রাম। সংগ্রামের যে-পদ্ধতি মাৎসিনী দেখিয়েছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ছাপা-লেখায় তার খোলাখুলি উপস্থাপনা সম্ভব ছিল না। নিবেদিতা ধরে নিয়েছিলেন, মাৎসিনীর বই বিপ্লবীদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, কিংবা তাদের সঙ্গে গ্রন্থবিষয় নিয়ে মৌখিক অলোচনা ক'রে, তিনি কিছুটা উদ্দেশ্যসাধন করতে পারবেন। প্রকাশিত রচনায় তিনি বিশেষভাবে আত্মত্যাগ সম্বন্ধে মাৎসিনীর উক্তিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তথাপি মাৎসিনীর চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে কিভাবে জ্বলে উঠতে পারতেন তার একটু নমুনা মডার্ন রিভিউ-এর জুন ১৯০৮ সংখ্যার "দি প্রেজেন্ট সিচুয়েশন" নামক স্বাক্ষরহীন রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। (এই লেখাটিকে নিবেদিতার বলে আগেই নির্ধারণ করেছি)। ঐ রচনায় আলিপুর বোমার মামলার সূত্র ধরে বিপ্লবের সাক্ষাৎ ফল ও ব্যাপক প্রভাবের কথা তিনি বলেছিলেন—মাৎসিনীর বক্তব্য অনুযায়ী। "টমাস কার্লাইলের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনাকালে মাৎসিনী এই

৮ *N C W*, III, 510, 520.

৯ NCW, IV, 295-96.

প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন [নিবেদিতা লিখেছেন]—'একটি বাস্তিল, একটি শাসনতন্ত্র, এবং একটি গিলোটিন—এই কি ফরাসি বিপ্লবের সামগ্রিক তাৎপর্যের যথার্থ প্রকাশ ? ঐ বিরাট ব্যাপারটি কি আমাদের অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না ?' তার উত্তর : 'না, কদাপি নয়, হতে পারে না। আড়াই কোটি লোক একদেহে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তাদের আহ্বানে অর্ধেক ইউরোপ জেগে উঠেছিল—তা অবশ্যই ঐ প্রকার একটা শব্দ, ফাঁকা ফরমুলা বা ছায়া-ব্যাপারের জন্য ঘটতে পারে না।' ।"

মাৎসিনী বলেছিলেন, বিপ্লবের বিক্ষোভ ও রোষগর্জন স্তব্ধ হয়ে যাবে কিন্তু বিপ্লবের ভাব থাকবে জাগরূক। নিবেদিতা উদ্ধৃত করেছিলেন মাৎসিনীর মহাবাণী :

"প্রতিটি মহান ভাবই অমর। ফরাসি বিপ্লব—'অধিকার'-বোধ,'স্বাধীনতা'-বোধ, মানবসত্তার 'সাম্য'-বোধ পুনর্জ্বলিত করেছে—তাকে কদাপি নির্বাপিত করা যাবে না।…প্রতিটি মানুষের মধ্যে তা সমষ্টি-সংকল্পের শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয় এনে দিয়েছে, সর্বশেষ বিজয় সম্বন্ধে বিশ্বাস, যার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।"

মাৎসিনীর বাণী উৎকলনের পরে নিবেদিতা চলে এসেছিলেন "কলকাতার সন্ত্রাসবাদীদের" প্রসঙ্গে, যাঁদের "গ্রেপ্তার ক'রে জেলে রাখা হয়েছে, বিচারের জন্য যাঁরা অপেক্ষা করছেন—বিচারকদের কর্তা বিদেশী।" ইংরাজ শাসকগণ ও সাহেবী কাগজগুলি প্রচার করছিল যে, বৈপ্লবিক অভিপ্রায় কেবল ধরা-পড়া মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, তার হাজার-হাজার সমর্থক আছে। নিবেদিতা সুযোগ পেয়ে গেলেন। "এই বিদ্রোহের সাক্ষাৎ ফল কী ? তা হল, এই পৃথিবীর সবকিছু খোয়ানো, নিজেদের জীবনসুদ্ধ।" মানুষ এই প্রকার মরীয়া-কাজ করে কেন ? "ভারতীয় পরিস্থিতির মধ্যে তাহলে নিশ্চয় অতি-অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে যা 'কাপুরুষ ও বাচাল বাঙালীদের' স্নায়ুতে শক্তি ও সাহস সঞ্চার ক'রে তাদের বোমা ছোঁড়ায় প্রণোদিত করেছে।" "শুধু ফুৎকার দিয়ে আগুন জ্বালানো যায় না ; স্ফুলিঙ্গ অন্তত থাকা চাই, এবং অবশ্যই ইন্ধন।" মাৎসিনীর প্রতিধ্বনি ক'রে নিবেদিতা বললেন, "সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ…নিছক একটা ছায়াবৎ ব্যাপারের জন্য একদেহে উত্থিত হয় না।"

চরিত্র ভিন্ন আত্মত্যাগ হয় না—এবং সে চরিত্রের মূলে বলাধান করে ঈশ্বরবিশ্বাস। মডার্ন রিভিউ-এর মার্চ ১৯০৮ সংখ্যার 'রিলিজন অ্যাণ্ড রিফর্ম' নামক নোট-এ (নিবেদিতার বলে অনুমিত) এই প্রসঙ্গে মাৎসিনীর অনেকখানি উক্তি উদ্ধৃত ছিল। তার একটি : "যতদিন আমরা স্বার্থের ভিত্তিতে আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব, ততদিন অনুগামী মিলবে—শুধু বাক্যে, কার্যে নয়।" মাৎসিনী আরও বলেছিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস-বিনা কেউ যথার্থ কর্মপ্রেরণা লাভ করতে সমর্থ নয়। ঈশ্বরবিশ্বাস সঞ্চারিত না করলে কদাপি সে শিক্ষাদাতা আচার্যের ভূমিকা দিতে সমর্থ নয়। মাৎসিনীর কথার সমর্থনে উক্ত নোট-এ লেখা হয় (পরিষ্কার নিবেদিতার ভাষা) :

"Character makes individuals and nations free and great...And character is not mere passive harmlessness, is certainly not submission to evil in any form ; it is rather the active power to resist evil within oneself and without and to do something positively good. When a man is one with the power making for righteousness he is invincible;character is form of faith in this oneness."

মডার্ন রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় নিবেদিতার বলে অনুমিত একটি নোটের নাম 'দি ক্যারেকটর অব দি পুলিশ।' তার শেষে মাৎসিনী-উক্তি উদ্ধৃত ছিল। তার প্রথম বাক্য এই : "জীবন মানে আদর্শের জীবন। কর্তব্য তাই তার প্রথম নীতি।" শেষে ছিল এই আহ্বান : "তরুণ ভ্রাতৃগণ ! যখন তোমরা তোমাদের আত্মার মধ্যে আদর্শের ধারণা লাভ করবে…তখন সর্বশক্তি দিয়ে তাকে

সফল করো—তাতে তোমরা প্রেমের আশীর্বাদ পাও বা ঘৃণার মুখোমুখি হও—কিছুতে পশ্চাদ্‌পদ হয়ো না।...যদি দুঃখ বেদনা ও ছলনা সত্ত্বেও তোমরা ঐ আদর্শকে শেষপর্যন্ত অনুসরণ না করো তাহলে তোমরা কাপুরুষ, নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসহন্তা।"

মডার্ন রিভিউ-এর জুলাই ১৯১০ সংখ্যার "দি ডিউটিজ্ অব ম্যান" নোট-এ (নিবেদিতার বলে অনুমিত) একই প্রসঙ্গ আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত। এর মধ্যে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে মাৎসিনীর শিক্ষার সারসংক্ষেপ করা হয়েছিল। ঐ শিক্ষা, নিবেদিতার মতে, নতুন প্রজন্মের পক্ষে "অপরিমেয় মূল্যের পথপ্রদর্শক।" 'অধিকারের' পাশেই 'কর্তব্যের' গুরুত্বের প্রশ্নটি নিবেদিতা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। যে-দৃষ্টান্তটি তিনি উপস্থিত করেন তা সমকালীন আন্দোলনের পটভূমিকায় সতর্কবাণী ছাড়া কিছু নয়। তিনি বলেন, "স্বদেশী আন্দোলন আমাদের উৎপাদনী শিল্পের বিশেষ লাভ ঘটাচ্ছে।" কিন্তু একই সঙ্গে দেখা গিয়েছে যে, সেই অর্থ দিয়ে দেশীয় ব্যবসায়ীরা ভোগবিলাস করছে কিংবা গচ্ছিত তহবিল বাড়াচ্ছে। "এমন করলে," নিবেদিতা লিখলেন, "এই দেশ ও জনগণের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট এই আন্দোলন মূলভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" পাদটীকায় তিনি কিছু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। চরিত্রগঠনের জন্য এই সময়ে অনেকেই, বিশেষত খ্রীশ্চান মিশনারিরা, অতিব্যস্ত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন। নিবেদিতার মতে, এই প্রকার ধর্মীয় শিক্ষা বস্তুতপক্ষে অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় পুরাণ-কথায়, বিশ্বাস করানোর চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। তার বদলে নিবেদিতা চেয়েছিলেন, কোনো বিশেষ ধর্মের সম্পর্কশূন্য "সর্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা"—আর সেক্ষেত্রে মাৎসিনীর রচনাবলী শ্রেষ্ঠ পাঠ্যগ্রন্থ। "ইউরোপ ও আমেরিকা তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাতিল ক'রে সেখানে সেকুলার-ভিত্তিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে"—একথা বলার পরে নিবেদিতা জানালেন : "ভারতীয় সমস্যার যথার্থ সমাধান হতে পারে যদি একথা সানন্দে স্বীকার করে নেওয়া হয় : ভারতের উদীয়মান তরুণ জীবন এখন নবজন্মের প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে উন্মথিত। আছড়ে-পড়া বন্যাকে যেমন স্তব্ধ করা যায় না, তেমনি একেও স্থগিত করা যাবে না।" এই প্রাণপ্রবাহকে উপযুক্ত খাতে চালিত করার জন্য নিবেদিতার প্রস্তাব—"ধর্মীয় গোঁড়ামিশূন্য, কুসংস্কারশূন্য নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তিত হোক।"

॥ ৭ ॥ সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র প্রসঙ্গে নিবেদিতা

প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন এবং তাতে অংশগ্রহণকারী নিবেদিতা যে, পাশ্চাত্যের সমকালীন ক্রমপ্রসারশীল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন, তা স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যায়। আগেই দেখেছি, তিনি প্রথম বয়সে ফেবিয়ান সোস্যালিজম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সংবাদ পেয়েই তিনি ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন—এই কাজ সোস্যালিস্টদের মনঃপূত হবে। অ্যানার্কিস্ট ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আমরা জানি যে, সমকালের ইউরোপীয় পত্রপত্রিকা সমাজতন্ত্রের নানা মত ও পথের আলোচনায় ও সমাজতন্ত্রীদের কীর্তিকলাপের সংবাদে পূর্ণ থাকত। এমন-কি ভারতীয় পত্রপত্রিকাতে ঐ বিষয়ে কী-ধরনের উল্লেখ ও আলোচনা থাকত—তার পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়েছি।[১০]

এখানে প্রশ্ন, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে নিবেদিতার মনোভাব শেষ পর্যন্ত ঠিক কী ছিল? নিবেদিতার লেখা থেকে এ-বিষয়ে আমরা যে-সিদ্ধান্ত করতে পারি তা হল :

১০ 'সমকালীন', ৩য়, ৪২৪-৩৮।

—তিনি ধনতন্ত্রী শোষণের চরিত্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং ধনতন্ত্রের উৎসাদন চেয়েছেন ;

—তিনি সর্বাত্মক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ চাননি, কারণ জমির উপর কৃষকের অধিকারকে (জমিদারের অধিকারকে নয়) পবিত্র অধিকার বলে মনে করতেন ;

—অধ্যাত্মবাদী হিসাবে তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বলে কথিত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে জড়িত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে স্বীকার করতেন না ; (সমাজতন্ত্রের অন্য অনেক শাখাও বস্তুবাদী) : তিনি মনে করতেন, ধর্মের মূলগত সত্যকে যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে পারলে তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দার্শনিক পটভূমিকা প্রস্তুত করতে পারবে ;

—বিশুদ্ধ আদর্শের দিক দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রকে স্থূল বলে মনে করেছেন ; কিন্তু ধনতন্ত্রের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে উত্থিত এই আন্দোলন বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর বলে তিনি শূদ্র বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন, এবং এক্ষেত্রে স্বামীজীর সমর্থনকে স্মরণ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের ধনতন্ত্রী চরিত্রকে নিবেদিতা কিভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, সে-প্রসঙ্গ বহুভাবে ইতিপূর্বে উত্থাপিত হয়েছে। ইহুদী ধনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁকে একাধিকবার চিঠিতে ঘৃণাপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। ভারত-দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারি মন্টেগু'র নীচতা প্রসঙ্গে তিনি অগস্ট ১৯১০ তারিখে র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন, "আমি খুশি যে, তুমি মন্টেগু-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছ—লোকটি ইহুদী।" ইহুদীদের অর্থলোভ ও স্থূল সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিক্তভাবে ঐ চিঠিতে বহুকিছু লিখেছিলেন :

"সাম্রাজ্য-ইহুদী অর্থনীতির আন্তর্জাতিক জাল। জাতীয়তা-ইহুদী-বিরোধী সংগ্রাম। ব্লান্ট-এর লেখা পড়ো, দেখবে—গ্লাডস্টোন ও মর্লে কিভাবে মিশরে রথচাইল্ড-এর হাতের পুতুলের ভূমিকা নিয়েছিলেন।...ফ্রান্সের অবস্থা অতীব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি। ছোট ইহুদী ব্যবসায়ী বনাম মস্ত মহাজনদের সমস্যার সমাধান জাতীয়তা কিভাবে করতে সমর্থ জানি না। আগামী বহু শতাব্দীতে যেন জমির উপরে ব্যক্তির অধিকার বলবৎ থাকে—অর্থের বিরুদ্ধে জন্মাধিকারের সেই শেষ প্রতিরোধ। জমিদাররা অবশ্য সকল দেশে শীঘ্রই রক্তে ইহুদী হয়ে দাঁড়াবে। রিভিউ অব রিভিউজ-এ রোজ্‌বেরী ও তাঁর কন্যা কাউন্টেস অব ক্রিটস্‌-এর ছবি দেখো—মধ্যবয়সী স্থূল ইহুদী—একটুও কমবেশি নয়। লেডি কার্জনের সন্তান-সন্ততিরা ঐ বয়সে একই ধরনের দাঁড়াবে। জেনিভায় হোটেল ডি রুমী-তে কয়েকদিন কাটাবার পরে এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমার মন আরও তেতো হয়ে গেছে। গিল্টি-ঝকমকে ঐ প্রাসাদ-হোটেলে, মখমলে মোড়া আসবাব, সেইসঙ্গে উঁচু বাঁকা-নাক ভদ্রমহোদয়গণ, আকণ্ঠ পানভোজনে নিয়োজিত, দৈনিক সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য কিছু পাঠে অসমর্থ—তাও পড়েন টাকার বাজারের বিষয়ে অবহিত হতে। ঐ জাতির কতিপয় ব্যক্তি হয়ত শিল্প-সংগ্রহশালা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করেছেন, কিন্তু প্রধানাংশে এঁরা রক্তমাংসের দেহ-উপাসক, পৃথিবী যে-আকারে প্রতীয়মান সেই পৃথিবীর প্রতিনিধি-শক্তিকে এঁরা নতজানু হয়ে দর্শন করেন—আর পৃথিবীকে ঐ আকারে বজায় রাখার দিকেই এঁদের সকল আশা আবর্তিত হয়। শীঘ্রই দেখা যাবে, এই পৃথিবীর সর্বাধিক মহান গর্বিত বংশধারাকে বহন করছে ছোট-মাপের কৃষক এবং আপসহীন দোকানদারগণ, কারণ কেবল তাদের মধ্যে ঐ মারাত্মক বিষের সংক্রমণ ঘটেনি। এক্ষেত্রে জাতি-প্রশ্নটি বিবেচনায় আসে যখন তা ধনসম্পদের বিপরীত ভূমিকায় থাকে—জাতি বিপর্যস্ত করে শ্রেণীকে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ধনতন্ত্র কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজ দেশেই সাধারণ মানুষের শোষণ-কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে ধারালো বিশ্লেষণ নিবেদিতা করেছিলেন মডার্ন রিভিউ-এর মার্চ, ১৯০৮ সংখ্যায়,

"ডিমক্র্যাটিক ফিলিং ইন ইংল্যাণ্ড" নামক প্রবন্ধে। [এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটি নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে গৃহীত হয়েছে]। এই রচনায় নিবেদিতা ইংলণ্ডের বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। গ্রামের অবক্ষয় ও কৃষির ক্ষতি ঘটাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ—"ইংলণ্ড এখন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কারখানা-অঞ্চলে।" ফল—"বাণিজ্যের ওঠা-পড়ায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অগণিত মানুষের ভাগ্যের ওঠা-পড়া।" লণ্ডন ঐকালে "বেকারে ভর্তি; তাদের মুখে নৈরাশ্যের কৃষ্ণছায়া।" নিবেদিতা সমাজতান্ত্রিক চিন্তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন: "দরিদ্র যখন দরিদ্রতর হচ্ছে, ধনী সেখানে টাকার স্তূপ জমিয়ে যাচ্ছে। আর এই দুই শ্রেণীর ব্যবধান ক্রমেই বর্ধিত আকারে মুখব্যাদান করছে।" সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড তার শিক্ষাপদ্ধতিতে তত্ত্ববিজ্ঞানের বদলে কারিগরী-বিজ্ঞানের প্রাধান্য বাড়িয়েছে। তার ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশের কাছে সে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, যদিও "তার এই অবস্থার আসল চেহারা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত, যেহেতু সাম্রাজ্যিক বাজার তার মুঠোর মধ্যে।" নিবেদিতা কঠোরভাবে বললেন, "বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণী তার দেশের পক্ষে পরগাছা; এবং বিশেষ অধিকারভোগী দেশ পৃথিবীর পক্ষে পরগাছা।" ইংলণ্ড মৃত্যু-পথবর্তী—নিবেদিতা আতঙ্কে দেখলেন। "যে-জাতি তার সকল সন্তানের সুখকে কয়েকটি লোকের সুখ-সম্পদের কাছে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে—সে-জাতি ইতিমধ্যেই মৃত্যুপথে পা বাড়িয়েছে।"

এই প্রবন্ধে নিবেদিতা ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাও বলেছিলেন। "বেকার লোকেরা সর্বত্র সোস্যালিস্ট বাগ্মীর চারপাশে সাগ্রহে ভিড় করছে।" ঐকালে "সোস্যালিজম শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য যদিও সাধারণভাবে অস্পষ্ট," তবু নিবেদিতা এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন: "ঐ অস্পষ্ট অর্থ শীঘ্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই অর্থ অনুযায়ী—ব্যক্তিগত সম্পদ, যাকে মানুষ নিজে অর্জন করেনি, তা অবশিষ্ট মানবসমাজের উপর অত্যাচার ও বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।" ইংলণ্ডে তখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন—নিবেদিতা নিশ্চিতভাবে অবশ্য সেকথা বলেননি; কিন্তু মনে করেছিলেন, যে-কোনো ইন্ধন-ঘটনা, যথা নিউইয়র্কের কর-গণ্ডগোল, "পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের বারুদখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠতে পারে।" অনিবার্য নিয়তি তাই। "অধিকারভোগীদের প্রতিটি প্রজন্ম ভূমিষ্ঠ হয় ক্রমবর্ধিত নির্বুদ্ধিতা ও লাম্পট্যের মধ্যে। আর সর্বহারাদের প্রতিটি প্রজন্ম উত্তরোত্তর বঞ্চিত হয় জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে।" "নিঃসন্দেহে, দারিদ্র্য ও নৈরাশ্য অতীব দাহ্য সামাজিক পদার্থ।"

আগে যেকথা বলেছি, নিবেদিতা স্বয়ং মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী নেত্রী হলেও অন্তরে-অন্তরে যুদ্ধ ও ধর্মঘট সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বোধ করতেন। ১৫ অক্টোবর ১৯০৮, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, "কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে ইউরোপে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আমার মতে সেটা খুবই সহায়ক হবে। [নিবেদিতা কথাটা বলেছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দিক দিয়ে।]। কিন্তু স্বীকার করছি, যুদ্ধ ও ধর্মঘটে আতঙ্ক হয়।" নিবেদিতা একাধিকবার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারিত রূপের অমসৃণ বর্বর শক্তির কথা বলেছেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের একেবারে প্রথম পর্বে, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯০২, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন:

"এই ভ্রমণের কালে [নিবেদিতা তখন দক্ষিণ ভারতের দিকে রাজনৈতিক ভ্রমণে অগ্রসর হচ্ছেন] ফ্রেডরিক হ্যারিসন [অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থ] আমার অবিচ্ছিন্ন আনন্দের হেতু। বিরাট নগরসমূহ সম্বন্ধে তাঁর পর্যালোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর। কেবল আদর্শ নগরীর প্রসঙ্গ এলেই তাঁর ব্যর্থতা ঘটে। আমাদের সকল প্রগতিশীল বন্ধুগণের—সোস্যালিস্ট, পজিটিভিস্ট, রিফর্মার ইত্যাদি ইত্যাদি—স্বপ্ন কেন এত দুঃখজনকভাবে স্থূল। আদর্শকে কি কেবল সর্বদাই জল সরবরাহ,

স্বাস্থ্যবিধি, উত্তম ধনবণ্টনের ব্যাপার হতে হবে ? সেক্ষেত্রে বরং আমি ডিস্‌রেলি ও তাঁর জমিদার প্রজাকে বেছে নেব ! হায়, ভাবী নগরীকে সূত্রবদ্ধ করবে যে-আদর্শ তার বিষয়ে কেউই আলোচনা করে না'! কিংবা আমাদের পারস্পরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধে কোনো প্রস্তাব আনে না ! এমন-কি কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে না—আদর্শ যুগে কলাশিল্পের চরিত্র কী হবে ? ধর্ম ও শিক্ষাপ্রসঙ্গ তো লেখকদের মস্তিষ্কে উঁকিঝুঁকিও মারে না।"

এর পরেই অবশ্য আদর্শজীবী এই নারী, সেকালের রাজার জাতির অন্তর্গত তিনি, জানিয়েছিলেন : "কথা প্রসঙ্গে বলি, আমি থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করছি। সেদিন তুমি [অন্য ক্লাসের তুলনায়] যে-পার্থক্যের কথা বলেছিলে তা মোটেই ঠিক নয়। এ-তো খুবই চমৎকার।" [বলাবাহুল্য 'চমৎকার' অংশ ছিল নিবেদিতার মনে। স্বাধীনতা-পূর্বে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণের স্মৃতি বর্তমান লেখকের কাছে—তা মোটেই সুখদায়ক নয়। তবে ইউরোপীয়ান থার্ড-ক্লাস বলে একটি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত থার্ড-ক্লাস ছিল। নিবেদিতা কি তার কথা বলেছেন ? মনে হয় না।]

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েও (৩১-৮-১৯১১) শূদ্রশক্তি সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন :

"তার বিরাট পেশী যথেচ্ছ চূর্ণ করছে। মধ্যবিত্তের স্বপ্নস্বর্গ ঐ ধনীগৃহের দ্বারপথ দিয়ে দৃশ্যমান কোনো কিছুকে তার বর্বর বল শ্রদ্ধা করতে বা অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত নয়।"

নিবেদিতার কাছে শূদ্রশক্তিতে ছিল সরল বর্বরতা, আর ধনিক শক্তিতে পচনশীল বিকৃতি। তাই একথা বলবার সাহস ও শক্তি তাঁর ছিল :

"ক্ষমতা ও সম্পদের চেয়ে বড় নরক আর কিছু নেই। দেহের রক্তমাংসের কারাগারে আধ্যাত্মিক তমসার সেই নরক। তার তুলনায় ধর্মঘট, ক্ষুধা ও দুর্বলতার নরকও শ্রেয়।" [১৪-৯-১৯১১]।

যে-সমাজতান্ত্রিক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ ইংলণ্ডের মাটিতে হবে না বলে তিনি আগে মনে করেছিলেন, তা ইংলণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১৯১১ সালে। সেইকালে তার প্রবলতা দেখে মনে হয়েছিল—ইংলণ্ডে বুঝি বিপ্লব এসে গেছে! এই "লেবার ওয়ার" সম্বন্ধে নিবেদিতা চিঠিতে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন, যাদের মধ্যে তাঁর বিস্ফারিত চোখের আতঙ্ক ও উল্লাস একইসঙ্গে ফুটে উঠেছে। ৩১ অগস্ট, ১৯১০, র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন :

"হাঁ, ধর্মঘট ! ফরাসি বিপ্লবের তুল্য কিছু শুরু হয়ে যাবে না কি ?...শূদ্র জাগছে। শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলছে।...কি দেখব আমরা ? অপেক্ষা করে আছে কোন্ বস্তু ? ঘটনার পটপরিবর্তন হতে বোধহয় রাত্রিও কাটবে না।"

একই তারিখে ডঃ চেনীকে লিখলেন :

"পাশ্চাত্যদেশ নবসৃষ্টির দ্বারপ্রান্তে। ভাবছি, তাহলে কি শূদ্রসমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হবার পথে ! জগৎ ! জগৎ ! পরিবর্তমান পৃথিবী ! ঘটনার সর্পিল গতি—মানবাত্মা তার প্রত্যক্ষদর্শী।"

'লেবার ওয়ার' নিয়ে নিবেদিতা নানাপ্রকার ভাবনা-কল্পনায় ডুবে ছিলেন। ধর্মঘটের ফলে মূলধন কি পাশ্চাত্যদেশকে ত্যাগ করে প্রাচ্যমুখী হবে ? সেক্ষেত্রে বিশ্বের সকল শ্রমিককে একই ধরনের আন্দোলনের সামিল করবার জন্য কি "পাশ্চাত্য শ্রমসংগঠনগুলি নিজ স্বার্থে প্রাচ্যকে বিপ্লব-বিজ্ঞান

শেখাবে ?" [৩১-৮-১৯১১]। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, ধর্মঘটের তত্ত্ব প্রাচ্যদেশের পক্ষে গ্রহণ করা সহজতর, কারণ প্রাচ্যে "আনুগত্যের গোটা ধারণাটি সামাজিক,...একেবারেই তা রাজনৈতিক নয়।" কিন্তু এটা তাঁর কাছে "ভয়াবহ বিজ্ঞান"—যদি এর প্রয়োগ শ্রেণীস্বার্থ-সাধনের জন্য করা হয়। "এইসব সময়ের সবচেয়ে আতঙ্কজনক রূপ ঘটে যখন দেখা যায়, সকলেই স্বার্থসন্ধানী এবং সকল শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে লড়াই করে।" নিবেদিতা শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাদের স্বার্থের পক্ষে এবং বঞ্চিত সকল শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন—তিনি চেয়েছিলেন, মানবতাবোধ হোক সকল সংগ্রামের ভিত্তি। ধর্মকে তিনি একই মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। "এমন কি ধর্ম পর্যন্ত আমার কাছে একটি যন্ত্র, যা মানবসমাজকে চুল্লীতে ফেলে দিয়ে বৃহৎসংখ্যক মানুষকে নতুন ছাঁচে গঠন করবে।" সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলিকে নিবেদিতা একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত দেখতে চেয়েছিলেন :

"শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারক চাই—যাঁরা তাদের দৃষ্টিপ্রসার ঘটাবেন, মানবতাবোধ তাদের মধ্যে জাগাবেন, মানবজাতির ঐক্যবোধের চেতনা তাদের মধ্যে আনবেন, পথ দেখাবেন আত্মোৎসর্গের। যদি এমন ঘটে, যদি বিশাল অধ্যাত্ম-উৎস থেকে শক্তি আহরণ করা হয়, যদি ত্যাগধর্মী মানুষ সৃষ্টি করা যায়, তবেই তাদের মধ্যে পূর্ণশক্তিমান নেতার জন্ম ঘটবে।" [র‍্যাটক্লিফকে, ১৪-৯-১৯১১]।

॥ ৮ ॥ ক্রপটকিনের বক্তব্য প্রচারে নিবেদিতা

'নৈরাজ্য'-তত্ত্বের মহান প্রবক্তা প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক, এবং নিবেদিতার চিন্তাধারার উপরে ক্রপটকিনের প্রভাবের বিষয়ে অনেক কথাই ইতিপূর্বে বলেছি। আমরা জেনেছি যে, নিবেদিতা বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রপটকিনের গ্রন্থ বিতরণ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি অরবিন্দর মামলার বিবরণ এবং তাঁর বিবৃতি ও রচনার সংকলন ইংলণ্ড থেকে প্রকাশ করবার জন্য ক্রপটকিনের সাহায্য নেবার কথা ভেবেছিলেন [২৬-৬-১৯০৯-এর চিঠি, ইতিপূর্বে উৎকলিত], অন্য দিকে তেমনি ক্রপটকিনের 'ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন্' প্রকাশমাত্রে সেটির আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন। র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে-১ জুলাই ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন :

"ক্রপটকিনকে তাগিদ দিয়ে তোমরা কি তাঁর 'ফ্রেঞ্চ উইকলি' গ্রন্থগুলি আমার জন্য জোগাড় করে নেবে ? সেইসঙ্গে আমি তাঁর 'ফরাসি বিপ্লব' গ্রন্থ বের হওয়া-মাত্র চাই। ও-বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কথা নেওয়া কি তোমাদের পক্ষে খুব-কিছু হয়ে দাঁড়াবে ?...আমি অবিলম্বে বইটির রিভিউ করতে চাই।"

নিবেদিতা সত্যই বইটির রিভিউ করতে পেরেছিলেন কিনা এখনো আমরা জানি না। তবে দেখেছি, তিনি মডার্ন রিভিউ মারফত, আইন বাঁচিয়ে, ক্রপটকিনের চিন্তাধারা যথাসম্ভব শিক্ষিত-সাধারণের গোচর করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত ছিল :

(ক) ক্রপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি চমৎকার বিবরণ।
A Chat with a Russian about Russia.
মর্ডান রিভিউ-এর ১৯০৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনাটি নিবেদিতা গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(খ) ক্রপটকিনের আত্মজীবনী থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি :

Thoughts from Prince Kropotkin's Memoirs of a Revolutionist.
উদ্ধৃতিগুলি মডার্ন রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোট-এর মধ্যে ছিল।
(গ)ক্রপটকিনের 'কনকোয়েস্ট অব ব্রেড' গ্রন্থের উদ্ধৃতি :

Kropotkin on Free Labour: Prince Kropotkin on Capital: Prince Kropotkin *on the Society of the* Future*: Kropotkin on Wage Labour: Kropotkrin on Parliamentary Rule.*
উদ্ধৃতিগুলি মডার্ন রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোট-এর অন্তর্গত।

'মেময়ার্স অব এ রিভুলিউশনিস্ট' গ্রন্থ থেকে যেসব অংশ উৎকলন করা হয়, তাদের সূচনায় কয়েক বাক্যে সংকলকের প্রারম্ভিক বক্তব্য ছিল। ধরে নিতে পারি, উক্ত গ্রন্থভুক্ত প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পক্ষে প্রচারাত্মক অংশগুলি এখানে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক, উৎকলিত অংশগুলির মধ্যে—জার-শাসিত রাশিয়ায় বিপ্লবপন্থীদের উৎপীড়িত অবস্থার যে-বিবরণ পাই, তা স্বদেশী যুগের বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা-সৈনিকদের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। নিবেদিতা মনে করেছেন, [তাঁর চিঠি থেকে পাই], অত্যাচার ও কণ্ঠরোধের ব্যাপারে ভারতের অবস্থা রাশিয়ার চেয়ে খারাপ। চমকপ্রদ উদ্ধৃতিগুলি পুরোপুরি উদ্ধৃত করব না। কেবল তাদের শিরোনামা এবং সংকলক-প্রদত্ত মন্তব্য তুলব, সেই সঙ্গে বাংলায় বক্তব্যের সারসংক্ষেপ দেব।—

(I) *The Evils of Absentee and Centralised Government.*

The following extract from Prince Kropotkin's *Memoirs* may be read with profit by the rulers and the people alike. [সংকলকের মন্তব্য]

উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, ক্রপটকিন সাইবেরিয়ার প্রশাসন-ব্যবস্থার নিন্দা করেন নি, বরং বলেছেন, তা রাশিয়ার অন্য জায়গার শাসনব্যবস্থার তুলনায় ভালো। কিন্তু সেখানকার প্রশাসকদের পক্ষে তাঁদের শুভ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয় যেহেতু উপর থেকে পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয়। প্রশাসন কেন্দ্রবদ্ধ—তার পিরামিড আকার। কেন্দ্রের কর্মচারীরা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না। তাদের একমাত্র চেষ্টা—উপরওয়ালাদের ইচ্ছাকে শাসনযন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া। তাতে দেশের ক্ষতি হয়—হোক গে।

(II) *Russian Methods of 'Not' Giving Education.*

The following passage shows that question, 'how not to educate the people' is bound to be answered in the same way all over the world. [সংকলকের মন্তব্য]।

শিক্ষার জন্য রাশিয়ানদের আগ্রহের অন্ত নেই। কিন্তু সরকার-তরফে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ মাত্র ২০ লক্ষ রুবল—সে টাকাও শেষপর্যন্ত খরচ করা হত না। রাশিয়ানরা চাইত কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা—কিন্তু সরকারী কর্তারা চাইতেন গির্জার কাঠামো-মাফিক শিক্ষা, যাতে জনসাধারণ বাস্তব প্রয়োজন ভুলে থাকে। গির্জার কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা আবার এমন কঠোর ছিল যে, অধিকাংশ ছাত্রই ফেল করত। ফল দাঁড়িয়েছিল—শিক্ষা কিছু লোকের বিলাসের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে যদি দেখা যেত, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কাউন্টি-কাউন্সিল বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুল ইত্যাদি খুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে, তখনি তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সংঘর্ষ বেধে যেত।

"যে-দেশে ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত কৃষক, ভূতাত্ত্বিক এত দরকার, সে-দেশে টেকনিক্যাল শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টাকে বিপ্লবপন্থা গ্রহণের সমতুল বিবেচনা করা হয়েছে। ও-শিক্ষা নিষিদ্ধ—এবং শাস্তিযোগ্য।" [ক্রপটকিনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ]

নিবেদিতা যখন এই অংশ উদ্ধৃত করছিলেন তখন তাঁর মনে নিশ্চয় কার্জনী শিক্ষাসংকোচ ব্যবস্থার কথা জাগরূক ছিল। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

(III) *A Russian Parallel to the Present Situation in India.*

The following lines present a parrallel to the atmosphere of suspicion, fear, demoralisation and paralysing prudence in which we at present find ourselves. [সংকলকের মন্তব্য]

ষাটের দশকে রাশিয়া, বিশেষত সেন্ট পিটারস্‌বার্গ পূর্ণ ছিল প্রগতিশীল চিন্তার নানা মানুষে। পরবর্তীকালে তাঁরা নিশ্চুপ। তরুণ ক্রপটকিন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—এভাবে ঝিমিয়ে যাওয়ার কারণ কি? উত্তর হিসাবে ওঁরা রুশ ভাষায় প্রাপ্তব্য প্রভূতসংখ্যক প্রবাদের দু'একটি ব্যবহার করেছিলেন, যথা, "খড়ের চেয়ে লোহা কঠিন," "মাথা ঠুকে পাথর ভাঙা যায় না।" ঐসব প্রগতিশীলেরা শেষপর্যন্ত বাস্তব দর্শন হিসাবে বিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছিলেন। "হাঁ, আমরা কিছু তো করেছি; আমাদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করো না।" "ধৈর্য ধরো। এমন জমানা নিশ্চয় চিরদিন চলতে পারে না।" ক্রপটকিনের মতো তরুণরা যখন জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঐসব ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ চাইতে যেতেন—তখন শুনতেন ঐ ধরনের কথা। তবে রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা তখন এমনই ভয়াবহ যে, সেরা লোকদের পক্ষেও নীরব থাকার যথেষ্ট হেতু ছিল। "রাজ্যের পুলিশ বিভাগ সর্বময় কর্তৃত্বে। যাঁদের বিরুদ্ধে র‍্যাডিক্যালিজম্‌-এর সন্দেহ জেগেছে—তাঁরা অতীতে কী করেছেন বা করেন নি সেসব বিবেচনাই নেই—তাঁরা যে-কোনো রাত্রে গ্রেপ্তার হতে পারেন। তাঁদের অপরাধ?—তাঁরা হয়ত এটা-ওটা রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, কিংবা মধ্যরাত্রির খানাতল্লাশকালে একটি নির্দোষ চিঠি তাঁর জিম্মায় পাওয়া গেছে, কিংবা নিছক তাঁর 'মারাত্মক একটা মত' আছে। আর রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের পরিণতি? যে-কোনো পরিণতিই সম্ভব।...মুরাভিয়ক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি সেন্ট পিটারস্‌বার্গের সকল চরমপন্থার শিকড় উপড়ে ফেলবেন।" এই পরিস্থিতিতে পূর্বতন প্রগতিশীল চিন্তার ধারক বয়স্ক মানুষেরা এমন গুটিয়ে গেলেন যে, পরবর্তী প্রগতিশীল যুবকদের সঙ্গে তাঁদের ফারাক বিরাট হয়ে দাঁড়াল। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের ব্যাপারে তো নয়ই, সমাজতন্ত্রের পক্ষে লড়াইয়েও নয়, এমন কি সাধারণ রাজনৈতিক অধিকার দাবির ক্ষেত্রেও পূর্বের প্রগতিশীলদের সাহায্য পরবর্তীরা পেলেন না। "আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম [ক্রপটকিন লিখেছেন], ইতিহাসে পূর্বে কি এমন কোনো নজির আছে যেখানে ওহেন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর তরুণদল এইভাবে তাদের পিতৃগণ, এমনকি অগ্রজগণের দ্বারা এমন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে—যদিও ঐ তরুণদল তাদের পিতৃগণ ও অগ্রজগণদের চিন্তার উত্তরাধিকারকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে জীবনে তাদের রূপায়িত করতে ব্রতী? এমন ট্র্যাজিক অবস্থার মধ্যে আর কখনো এমন সংগ্রাম শুরু হয়েছে?" [ঐ, সারসংক্ষেপ]

(IV) *Work for the Masses.*

If we want to know what sacrifices have to be made to reach the heart

of the masses and educate and uplift them, we cannot do better than read the following passage. [সংকলকের মন্তব্য]

রাশিয়ার গ্রামে-গঞ্জে কিভাবে তরুণদল ছড়িয়ে পড়েছিল তার কিছু বিবরণ ক্রপটকিন দিয়েছেন। তারা গিয়েছিল ডাক্তারের সহকারী হয়ে, কিংবা শিক্ষক হয়ে, কিংবা খাতা লেখার কর্মচারী, কৃষিশ্রমিক, কামার, ছুতোর ইত্যাদি হয়ে। তরুণীরা ধাত্রীবিদ্যা শিখে শত-শত সংখ্যায় গ্রামে গেছে। তাদের অধিকাংশের গ্রাম-সংগঠনের শিক্ষা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু ছিল আন্তরিকতা—সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য, অন্ধকার দুঃখজীবন থেকে তাদের উত্তোলনের জন্য। সেই সঙ্গে তারা জানতে চেয়েছে—গ্রামের ঐ সকল সাধারণ মানুষ উন্নততর সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কোনআদর্শকে প্রিয় বলে মনে করে। [ঐ, সারসংক্ষেপ]

(V) *The Meaning of Local Self-Government in Russia.*

WE hope under Lord Morley's Reform Scheme and Decentralisation Scheme, Local Self--Government will be different from its namesake in Russia as described below. [সংকলকের মন্তব্য]

রাশিয়ার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের নামে ক্ষমতার যৎসামান্য বিকেন্দ্রীকরণই মাত্র করা হয়। তারপর যখন সেই সামান্য ক্ষমতা কাউন্টি কাউন্সিলগুলি ব্যবহার করতে চাইল তখন তারা গভীর সন্দেহ ও ঘৃণার লক্ষ্য হল, তা বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতা বলে ধিকৃত হল, অপবাদ দিয়ে বলা হল—এ হচ্ছে 'রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা।' অর্থাৎ স্থানীয় কাউন্সিলগুলি সেন্ট পিটারস্‌বার্গের মন্ত্রীদের নির্দেশের বাধ্যবাহক হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবার অধিকারী নয়। [ঐ, সারসংক্ষেপ]

(VI) *Moderates and Extremists in Russia.*

Do our Moderates and Extremists resemble in any respect the two Russian parties described below? [সংকলকের মন্তব্য]

সর্বদাই এমন ঘটতে দেখা যায় : যখন কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পরে ঘোষণা করে দিয়েছে—পূর্ণ লক্ষ্যলাভের পূর্বে তারা ক্ষান্ত হবে না, তখন সেই দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি দল পুরোপুরি ঘোষিত আদর্শকে ধরে থেকেছে—আর অন্য দল ঘোষিত আদর্শের একচুল ব্যতিক্রম করা হয়নি, একথা সজোরে জানাবার পরে, কোনো-না-কোনো আপসরফার পথে এগিয়েছে—আপস বেড়েছে ক্রমান্বয়ে—অবশেষে প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে, 'এখনকার মতো এতেই চালিয়ে নেওয়া যাক' ধরনের নম্র-মত শাসন-সংস্কারের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। [ঐ, সারসংক্ষেপ]

(VII) *A picture of Police-and-Spy Rule.*

A picture of police rule in Russia in likely to give us the gloomy satisfaction of feeling that we are somewhat better off because we are not revolutionists. [সংকলকের মন্তব্য]

রাশিয়ার বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আঘাতের পথ ধরেছিলেন। আঘাত (ক) পার্টির মধ্যে যেসব স্পাই ঢুকে গিয়েছিল, (খ) যারা বন্দীদের উপর অত্যাচার করত, (গ) যেসব পুলিশ-প্রধান সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল—এদের সকলের বিরুদ্ধে।

জারকে রক্ষার জন্য গুপ্ত পুলিশবাহিনী গঠিত হয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত অফিসাররা ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করে অপর মানুষদের প্রণোদিত করত বিপ্লবাত্মক কথা বলার জন্য। তারপরেই তাদের পাকড়াত। প্রত্যেক বিপ্লবীই এই ধরনের উস্কানিদাতা এজেন্টের খপ্পরে পড়েছেন। এই সকল 'বিষধর সরীসৃপকে' পুষতে সরকার অঢেল খরচ করেছে।

সমাজের উচ্চবর্গের মধ্য থেকে সংগৃহীত চরদের নৈতিক চরিত্র আঁস্তাকুড়ের অধম। "এইসকল শয়তানের জন্য কী বিপুলসংখ্যক ট্র্যাজেডি না ঘটে গেছে। মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়েছে, গোটা পরিবার ধ্বংস হয়েছে—কেন ? না, ঐ জোচ্চোরগুলো যাতে আরামের জীবন যাপন করতে পারে। যদি কেউ পৃথিবীর দেশগুলির বেতনভোগী হাজার-হাজার স্পাইয়ের কথা চিন্তা করে, সরল মানুষদের সামনে যারা সর্বপ্রকার ফাঁদ পাতে, মর্মন্তুদ পরিণতি ঘটায় অগণিত জীবনে, দুঃখবেদনাকে ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র ; যদি কেউ ভেবে দেখে, সমাজের আবর্জনার মধ্য থেকে সংগৃহীত এই চরবাহিনী পোষার জন্য কোন্ বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়, এবং সমাজের উপর ঐ লোকগুলি কিভাবে বীভৎস দুর্নীতি ঢেলে দেয়—তখন তারা এই স্পাইদের দ্বারা সৃষ্ট বিকট পাপ দেখে আতঙ্কিত না হয়ে পারবে না।" [ঐ, সারসংক্ষেপ]

মডার্ন রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সংখ্যায় নোট-এর মধ্যে প্রদত্ত ক্রপটকিনের 'কনকোয়েস্ট অব ব্রেড' গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলিতে ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার আসল চরিত্র, ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্কের রূপ, এবং ভাবীকালের পৃথিবীতে শ্রমিকের ভূমিকা ইত্যাদির কথা ছিল। উদ্ধৃতিগুলি দেখিয়ে দেয়—নিবেদিতা কোন্ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সংগ্রামী ভারতবাসীকে পরিচিত করাতে চাইছিলেন। এদের বিষয়বস্তু উপস্থিত করব না। শিরোনামগুলি আগেই উৎকলন করেছি।

॥ ৯ ॥ ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকার-বিবরণ

উপরের উপ-অধ্যায়ে উপস্থাপিত ক্রপটকিনের চিন্তার সঙ্গে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এর পাঠকদের কিছু পূর্ব-পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন এই পত্রিকার ১৯০৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-বিবরণের মধ্যে।

নিবেদিতা ক্রপটকিনকে তাঁর লণ্ডনের হাইগেট-এর বাসভবনে "সদানন্দ আতিথ্যে পূর্ণ" রূপে দেখেছিলেন। অতি দুঃখের মধ্যেও দুঃখজয়ী তিনি। এই নির্বাসিত রাশিয়ান বিপ্লবীর দুঃখের সত্যই সীমা ছিল না, কারণ "রাশিয়ার দুঃখ…তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছে মৃত্যুর চেয়ে সহস্রগুণ অধিক মন্দ।"

আলোচনাকালে ক্রপটকিন ভারত ও রাশিয়ার সমাজ-সংগঠনের সমরূপের কথা বলেছিলেন। "উভয় দেশেই গ্রাম একক মাত্রা"—তিনি বলেন। ভাষা ও আচার ব্যবহারের কিছু পার্থক্যের কথা বাদ দিলে উভয় দেশের গ্রামগুলির মধ্যে সাধারণ রূপের কত-না ঐক্য। নিবেদিতা সর্বদাই সাধারণ মানুষের সহজ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ। ভারতীয় জনজীবনে তার অদ্ভুত প্রকাশ তিনি দেখেছেন। নিবেদিতা সম্ভবত মনে করেছিলেন—কৃষক নিজের হাতে কাজ করে, তার অভিজ্ঞতা বস্তু-ঘনিষ্ঠ, সেই কারণেই সে সহজ বুদ্ধির অধিকারী। ক্রপটকিন বলেন, কেবল ওটাই সহজ বুদ্ধির কারণ নয় ; গভীরতর কারণ হল, "কৃষক সামাজিক-মনের সংস্পর্শে থাকে।" কথাটাকে ক্রপটকিন ব্যাখ্যা করেন : "আমার লাগোয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের রূপ দ্যাখো। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পরস্পরের নাম জানি কিনা সন্দেহ—পরস্পরের কাজকর্মের সংবাদ তো রাখিই না।

আমাদের সমস্বার্থ আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে-বিষয়ে আমরা অসচেতন। এই হল আধুনিক নগর-সভ্যতার চেহারা। কৃষকের যুক্তিশক্তি আসে সমগ্র সমাজের বুদ্ধি-উৎস থেকে : আর আমাদের ব্যক্তি-বুদ্ধি।" নিবেদিতার কাছে "আলোকোজ্জ্বল এই মন্তব্য।" তাঁর চোখের সামনে খুলে গিয়েছিল ইতিহাসের বিস্তীর্ণ অধ্যায়গুলি—কিভাবে গ্রাম-চৈতন্য অতীতে জাতীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—সেই ইতিহাস। সদুঃখে তিনি সেই অতীত ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক যুগের তুলনা করেছিলেন—যে-আধুনিক যুগ অতীত ঐশ্বর্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নয়, তার ক্ষয়কার্যে ব্যাপৃত।

নিবেদিতার পরবর্তী প্রশ্ন নিকট-অতীত নিয়ে। ১৯০৬-০৭ সালে রাশিয়ায় বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয়। তা ব্যর্থ হয়েছিল। ঐ দু'বছরের কঠোর সংগ্রামে রাশিয়ানরা কী পেয়েছিলেন? ক্রপটকিন উজ্জ্বলমুখে বলেন : "তার ফল—একটি নতুন জাতির জন্ম, একটি নতুন সাহিত্যধারার উদ্ভব।" শেষোক্ত বিষয়টি ক্রপটকিন দৃষ্টান্তযুক্ত করেন : "ধরা যাক, আমার নিজের 'মেময়ার্স অব এ রিভলিউশনিস্ট' বইটির কথা—তার ৭০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছে—ছাপা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ।...এই ধরনের বই আগে রাশিয়ায় পড়া হত না। এখন তাদের গ্রোগ্রাসে গেলা হচ্ছে।"

এই ধরনের বই কেন রাশিয়ায় আগে পড়া হত না তার কারণ ক্রপটকিন বুঝিয়ে বলেছিলেন। প্রথমত বইটি এক রাজদ্রোহীর লেখা যিনি বহু বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, এই বইয়ে 'বিব্‌লিক্যাল ক্রিটিসিজম' আছে। বাইবেলে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে নির্বিচারে সত্য বলে গ্রহণ না করে, তাদের মূলে প্রত্নতাত্ত্বিক, গাণিতিক, জ্যোতিষিক কারণ সন্ধানের, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ সন্ধানেরও, যে-চেষ্টা এই গ্রন্থে আছে তা ধর্মভীরু রুশ জনগণের কাছে নিতান্ত বিতৃষ্ণাকর, এমন-কি ধর্মদ্রোহিতামূলক বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা ছিল। তথাপি বইটি হাজারে হাজারে বিক্রয় হয়েছে।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান কি করে ঘটতে পারল, সে প্রশ্ন নিবেদিতা উত্থাপন করেন।

নিবেদিতা—রাশিয়ার উপর দিয়ে যে-পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে তার হেতু কি? যুদ্ধ কি সেই হেতু?

ক্রপটকিন—না। উল্টোপক্ষে বলা যায়, যুদ্ধ ঐ পরিবর্তনের ফল। জার যুদ্ধঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন—বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখার অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি অবশ্য জয়ী হবেন ভেবেছিলেন। যুদ্ধকালে প্লেভে-র হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার।

নিবেদিতা—তাহলে বিপ্লবের হেতু ঠিক কি?

ক্রপটকিন—গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা যে-কাজ করেছি তা-ই কারণ। এইসব ঘটনা থেকে আমি শিখেছি যে, মানবতার জন্য উৎসর্গীকৃত কোনো একটি চিন্তা বা শব্দ কদাপি নষ্ট হয় না। মন্দ বস্তু বা সমাজবিরোধী কার্য ধ্বংস হয়, কিন্তু কোনো শুভ কার্যের মৃত্যু নেই। কোনো তরঙ্গের উত্থানে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু সবকিছুই স্থায়ী। তাই কারাবাস, নির্বাসন, উৎপীড়ন, প্রাণদণ্ড সত্ত্বেও আজ রাশিয়ার কৃষকরা রাজনৈতিক বুদ্ধি ও চেতনা অর্জন করেছে।

নিবেদিতা—আপনারা কোন্ মৌলিক ভাবের দ্বারা এই সাধারণ শিক্ষার অবস্থা সৃষ্টি করলেন?

ক্রপটকিন—কৃষকের কাছে প্রদত্ত আমাদের প্রথম শিক্ষা—'এই জমি কার জানো? এই জমি তোমার। এই জমি তোমার পিতৃপিতামহগণ পরিষ্কার করেছেন, তাতে লাঙল দিয়েছেন, জলসেক করেছেন, বীজবপন করেছেন, এবং শস্য উৎপাদন করেছেন। এক্ষেত্রে জমির মালিককে তোমরা খাজনা দেবে কেন—মালিকই তা তোমাদের দেবে—ঐ জমিতে তারা বসবাসের অনুমতি পেয়েছে বলে।' এই ভাবটি তাদের প্রাণ-মনের গভীরে ঢুকে গিয়েছে। তারা এখন জমিকে নিজস্ব বলে মনে করে—কর্তারা তাদের সেবক।

নিবেদিতা—তাহলে প্রতিটি প্রদেশের সকল কৃষক কেন একযোগে উত্থিত হচ্ছে না—বাধা কি? সে-ক্ষেত্রে তো বিপ্লব সফল হয়ে যায়।

ক্রপটকিন (হেসে)—আ-হা। ওটা মস্ত প্রশ্ন। প্রথমত, আমরা ১৭ কোটি মনুষ্য। ১৭ কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়। পুনশ্চ, ভূমির যে-মালিকশ্রেণী কনস্টিটিউশন চায়, তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের সঙ্গে—গ্রাম-গোষ্ঠীর জন্য জমির অধিকার চায় এমন কৃষক-শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব [অর্থাৎ যারা চায়—সমস্ত জমি গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধীন হোক]—উভয়ের টানাপোড়েনে অবস্থা জটিলাকার ধারণ করেছে। যতদিন-না জমির মালিকেরা কৃষকদের সমর্থন করতে রাজি হচ্ছে ততদিন কোনো ফললাভ হবে না। [স্মতর্ব্য, রাশিয়ার ভূস্বামীদের একাংশ বিপ্লব-সমর্থক ছিলেন; তাঁরা কনস্টিটিউশন চাইতেন; অপর অংশ জার-সমর্থক]।

নিবেদিতা—তা ঘটবার কোনো আশা আছে কি?

ক্রপটকিন (উদ্দীপ্তভাবে)—আশা থাকতেই হবে। একই জিনিস ফরাসি বিপ্লবের সময়ে হয়েছিল। ফ্রান্সের গৌরব এইখানে—১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্ষতিস্বীকার করেও জমির অধিকার দিয়েছিল কৃষকদের। এই ব্যাপারটিই বিপ্লবকে জাতীয় ব্যাপার করে তোলে, এবং তার সাফল্য সুনিশ্চিত করে। সকল বিপ্লব এই মূল প্রশ্নের সম্মুখীন—জনগণের জন্য কোন্ প্রতিশ্রুতি সে দেবে? আমাদের রুশ কৃষকেরা যে-জমিতে বসবাস করে তাকে তারা কিনতে প্রস্তুত, প্রয়োজন হলে চড়া দাম দেবে—কুড়ি-তিরিশ-পঞ্চাশ বছরে শোধ করবে। তারা দান চায় না। তারা চায়, বিভিন্ন দফায় দাম দেবার যুক্তিসঙ্গত সুবিধা। অবনত, অবনমিতদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা ভিন্ন কোনো বিপ্লব কদাপি সফল হতে পারে না।

ক্রপটকিন (পুনশ্চ)—রাশিয়ার মধ্যবিত্তশ্রেণী বিভিন্ন স্তরে সুসংগঠিত। তাদের সকলেরই নিজ বৃত্তি-অনুযায়ী ইউনিয়ন আছে। গ্রামের ধাত্রী, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য সকলে নিজেদের ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আজ 'ছাত্ররা' [যারা রাজনৈতিক প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে থাকে] সকল গ্রামবাসীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। ঐ তিন সপ্তাহের ধর্মঘটের তুল্য অপূর্ব কাণ্ড আর কখনো ঘটেনি। ট্রেন অচল, বিভিন্ন প্রদেশে পর্বতপ্রমাণ খাদ্যবস্তু জমে আছে, কিন্তু সেন্ট পিটারসবার্গে তাকে বহন করে নিয়ে যাবার কেউ নেই। রাত্রি হলেই পথঘাট সম্পূর্ণ অন্ধকার, কারণ ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এরই মধ্যে নিকোলাস কনস্টিটিউশনে স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিলেন, কিন্তু গোপনে পুলিশকে খবর পাঠালেন যাতে সেটি বরবাদ করা হয়। যদি আমাদের ঐ প্রকার বৃহৎ সংখ্যায় নির্বাসিত করা না হত তাহলে আমরা সকলেই গ্রামে কয়েক বৎসর শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতাম। নারী ও পুরুষ সকলেই ঐ কাজ করত। সেক্ষেত্রে সাফল্য তরান্বিত হত।

নিবেদিতা বলবার চেষ্টা করেছিলেন—উস্কানি দিতেই অবশ্য—জার নিকোলাস সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার উত্তরে ক্রপটকিপনের কাছ থেকে অভিপ্রেত ধমকটুকু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণও করেছেন।

ক্রপটকিন—স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে? স্বাধীনতা কখনো দেওয়া হয় না। স্বাধীনতা সর্বদাই কেড়ে নেওয়া হয়।

কথাবার্তার শেষে এই নির্বাসিত বিপ্লবী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন:

"সাহস বন্ধু, সাহস। জেনো, কোনোভাবেই স্বাধীনতাকে দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না।"

একাদশ অধ্যায়

পুনশ্চ এবং শেষত বিবেকানন্দ

নিবেদিতার ভারতীয় জীবনের রাজনৈতিক চেষ্টা ও চিন্তার বিবরণ শেষ করার সময়ে উৎসে-মুখে প্রত্যাবর্তন করতে হয়ই—যার নাম বিবেকানন্দ।

নিবেদিতা একদা স্বামীজীর জীবনী রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে কলম তুলে নিয়েও সে-বাসনা ত্যাগ করেছিলেন। আত্মশাসন করে বলেছিলেন, কে আমি যে তাঁর জীবনী লিখব? তিনি কত বিভিন্ন রূপে কত বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রতিভাত ছিলেন—আমার সাধ্য কি সেই সকল রূপকে সম্মিলিত করে বিরাটের রূপাঙ্কন করি! নিবেদিতা তখন নিজের দেখাকেই লিপিবদ্ধ করতে বসে গ্রন্থনাম দিলেন—"দি মাস্টার অ্যাজ্ আই স হিম্।" আচার্যদেবকে যে-রূপে দেখিয়াছি।

সে কী আশ্চর্য দেখা! যার শুরু লণ্ডনের এক উপবেশন-কক্ষে উপবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন থেকে—যিনি মাঝে-মাঝে বিচিত্র উচ্চারণে 'শিব শিব' বলছিলেন, মুখে ছিল নিরন্তর ধ্যানী মানুষের মগ্নতা আর শিশু যীশুর বিহ্বল কোমলতা।

বেলুড়ে সর্বশেষ সাক্ষাতের সময়েও নিবেদিতা বিবেকানন্দকে খ্রীস্টের মতোই ইঙ্গিতময় ভাষায় নিজ মৃত্যুর কথা বলতে শুনেছেন। মধ্যবর্তী অংশে নিবেদিতার মনে বিবেকানন্দ কখনো শিব, কখনো বুদ্ধ। আবার এই সকল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র-সাদৃশ্যকে পরিহার করে কখনো-বা নিবেদিতা বলেছেন—না, স্বামীজী ও-সব কিছু নন, তিনি আলোক, শুধু আলোক।

নিবেদিতার চোখে বিবেকানন্দ কী তার পূর্ণ পরিচয় দেবার চেষ্টা এখানে করব না—সে সাধ্যও নেই। আমার বিশেষ আলোচনার বিষয়—ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও তাতে নিবেদিতার ভূমিকা। তাই বিশেষভাবে জানতে হয়—নিবেদিতা কোন্ ভারতবর্ষকে গ্রহণ করেছিলেন—কিভাবে সেই ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন?

নিবেদিতাকে বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক ইংরাজ রমণী মার্গারেট ই নোবল—শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাবিজ্ঞানী—ভারতবর্ষে আসতে চান বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত বেদান্তের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, সেইসঙ্গে চান ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করতে—বিবেকানন্দ তাঁকে কিন্তু কোনো কুয়াশা-রঙিন ছবি দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাননি—সত্য, নির্মম কঠিন সত্য জানিয়েছিলেন:

"এ-দেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব—সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এ-দেশে এলে দেখবে, চারদিকে অর্ধনগ্ন অগণিত নর-নারী,—'জাতি' ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয়ে বা ঘৃণায়। উল্টোপক্ষে ঘৃণাও পায় অসম্ভব। অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতো

দক্ষিণে তো সর্বসময় আগুনের হল্‌কা। শহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

"এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো—স্বাগত তুমি, শতবার স্বাগত।"

নিবেদিতা এসব শুনেও এসেছিলেন। তার কারণ, মিস ম্যাকলাউডের মতো তিনিও জেনেছিলেন যে, আবর্জনা ও পতনের মধ্যেও ধর্মকথা বলবার মতো কৌপীন-পরা মানুষ ভারতবর্ষে আছে। আর শুনেছিলেন বিবেকানন্দের সেই কণ্ঠস্বর যা মানুষের আত্মাকে উৎপাটিত করে আনে দেহের আশ্রয় থেকে :

"জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য। যুগ-যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আত্মবিসর্জন করতে হবে।...জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায় যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।

"আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী, এবং তারো চেয়ে জ্বালাময় কর্ম। সে মহাপ্রাণ। ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?"

ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে দিলেন সন্ন্যাসীর দেবতা শিবের কাছে। দীক্ষা নিয়ে নমস্কার করতে পাঠালেন সন্ন্যাসীর গুরু বুদ্ধের কাছে, যিনি লোককল্যাণের জন্য পাঁচশোবার দেহধারণ করেছেন। উন্মোচন করলেন রামকৃষ্ণকে—যিনি সহস্র-সহস্র বৎসরের ধর্মসাধনার সমষ্টিভূত বিগ্রহ।

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষ-নামক গ্রন্থটি খুলে দেখালেন—যার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় কত মানুষ আর তাদের কীর্তি, কত কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন এবং জনপ্রবাহ—সবই ধর্মে ধোয়া। দেখালেন, মহিমার শিখর, পতনের বিধ্বস্ত শ্মশান। আর তার মাঝখানে বাজতে লাগল তাঁর 'অপূর্ব কণ্ঠে, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!

সিস্টার ক্রিস্টিন যে-কথা বলেছেন, সে-কথা নিবেদিতারও :

"আমি মনে করি, আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন আমরা স্বামীজীকে INDIA শব্দটি তাঁর অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ভরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা, এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা! কোনো এক বিরাট গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। অপরের মধ্যে ভালবাসা সঞ্চারের জাদুশক্তি ওর মধ্যে ছিল। যে-ই শুনত তার মধ্যে তা জেগে উঠত। তারপর থেকে তাদের মধ্যে ভারতের সবকিছুই আগ্রহের বস্তু হত, সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠত—তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী পর্বত উপত্যকা সমভূমি—তার শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্মধারণা।"

নিবেদিতা এখন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে চাইছেন—কিন্তু বাধা আসছে পূর্বতন আনুগত্যের কাছ থেকে। বিবেকানন্দ তাঁকে কঠিন আঘাতে সচেতন করে দিলেন—যদি সত্যই ভারতবর্ষকে সেবা করতে চাও তাহলে ভারতীয় হয়ে ওঠো, পূর্বতন আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে। নিজেকে বলি দাও ভারতবর্ষের জন্য।

নিবেদিতা দেখলেন—বিবেকানন্দের অসহ্য যন্ত্রণাকে। সিংহের মতো তিনি পায়চারি করছেন—কারাগারে আঘাত করছেন, গর্জন করে বলছেন, যদি পারো চূর্ণ করো অন্যায়কারীকে। যাদের জন্য বিবেকানন্দের যন্ত্রণা—ভারতের সেই শীর্ণ দীর্ণ মানুষগুলি নিবেদিতার সামনে সার দিয়ে এসে দাঁড়াল। পৃথিবীর সকল দুঃখী মানুষের মিছিলের ছবিও বিবেকানন্দ খুলে ধরলেন, যেখানে "অগণিত উৎপীড়িত ও উৎপীড়কের আতঙ্ক ও উল্লাস, সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনি, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের নির্ঘোষ।" নিবেদিতা শুনেছিলেন, বিপ্লবের প্রলয়ধ্বনি স্বামীজীর কণ্ঠে।

শুনেছিলেন প্রেমের আর্ত কণ্ঠও। "যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" প্রেম পৃথিবীর প্রধান অগ্নি। উজ্জ্বল করার নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষায় কেবলই তা দগ্ধ করে। নিবেদিতা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রমিথিউসকে দেখলেন—যিনি আত্মদহনের অগ্নি আহরণ করেছেন—অপরকে আলোকিত করার জন্য। দেবরাজ জিউস্ ক্ষমা করেননি প্রমিথিউসকে তাঁর মানবপ্রেমের জন্য। তিনি মানবসৃষ্টির ভার দিয়েছিলেন টাইটান প্রমিথিউস ও তাঁর ভাই এপিমিথিউসকে। প্রমিথিউস 'দেবতাদের চেয়ে জ্ঞানী।' অপরপক্ষে এপিমিথিউস হঠকারী। তিনি যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও শক্তিসম্পন্ন তাদের দিয়ে দিয়েছিলেন পশুদের—শক্তি ও দ্রুতগতি, সাহস ও চতুরতা, লোম ও পালক, পাখা ও খোলস। মানুষকে দেবার মতো ছিল না কিছু—অরক্ষিত অসহায় রইল সে। নিজ অবিবেচনায় লজ্জিত তিনি ভ্রাতাকে অনুরোধ করলেন—উপায় করো। প্রমিথিউস তখন মানুষকে পশুদের চেয়ে মহৎ আকার দিলেন, দেবতার মতো উন্নত করলেন, তারপর গেলেন সূর্যের কাছে, সেখানে জ্বালিয়ে নিলেন মশাল, সেই আগুনকে নিয়ে এলেন মানুষের জন্য—মানুষ পেল শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকার। মানুষের এই বিরাট প্রাপ্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন দেবরাজ জিউস্। মোহিনী নারীমূর্তি প্যাণ্ডোরাকে সৃষ্টি ক'রে যত অশুভ আর পাপ ছড়িয়ে দিলেন মানুষের জগতে। তাতেও থামলেন না—মানববন্ধু প্রমিথিউসকে বন্দী করে পাঠালেন ককেশাস পর্বতে। সেখানে উচ্চ বন্ধুর কর্কশ পাথরের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা হল তাঁকে, বলা হল :

> ঐ অসহ্য দান চিরদিনের জন্য বাঁধবে তোমাকে।
> তোমায় মুক্তি দেবে যে—সে এখনো জন্মায়নি।
> মানুষকে ভালবাসার ফল এই পেলে।
> স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবরাজের ক্রোধকে ভ্রূক্ষেপ করলে না!
> অযোগ্যকে দিলে অপ্রাপ্য সম্মান!
> তাই এই নিরানন্দ পর্বতের চিরপ্রহরী হও,
> শান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, নিদ্রাহীন,
> গোঙানি হোক ভাষা, আর্তনাদ একমাত্র বাণী।
> এই শেষ নয় :
> একটি ঈগল আসবে রক্ত নখদন্তে, ভোজ-উৎসবের জন্য,
> সারাদিন ছিড়ে-ছিড়ে খাবে তোমার দেহ,
> হিংসার দারুণ আনন্দে বাঁকা ঠোঁট ডুবিয়ে থাকবে
> তোমার কালো হৃৎপিণ্ডে।

শোণিতাক্ষরে লেখা স্বামীজীর যন্ত্রণার কাহিনী নিবেদিতা শুনেছেন :

"দৈবের সহায়তা আমি পেয়েছি, কিন্তু উঃ! তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণে

না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে !…তবে আমি যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে-করতেই আমাকে প্রাণ দিতে হবে। আমার জীবনে ভুলভ্রান্তিগুলো খুব বড়ো বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা।…হায় যদি নির্বিকার বৈদান্তিক হতে পারতাম।

"বহু বৎসর পূর্বে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম—আর ফিরব না মনে করে। এদিকে ভগিনী আত্মহত্যা করল, সে সংবাদ আমার নিকট পৌঁছে আমার দুর্বল হৃদয়কে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সেই দুর্বল হৃদয় আবার আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য সাহায্যভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।…শান্তির পিয়াসী আমি, কিন্তু ভক্তির আলয় হৃদয় আমার তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম।…

"কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়ব না। কাজ করে-করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমাকে তাঁর ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া করে রাখেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ওয়াহি গুরুজীকী ফতে। গুরুজীর জয় হোক। হ্যাঁ, যে-অবস্থাই আসুক না কেন—জগৎ আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাবই, কখনো হার মানব না।"

জিউসের দূতের কাছে প্রমিথিউস বলেছিলেন :

যদি চান—
জিউস তাঁর অগ্নিবজ্র নিক্ষেপ করুন।
তুষারের শীতল শুভ্র ডানার ঝাপটে,
ভূমিকম্পের উন্মাদ আলোড়নে,
বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায় বর্ষণে,
মথিত করুন পৃথিবীকে।
কিন্তু কিছুই নমিত করতে পারবে না—
আমার ইচ্ছাশক্তি।

বিবেকানন্দের অসীম যন্ত্রণা ভারতবর্ষকে নিয়ে। তিনি দেখেছিলেন ভারতবর্ষের 'বিশ্বরূপ'। অন্তত নিবেদিতা তাই মনে করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলছেন এইভাবে :

"সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাবে। ডোলমেনদেরও অভাব নেই। গুহাবাসী ও পত্রসজ্জাকারীদের, বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের, এখনো নানা অঞ্চলে দর্শন মেলে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। এদের সঙ্গে আছে তাতার, মঙ্গোল-বংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ-কথিত আর্যদের শাখাপ্রশাখা। পারসিক, গ্রীক, ইয়ংচি, হুন, চীন, সীথীয়ান, ইহুদী, আরব—এই সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুযুধান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে, ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করে, আবার শান্ত হচ্ছে—এই হল ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

এই হল বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ—

"আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্বিত। এ-পর্যন্ত সর্বপ্রাচীন বলে জ্ঞাত সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য গর্বিত। এই দুই সভ্যতা—আর্য ও তামিল সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষদের জন্য গর্বিত। মানবজাতির আদি পুরুষ, প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহারকারীদের জন্য গর্বিত। আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়—তবে আমাদের জন্তুরূপী পূর্বপুরুষগণের জন্য গর্বিত। জড় অথবা চেতন—এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলে আমরা গর্বিত।"

বিবেকানন্দ বললেন, "আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি—আমি আমার দেশকে ভালবাসি, একান্তভাবে ভালবাসি।"

বললেন, "আমি জীবনে যা-কিছু ঘা খেয়েছি, যা-কিছু যন্ত্রণাভোগ করেছি—সবই একটা সানন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে, যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।"

বিবেকানন্দের দেহান্তের পরে তাঁর চিতাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—স্বামীজীর যন্ত্রণাভার লাঘবের চেষ্টা তিনি করবেন—ভারতের জন্য সংগ্রাম ক'রে। বিবেকানন্দের নাম পতাকায় লিখে নিয়ে তিনি পথে নেমেছিলেন, ছুটেছিলেন। মুক্তি, মুক্তি চাই।

কিন্তু বিবেকানন্দের মুক্তি তো কেবল কোনো একটি দেশের জন্য নয়—সর্ব দেশের; কোনো একটি মানুষের জন্য নয়—সর্ব মানুষের। তা একইসঙ্গে চিরমুক্তির আকাঙ্ক্ষাও বটে। নিবেদিতার জীবনে তাই সান্ত ও অনন্ত মুক্তির ছন্দ একতানে বেজেছিল। তিনি তাঁর জীবনের এক পরম ক্ষণকে লাভ করেছিলেন যখন স্বামীজীকে তিনি বলতে শুনেছিলেন:

"আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না—মুক্তি চাই।...মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরো আরো আরো—আরো চাই।...এই বাসনা অসীমের দ্যোতক। অসীম মানুষ একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে অসীম কামনায়, এবং—অসীম প্রাপ্তিতে।...

"অসীমকে সাহায্য করতে পারে কে?...অন্ধকারের মধ্যেও যে-হাত তোমার কাছে পৌঁছেছে, সে-হাত তোমারই, আর কারো নয়।...

"আমরা—অনন্তের স্বাপ্নিকেরা—আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়।"

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' অনন্ত মুক্তির স্বাপ্নিক ও সংগ্রামী।

সংযোজন :

খাপার্দে-র ডায়েরিতে নিবেদিতা

স্বদেশী যুগে চরমপন্থী নেতাদের প্রথম সারিতে গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দের (১৮৫৪-১৯৩৮) স্থান। তিলক, বিপিন পাল, লাজপত রায়, অরবিন্দের পরেই তাঁর নাম করা হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে অনেকবার স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন প্রসঙ্গে খাপার্দের জোরালো ভূমিকার কথা বলেছেন। ইনি বেরারের জাতীয় নেতা ছিলেন।

খাপার্দে মোটামুটি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। বাল্যে ধর্মশিক্ষা ও সংস্কৃতশিক্ষা করেছেন। কলেজ জীবনে ইংরেজিতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বি-এ এবং ল' পাস করেছিলেন। গোড়ার দিকে সরকারী কাজ করলেও তা ত্যাগ ক'রে আইনব্যবসায় গ্রহণ করেন এবং অচিরে সাফল্য ঘটে। উত্তম বক্তা ছিলেন—সাহিত্যের উদ্ধৃতিতে এবং ধারালো রসিকতার মিশ্রণে তাঁর বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ ক'রে রাখত।

আইনব্যবসা-সূত্রে ১৮৯৮ থেকে তিলকের সঙ্গে তাঁর সাহচর্য, যা ক্রমে রাজনৈতিক আনুগত্যের রূপ ধরে। বেরারে খাপার্দে খুবই প্রভাবশালী ছিলেন ('বেরারের নবাব'), সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছেন (১৮৯১-১৯০৭)। ১৮৯৭ অমরাবতী কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তিলকের অনুগামীরূপে তিনি চরমপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত; এবং সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থার পক্ষে যোদ্ধা। সুরাটের পরে তাঁর কংগ্রেস ত্যাগ। ১৯১৫ সালে তিলকের প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি কংগ্রেসে ফেরেন। তিলকের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তবে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নি। ধার্মিক মানুষ ছিলেন, অ্যানী বেশান্ত ও থিয়জফির প্রতি অনুরক্ত। [এস পি সেন, ২য় খণ্ড]

আত্মপ্রাণা-লিখিত নিবেদিতা জীবনীতে (পৃ. ১৪৭) এইটুকু প্রাসঙ্গিক সংবাদ আছে : নিবেদিতা ১৬ অক্টোবর ১৯০২,সদানন্দের সঙ্গে অমরাবতী পৌঁছান। পরবর্তী দুই দিনে তিনি 'সেজেস্ অব এশিয়া' এবং 'হিন্দুইজম্ ইন দি লাইট অব মডার্ন থট্' নামে দুটি বক্তৃতা করেন।

খাপার্দের ডায়েরিতে নিবেদিতার অমরাবতীতে ওইকালে উপস্থিতি ও বক্তৃতাদির বিষয়ে অনেক নিকট ও চিত্তাকর্ষক সংবাদ পেয়েছি। খাপার্দে নিবেদিতাকে রেল স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়ে (১৬ অক্টোবর) তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেন। প্রথমদিন সন্ধ্যায় উপরতলার এক বারান্দায় বহুলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। নিবেদিতার চমৎকার কথাবার্তা, সম্পূর্ণ ভারতীয় জীবনযাত্রা খাপার্দেকে আকৃষ্ট করে। নিবেদিতার সঙ্গী স্বামী সদানন্দকে দেখেন আত্মমগ্ন ভাবময় সন্ন্যাসীরূপে। নৈশ আহারের পরে দীর্ঘসময় ধর্মবিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে খাপার্দের আলাপ হয়। দ্বিতীয়দিন সকালেই নিবেদিতার সঙ্গে বহুক্ষণ কথাবার্তা বলেন এম জি কেটকার—এবং খুব খুশি হন। বিকালে খাপার্দে নিবেদিতা ও সদানন্দকে নিয়ে গণেশ থিয়েটারে যান—সেখানে বহুসংখ্যক শ্রোতার সামনে নিবেদিতা 'সেজেস্ অব এশিয়া' বিষয়ে বক্তৃতা করেন—অতি সুন্দর ও গভীর

ভাবতাৎপর্যময় সেই বক্তৃতা। নিবেদিতার চরিত্র মনোহর ও আনন্দদায়ক, অতি উচ্চশিক্ষিত তিনি, বুদ্ধিমতী অথচ সহজ সরল—খাপার্দের মনে হয়েছিল। তৃতীয়দিন সকালে নিবেদিতার প্রসন্ন সহৃদয় রূপ দেখে খাপার্দের মনে হয় ঠিক যেন নিজের বোন—তেমনি সাদর আন্তরিক ব্যবহার। মনে হল, তিনি যেন সারাজীবন ধরে নিবেদিতাকে জানেন। কোর্ট থেকে সেদিন ফেরার পরে কথাবার্তার সময়ে খাপার্দে নিবেদিতার বহু বিষয়ে জ্ঞান এবং সহৃদয় ব্যবহার আবার লক্ষ্য করলেন। সন্ধ্যায় গণেশ থিয়েটারে নিবেদিতার 'হিন্দুইজম্ ইন দি লাইট অব মডার্ন থট্' বক্তৃতা অপূর্ব সুন্দর, অতীব বাগ্মিতায় পূর্ণ, নিরতিশয় স্বচ্ছ, মনোহারী ও শিক্ষণীয়। সান্ধ্য আহারের পরে আবার তাঁরা উপরের খোলা ছাতে বসে কথা বললেন। কিছু স্কুল- ছাত্রও এসে উপস্থিত হল। স্বামী সদানন্দ কিছু সময়ের জন্য সেখানে ছিলেন। তাঁর কথাবার্তাও চিত্তোন্নতিকর ও শিক্ষাপ্রদ। আর চন্দ্রালোকিত রাত্রে বারান্দায় বসে নিবেদিতার কথাবার্তা তো তাঁর আগমনের ক্ষেত্রে বিশেষ গভীর ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯ অক্টোবর নিবেদিতা গণেশ থিয়েটারে বক্তৃতা করেছিলেন, তবে সকালে (এই বক্তৃতার উল্লেখ আত্মপ্রাণার নিবেদিতা-জীবনীতে নেই)—এই বক্তৃতাও অনবদ্য, উপস্থিত সকলের উপভোগ্য। নিবেদিতা ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বিশেষভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে,সৎ ও পরিশ্রমী হতে বলেন। বক্তৃতা থেকে ফিরে প্রাতরাশের পরে খাপার্দের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে নিবেদিতা তাঁর হাত দেখেন এবং এমন কিছু বলেন যা বিস্ময়জনক। এম ভি যোশী আসেন, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। তারপর নিবেদিতা অমরাবতী ত্যাগ ক'রে যান। খাপার্দের মনে হয়েছিল—যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি নিবেদিতার সান্নিধ্য পেয়েছেন তবু নিবেদিতার চলে যাওয়ার সময়ে তাঁকে হারানোর বেদনা সুগভীর।

গোখলেকে লেখা নিবেদিতার ৫ অক্টোবর ১৯০৪ তারিখের চিঠি থেকে দেখা যায়—শোলাপুরে যাবার জন্য তাঁকে বার পঞ্চাশেক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ক্রিস্টিনকে নিয়ে সেখানে এবং আরও কয়েকটি জায়গায় যেতে তিনি ইচ্ছুক হন। সে-ব্যাপারে পুনায় তিলকের সঙ্গে, নাগপুরে কোলটকরের সঙ্গে, এবং অমরাবতীতে খাপার্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। এই যাত্রা কিন্তু ঘটেনি।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত ১৯০৫ সালের বেনারস কংগ্রেসের গুরুত্বের কথা আগে বলেছি। বেনারস কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে নিবেদিতা মধ্যস্থতা করেন, এবং তাঁর প্রভাবে সভাপতি গোখলের ভাষণের নরম সুরে কিছু বাড়তি তাপ লেগেছিল।

খাপার্দের এইকালের ডায়েরিতে নিবেদিতার উল্লেখ থাকলেও বেশি-কিছু নেই। ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫ ডায়েরিতে তিলকের বিপুল সংবর্ধনার কথা আছে। 'মিস নিবেদিতা', তিলক ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন 'মিস ক্রিস্টিনকে' সঙ্গে ক'রে—একথা খাপার্দে লিখেছেন। ২৭ ডিসেম্বরের ডায়েরিতে পাই, নিবেদিতা খাপার্দের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য এসেছিলেন। এইদিন গোখলের সভাপতির ভাষণ মডারেটদের পক্ষে গরম ছিল, সেজন্য গোখলে সহর্ষ অভিনন্দন পান। খাপার্দে বিস্মিত হয়ে দেখেন—পূর্বদিন বাঙালী ডেলিগেটরা যদিও স্বদেশী ও বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করতে স্বীকৃত ছিলেন কিন্তু এইদিন যখন তিনি প্রস্তাব তুললেন তখন বাঙালী প্রতিনিধিরা বেঁকে বসলেন। ২৮ ডিসেম্বরের ডায়েরি রাজনৈতিকভাবে মূল্যবান। স্বদেশী ও বয়কট প্রস্তাব সমর্থনের জন্য চরমপন্থীরা ক্যাম্পে-ক্যাম্পে ঘুরেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা বয়কট প্রস্তাব পাস করাতে পারেন—প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার হুমকি দিয়ে। এইদিন

সকালে খাপার্দে 'জেনারেল টেন্টে' গিয়েছিলেন বয়কট প্রস্তাব নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলার জন্য—সেখানে নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বয়কট প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দিতে রাজি হয়েছিলেন। ২৯ ডিসেম্বর পুনশ্চ বয়কট প্রস্তাব নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। মডারেটরা নানা ছুতোয় কেবলই বাধা দিতে থাকেন। খাপার্দের বক্তৃতা কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের নিকট থেকে উল্লসিত অভিনন্দন লাভ করে। এইদিন বন্দেমাতরম শোভাযাত্রা হয়। ৩০ ডিসেম্বরের ডায়েরিতে আছে—দুপুরে সরলা দেবী অসাধারণ সুরেলা গলায়, যেন দৈবী কণ্ঠে, বন্দেমাতরম গান করেন। তারপর বন্দেমাতরম শোভাযাত্রা প্যাণ্ডেল প্রদক্ষিণ করে। তাতে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন যোগদান করেন—অন্য বাঙালী মহিলাদের যোগ দিতেও প্রণোদিত করেন। ১ জানুয়ারি ১৯০৬-এর ডায়েরিতে খাপার্দে বেনারস কংগ্রেসের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নিজের ভূমিকায় খুবই তৃপ্ত। বলেছেন, মডারেটরা হতমান, তাদের কোনো নেতাই মনে দাগ কাটেন নি। লাজপত রায় প্রভৃতির চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়া, তিলকের উপযুক্ত সাহায্য ইত্যাদির কথা বলেছেন। "নিবেদিতা অতীব শক্তিশালী আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি এক উত্তম ভাষণ দিয়েছেন।"

Nivedita in Khaprade Diary

AMARAVATI
Thursday, October 16, 1902.

In the morning while I was studying to-day's appeal M.V. Joshi sent a note enclosing a letter from Sister Nivedita, saying that she would arrive here today at 11-30 a.m. I had to make great haste and hurry up tthe necessary arrangements. I got Babu's house [?] [at] which Mrs Annie Besant was lodged, made ready for Sister Nivedita, and after a hurried breakfast went to the Railway station to receive her. [...] She came with a Bengal gentleman. She is nice looking person with very good and engaging manners. I sent her and Babu to my house [...] I went to court, Mr Hare was busy with a past heard appeal. So I sat on and ultimately came away requesting Joshi to obtain adjournments in my cases. I had to do this and be able to make arrangements for the proper reception of Sister Nivedita. I went to D.B. Office for a few minutes, gave a legal opinion, and returned home. I had a long talk with Sister Nivedita and the Babu who is a Swami. We settled the programme and I sent off a few telegrams at her request. In the evening I arranged seats for her in the upper verandah, and a number of people came to her, Bodhankar, V.K. Kale, G.G. Keskar, and a large number of others came. She speaks very well and is a Vedanti of Swami Vivekanand School. The Swami is very good and contemplative. She lives in complete Indian style. After dinner we sat speaking for a long time on religious subjects.

AMARAVATI
Friday, 17 Oct. 1902.

In the morning I did not feel well, but had to go Court as usual. Fortunately the appeals to be argued had already been studied. So the work of refreshing my memory was comparatively easy. I went upstairs and saw Sister Nivedita. N.G. Ketkar had a long interview with her, and he came away very much pleased. I had no time to ask him as to what the conversation was about. After a hasty breakfast I went to Court...I returned home with Dadib [...] I felt very tired so I had something to eat and then sat smoking with Swamiji. A little later I drove to Ganesh Theatre with Sister Nivedita and Swamiji and the former delivered her lecture on "Sages of Asia" to a very large audience. It was a very beautiful lecture, very suggestive. After it I took her and Swami to a drive in my big carriage through the Camp in moon-light. She is a very delightful person, very learned, clever and yet very simple.

AMARAVATI
Saturday, 18 October 1902.

In the morning, I read today's appeals as usual and then went upstairs to see Sister Nivedita. She is very good and kindly. She deals one with the same winning and real manner of a Sister. Indeed I feel as if I have known her all my life. After breakfast I went to Court with Narayan...I returned home and sat talking with Sister Nivedita. She is very well informed and sympathetic. In the evening I took her to Ganesh Theatre. She delivered a splendid lecture, exceedingly eloquent, exceedingly clear and exquisitely instructive on "Hinduism in the light of modern thought." After it I returned home with her, and after the evening meal sat talking on the flat-roof upstairs. Indeed these moonlight conversations are quite a feature of her visit. Some of the High School boys came and they also sat round about us. The Swamiji was there for a time. Her conversations are very edifying and very very instructive.

AMARAVATI
Sunday 19 Oct. 1902

I got up as usual in the morning and at 8 a.m. took Sister Nivedita to the Ganesh Theatre for her lecture. I have a bad throat and so did not speak. So the Sister began her speech without any introduction. She spoke very splendidly and everyone present appreciated it. It was advice to students to preserve Brahmacharya, be honest, hard-working and all that. After the lecture I brought her home and we sat talking for a long time. I forgot to mention that Pundit Oke [?] has come and is my guest. After breakfast I and Sister Nivedita and Swami Sadanand sat talking. She understands palmistry, examined my hand and said somethings that struck me as very shrewed observations. M.V. Joshi called to see her and sat in the verandah. They had not a very long interview. After he went Sister made herself a little tea, and packed her things. I accompanied her to Badnera [?], Swami of course went with her. I saw them off...Sister and Swami went to Surat. I miss them very much, though the period in which we were together was so short.

BENARES
Tuesday 26 December 1905

Tilak came early in the morning with Wapudeosad [?] Joshi. He got down yesterday at Allahabad. He is staying in the room next to mine. A large number of people came to see him. They worship him like a God and he deserves it. We sat talking for a long time. Miss Nivedita came to see us and went away soon. She had Miss Christine with her, We thought of

going to the Temperance Congress but did not eventually go. We sat discussing some resolutions with Lala Lajapat Raya, Babu Bhupendranath Sen, and other delegates. After evening meal I, Brahma, Palekar, Dr Moonje, and others went out into Bengal Camp and Mr P.C. Ray told us that Bengal would support the Swadeshi resolution. Then we went to Lala Lajapat Raya's tent. He had a meeting of the Punjab Delegates. After it, we saw him and sat discussing with him and his friends, the question of Swadeshi resolution.

BENARES
Wednesday 27 December 1905

In the morning Tilak went to the Railway Station to see Mr Babu Surendranath. Miss Nivedita came with Swami to see me and we sat talking. Many people came as usual. Mr Muhajani [?] and his son came. Mundle, Landge and Deva are also here. So are also Peshwa and others. Lala Madhaskar [?] went yesterday to Lucknow to receive his Royal Highness and returned this morning. The Congress began today at 1-30 p.m. Mr Chintamani put me on the dias. Gopalrao Bootee [?] who came this morning sat with me. Mohini was with him. The Pandal is very well constructed and was full. Mr Gokhale's speech, as president, was not quite in the ultra moderate style and was cheered in its stronger parts. The Subject Committee proceedings were not quite as usual. It was held in a very cramped place on the dias, and Gokhale did not count votes and decided matters on his impressions. I moved Swadeshi resolutions. I was surprised to see Bengalees opposing them. The Madras people also opposed on other grounds. The whole thing was unsatisfactory. We broke up at 8 p.m.

BENARES
Thursday 28 December 1905

Last night after finishing the diary, I, Brahma, Palekar, Durani, and others went out into Bengal Camp and canvassed, We first went to a Behar tent, one of them came over to my views. Then I met G.N. Ray who told me that the Bengal delegates had held a meeting a few moments before and came to the resolution to support the Swadeshi and boycott resolution. Then we went to the Punjab Camp and found that all the Punjab delegates were ap... [?] in Lala Lajapat Raya's tent. We went there and listened to the discussions. They resolved to oppose the resolution of thanks to H.H. the *Prince of Wales* in the Subjects' Committee. After the meeting we sat talking with Lala Lajapat Raya. Mr Bhagatram and Mr Rambhuja Datta Chaudhuri, and others. We returned home after midnight. I got up early this morning and sent a letter to the President informing him that we would oppose the thanking resolution

and would press for the Boycott resolution in the Congress itself. I went also to the general tent to speak to Babu Surendra Nath Banerjia. Sister Nivedita was there. They agreed to press for the boycott resolution. To be in time for moving an amendment on the thanking resolution, I [...] and went to the Pandal without taking my breakfat. Tilak also came, Mr Dutt sent for him and me. I said we would not give up our opposition to the thanking resolution. It turned out that Madan Mohan Malaviya had not correctly stated facts. Dr Moonje was with me last night and to-day. He was very strong on the points. Daji Abaji Khan intervened and Mr Gokhale himself asked it as a favour to give up my opposition. We did so, on condition they accepted our boycott resolution. They did so. The Thanking resolution was "carried" but not "unanimously". I spoke on the expansion of Legislative Council. My speech was very very successful and the whole Pandal cheered, and my expression "double distilled" became the watch word. In the Subject Committee the boycott resolution was carried after great opposition.

BENERAS
Friday December 29, 1905

In the morning things again appeared to be going wrong about our boycott resolution. It was not printed and Gangaprasad Sharma said that there was an amendment. I got very angry. So did Tilak, Dr Moonje, Brahma, Daji and all. There was great excitements but the amendment eventually turned out to be very trivial and we accepted it. In the aftrnoon the subject was reached and I spoke on it. The whole Congress cheered me tremendously and my expression "Scientific Live" was taken up by all and repeated from mouth to mouth. We joined in a Bande Mataram procession also and on the platform they received me with Bande Mataram. The sitting lasted till 8 p.m. and was adjourned to tomorrow morning at 8.30 a.m.

Saturday 30 December 1905

Todays morning sitting was not finished till 12 noon. After it, Sarala Devi sang Bande Mataram. Her voice is extraordinarily sweet and capable of a very high pitch. It was quite divine in its melody and the whole Congress stood spell-bound. I never heard such sweet singing and so effective before. Then we formed a Bande Mataram procession and walked round the Pandal making a Pradakshin. Sister Nivedita and Miss Christine joined us and they helped to bring the Bengali ladies in.

BENERAS—train
Monday January 1, 1906.

I got up early in the morning, hastily dressed, said good-bye to Dr Moonje, Dr Lunaya [?], Mr Ranada and others and went to the Kashi

station. Then Mudholkar had arranged for a reserved composite carriage for himself, myself, Dada Bedamkar [?] and Joshi and his family. We all got into it. Tilak came to see us off. So did Mr Gangaprasad Varma and many others. Our train started at 8 a.m. I had ample time in the train to think over the events of the past week at Beneras. The so-called moderates lost all along the line. Wacha, Sitalvad and others who came with a mandate from Sir Perogsha Mehta, could not make any impression. Dr Moonje, Dr Lunaya both of Nagpur turned out very strong and useful. Brahma helped with a will and so did Palekar and Durani [?]. If it was not for the assistance of these people I should not have been able to accomplish anything. Above all there was Tilak and his help was very material. Lala Lajapatraya is a strong radical and very useful. Bhagatram is a very nice strong man. Both G.N. Roy and R.N. Ray are very good men, more particularly the latter. For myself, my star appears to have been in the ascendant, and I became quite as popular here as at Amaravati or elsewhere. Children have as usual taken to me very much and the younger generation applauded whatever I did or said. Sister Nivedita came out very strong and made a very good speech. Ramabhuj Dutt Chaudhari appears to hob-nob both with the moderates and the radicals. I am sorry he did not impress me much. M.K. Padhya of Nagpur behaved rather curiously and appeared to fall behind even the moderates. M.V. Joshi was strongly with me all through. So was Dada Badarkar [?]. Chandavarkar was in the train. I exchanged a few words with him when he stopped to talk but that was all.

নির্দেশিকা

[শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট বাদ দেওয়া হয়েছে]